সূচীপত্র

মাঘ, ১৩৫৪

সম্পাদকীয় কার্যালয় ঃ৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬।

*তিমিরবরণ ভট্টাচার্য ১৯১০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি সরোদ শিখতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র ১৮ বৎসর বয়সেই এই যন্ত্রে অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁর ছাত্র। তিমিরবরণ ১৯৩০ সালে উদয়শঙ্করের শিল্পীসংঘে যোগদান করেন এবং তাঁর সঙ্গেই আমেরিকা, বৃটেন এবং ইউরোপের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। সে সব দেশে সঙ্গীতের গুণগ্রাহী মাত্রেই তিমিরবরণের প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে ঐকতানবাদনের একজন অভিনব পথপ্রদর্শক হিসেবে তিমির-বরণ যথেষ্ট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেছেন।
তিমির বরণ... সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতান সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেন:
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IR 289

ফাল্গুন, ১৩৫৪

সম্পাদকীয় কার্যালয়ঃ ৬০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬।

"নিমন্ত্রিতেরা সকলেই এসেছেন...

এবার চা খেতে খেতে চলবে খোশগল্প...গল্পের আসর হয়ত বেশ ভালোভাবেই জমে উঠবে কিন্তু চা খেয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই নিরাশ হবেন। তার কারণ গৃহকর্ত্রী চা তৈরি করেছেন একটা ভেজা আর ঠাণ্ডা পট-এ। তিনি হয়তো জানেন না যে ভালো চা করতে হ'লে চা ভেজাবার আগে পটটি বেশ ভালো করে শুকিয়ে গরম করে নিতে হয়।"

আয়েশ-আরামের জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক যখন তখন চা খেয়ে থাকেন। কিন্তু ভালো চায়ের স্বাদ যে কী তা অনেকেই জানেন না। এটা কম দুঃখের কথা নয়। অথচ ভালো চা তৈরি করা কঠিন নয় এবং খরচও তাতে মোটেই বেশি পড়ে না। শুধু পাঁচটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই চমৎকার চা তৈরি করা যায়। স্বাদে গন্ধে সবদিক দিয়ে চা-টা ভালো করতে হলে এই নিয়ম ক'টি মনে রাখবেন এবং আপনার বাড়িতে চা করবার সময় সবাই যাতে এগুলো মেনে চলেন সে দিকে নজর রাখবেন।

চা তৈরির পাঁচটি সহজ নিয়ম

১। টাট্‌কা জল একবার মাত্র ফুটিয়ে ব্যবহার করবেন ২। চা ভেজাবার আগে পটটা গরম করে নেবেন ৩। মাথা-পিছু এক চামচ আর ঐ সঙ্গে আর এক চামচ বেশি চা দেবেন ৪। চা-টা তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ভিজতে দেবেন ৫। কাপে চা ঢালার পর দুধ চিনি মেশাবেন।

ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও তামিল ভাষায় "চা তৈরির খুঁটিনাটি" নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড, ১০১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় তাদের উদ্দেশে চিঠি লিখলেই পুস্তিকাখানা বিনামূল্যে আপনার নামে পাঠানো হবে।

★

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 296

চৈত্র, ১৩৫৪

পরিচালক মণ্ডলী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, অরুণ মিত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় কার্যালয়: ৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬।

“নিমন্ত্রিতেরা সকলেই এসেছেন...

এবার চা খেতে খেতে চলবে খোশগল্প...গল্পের আসর হয়ত বেশ ভালোভাবেই জমে উঠবে কিন্তু চা খেয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই নিরাশ হবেন। তার কারণ গৃহকর্ত্রী চা তৈরি করেছেন একটা ভেজা আর ঠাণ্ডা পট-এ। তিনি হয়তো জানেন না যে ভালো চা করতে হ'লে চা ভেজাবার আগে পট্‌টি বেশ ভালো করে শুকিয়ে গরম করে নিতে হয়।”

আয়েশ-আরামের জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক যখন তখন চা খেয়ে থাকেন। কিন্তু ভালো চায়ের স্বাদ যে কী তা অনেকেই জানেন না। এটা কম দুঃখের কথা নয়। অথচ ভালো চা তৈরি করা কঠিন নয় এবং খরচও তাতে মোটেই বেশি পড়ে না। শুধু পাঁচটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই চমৎকার চা তৈরি করা যায়। স্বাদে গন্ধে সবদিক দিয়ে চা-টা ভালো করতে হলে এই নিয়ম ক'টি মনে রাখবেন এবং আপনার বাড়িতে চা করবার সময় সবাই যাতে এগুলো মেনে চলেন সে দিকে নজর রাখবেন।

চা তৈরির পাঁচটি সহজ নিয়ম

১। টাট্‌কা জল একবার মাত্র ফুটিয়ে ব্যবহার করবেন ২। চা ভেজাবার আগে পট্‌টা গরম করে নেবেন ৩। মাথা-পিছু এক চামচ আর ঐ সঙ্গে আর এক চামচ বেশি চা নেবেন ৪। চা-টা তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ভিজতে দেবেন ৫। কাপে চা ঢালার পর দুধ চিনি মেশাবেন।

ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও তামিল ভাষায় “চা তৈরির খুঁটিনাটি” নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একসপ্যানশন্ বোর্ড, ১০১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় ভাষার উল্লেখ করে চিঠি লিখলেই পুস্তিকাখানা বিনামূল্যে আপনার নামে পাঠানো হবে।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একসপ্যানশন্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IX 296

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৫৫

সম্পাদকীয় কার্যালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ॥

তিমিরবরণ ভট্টাচার্য ১৯১০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি সরোদ শিখতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র ১৮ বৎসর বয়সেই এই যন্ত্রে অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁর ছাত্র। তিমিরবরণ ১৯৩০ সালে উদয়শঙ্করের শিল্পীসংঘে যোগদান করেন এবং তাঁর সঙ্গেই আমেরিকা, বৃটেন এবং ইউরোপের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। সে সব দেশে সঙ্গীতের গুণগ্রাহী মাত্রেই তিমিরবরণের প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে ঐকতানবাদনের একজন অভিনব পথপ্রদর্শক হিসেবে তিমিরবরণ যথেষ্ট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেছেন।
তিমির বরণ ... সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতান সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেন:
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যান্‌শন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

পরিচয়

সপ্তদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৫৪

মহাত্মা গান্ধী

আততায়ীর হাতে গান্ধীজীর জীবননাশ সেই মহৎ জীবনের পক্ষে মহত্তম পরিসমাপ্তি। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের পক্ষে তা এক ক্রূরতম কলঙ্কের দাগ হয়ে থাকবে। তার ইতিহাসে এ জাতীয় গ্লানিকর ঘটনা সম্ভবত আর ঘটেনি। পৃথিবীর সামনে আমরা মহাত্মা গান্ধীর জাতি বলে উন্নত মস্তকে দাঁড়াতে পারতাম। কিন্তু এবার থেকে সঙ্গে সঙ্গে নত মস্তকে আমাদের স্বীকার করতে হবে—আমরা আততায়ী গড্‌সেরও জাতি। দু' হাজার বছরেও য়িহুদীদের এ পরিচয় পৃথিবীতে মুছে যায়নি যে, তারা জুডাসের জাতি; এ কথা বোঝানো সম্ভব হয় নি যে, মানবপুত্র যীশুও তাদেরই সন্তান। অবশ্য সে ঘটনার সঙ্গে এ ঘটনার তুলনা চলে না। বরং তুলনা হয়ত চলে এব্রাহাম লিন্‌কনের হত্যার সঙ্গেই গান্ধীজীর হত্যার। কিন্তু তুলনা নিষ্প্রয়োজন। যা এক্ষেত্রে স্মরণীয় তা এই: এক জনের পাপেই শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরদিনের মত মসীলিপ্ত হল না। এই বীভৎসতা শুধু এক জনের ব্যক্তিগত বিকৃতি মাত্র নয়, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একেবারে আকস্মিক বা অভাবনীয় ঘটনাও নয়। হত্যার এ চক্রান্ত চলেছিল আগে থেকেই, এবং মহাত্মাজীর হত্যা-সংবাদে ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও রাজা-রাজড়া ও ধনী-মানীরা উল্লাস প্রকাশ করেছে, বহু ক্ষেত্রে তারা মিষ্টান্ন বিতরণও করেছে। আইনের বিধি-বিধানে তাই যা'ই বলুক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—এ মহাপাপের নৈতিক দায়িত্ব এক-আধটি ঘাতকের নয়, আরও অনেকের; এর রাজনৈতিক দায়িত্বও জাতির একটি বৃহৎ অংশের। তাই ইতিহাসে আমাদের এ অপরাধ আরও কালিমাময় হয়ে দেখা দেবে—যদি এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তে আমরা এই বিষাক্ত নৈতিক ও রাজনৈতিক চক্রান্তের মূলোচ্ছেদ না করি।

বলা বাহুল্য, এ প্রয়োজন আমাদেরই, গান্ধীভক্তদের দিক থেকে এর মূল্য বিশেষ নেই। কারণ, গান্ধীজী শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতা ছিলেন না, যদিও সে নেতৃত্বের জন্যই স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর পরিচয় ও সাধনা পরিব্যাপ্ত হতে পেরেছে। তবুও, এ কথা স্মরণীয়, এক বিশেষ জীবন-দর্শনের তিনি প্রবক্তা ছিলেন; এক বিশেষ জীবন-সাধনারও তিনি ছিলেন সাধক। তাই আততায়ীর হাতে তাঁর নিধন নেই। বরং আত্মদানের মহিমায় তাঁর দর্শন উজ্জলতর হয়ে উঠবে, সে সাধনাও শক্তিলাভ করবে। আর, সে জীবন-দর্শন যদি নিছক ভাবনার বিষয় না হয়, ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটাবার মত হয়, তা হলে ব্যক্তি-বিশেষের বা মণ্ডলী-বিশেষের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে না, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তা রূপায়িত হবে, পৃথিবীর মানুষও তাকে স্বীকার করবে।

গান্ধীজী তাঁর আদর্শকে নিছক ভাবনার বিষয় বলে মনে করতেন না, বরং কর্মক্ষেত্রে সাধনার বিষয় বলে জানতেন। ব্যক্তিগত একান্ত সাধনার বিষয় বলেও মানতেন না, লোক-জীবনে তা মূর্ত করবার মত বলেই মনে করতেন। এ জন্যই গান্ধীজীর জীবন-দর্শন জন-সমাজেরও আলোচ্য,—সামাজিক বিচারের ও সামাজিক পরীক্ষার বস্তু।

—

গান্ধীজীর এই জীবন-দর্শন সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য নয়। কারণ, যুক্তিতর্কের সুতীক্ষ্ণ তরবারিমুখে সে পথ পরিষ্কার করতে হয় না। ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে গান্ধীজী তাঁর জীবন-দর্শন রচনা করতে বসেননি। বরং অনেকেই জানেন, অধ্যয়নে তাঁর আস্থা ছিল কম। এমন কি, তাঁর সে অনাস্থাই তাঁর অনুগামীদের কারো কারো পক্ষে মারাত্মক ঔদাসীন্য ও অশ্রদ্ধায় পরিণত হতে দেখা গিয়েছে। গান্ধীজীর প্রধান আস্থা ছিল কায়িক পরিশ্রমে আর তারপর সৎচিন্তায়, বিশেষ করে ভগবৎ-চিন্তায়। তাঁর সুগভীর আস্থা ছিল মানুষের ওপর—মানুষের অন্তর বিধাতার আসন। এ মানুষ অবশ্য আপনার মহিমায় মহিমান্বিত নয়, বিধাতার মহিমারই স্বাক্ষর। তাঁর অন্তরের সাক্ষ্যই হল বিধাতার বাণী। কান পাতলে সেই অন্তর্বাণী, 'ইনার ভয়েস্', শোনা যায়। অবশ্য আমরা তা প্রায়ই শুনি না। তা শুনতে গিয়েও আবার ভুল করি আমাদের নিজেদের মোহবশে, অক্ষমতার বশে। এই অন্তরের সাক্ষ্যকে তবু চিনবার উপায় আছে; ইন্দ্রিয় সংযম ও চিত্তশুদ্ধি তার এক দিকে, জীবনযাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতাতেও তার পরীক্ষা হয় অন্য দিকে।

মোটামুটি এ সব সহজ কথা এ দেশের কোনো মানুষের পক্ষে বুঝতে কষ্ট হয় না। আমরা আমাদের বহু কালের শিক্ষা-দীক্ষার ফলে এসব কথা প্রায় উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করি। গান্ধীজীও তা'ই করেছেন। গুজরাতের বৈষ্ণব বানিয়া পরিবারে তাঁর জন্ম, বিশেষ করে সে অঞ্চলের জৈনধর্মের প্রভাব ছিল তাঁর পরিবার-পরিজন-দের ওপর বেশি। তাই মাছমাংস প্রভৃতি আহারের প্রতি একটা বিরাগ তাঁর স্বভাব-

গত হয়ে যায়, জীবন-যাত্রায় ও সাধারণ ভাবে তিনি ভক্তি ও অহিংসার একটা পরিবেশের মধ্যেই মানুষ হন। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি একটা সন্দেহও তাঁর মজ্জাগত ছিল। এসব বিষয়ে তিনি সনাতনী হিন্দু।

ভারতীয় হিন্দুর এ সহজ ধর্মকে যাচাই করতে গিয়ে গান্ধীজী দেখলেন—সভ্যতা, তার মানে উনবিংশ শতাব্দীর ধনিকতন্ত্রী সভ্যতা,—এ ধর্মকে বিশেষ কোনো মর্যাদা দেয় না। মানুষের অন্তরের সত্যকে তা উপেক্ষা করে বাড়িয়ে তুলেছে শুধু উপকরণ, যন্ত্রসৃষ্ট বাহুল্য, বিলাসিতা ও দারিদ্র্য, বৈষম্য ও হিংসা। সভ্যতার কোনো বিশেষ মূল্য তাই গান্ধীজী খুঁজে পেলেন না। ধনিকতন্ত্রের কীর্তি ও অপকীর্তি তিনি উপলব্ধি করলেন না; দেখলেন ধনিক পরিচালিত যন্ত্রও সমাজব্যবস্থারই কুৎসিৎ হৃদয়হীন রূপ। তাঁর এই অনুভূতি আরও সুদৃঢ় হল যেটুকু সামান্য বিদেশীয় চিন্তার তিনি সংস্পর্শে এলেন তার ফলে—এর মধ্যে বাইবেলই প্রধান, আর অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতম হলেন টলস্টয়; থরো ও রাস্‌কিনের নামও স্মরণীয়। ধনিকতন্ত্রের ক্লেদে পীড়ায় এঁরা অনেকেই তখনো (রুসোর মত ?) বিশ্বাসী হয়েছিলেন সরল "প্রাকৃতিক জীবনে", অর্থাৎ এক কল্পিত ও আদর্শ আদিম সভ্যতায়—গান্ধীজীর ভাব-দৃষ্টিতে যা মনে হল ভারতের ভগ্নপ্রায় গ্রাম্য জীবনযাত্রারই যেন প্রতিলিপি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমাদের দেশের মনস্বীদের চিন্তায় কিন্তু ছায়াপাত করে একদিকে হেগেল-কাণ্ট প্রভৃতি বিদেশীয় দার্শনিক; স্পেন্‌সার, হাক্‌স্‌লি কোঁৎ প্রভৃতি মনস্বী, ও বিপুল ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতা। অন্য দিকে পশ্চিমের আঘাতে-প্রেরণায় নব-জাগ্রত ভারতীয় গরিমাবোধ আমাদের ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, জীবনে এক প্রচণ্ড ঝড় তোলে। গান্ধীজীর জীবনে সে সংগ্রামের কোনো পরিচয় নেই।—ভারতবর্ষের চিরদিনকার সরল পল্লীকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার ওপর পূর্ণতর আস্থা নিয়েই তিনি অগ্রসর হন জীবন-ক্ষেত্রে।

নিজের জীবন থেকেই তাঁর পরীক্ষা শুরু হয়, আর সমস্ত জীবন জুড়ে চলে এ পরীক্ষা। তাই গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন 'সত্যের পরীক্ষা।' এ পরীক্ষায় তিনি সময়ে সময়ে এক-আধটুকু মত পরিবর্তন করেছেন, কোনো কোনো ধারণা পরিবর্জন বা পরিবর্ধন করেছেন। যেমন, যতদূর জানি, এক সময়ে তিনি হিন্দুর জাত্যন্তরে বিবাহ অনুমোদন করতেন না; পংক্তি-ভোজন বিষয়েও তাঁর নানা সংশয় ছিল। যন্ত্রমাত্রেরই বিরোধী হলেও তিনি ক্রমে সেলাইর কল ও সাইকেলের পক্ষপাতী হন, এবং ওরূপ যন্ত্র-উৎপাদনের বড় বড় কারখানা জাতীয় সম্পত্তি করবার তিনি পক্ষপাতী বলে মত প্রকাশ করেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু গান্ধীজীর জীবনী-পাঠক মাত্রই জানেন—তাঁর জীবনাদর্শের কোনো মূলসূত্র তিনি পরিবর্তন করেননি। আরও যা বুঝবার কথা তা এই-যে তাঁর মূল আদর্শ থেকে তাঁর কোনো কর্ম বিচ্ছিন্ন নয়, কোনো লেখা

বা কথায় সে আদর্শের অস্বীকৃতি নেই—অসঙ্গতি অনেক সময়েই এ জন্ত যে, এ আদর্শ ক্রমশ উপলব্ধি করাই সম্ভব; গান্ধীজী বাস্তবকে উড়িয়ে দিয়ে চলতে পারেন না। তাছাড়া দেখা যাবে অসঙ্গতি বা সংশয়ের মূল হেতু রয়েছে তাঁর মূল জীবন-দর্শনেই। সে দর্শন ব্যাপক হলেও দ্বন্দ্বমুক্ত নয়। এ মূল দর্শন একত্র সুনিবদ্ধ হয় সম্ভবত সর্বাগ্রে গান্ধীজীর 'ইণ্ডিয়ান্ হোম্ রুল' বা 'হিন্দ্ স্বরাজ' নামক গ্রন্থে। পরবর্তী কালে যে বিপুল গান্ধী-সাহিত্য 'ইয়ং ইণ্ডিয়া', 'নব জীবন' ও 'হরিজনের' পাতায় দিনের পর দিন গড়ে ওঠে তা সেই দর্শনের নানা দিকে নানা ক্ষেত্রে ব্যাখ্যান ও প্রয়োগমাত্র, এ কথা বললে ভুল হবে না।

গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের প্রধান সত্য বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে তাঁর ভগবৎ-বিশ্বাস, সেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভক্তিবাদ। বলা বাহুল্য, বাইবেল ও কোরানেরও মূল এই ভক্তিবাদই। আর এই ভক্তিসূত্রে গান্ধীজী পৃথিবীর সমস্ত মানবধর্মের মধ্যে ঐক্য ও সমস্ত মানব সমাজের মধ্যে সাম্যও উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। এ কথা স্বীকার করতেই হবে—গান্ধীজী যতই একে সনাতন ধর্ম বলুন, এ "সনাতন" হিন্দু ধর্ম নয়, তাঁর অহিংসা তত্ত্বও হিন্দুর বহুশাস্ত্রে—এমন কি গীতা বা মহাভারতেরও সহজ-বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রতিপাদ্য তত্ত্ব নয়। তথাপি গান্ধীজীর ভক্তিবাদ হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মেরই একটি বিশেষ ধারা। তাই তাঁর অহিংসাবাদ ও আচার বিচার, ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয়নিরোধ এমন কি কৃচ্ছ্রসাধন, প্রার্থনার বিশেষ রীতি (রামধুন), ও তাঁর গীতা, তুলসীদাসের প্রতি ভক্তি এবং তাঁর প্রচারিত 'রামরাজ্য' প্রভৃতি আদর্শ অবিচ্ছেদ্য ভাবে তাঁর অধ্যাত্মবাদের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর অন্য ধর্মের ভক্তিবাদে, ইস্লামে বা খ্রীষ্টধর্মে, ভক্তিবাদের এ সব অনিবার্য অঙ্গ নয়।

বলা বাহুল্য, ভক্তিবাদ যতই সরল হোক, অন্যান্য অধ্যাত্মবাদের মতই মানুষের জীবন-যাত্রার সমস্ত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা তাতে সম্ভব হয় না। গান্ধীজীরও অনেক মীমাংসাই তাই সাধারণ বুদ্ধিতে দুর্বোধ্য ঠেকে—অন্তর বাণীর বা ইনার ভয়েসের কথা যতই মেনে নিই, মেনে নিতে বাধা পাই যে বিহারের ভূমিকম্প হল বিধাতার রুদ্র রোষ—হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। কিন্তু গান্ধীজীর পথ যুক্তি-প্রধান নয়, হৃদয়-প্রধান। হৃদয়ের যুক্তি অপরের পক্ষে সহজ-বোধ্য নয়।

অথচ গান্ধীজী অধ্যাত্মবিলাসী ভক্তিবাদী নন, একান্ত সাধকও নন। তিনি কর্মযোগী। সংসারে সমাজে রাষ্ট্রে নানা দিকে তিনি অক্লান্ত নিষ্ঠায় নানা প্রয়াসে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কোথাও অবশ্য এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর এই

ভক্তিবাদকে তিনি বিস্মৃত হন নি: মানুষের জীবনের মূলকেন্দ্র সেই পরমাত্মা, সত্য; তাঁরই সুপরিচিত নাম 'রাম'। সেই সত্য লাভের পথ হল সত্য জীবন-নীতি বা এথিক্‌স—তা চিত্তশুদ্ধির নীতি—অহিংসা, অনাসক্তি প্রভৃতি বাহ্য ও আন্তরিক গুণগ্রামের অনুশীলন; আব কর্তব্য পালন বা ধর্ম পালন। গান্ধীজীর এই কর্মকাণ্ডের প্রধান কথা হল তাই—কায়িক পরিশ্রম বা 'যজ্ঞ'। শুধু কায়িক পরিশ্রম নয়, এর আসল কথা—প্রত্যেককেই জীবনযাত্রার উপকরণ নিজ-শ্রমে বা পারিবারিক সহযোগে উৎপন্ন করতে হবে। শ্রম-বিভাগের পথে সভ্যতা-বিকাশ নয়, যন্ত্রোৎপাদনে শ্রম-লাঘবও নয়; শহর, এমনকি কলকারখানা, যান-বাহন প্রভৃতির যথাসম্ভব সঙ্কোচ, পল্লীতে জনপদে সমাজের সভ্যতার বিকেন্দ্রীকরণ; রাষ্ট্রীয় শাসনের বিলোপ-সাধন; প্রধানত আত্ম-শাসন, ও সেই সঙ্গে পল্লী পঞ্চায়েতের বিধান নিয়মন, ইত্যাদি। এই গান্ধীজীর ইকোনমিক্‌স্ ও সমাজতত্ত্ব। অবশ্য এই ইকোনমিক্‌স্‌ও তাঁর এথিক্‌স্ (নীতিবোধ) ও ফেথ্ (ধর্মবোধ)-এরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কারণ, সমাজের এ পরিবর্তন পুনরায় সম্ভব প্রধানত ব্যক্তির 'হৃদয় পরিবর্তনে' আর হৃদয় পরিবর্তন সম্ভব অহিংস কর্মযোগে।

গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের কাঠামোটি এইরূপ। বলা বাহুল্য, এ টলস্টয়েরই জীবনাদর্শ। টলস্টয়ের মত গান্ধীজীও মনে করতেন সভ্যতা একটা বিলাস ও বিকৃতি, "প্রাকৃতিক সরলতাতেই" মানুষের মুক্তি ও শ্রেয়ঃলাভ সম্ভব। রাষ্ট্র শুধু একটা পেষণযন্ত্র, হিংসার মূর্তিমান প্রতীক। এজন্যই নৈরাজ্যবাদী বলেও গান্ধীজী নিজের পরিচয় দিতেন। তাঁর নৈরাজ্যবাদ অবশ্য ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান বা আধুনিক কোনো বিজ্ঞানের থেকে গৃহীত নয়, ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মবোধের ওপরেই তার প্রতিষ্ঠা।

একদিকে বাকুনিন্, ক্রোপটকিন্ প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদীরা, অন্য দিকে মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্ প্রভৃতি সাম্যবাদীরা—এ দু' দলেই রাষ্ট্রের এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন প্রধানত পণ্ডিত ও মানব-হিতৈষী। গান্ধীজীর তাঁদের সঙ্গে মতের সাদৃশ্য থাকলেও তিনি ছিলেন টলস্টয়-পন্থী। রাষ্ট্র যে শ্রেণী-বৈষম্যের ফল, এবং শোষক শ্রেণী নির্মূল না হলে যে রাষ্ট্রও "বিশুষ্ক" হয়ে যাবে না—এ কথা গান্ধী বা টলস্টয় মানতেন না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিও তাঁদের ছিল না, এ শ্রেণীবোধও তাঁরা মানতেন না।

গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন—শোষক-শ্রেণীর উচ্ছেদ না করে শোষণেরই বরং অবসান ঘটানো যাবে, আর সে পরিবর্তন সম্ভব হবে সত্যাগ্রহের বা অহিংসার প্রয়োগে। শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা শোষণকারীকে নির্মূল করে নয়, অহিংসার দ্বারা, "সত্যাগ্রহের" দ্বারা শোষকের হৃদয় পরিবর্তন করে—নিজের চিত্তশুদ্ধির দ্বারা অপরের শুভ চেতনাকেও প্রবুদ্ধ করে। কারণ মানুষ আসলে যে ভালো।

এইটিই গান্ধীজীর বিশেষ সাধনাপদ্ধতি—সত্যাগ্রহ বা অহিংসার পথে লোক-চিত্তজয়—হৃদয় পরিবর্তন। থরো যে পদ্ধতির কথা ভেবেছিলেন তা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীর "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ"—তাতে অহিংসা এমন কায়মনোবাক্যে আবশ্যিক নয়। টলস্টয় অবশ্য খ্রীষ্টের জীবন বাণী গ্রহণ করে নির্বিরোধ অহিংসার এই পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেন। কিন্তু গান্ধীজী ছাড়া ইতিপূর্বে রাষ্ট্র ও সমাজক্ষেত্রে কেউ তো প্রয়োগে করতে এমনভাবে অগ্রসর হননি।

অবশ্য এ পরীক্ষাও একেবারে নতুন নয়। মানুষের ইতিহাসে সভ্যতারই ক্রমবিস্তারের সঙ্গে হিংসার অপেক্ষা অহিংসার শক্তিরই ক্রমাবিষ্কার ঘটেছে। গুহাবাসী মানব-পিতা মতান্তর হলেই লগুড়ের দ্বারা তার মীমাংসা করে নিত; আজ মতান্তর হলে আমরা আলোচনা করি, কলহ করি, বিচারালয়ে যাই, অবশ্য বোমা পিস্তলেরও শরণ নিই। কিন্তু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রেও বাগ্‌বিতণ্ডার ক্ষেত্রে এখনো "বিগ্ ব্যাটেলিয়ন" বা সমর শক্তিরই জয়-জয়কার। প্রচারের দ্বারা দেশের ও বিদেশের চিত্তজয় যতটা হয় তার অপেক্ষা বেশি হয় জনচিত্তকে হিংসায় বিক্ষুব্ধ করার চেষ্টা। কাজেই রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে এখনো অহিংসা প্রয়োগের কথা প্রায় সুদূর স্বপ্ন। বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট অহিংসার নীতি, প্রেমের নীতিকে তাই মানুষে মানুষে ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন। দু' হাজার বছর আগে সিজারের এলেকাকে অধ্যাত্ম-এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে যীশুও পারেননি। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের বাইরেই তিনি আপনার কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখেন। তখনো অহিংসা নীতির প্রয়োগ-ক্ষেত্র ছিল তাই সীমাবদ্ধ। গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি এই সীমা মানলেন না। এ কালে তিনি বুঝেছেন—এমন খণ্ড করে জীবনকে পরিচালিত করা সম্ভব নয়—মানুষে মানুষে সম্পর্কে যা প্রযোজ্য, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও যদি সে নীতি প্রযোজ্য না হয় তা হলে তা সে নীতিরই অসম্পূর্ণতা, জীবনের অখণ্ডতারই অস্বীকৃতি।

ইতিহাসব্যাপী অহিংসা নীতির বিকাশের দিকে এইটিই গান্ধীজীর বিশেষ দান—তিনিই তার প্রধান বাহন রাষ্ট্রীয় যোজনায়, তিনি তার সীমারেখা বিস্তারিত করলেন। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামেও এ বৈশিষ্ট্য ছিল; তা মোটামুটি অহিংসা-প্রধান। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই প্রয়াস কতখানি সার্থক হয়েছে—আমাদের চিত্তশুদ্ধি এতটা অগ্রসর হয়েছিল কিনা যার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্যবাদীর চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেল; ভারতের বিভাগ ও বর্তমান ব্যবস্থা বৃটেনের "হৃদয় পরিবর্তনের" ফল, না সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের অবস্থা বিপর্যয়ের অনুরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থা; কতটা তা সত্যকারের স্বাধীনতা আর কতটা ইঙ্গ-মার্কিন-ভারতীয় ধনিক-স্বার্থের সম্মিলিত শোষণ-ব্যবস্থা, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিক্ষেপ ও বিপর্যয়; যে অহিংসা নীতি আমরা সাম্রাজ্য-বাদী সংগ্রামে প্রয়োগ করতে পারি সে নীতিকে আমরা বিস্মৃত হই কি করে ভ্রাতৃ-বিরোধের কালে নোয়াখালিতে, বিহারে, পাঞ্জাবে; কি করেই বা তা অক্ষুণ্ণ থাকে যখন

কংগ্রেস-মন্ত্রীরা শুধু নয়, পট্টভি-পটেল থেকে ক্ষুদ্র বৃহৎ গান্ধী-ভক্তরা নির্বাচনে, শ্রমিক সংগঠন দলনে বা শ্রমিককর্মী দমনে মহোল্লাসে গ্রহণ করেন বন্দুক, বেয়নেট থেকে গুণ্ডার লাঠি পর্যন্ত,—ইত্যাদি শত শত প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে উঠে পড়ে। তাতে এ সত্যই হয়ত শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হবে—গান্ধীজী যতটা শোষিত সাধারণের হিংসানীতি গ্রহণে বাধা দিতেন, ততটা তীব্রভাবে শোষক-শক্তির রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগে--হিংসার কায়েমি অস্ত্র ব্যবহারে—বাধা দিতে পারেননি; কিংবা যতটা সহজে তিনি শোষিত সাধারণকে অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করা সম্ভব মনে করতেন, ততটা সহজে তিনি শোষক-গোষ্ঠীকে অহিংসায় দীক্ষিত করা সম্ভব বলেও মনে করেননি। এ জন্যই মনে হয় তাঁর অহিংসা নীতির নামে বিপক্ষ দলন করে সবচেয়ে বেশি হিংসাকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ নেবে এখন রাষ্ট্রশক্তি—মূলত যারা হিংসার অগ্রদূত।

এ কথা আমরা জানি—শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সত্যাগ্রহ পদ্ধতির প্রয়োগেও দৃঢ়ভাবে বাধা দিতেন। তাতে কিন্তু কোনো অসঙ্গতি নেই। কারণ, প্রথমত তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। কারণ, এরূপ সংগ্রামে সত্যাগ্রহ, অনশন, বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—যে পদ্ধতিই বাহ্যত গৃহীত হোক,—তিনি জানতেন-যে বৈষম্য-জাত বিক্ষোভ থেকেই এরূপ দেশীরাজ্যের প্রজা-আন্দোলন, কৃষক-আন্দোলন, শ্রমিক-বিরোধের জন্ম। প্রজা, কৃষক ও শ্রমিকদের উদ্দেশ্য যদি বা ন্যায়সঙ্গত হয়, তাদের ক্ষুব্ধ হৃদয় কথনো কায়মনোবাক্যে অহিংস নয়। তাই তিনি শ্রমিক-আন্দোলনের অপেক্ষা বেশি আস্থা রাখতেন ধনিকদের হৃদয় পরিবর্তনে। তাদের মুনাফার পথ রুদ্ধ হবে না, সমাজের ট্রাস্টিরূপে তারা শ্রমিকদের প্রতি ও সাধারণের প্রতি কর্তব্য পালন করবে—এই ছিল তাঁর আশা। গত কয় বৎসর ধরে চোরাবাজারি কাণ্ড দেখেও তিনি এ আশা পরিত্যাগ করেননি—বরং ডিকন্ট্রোল বা বিনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছা-বাণিজ্যের পক্ষেই সজোরে আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করলেন। শোষিত ও অত্যাচারিত শ্রেণীর কাছে গান্ধীজীর অহিংসাবাদ তাই বহুক্ষেত্রে সন্দেহের বস্তু হয়ে রয়েছে।

এ কথা অবশ্য আমরা জানি—পৃথিবীতে মোটের ওপর পশুর ওপর মানুষই জয়ী হচ্ছে, সভ্যতার পথই তা'ই। মানুষ সামাজিক অবস্থার যতই পরিবর্তন সাধন করছে, মানুষের হৃদয় পরিবর্তনও ততই সম্ভব হচ্ছে। সে পথে হিংসা অহিংসা দুয়ের দ্বারাই পশুবলকে নির্জিত করতে হয়েছে। তাতেও মোটের উপর মনুষ্যত্বের বিকাশই সুসম্ভব হয়েছে। হিংসা ও অহিংসা দুই-ই শক্তি। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে একজনের পক্ষে যা অহিংসা, অন্যের পক্ষে তা হিংসা। শোষণ মালিকের দৃষ্টিতে অহিংসা, শোষিতের দৃষ্টিতে হিংসা। আবার ধর্মঘট ঠিক তার উল্টো। এ কথাও স্পষ্ট, যেখানে বাস্তবে শ্রেণী-বৈষম্য থাকবে সেখানে শ্রেণী-বিরোধও অনিবার্য। সে বিরোধ কতটা কায়িক, মানসিক, ও বাচনিক বিদ্বেষ কাটিয়ে উঠতে পারবে তা নির্ভর করবে শাসক-শ্রেণী কতটা পশুশক্তি, কতটা বিদ্বেষ প্রয়োগ করছে তারই ওপর। একটার মাত্রা অনেকাংশেই নির্ভর করে

অন্তটার ওপর। বৈষম্যের মূলোৎপাটনে সমাজশক্তি মাত্রা ছাড়িয়ে অতি-বিরোধে বা অতিবিনাশে যাতে না মাতে তাই দেখা প্রয়োজন। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজেই অহিংসার সামাজিক প্রসার ও প্রতিষ্ঠা সহজতর, মানুষের হৃদয় পরিবর্তন সম্ভব। আর এই শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ—শোষিত শ্রেণীর মতে—বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা নির্দেশও করতে পেরেছেন : বৈষম্যময় সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত হিংসাকে সক্রিয় সংগ্রামে বাতিল করা।

গান্ধীজীর জীবন-দর্শনে অবশ্য সে পথ অগ্রাহ্য ; তিনি হৃদয় পরিবর্তনের দ্বারাই সামাজিক পরিবর্তন আনতে চান। কারণ তিনি অধ্যাত্মসত্যকেই সত্য বলে মানেন ; সমাজনীতিকেও সে অনুসারেই অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত কতকগুলো নিয়মে (অহিংসা, ব্রহ্মচর্য) বেঁধে নিয়েছেন। তাঁর ত্রুটি রয়েছে এই জীবন-দর্শনে। সেই ত্রুটিবশেই বারে বারে বাস্তব জীবনে নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ অসঙ্গতির মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়েন, নানা দুর্বোধ্য কর্ম ও আচরণের প্রশ্রয় দেন—এমন কি শেষ পর্যন্ত শ্রমিক-আন্দোলন, কৃষক-আন্দোলন, প্রজা-আন্দোলন প্রভৃতি অগ্নিগর্ভ গণ-আন্দোলনের পথ নিরুদ্ধ করেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে ও তার অকল্যাণকেও তাই পরোক্ষে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন।

এ কথাও তিনি ভালো করেই জানতেন-যে বড় বড় শেঠ মালিকেরা নানা সূত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেছে ; কিন্তু তাই বলে মুনাফা-শিকারে তাদের এমন কোন বিতৃষ্ণা দেখা যায়নি যার থেকে অনুমান করা যেতে পারে তাঁর সংস্পর্শে ও সাধনায় তাদের কিছুমাত্র "হৃদয় পরিবর্তন" ঘটেছে। বরং একথাই তিনিও বুঝেছেন যে, তাঁর অপূর্ব কর্মযোজনায় এ দেশের জীবনেও এক বিকৃত ধনিকতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়েছে। মুনাফার শিকার এদেশেও মানুষ শিকারে পরিণত হয়েছে, তাঁর "রামরাজ্য" স্থাপনা আরও দুর্ঘট হয়ে উঠেছে। এমন কি এই শোষক-শ্রেণীর ক্ষমতা লাভে তাঁর "কৃষক-মজুর-প্রজা রাষ্ট্র" দূরের কথা, তাঁর "অহিংসা নীতি"ই হবে এ রাষ্ট্রশক্তির মুখে মুনাফা শিকারের ও মানুষ শিকারের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক যুক্তি।

তাঁর জীবন-দর্শনের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ রয়েছে, এসব থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবার কথা। কিন্তু তা তাঁর কাছে গ্রাহ্য হয়নি হয়ত দু' একটি কারণে। প্রথমত, তিনি জানতেন মানুষের হৃদয় পরিবর্তন কেন, "সমাজ পরিবর্তন সুদীর্ঘ, সুকঠিন, এবং বহু জটিলতাময় এক প্রক্রিয়া"—বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি যে সাধনার সূচনা করেছেন তা তাঁরই জীবনকালে তিনি সুসম্পূর্ণ করে যাবেন, এমন অসম্ভব আশা পোষণ করাই হাস্যকর ; তিনি সে পথকে প্রাণপণে সুগম করে যেতে পারলেই যথেষ্ট। তাই ধৈর্যহীন বা নিরাশ হবার কোনো কারণই নেই। দ্বিতীয়ত, তাঁর সমস্ত দর্শনের মূল হল তাঁর ভগবৎ-চেতনা, তাঁর আধ্যাত্মবাদ। তাঁর আসল বাস্তব ও সামাজিক বিচার ফলাফল দিয়ে নয়, আধ্যাত্মিক মানদণ্ড

দিয়ে। এ অধ্যাত্মবাদ হেগেল-ফিখ্‌টে প্রভৃতির অধ্যাত্মবাদ নয়; এর আসল সাধনক্ষেত্র হল ব্যক্তিজীবন, এ 'রামরাজ্য' প্রত্যেকের অন্তর। সেখানকার সাক্ষ্যে তিনি জানতেন, তিনি ধ্রুব পথ গ্রহণ করেছেন—তাঁর ব্যক্তি-জীবনের পরম প্রকাশে কোনো বাধাই তো নেই।

নিজের মতবাদকে তিনি জীবনে রূপায়িত করতে নিরস্ত হননি।—এইটিই মহাত্মাজীর জীবনের আসল শিক্ষা। মত (profession) ও জীবন (practice) এখানে অভিন্ন। তাঁর জীবন-দর্শন যতই স্ববিরোধী হোক, এই আন্তরিক "স্বধর্মনিষ্ঠা" সে দর্শনের ত্রুটিকে তাই ছাড়িয়ে গিয়েছে। আসলে তিনি ছিলেন জীবন-শিল্পের সাধক—তাঁর মতামতের থেকেও তাই তিনি মহৎ। এ জীবন-শিল্প অবশ্য একালের গতিময়, সৃষ্টিময়, ঐশ্বর্যময় ঐতিহাসিক ধারাকে অঙ্গীকার করে রূপায়িত হয়নি;—তেমন রূপায়ণের ইঙ্গিত লাভ করেছি আমরা বরং আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনে;—গান্ধীজীর জীবনের বৃত্তকেন্দ্র তাঁর একান্ত ব্যক্তি-জীবন, তাঁর অধ্যাত্মচেতনা; সে বৃত্তের পরিধি ভ্রষ্টশ্রী বর্তমান সভ্যতাকে বর্জন করে চলে, বিলুপ্ত অতীতের সহজ শ্রী ও স্বাচ্ছন্দ্যকে অবলম্বন করেই তা রূপময়। কিন্তু রূপময় তাতে ভুল নেই। এমন ঋজুতা, এমন নিরভিমান তেজোবীর্য, এমন মানব-প্রীতিতে সমুজ্জ্বল, আর সর্বোপরি এমন সানন্দ কৌতুকপ্রিয় মানুষ আমাদের একালে আমরা আর কাকে দেখেছি? তাঁর আসল শক্তিকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারব?—তিনি যে জীবন-মহাশিল্পের শিল্পী!

তাঁর এ কথার চেয়ে বড় সত্য কথা আর নেই—"আমার জীবনই আমার বাণী।" শুধু জীবন নয়, তাঁর মরণও—এ কথাও আমরা তাঁর উদ্দেশে আজ বলতে পারি:

গোপাল হালদার

কবিতাগুচ্ছ

গান্ধিজীর মৃত্যু

আটাত্তরেও গান্ধীজী মরেনিকো
ইতিহাস, তুমি এই কথাক'টি লিখো
আরো লিখে রেখো গান্ধী-হত্যা সাগর রচেনি শোকে—
ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছিলো জনতার চোখে চোখে :
যুগের আকাশে তুলে ধরো সেই জ্বলন্ত স্বাক্ষর
নিভ্‌তে দিও না হাজারো ক্ষুব্ধ মনের অগ্নিঝড়
ইতিহাস, তুমি এ সত্য রেখো লিখে
বিধাতা নেয়নি মহাত্মা গান্ধীকে।
এমন কঠিন হিংস্র মৃত্যু সেও কভু চায়নিকো—
সারা পৃথিবীর অনুরোধে তুমি এই কথাটিও লিখো :
তোমার ভাষায় জানি কোনদিন নেই কোন ছলা কলা
স্বেচ্ছা রচিত কপটতা কভু আট্‌কাবে নাকো গলা,
তোমার স্পষ্ট সত্য ভাষণে জনতার বিশ্বাস
আগুনের ঝড়ে জানি মুছে দেবে যুগের সর্বনাশ।
ইতিহাস, তুমি তাই করো তাই করো—
টেনে খুলে ফেলো শোকের কুজ্‌ঝটিকা,
মধ্য আকাশে ক্রোধের সূর্য ধরো,
হতাশ দু'চোখে জ্বলুক অগ্নি-শিখা।
গান্ধীজী মরেনিকো
ইতিহাস, তুমি কঠোর আগুনে এই কথাক'টি লিখো।

রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী

সনেট

ঘুরেছি অনেক ভিড়ে, অনেক নির্জনে ফিরেছি তো,
চেনা সেই অম্বিষ্টের তবু বুঝি আজো দেখা নেই ;
সিংহের নৈসঙ্গ্যে তথা শকুনের সংহতিতে ভীত
বারবার হয়েছে হৃদয়। জানি অন্বেষার থেই
নেই কোনো আকস্মিকে, দৈবে কিম্বা মুদ্রারাক্ষসের
হাতবদলের কোনো ক্ষেড়নাট্যে, রাজস্তবাহারে।
দেখেছি ক্ষমতা আর অক্ষমেও, যশ কুযশের
জানি নেই মূল্যভেদ। ভেদ শুধু দুর্ভিক্ষে আহারে
উলঙ্গে ও সুসজ্জিতে, ভেদ শুধু শক্তিমদে আর
জিজ্ঞাসার স্বচ্ছ স্রোতে, ভেদ শুধু গৃধ্নু ও গিতায়—
জলে জলে যেবা ভেদ পশ্বল ও স্বচ্ছল তিস্তার,
কিংবা যেন বেহুলার বাসরে ও সর্পিল চিতায়।
ঘুরেছি অনেক, জানি নিরুদ্দেশ অন্বেষা উৎসবে
সতীকে মেলে না, মেলে পার্বতীকে কুমারসম্ভবে॥

বিষ্ণু দে

চতুর্দশপদী

সমাজ গড়িতে চাও ? নবরূপে ক'রে রূপায়িত ?
এসো তবে হাত দাও, মাঠে নামি জীবনের কবি !
কবিতায় লিখে লিখে অফুরন্ত বাস্তবের ছবি
একটি ভরেনি প্রাণ, একটি ডোবাও ভরেনি তো !
অমৃতের পুত্র যারা আজো তারা রয়ে গেছে মৃত,
যদিও দিনের শেষে মাঠে ভেসে এসেছে পুরবী,
সে গানের কান নেই, কেবা দেখে প্রভাতের রবি ?
দেখেছি, ভেবেছি তাই, কবি আমি, ব্যর্থতায় রত !

শঙ্কাহীন প্রাণে তাই বলি আজ বার বার বলি :
ছবি এঁকে ফাঁকি দেওয়া, জীবনের অতি ব্যর্থতা যে !
প্রাণের বেদনা দিয়ে গড়ো যদি কবিতার কলি,
ধরো এ মাটিও তবে কিছুখন, এ তোমারই সাজে ;
কবি তুমি ? শ্রম দাও। মাটি ভাঙো। নামাও গোধূলি।
পৃথিবী গড়িতে চাও, এসো তবে হাত দাও কাজে।

জগন্নাথ বিশ্বাস

স্বপ্ন-সম্ভব

আমার মনের স্বপ্ন আকাশের মত প্রসারিত
অনেক দূরের দেশ আপনার হয়ে যেন ভাসে
আমার হৃদয় দেশ আপনারে করে অবারিত
দুস্তর বাধার তীর ধ্বসে যায় বন্যার আভাসে।
তখন মাটির দেশে স্বপ্ন-নীল আকাশ নামাই
ছোট-বড় পাহাড়ের অনেকেই ভেঙে মুছে যায়
তখন মনের নদী সমতল মাটিতে ভাসাই
আকাশ-মাটির প্রেমে মিলনের আবেশ ঘনায়।

অনেক মানুষ আজো এই কথা শুনে
অকারণ হাসে। বিদ্রুপে বাহবা দেয়,
কবি-শিল্পী-স্থপতিরে ক্ষমে নিজ গুণে
আপনার মূঢ়তার বাহাদুরি নেয়!
ঘরেতে আকাশ-ছবি বাঁধ ভেঙে দিলে
অথবা আমরা যদি নিবিড় বন্ধনে
স্বার্থের সমাধি রচি অন্তরের মিলে
তখন সে-সব প্রাণী অন্তিম শয়নে!

অনেক আকাশ-ছবি ছেয়ে আছে মৃত্তিকা-সাগর
আমার হৃদয় তলে কত ঢেউ করে তোলপাড়
এদেশ-ওদেশ জুড়ে বয়ে যায় আবেগের ঝড়
অনেক মনের ছবি মুছে দেয় দুর্মদ পাহাড়।
কবি-শিল্পী-স্থপতির অনেকেই আপনা হারায়
আগ্নেয় লাভার স্রোত অনির্বাণ হৃদয় গহ্বরে
অহর্নিশ প্রজ্বলিত বেদনার দুঃসহ জ্বালায়
নির্গমের পথ খোঁজে নিরন্তর ব্যথিত অন্তরে।

বারে বারে ব্যর্থ হয় পরম প্রয়াস
জানি যত বাধা আসে শক্তি তত দড়
এখানে-ওখানে হবে প্রতিরোধ জড়ো
প্রলুব্ধ শকুনি চিত্তে অন্তিমের ত্রাস।
প্রার্থিত স্বপ্নের দেশ ধ্রুব জাগে আকাশ মিনারে
যেন সে প্রথম-সূর্য ধরিত্রীর সৌধচূড়া পরে
ধীরে তার স্পর্শ রাখে আলোকের উত্তপ্ত জোয়ারে
অবাধ মাটির মাঠে হেসে ওঠে প্রাণ থরে থরে।

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

শাপমুক্তি

আসমুদ্র ডাক শুনি :
ডাক শুনি তার,
থরোথরো আমি এক কালের পাহাড় !

কেন আমি কেঁপে উঠি ? হাজার বছর ধ'রে প্রস্তরের প্রান্তিকে নোয়ানো
আমারো অহল্যা দেহ থরোথরো কেন কাঁপে, কোন প্রত্যাশায় ?
দূরের পাহাড় আমি, তৃপ্তি কেন দুই চোখে নামে তবু শ্রাবণে, বন্যায় ?
আমার কি আসে যায় বালুচরে সমুদ্রের সর্বগ্রাসী এই মত্ততায় !
আমার চঞ্চল মনে একটি মুহূর্ত থেমে এই প্রশ্ন নিজেরে শুধাই :
সমুদ্রের প্রাণে আমি কেন মুক্তি পাই ?
এত বৃষ্টি হ'য়ে গেল, আমার অরণ্যে তবু শ্বাপদের চোখে ঘুম নাই—
তবু কেন সব ক্লান্তি অতীতে ভাসাই ?

বুঝি সমুদ্রের ঢেউ, আমার বুকের মেঘ হ'য়ে
এতদিন ছিলো যারা সঞ্চিত ধনের মতো প্রেমহীন মৃত্যুতে লুকিয়ে,
যারা করেছিলো স্থূল শক্তিহীন এই দেহ অবশ পাতাল—
তারাই আজকে ঝড়ে সমুদ্রের সঙ্গমের স্বপ্ন সঙ্গে করে
ভাদ্রে জন্মাষ্টমী লগ্নে অথবা কি বার্তাবহ স্পন্দমান প্রথম আষাঢ়ে
হ'লো বৃষ্টি, হ'লো বন্যা ?—আহা, স্বপ্ন নেমে আসে মুক্তিতে, জোয়ারে,—
অহল্যা মাতাল !...
বুঝি তাই, বুঝি আমি কালের পাহাড়
আর নই প্রস্তরের, গৌতমবন্ধন থেকে মুক্ত আমি ; প্রণাম আমার
ঐ আসে, নিতে আসে নবজলধরশ্যাম বর্ষণে শ্রীরাম !
থরোথরো এ আকাশ, আমার আকাশ আজ আশ্চর্য সুন্দর ;
বৃষ্টি, বন্যা, শান্তি আর ভাদ্রের কি শ্রাবণের, আষাঢ়ের সমুদ্রের ঝড়
আমারো আমারো প্রেম,—সিঞ্চিত মাটির স্পর্শে আজ আমি তৃপ্ত, আজ
মুক্তি লভিলাম ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাপৃথিবী

ঘর অন্ধকার, আর একটু দূরে আভাস, আরো একটু গেলে আলো.
আকাশে জ্যোতি—
আমি সূর্যের সন্ততি।
এই গাছ আমি এই মাটি, আমি এই মানুষ,
আমি নদী কল্লোলিনী
সূর্যের করুণায় স্বর্ণপসারিণী।

মাঝে মাঝে তবু মনে হয় আমার এই প্রেমে
নিজেকে নিজের সকরুণ ছলনা
মাঝে মাঝে ভয়ে মরি
মাঝে মাঝে অসহায় পথ ঘাট প্রান্তর দুরন্ত নগরী
হিংস্র ছুরিকায়—
আবার কখন শুনি নিজেরই রক্তে বাজে বানরের নির্মম কাহিনী
পাশবিক ইতিহাস
আবার কখন দেখি
শ্যামশ্রীসম্ভারে নত পৃথিবীর প্রতি তৃণ সে নির্লজ্জ লজ্জায়।

তা বলি আরো, আরো বাড়াও—
যেখানে পৌছোয় না হাত, দৃষ্টি চালাও ;
এ ঘর অন্ধকার : এ নয় চরম এ নয় শেষ—
আমি অশেষ।
সবই প্রেম সবই পথ সকলে শুভার্থী
আমি তীর্থযাত্রী।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

ধর্মকীর্তি

ডাক্তার শ্চেরবাস্কির কথায় ধর্মকীর্তি ছিলেন ভারতীয় ক্যাণ্ট। ধর্মকীর্তির প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীগণও স্বীকার করিতেন। উদ্যোৎকরের (৫৫০ খৃঃ অব্দ) 'ন্যায়বার্তিক'কে ধর্মকীর্তি তাঁহার তর্কশরদ্বারা এরূপ ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন যে বাচস্পতি তাহার উপর টীকা (১) করিয়া (ধর্মকীর্তির) তর্কপঙ্কে নিমগ্ন উদ্যোৎকরের 'অতি বৃদ্ধা গাভীগুলিকে' উদ্ধার করিবার পুণ্য অর্জন করিতে চাহেন। ধর্মকীর্তির গ্রন্থের কঠোর সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও জয়ন্তভট্ট তাঁহাকে 'সুনিপুণবুদ্ধি' (২) এবং তাঁহার প্রয়াসকে 'জগৎভিভবধীর' বলিয়াস্বীকার করিয়াছেন। যে শ্রীহর্ষ নিজেকে অদ্বিতীয় কবি ও দার্শনিক বলিয়া মনে করিতেন তিনিও ধর্মকীর্তির তর্কপথকে 'দুরাবাধ' (৩) বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্তুত ধর্মকীর্তির প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলী অপেক্ষা বর্তমান পণ্ডিতমণ্ডলী অধিক স্বীকার করিতে পারেন, কেননা আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতিতে উহার মূল্য তাঁহারা অধিকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম।

জীবনী

ধর্মকীর্তির জন্ম হয় চোল (উত্তর তমিল) প্রদেশের তিরুমলৈ নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে। তাঁহার পিতার নাম তিব্বতী পরম্পরাতে কোরুনন্দ (?) বলিয়া পাওয়া যায় এবং কোথাও কোথাও এইরূপও বলা হইয়াছে যে তিনি কুমারিল ভট্টের ভাগিনেয় ছিলেন। যদি ইহা ঠিক হয় (সে সম্ভাবনা অবশ্য খুবই কম) তাহা হইলে মাতুলের তর্কগুলিকে প্রমাণবার্তিকে খণ্ডন করিতে গিয়া ভাগিনেয় যেরূপ তীব্র পরিহাস করিয়াছেন, তাহাতে প্রাণবন্ত এবং পরিহাসপ্রিয় ব্যক্তিরূপে তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। ধর্মকীর্তি বাল্যকাল হইতেই বিরাট প্রতিভাশালী ছিলেন। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র ও বেদবেদাঙ্গসমূহ অধ্যয়ন করেন। সেই সময় ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের ধ্বজা উড্ডীন ছিল এবং নাগার্জুন, বসুবন্ধু এবং দিঙ্‌নাগের বৌদ্ধদর্শন বিরোধিপক্ষের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ধর্মকীর্তিরও সেই সম্বন্ধে জানিবার সুযোগ ঘটে। তিনি উহাদ্বারা এরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে তিব্বতী পরম্পরা

---

[১] ন্যায়বার্তিক—তাৎপর্যটীকা ১।১।১

[২] ইতি সুনিপুনবুদ্ধির্লক্ষণং বক্তুকামঃ পদযুগলমপীদং নির্মমে নাস্যবদম্।
ভবতু মতিমহিম্নশ্চেষ্টিতং দৃষ্টমেতজ্জগদভিভবধীরং ধীমতো ধর্মকীর্তেঃ॥
—ন্যায়মঞ্জরী পৃঃ ১০০

[৩] দুরাবাধ ইব চায়ং ধর্মকীর্তেঃ পন্থা ইত্যবহিতেন ভাব্যমিহেতি॥—খণ্ডনখণ্ডখাদ্য—১

অনুসারে জানা যায় যে, তিনি বৌদ্ধ গৃহস্থের বেশে বাহিরে যাতায়াত আরম্ভ করেন (?)। ইহার ফলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বর্জন করেন। সেই সময় নালন্দার খ্যাতি ভারত হইতে দূর-দূরান্তরে প্রসারিত। ধর্মকীর্তি নালন্দা চলিয়া আসেন এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবাদী, দার্শনিক এবং নালন্দার সংঘস্থবির ধর্মপালের শিষ্য হইয়া ভিক্ষুসংঘে যোগদান করেন।

ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে ধর্মকীর্তির গভীর অনুরাগ ছিল এবং তিনি দিঙ্‌নাগের শিষ্য-পরম্পরায় আচার্য ঈশ্বরসেনের নিকট সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া তিনি গ্রন্থরচনায়, শাস্ত্রার্থকরণে এবং অধ্যয়নে নিজ জীবন অতিবাহিত করেন।

ধর্মকীর্তির কাল (৬০০ খৃঃ অব্দ)

"চৈনিক পর্যটক ই-চিঙ স্বীয় গ্রন্থে ধর্মকীর্তির বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে ধর্মকীর্তি ৬৭১ খৃঃ অব্দের পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে ধর্মকীর্তি নালন্দার প্রধান আচার্য ধর্মপালের শিষ্য ছিলেন। য়ুন চেঙের সময় (৬৩৩ খৃঃ অব্দ) ধর্মপালের শিষ্য শীলভদ্র নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১০৬ বৎসর। এই অবস্থায় ধর্মপালের শিষ্য ধর্মকীর্তি ৬৩৫ খৃঃ অব্দে শিশু হইতে পারেন না। ধর্মকীর্তির বিষয়ে য়ুন-চেঙ নীরব। এই নীরবতার কারণ এই হইতে পারে যে য়ুন চেঙের নালন্দাবাসকালের পূর্বেই ধর্মকীর্তির দেহান্ত ঘটিয়াছিল।" (৪)

ইহা এবং অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে মনে হয় যে ধর্মকীর্তির কাল ৬০০ খৃষ্টাব্দই ঠিক।

ধর্মকীর্তির গ্রন্থ

ধর্মকীর্তি তাঁহার গ্রন্থ কেবল প্রমাণসম্বন্ধ বৌদ্ধদর্শন অর্থাৎ বৌদ্ধপ্রমাণশাস্ত্রের উপর লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ সংখ্যা নয়টি, ইহার মধ্যে সাতটি মূলগ্রন্থ এবং দুইটি তাঁহার নিজগ্রন্থের উপর টীকা।

	গ্রন্থনাম	গ্রন্থপরিমাণ (শ্লোকে)	গদ্য বা পদ্য
১।	প্রমাণবার্তিক	১৪৫৪½	পদ্য
২।	প্রমাণবিনিশ্চয়	১৩৪০	গদ্য ও পদ্য
৩।	ন্যায়বিন্দু	১৭৭	গদ্য
৪।	হেতুবিন্দু	৪৪৪	গদ্য
৫।	সম্বন্ধ-পরীক্ষা	২৯	পদ্য

[৪] মৎপ্রণীত "পুরাতত্ত্বনিবন্ধাবলী" পৃঃ ২১৫—১৭

৬।	বাদ-ন্যায়	৭৯৮	গদ্য ও পদ্য
৭।	সন্তানান্তর-সিদ্ধি	৭২	পদ্য
		৪৩১৪½	

টীকা :—

১।	বৃত্তি	৩৫০০ গদ্য	প্রমাণবার্তিক পরিচ্ছেদের উপর
২।	বৃত্তি	১৪৭ গদ্য	সম্বন্ধ পরীক্ষার উপর
		৩৬৪৭	

অর্থাৎ মূল এবং টীকা একত্র করিয়া ধর্মকীর্তি (৪৩১৪½+৩৬৪৭) ৭৯৬১½ শ্লোকের (৫) সমান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ধর্মকীর্তির গ্রন্থ কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হইত তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়-যে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধন্যায়ের সমগ্র সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর ১,৭৫০০০ শ্লোকের মধ্যে ধর্মকীর্তির গ্রন্থের টীকা-অনুটীকাই ১,৩৭০০০ শ্লোক (৬)।

প্রমাণবার্তিক

ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক দিঙ্‌নাগের প্রমাণসমুচ্চয়ের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রমাণসমুচ্চয়ের ৬টী পরিচ্ছেদের কথাও পূর্বে বলা হইয়াছে।

প্রমাণবার্তিকের চারিটি পরিচ্ছেদের বিষয় হইতেছে প্রমাণসিদ্ধি, প্রত্যক্ষ স্বার্থানুমান-প্রমাণ এবং পরার্থানুমান-প্রমাণ; কিন্তু সাধারণত পুস্তকগুলিতে নিম্নলিখিত ক্রম পাওয়া যায়—স্বার্থানুমান, প্রমাণসিদ্ধি, প্রত্যক্ষ এবং পরার্থানুমান। এই ক্রম যে ভুল ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

---

[৫] একটী শ্লোকে ৩২টি অক্ষর ধরিতে হইবে।

[৬] টীকাগুলি এইপ্রকার :—

মূলগ্রন্থ		টীকাকার কোন পরিচ্ছেদের উপর	গ্রন্থপরিমাণ
১। প্রমাণবার্তিক	১।	দেবেন্দ্রবুদ্ধি (পঞ্জিকা) T২—৪	৮৭৪৮
	২।	শাক্যবুদ্ধি (পঞ্জিকা টীকা) T২—৪	১৭০৪৬
	৩।	প্রজ্ঞাকরগুপ্ত (ভাষ্য) TS২—৪	১৬২৭৬
	৪।	জয়ানন্ত (ভাষ্যটীকা) T২—৪	১৮১৪৮
	৫।	যমারি (ভাষ্যটীকা) T২—৪	২৬৫৫২
	৬।	রবিগুপ্ত (ভাষ্যটীকা) T২—৪	৭৫৫২
	৭।	মনোরথনন্দী (বৃত্তি) S১—৪	৮০০০
	৮।	ধর্মকীর্তি (স্ববৃত্তি) TS১	৩৫০০
	৯।	শঙ্করানন্দ (স্ববৃত্তি-টীকা)T (অপূর্ণ)	৭৫৭৮
	১০।	কর্ণকগোমী (স্ববৃত্তি টীকা)T	১০০০০
	১১।	শাক্যবুদ্ধি (স্ববৃত্তি টীকা) S১	১০০০০
২। প্রমাণ বিনিশ্চয়	১।	ধর্মোত্তর (টীকা) T১—৩	১২৪৬৩
	২।	জ্ঞানশ্রী (টীকা)T	৬২৭১

ইহার জন্ত প্রমাণসমুচ্চয়ের ভাগ এবং তদুপরি লিখিত প্রমাণবার্তিক দেখিতে হইবে।

প্রমাণসমুচ্চয়	পরিচ্ছেদ	প্রমাণবার্তিক	পরিচ্ছেদ
মঙ্গলাচরণ	১।১	প্রমাণসিদ্ধি	১
প্রত্যক্ষ	১	প্রত্যক্ষ	২
স্বার্থানুমান	২	স্বার্থানুমান	৩
পরার্থানুমান	৩	পরার্থানুমান	৪

প্রমাণসমুচ্চয়ের অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি :—দৃষ্টান্ত (৭), অপোহ (৮), জাতি (৯) (=সামান্ত, universal)। পরীক্ষার বিষয়ে পৃথক পরিচ্ছেদে না লিখিয়া ধর্মকীর্তি সেগুলিকে প্রমাণবার্তিকেব উক্ত চারিটি পবিচ্ছেদে প্রকরণ অনুসারে ভাগ করিয়াছেন।

প্রমাণবার্তিক

১। স্বার্থানুমান ২। প্রমাণসিদ্ধি ৩। প্রত্যক্ষ ৪। পরার্থানুমান

ধর্মকীর্তি মনোরথনন্দী প্রজ্ঞাকরগুপ্ত দেবেন্দ্রবুদ্ধি

শঙ্করানন্দ শাক্যবুদ্ধি কর্ণকগোমী

রবিগুপ্ত জয়ানন্দ যমারি শাক্যবুদ্ধি
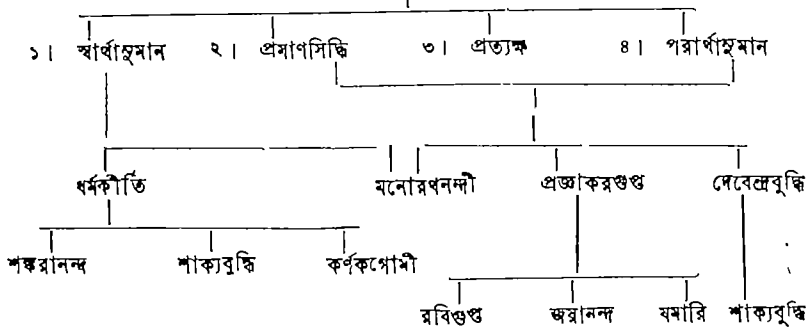
৩। ন্যায়বিন্দু	১। বিনীতদেব (টীকা)T ১—৪	১০৫০
	২। ধর্মোত্তর (টীকা)TS ১—৩	১৪৭৭
	৩। দুর্বেকমিশ্র (অনুটীকা)S ১—৩	……
	৪। কমলশীল (টীকা)T	২২১
	৫। জিনমিত্র (টীকা)T	৩১
৪। হেতুবিন্দু	১। বিনীতদেব (টীকা)T ১—৪	২২৬৮
	২। অর্চট (বিবরণ)TS ১—৪	১৭৬৮
	৩। দুর্বেকমিশ্র (অনুটীকা)T ১—৪	১৭৬৮
৫। সম্বন্ধ-পরীক্ষা	১। ধর্মকীর্তি বৃত্তি)T	১৪৭
	২। বিনীতদেব (টীকা)T	৫৪৮
	৩। শঙ্করানন্দ (টীকা)T	৩৮৪
৬। বাদন্যায	১। বিনীতদেব (টীকা)T	৬০৯
	২। শান্তরক্ষিত (টীকা)TS	২৯০০
৭। সন্তানান্তর-সিদ্ধি	১। বিনীতদেব (টীকা)T	৪৭৪

T তিব্বতী ভাষানুবাদ উপলব্ধ

S সংস্কৃত

(৭) প্রমাণবার্তিক ৩।৩৭, ৩।১৩৬

(৮) " ২।১৬৩—৭৩

(৯) " ২।৫—৫৫ ; ২।১৪৫—৬২ ; ৩।৫৫—১৬১ ; ৪।১৫৩—৪৮ ; ৪।১৭৬—৮৮

ধর্মকীর্তির শিষ্যপরম্পরা ও তাঁহাদের সময় :—
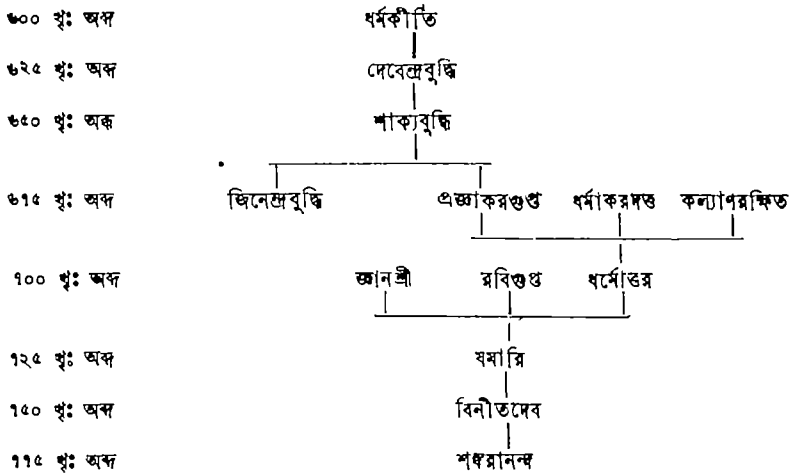
ন্যায়বিন্দু এবং ধর্মকীর্তির অন্যান্য গ্রন্থগুলিতেও প্রত্যক্ষ স্বার্থানুমান, পরার্থানুমানের যুক্তিসঙ্গত ক্রমকেই স্বীকার করা হইয়াছে; এবং মনোরথনন্দী প্রমাণবার্তিকবৃত্তিতেও এই ক্রম-ই স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য ভাষ্য, পঞ্জিকা, টীকা এবং মূল পাঠগুলিতে সর্বত্র স্বার্থানুমান, প্রমাণসিদ্ধি, প্রত্যক্ষ এবং পরার্থানুমানের ক্রম দেখিলেও গ্রন্থকারের ক্রম ইহা নহে; উপরন্তু মনোরথনন্দী কর্তৃক স্বীকৃত ক্রমই সঠিক প্রমাণিত হয়। ক্রমে উলটপালট হইবার কারণ হইল—ধর্মকীর্তির স্বার্থানুমানের উপর স্বরচিত বৃত্তি। তাঁহার শিষ্য দেবেন্দ্রবুদ্ধি গ্রন্থকারের বৃত্তিযুক্ত স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদকে বাদ দিয়া নিজস্ব পঞ্জিকা লেখেন। ইহাতে পরবর্তীকালে বৃত্তি এবং পঞ্জিকা পৃথক রাখিবার জন্য প্রমাণবার্তিককে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রজ্ঞাকরগুপ্তের ভাষ্য এবং দেবেন্দ্রবুদ্ধির পঞ্জিকাযুক্ত তিনটি পরিচ্ছেদের নির্বাচন এই বিভাগকে স্থায়ীরূপদানে সহায়তা করিয়াছিল। এই ক্রমকে সর্বত্র প্রচলিত দেখিয়া মূল কারিকার অনুলিপিগুলিতেও লেখককে ঐ ক্রমই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যদিও মনোরথনন্দী কর্তৃক স্বীকৃত ক্রম অনুসারে তাহার বৃত্তি সম্পাদনা করিয়াছি (এবং উহা পাওয়া যায়) তথাপি মূল প্রমাণবার্তিককে আমি সর্বস্বীকৃত এবং তিব্বতী অনুবাদ এবং তালপত্রে প্রাপ্ত ক্রমানুসারে সম্পাদিত করিয়াছি। ইহার উপর প্রজ্ঞাকরগুপ্তের প্রমাণবার্তিক ভাষ্য (বার্তিকালঙ্কার) সেই ক্রম অনুযায়ী সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য আমিও পরিচ্ছেদ এবং কারিকা দিতে গিয়া সেই সর্বস্বীকৃত ক্রমকে স্বীকার করিয়াছি।

ধর্মকীর্তির দার্শনিক বিচারের উপর লিখিবার সময় প্রমাণবার্তিকে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির উপর আমরা পরে বলিব। তাহা হইলেও এইস্থলে পরিচ্ছেদের ক্রমানুযায়ী মুখ্য বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

বিষয়	পরিচ্ছেদ কারিকা	বিষয়	পরিচ্ছেদ কারিকা
প্রথম পরিচ্ছেদ (স্বার্থানুমান)		**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** (প্রত্যক্ষ প্রমাণ)	
১। গ্রন্থের প্রযোজন	১।১	১। প্রমাণ দুইটি : প্রত্যক্ষ এবং অনুমান	২।১
২। হেতু সম্বন্ধে বিচার	১।২	২। পরমার্থ সত্য এবং ব্যবহার সত্য	৩।৩
৩। অভাব সম্বন্ধে বিচার	১।৫ (+৪.১২৬)	৩। সামান্য [কোন বস্তু নহে]	৩।৩ (+৪।১৩১)
৪। শব্দ সম্বন্ধে বিচার	১।১৮৬	৪। অনুমান প্রমাণ	৩।৫৫
৫। শব্দ প্রমাণ নহে	১।২১৪	৫। প্রত্যক্ষ প্রমাণ	৩।১২৩
৬। অপৌরুষেয় বেদ প্রমাণ নহে	১।২২৫	৬। প্রত্যক্ষের ভেদ	৩।১৯১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (প্রমাণসিদ্ধি)		৭। প্রত্যক্ষাভাস কে ?	৩।২৮৮
১। প্রমাণের লক্ষণ	২।১	৮। প্রমাণের ফল	৩।৩০০
২। বুদ্ধের বচন কেন মাননীয়	২।২৯		

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(পরার্থানুমান)

বিষয়	পরিচ্ছেদ কারিকা
১। পরার্থানুমানের লক্ষণ	৪।১
২। পথ সম্বন্ধে বিচার	৪।১৫
৩। শব্দ প্রমাণ নহে	৪।৪৮
৪। সামান্য [কোন বস্তু নহে]	৪।১৩১ (+৩।৩)
৫। পক্ষের দোষ	৪।১৪১
৬। হেতু সম্বন্ধে বিচার	৪।১৮৯
৭। অভাবসম্বন্ধে বিচার	৪।১২৬ (+১।৫)
৮। ভাব কি ?	৪।২৮

ধর্মকীর্তির দর্শন

ধর্মকীর্তি একমাত্র প্রমাণ-(ন্যায়)-শাস্ত্রের উপরই সাতটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার দর্শনের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা এই প্রমাণশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিতেই বলিয়া দিয়াছেন। এই সাতটি গ্রন্থের মধ্যে প্রমাণবার্তিক

(১৪৫৪½ 'শ্লোক'), প্রমাণবিনিশ্চয় (১৩৪০ 'শ্লোক'), হেতুবিন্দু (৪৪৪ 'শ্লোক'). এবং ন্যায়বিন্দুব (১৭৭ 'শ্লোক') প্রতিপাদ্য বিষয় একই এবং উহাদের মধ্যে প্রমাণবার্তিক গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সংক্ষেপে অধিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়াছে। 'বাদন্যায়ে' আচার্য ধর্মকীর্তি-অক্ষপাদের আঠারটি বিগ্রহস্থানের বিরাটসূচীকে অনাবশ্যক দেখাইয়া উহাকে মাত্র অর্ধশ্লোকেই বলিয়া দিয়াছেন। (১০)

"নিগ্রহ (=পরাজয়) স্থান হইতেছে (বাদের জন্য) অ-সাধন, বাক্যের কথন এবং (প্রতিবাদীর) দোষ গ্রহণ না করা।"

ক্ষণিকবাদ অনুযায়ী কার্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে সম্বন্ধ পরীক্ষার ২৯টি কারিকাতে ধর্মকীর্তি ইহা দেখাইয়াছেন। এই বিষয়টি প্রমাণবার্তিকেও আসিয়াছে। সন্তান্তরসিদ্ধির ৭২টি সূত্রের মধ্যে ধর্মকীর্তি প্রথমে এই মনসন্তান-(মন এক বস্তু নহে, অধিকন্তু প্রতি মুহূর্তে বিলীয়মান এবং নবোৎপন্ন ; এইরূপ সন্তান= ঘটনা)-এর পরে অন্যান্য মন-সন্তানগুলি (৪ কার্য) আছে, ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন এবং পরিশেষে বলিয়াছেন-যে এই সকল মন-(বিজ্ঞান)-সন্তানগুলি কি প্রকারে মিলিত হইয়া দৃশ্যজগতকে (বিজ্ঞানবাদ অনুসারে) বহির্প্রক্ষেপ করিয়া থাকে। প্রমাণবার্তিকেও ধর্মকীর্তি বিজ্ঞানবাদের আলোচনা কবিয়াছেন। ধর্মকীর্তির দর্শনকে জানিবার পক্ষে প্রমাণবার্তিকই যথেষ্ঠ।

তৎকালীন দার্শনিক পরিস্থিতি

ধর্মকীর্তি দিঙ্‌নাগের ন্যায় অসঙ্গের যোগাচার (বিজ্ঞানবাদ) দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন। বসুবন্ধু দিঙ্‌নাগ এবং ধর্মকীর্তির ন্যায় শ্রেষ্ঠ তার্কিকগণ যে শূন্যবাদ ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানবাদেব সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা ইহাই প্রমাণ বরে যে, হেগেলের ন্যায় ইঁহাদেরও স্বীয় তর্কসম্মত দার্শনিক মতবাদের জন্য বিজ্ঞানবাদের অতিশয় প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু ধর্মকীর্তি বিশুদ্ধ যোগাচারী নহেন, সৌত্রান্ত্রিক (অথবা স্বাতন্ত্রিক) যোগাচারী বলিয়া স্বীকৃত হন। সৌত্রান্ত্রিক বাহ্যিক জগতের সত্বাকেই মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন আর যোগাচারী কেবল বিজ্ঞানকে (=চিত্ত, মন)। সৌত্রান্ত্রিক (অথবা স্বাতন্ত্রিক) যোগাচারের উদ্দেশ্য হইতেছে বাহ্যজগতের প্রবাহ-রূপী (ক্ষণিক) বাস্তবতাকে স্বীকার করিবার কালে বিজ্ঞানকে মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা—ঠিক হেগেলের ন্যায়। আধুনিক ভাষানুযায়ী ইহার অর্থ হইবে—জড়-(বস্তু) তত্ত্ব, বিজ্ঞানেরই বাস্তব গুণাত্মক পরিবর্তন। প্রাচীন যোগাচার দর্শনে মূলতত্ত্ব বিজ্ঞান-(চিত্ত)-এর বিশ্লেষণ কবিয়া উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—আলয়-বিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান। প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ছয়টি। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, স্পর্শ ; এই

(১০) "অসাধনাংগ বচনং অদোষোদ্ভাবনাং দ্বয়োঃ।"—ব্যাদনায়, পৃঃ ১।

পাঁচটি জ্ঞানইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিজ্ঞান (জ্ঞান); ইহা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইবার সময় রং আকার ইত্যাদির কল্পনা হইবার পূর্বেই অনুমিত হয়। ষষ্ঠ হইতেছে মনের বিজ্ঞান। আলয়-বিজ্ঞান হইতেছে উক্ত ছয়টি বিজ্ঞানের সহিত জন্ম-মৃত্যুতেও স্বীয় প্রবাহে (সন্তান) সমগ্র প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানের আলয়। ইহার মধ্যে পূর্বেকার সংস্কারগুলির বাসনা এবং পরে উৎপন্ন হইবে এরূপ বিজ্ঞানের বাসনা থাকে। যদিও ক্ষণিকতার সহিত সর্বদা থাকিবার ফলে আলয় বিজ্ঞানে ব্রহ্ম অথবা আত্মার ভ্রম হইতে পারিত না, তথাপি ইহা এক রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব হইয়া উঠিত। ইহাতে বিমুক্তসেন, হরিভদ্র, ধর্মকীর্তির ন্যায় অনেক দার্শনিক ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আত্মতত্ত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন। তাঁহারা আলয়বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তকে অন্ধকারে তীর নিক্ষেপ করিবার ন্যায় বিপদজনক মনে করিতেন (১১)। ধর্মকীর্তি আলয় (বিজ্ঞান) শব্দের প্রয়োগ প্রমাণবার্তিকে (১২) করিয়াছেন; কিন্তু উহা হইতেছে বিজ্ঞান—সাধারণ অর্থে, কিন্তু তথায় কোন অদ্ভুত রহস্যময়ী শক্তির ধারণা নাই (১৩)।

উক্ত দার্শনিকগণ সন্তানরূপে (ক্ষণিক অথবা বিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে) বস্তু জগতের বাস্তবতাকে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করিতে চাহিতেন না, ইহা পরে বুঝা যাইবে। কিন্তু বেচারাদের কতকটা ধর্মসংকটও ছিল। যদি তাঁহারা তাঁহাদের তর্কে স্থানে স্থানে প্রযুক্ত বস্তুতত্ত্বগুলির বাস্তবতাকে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেন, তবে ধর্মের আবরণ খসিয়া পড়ে এবং তাঁহারা সোজাসুজি বস্তুবাদী হইয়া যান। এইজন্য স্বাতন্ত্রিক হইলেও তাঁদের বিজ্ঞানবাদী থাকা প্রয়োজন ছিল। ইউরোপে বস্তুবাদের প্রসার লাভ করিবার সুযোগ সেই সময়েই ঘটে যখন সামন্ততন্ত্রের গর্ভ হইতে এক ভবিষ্যশ্রেণী—ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতি—বাহির হইয়া বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সহায়তায় স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছিল এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাচীন মতবাদগুলিকে রক্ষণশীল বলিয়া বস্তু জগতের বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত বিচারগুলিকে উৎসাহ প্রদান করিতেছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের ভারতে তখনও এই অবস্থা আসিতে চৌদ্দশত বৎসর বিলম্ব ছিল। কিন্তু ভারতীয় হেগেল (ধর্মকীর্তি) যে জার্মানীর হেগেল অপেক্ষা দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে হইয়াছিলেন—ইহাকে সামান্য ঘটনা মনে করা ঠিক হইবে না।

---

[১১] তিব্বতী নৈয়ায়িক জম্-য়ঙ-শদ্-পা (মঞ্জুঘোষপাদ—১৬৪৮-১৭২২) স্বীয়গ্রন্থ "সপ্তনিবন্ধ ন্যায়লঙ্কার-(সিদ্ধি)" বা অলঙ্কার-সিদ্ধিতে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা বলেন যে ধর্মকীর্তির সাতটি নিবন্ধের মন্তব্যগুলিতে "আলয় বিজ্ঞান"ও আছে, তাঁহারা অন্ধ। স্বীয় অজ্ঞানান্ধকারে তাহারা বাস করে"—ডাঃ শ্চেরবাস্কীর Buddhist Logic, Vol II, P. 329 এর পদাবলীতে উদ্ধৃত।

[১২] ৩।৫২২

[১৩] আলয় শব্দ প্রাচীন পালিসূত্রগুলিতেও পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে উহা রুচি অনুকৃত বা অধ্যবসায়ের অর্থে আসিয়াছে। মহাহত্থিপদোপমসুত্ত "মজ্ঝিম নিকায়" ১।৩।৮, মৎকৃত বুদ্ধচর্যা, পৃঃ ১৭৯।

তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি

এখানে এই দর্শনকে তাহার সামাজিক ভিত্তির পটভূমিতে কিঞ্চিৎ দেখা প্রয়োজন, কেননা দর্শন যতই হাড়মাংসকে ঘৃণা করিয়া নিজকে উহার উর্ধ্বে মনে করুক না কেন, উহা হাড়মাংসেরই সৃষ্টি।

বসুবন্ধু হইতে ধর্মকীর্তি (৪০০-৬০০ খৃঃ) পর্যন্ত সময় ভারতীয় দর্শনের (এবং কাব্য, জ্যোতিষ, ভাস্কর্য, স্থাপত্যেও) (১৪) চরম বিকাশের কাল। এই দর্শনের পশ্চাতে গুপ্ত-মৌখরী-হর্ষবর্ধনের মহান এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের প্রভাব রহিয়াছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু 'মহান সাম্রাজ্য' আখ্যা দিয়া আমরা মূলভিত্তিকে প্রকাশ্যে আনয়ন করি না, অধিকন্তু উহাকে অন্ধকারেই লুকাইয়া রাখি। সেই সময়কার সেই মহান সাম্রাজ্য কিরূপ ছিল? অনেকগুলি সামন্ত পরিবার একটি বড় সামন্তকে—যেমন সমুদ্রগুপ্ত, হরিবর্মা অথবা হর্ষবর্ধনকে—তাঁহাদের উপর স্বীকার করিয়া লইয়া নূতন প্রদেশগুলি, নূতন লোকসমূহকে তাঁহাদের অধীন করিতেন। অথবা তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাগণগুলীকে অপর কাহারও হস্তে না যাইতে দিবার জন্য সৈনিক-শাসন—যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের প্রস্তুতি—করিতেন। তাঁহাদের শাসনে পূর্বস্থিত অথবা নবাগত জনতার মধ্যে শান্তি এবং শৃংখলা রক্ষা করিবার জন্য নাগরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু এই দুই প্রকার শাসনই কেবলমাত্র পরোপকার প্রবৃত্তি প্রণোদিত ছিল না। সাধারণ জনগণ হইতে আগত সৈনিককে বহুল পরিমাণে উপবাসী থাকিতে হইত। শুধু সৈনিকের মধ্যে নহে, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতের মধ্যেও ইহারাই সংখ্যায় অবশ্য সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু সেনানায়ক সেনাপতিগণ সামন্ত বংশগুলি হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রথম হইতেই বড় সম্পত্তির মালিক ছিল। সমুদ্রে মুষলধারে বর্ষণের ন্যায় তাহারা তাহাদের উচ্চপদের জন্য প্রচুর বেতন, লুণ্ঠনের অগাধ ধনরত্ন, জায়গীর এবং পুরস্কার-লাভের অধিকারী হইত। ইহার উপর নাগরিক শাসনের বিরাট বিরাট অধিকারী উপরিক (ভুক্তির শাসনকর্তা অথবা গভর্নর) বা কুমারামাত্য (বিষয়ের শাসনকর্তা অথবা কমিশনার) অবৈতনিক ছিল না। তাহারা প্রজার নিকট হইতে উপঢৌকন (উৎকোচ) সম্রাটের নিকট বেতন, পুরস্কার এবং জায়গীর লইত।

ইহা নিশ্চিত যে লোকে তাহাদের আহার-বিহার, বসনভূষণ এবং অন্যান্য সাময়িক কাজের জন্য যে পরিমাণ খরচ করে, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে এ এইরূপ বস্তুর উপর সে তুলনায় অনেক কম খরচ করিয়া থাকে। সে সব দীর্ঘকালস্থায়ী বস্তুরও অধিকাংশই বহু শতাব্দীর অতিবাহিত কালের ধ্বংসাত্মক কার্যের দ্বারাই শুধু নহে,

[১৪] কাব্য—কালিদাস, দণ্ডী, বাণ। জ্যোতিষ—আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত। চিত্রকলা—অজন্তা এবং বাগ। মূর্তিকলা—গুপ্তকালীন পাষাণ এবং পিত্তল মূর্তিগুলি; বাস্তুকলা—অজন্তা ইলোরার গুহা, কোনারকের মন্দির।

বর্বর মানবের স্থূল হস্তাবলেপের দ্বারাও বিনষ্ট হইয়া যায়। তথাপি এখনও বর্তমান বুদ্ধগয়া, বৈদ্যনাথের মন্দির অথবা অজন্তা এলোরার গুহাপ্রাসাদ দেখিলে, অথবা কালিদাসের রচনাবলী এবং বাণভট্টের কাদম্বরীতে যে সকল নগরী অট্টালিকা রাজ-প্রাসাদের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝা যায়-যে তৎকালীন সম্পত্তিশালী শ্রেণী এই সকলের জন্য কিরূপ ব্যয় করিতেন এবং সর্বসাকুল্যে নিজেদের জন্য তাঁহারা কিরূপ খরচ করিতেন। আজিও শৌখিন বিলাসদ্রব্যের মূল্য অধিক, কিন্তু যন্ত্রযুগে এই দ্রব্য-গুলি যন্ত্রে নির্মিত বলিয়া অত্যন্ত সুলভ। অর্থাৎ উহাদের জন্য যে মানবহস্তকে পরিশ্রম করিতে হয়, গুপ্তযুগে উহা অপেক্ষা কয়েকগুণ অধিক হস্তের প্রয়োজন হইত।

সার কথা ইহাই যে, এই শাসন সামন্তশ্রেণীর শারীরিক আবশ্যকতাগুলির জন্যই নহে, অধিকন্তু উহাদের বিলাসসামগ্রী উৎপন্ন করিবার জন্যও লোকসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশকে তাহাদের সমগ্র শ্রম নিয়োগ করিতে হইত। ঐ সংখ্যার অনুমান ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে-যে আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে কোম্পানীর শাসনে ভারত তাহার ইংরেজ শাসকগণের জন্য তাহাদের দেশে প্রতি বৎসর যত ধন প্রেরণ করিত, উহা উপার্জন করিবার জন্য ষাট লক্ষ লোক অথবা সমগ্র লোক সংখ্যার এক চতুর্থাংশের অধিক লোকের শ্রমের আবশ্যক হইত। ইহা ব্যতীত ভারতে থাকাকালীন ইংরেজ কর্মচারী যাহা খরচ করিত—উহা পৃথক ছিল।

জনতার অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়-অংশকেই যে শাসকগণের জন্য এই প্রকারের দ্রব্যগুলি শ্রম দ্বারা জোগাইতে হইত—শুধু তাহাই নহে, উপরন্তু উহাদের কাম-বাসনা তৃপ্তির জন্য লক্ষ লক্ষ নারীকে বৈধ অথবা অবৈধরূপে তাহাদের দেহ বিক্রয় করিতে হইত। উহাদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ দাসীরূপে বিক্রীত হইতে বাধ্য হইত। দাসদাসীরূপে প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হওয়া সেই সময়কার একটি সাধারণ দৃশ্য ছিল।

অর্থাৎ এই দর্শন-কলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান, সেই শ্রেষ্ঠযুগের সমগ্র সভ্যতা—মানুষের পশুবৎ পরবশতা এবং হৃদয়হীন দাসত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই কথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। শুধু তাহাই নয়, এরূপ ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী দার্শনিকগণেরও তাঁহাদের মতবাদ সম্পর্কীয় বৈপ্লবিকতাকে সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল; ইহার বাহিরে গেলেই শাসকশ্রেণীর বিরাগভাজন হইতে হইত—তাহা সোজা রাজদণ্ডরূপেই হউক, অথবা তাহাদের কৃপা-বঞ্চিত হইবার রূপেই হউক অথবা ধর্মমঠমন্দিরে স্থান না পাইবার রূপেই হউক। সেই সময় শাস্তি এবং শৃংখলারক্ষার বাহু বর্তমানকাল হইতে অনেক বেশী বিস্তৃত ছিল। ইহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ধর্মের সহানুভূতিই কিছুটা সহায়তা করিতে পারিত। এই সহানুভূতি যে হারাইত, তাহার জীবন কোনো পুরস্কার ঘোষিত দস্যুর জীবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত না।

ধর্মকীর্তি যে নালন্দার রত্ন ছিলেন, সেই মহাবিহার পরিচালনার জন্য গ্রাম ও নগরস্বরূপ বড় বড় দানগুলি এই সামন্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত হয় (১৫)।

তাহাদের তাম্রপত্রে লিখিত দানপত্র এখনও আমরা যথেষ্ট পাই। হুনচেঙের সময় তথাকার ১০,০০০ বিদ্যার্থী এবং পণ্ডিতগণের জন্য যেরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করা হইত, প্রমাণবার্তিকের পংক্তিগুলি যে সেই হস্তকে ভুলিয়া তাহাকেই ছেদন করিবার জন্য উত্তোলিত হইবে, ইহা হইতেই পারে না। এই জন্যই স্বাতন্ত্রিক (বস্তুবাদী) ধর্মকীর্তিও দুঃখের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে করিয়াই অবসর লইয়াছেন্। যে ধর্মকীর্তি বিশ্বের উৎপত্তির কারণকে ঈশ্বর ইত্যাদি পরিহার করিয়া তাহার ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম অবয়বগুলির ক্ষণিক পরিবর্তনশীলতা এবং গুণাত্মক পরিবর্তনের রূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনিই দুঃখের কারণকে অলৌকিক রূপে পুনর্জন্মে নিহিত বলিয়া সাকার (objective) এবং বাস্তব দুঃখের জন্য বাস্তব এবং সাকার কারণের সন্ধান করিতে গিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন। যদি জনগণের এক তৃতীয়াংশ ঐ দাসগুলিকে মুক্ত করিয়া ঐসব সমসংখ্যক অন্য লোকদিগকে—যাহাদিগকে সুদ এবং ব্যবসায়ের মুনাফারূপে তাহাদের শ্রমকে বিনা পারিশ্রমিকে দিতে বাধ্য করা হইত—তাহাদের শ্রমকে সমগ্র জনগণের (যাহাদের মধ্যে ধর্মকীর্তি নিজেও একজন ছিলেন) মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করা হইত এবং যদি সামন্ত পরিবার ও বণিক শ্রেষ্ঠী পরিবারগুলির অপদার্থতা, কর্মবিমুখতাকে দূর করিয়া তাহাদিগকেও সমাজের জন্য লাভপ্রদ কাজ করিতে বাধ্য করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই সময়ের সাকার দুঃখের মাত্রা বহুল পরিমাণে লাঘব হইয়া যাইত। অবশ্য ইহা ঠিকই যে কর্মবিমুখতাকে দূর করিবার সময় তখনও হয় নাই। এই রাম-রাজ্যের কল্পনা যে সেই সময় ব্যর্থ হইত ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কথা তো সেই সময়কার সকল দার্শনিক কল্পনা এবং সকল ধর্ম সম্বন্ধীয় মনোরম কল্পনার পক্ষেই প্রযোজ্য। সফল না হউক, দার্শনিকের সেরূপ ভুলত্রুটিও তাহা হইলে মহৎ লক্ষ্যের জন্যই হইত, তাঁহার সহৃদয়তার এবং নির্ভীকতারই পরিচয় দিত। যদি উপেক্ষা ও শত্রুর আক্রমণে তাঁহার নিজ রচনাবলী বিনষ্ট হইয়াও যাইত, তাহা হইলেও অপর লেখকের লেখায় খণ্ডনের জন্য উদ্ধৃত তাঁহার প্রতিভার তীক্ষ্ণশর বহু শতাব্দীর বক্ষ ভেদ করিয়া মানবতার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিত এবং এই কালের মানুষের নিকটও নূতন বার্তা বহন করিয়া আনিত।

রাহুল সংকৃত্যায়ণ

[অনুবাদ : অনু সেন]

[ক্রমশ]

---

[১৫] H. D. Sankalia—History of Nalanda, (Madras) 1935.

অভিজ্ঞান

'সে কি, ওঠাননি পতাকা এখনো! উঠুন, হাত লাগান।'
ওরা নিজেরাই এনেছে পতাকা, বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে বেড়াচ্ছে। নিজেরাই দিচ্ছে উড়িয়ে।

তলতা বাঁশের লগিটাকেই ওরা পতাকাদণ্ড করে নিলো। আস্তে আস্তে যত্ন করে একটি পতাকা দিলো লাগিয়ে।

'এইবার মালাখানা পরিয়ে দিন।'

একপাটি-টগর ফুলের মালা। ওদের নিজেদের হাতে গাঁথা।

পতাকা-ওড়ানো শেষ করেই ওরা হৈ-হৈ করে চলে যায়। অন্যান্য বাড়িতে আবার যেতে হবে তো।

সকাল-বেলার রোদ্দুরে চিক্‌চিক্ করে উঠেছে পতাকাখানা। হাল্‌কা হাওয়ায় উড়ছে পত্‌পত্ করে। শাদা আর সবুজে ভাগ করা জমি। সবুজের ওপর বাঁকা-চাঁদ আর তারা আঁকা।

সুবোধ বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। একটি নতুন-জন্মের প্রতীক ওই সিল্কটুকু। ঢেউ দিয়ে দোল খাচ্ছে ছোট্ট নবজাতকটির মতো।

কিন্তু নাঃ। তোমার জন্যেই কি প্রতীক্ষা করেছি এতদিন! এতো দুঃখবেদনা তো তোমার জন্য নয়।

একটি বিলম্বিত শ্বাস বেরিয়ে আসে সুবোধের বুকের ভেতর থেকে। একটি দগ্‌দগে ব্যথা ছুঁয়ে এসেছে যেন, একটি মর্মাঘাতের সুস্পষ্ট জানানি এই নিশ্বাসের মধ্যে।

সুবোধ চোখ বুঁজে অনুভব করে, তিনটি রঙ ভেসে উঠেছে তার সামনে। জাফরাণী, সাদা, সবুজ। বুকের ভেতর কেবলই একটি সুর গুন্‌গুন্ করে উঠতে-চায়: রাষ্ট্রীয় গগনকী দিব্য জ্যোতি রাষ্ট্রীয় পতাকা নমো নমো।

সুবোধ বুঝতে পারে, নাড়িতে-শিরায় জড়িয়ে রয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট অনুভূতি, অনেক বেদনা অনেক সংগ্রাম দিয়ে গড়া: পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ। আজ অন্যকে স্বীকৃতির স্বাক্ষর দেওয়া এতই কি সহজ। একটি মুহূর্তেই কি রূপান্তরিত হয়ে যাবে সে-অনুভূতি! পনেরোই আগস্টের সত্যিই কি অত যাদু আছে!

সুবোধ বেরিয়ে পড়ে চটিটা পায়ে দিয়ে। বুকের মধ্যে একটি অপরিচিত ঝড় তাকে অস্থির করে তুললো।

পথের ওপর থানার কাছে থমকে দাঁড়ায় সুবোধ। তিরিশ-চল্লিশ জন লাল-পাগড়ী সেপাই সামরিক কায়দায় পতাকা-অভিবাদন করছে। জমাদার সাহেব ভারি গলায় আদেশ দিচ্ছেন।

থানাঘরের মাথায় পতাকা উড়ছে দুলে দুলে। সুবোধের মনে হয়, অনধিকার-প্রবেশের একটি চূড়ান্ত পরিচয় ওই পতাকাটিতে। একজন যেন ফলিয়েছে সোনার ফসল, আর একজন তাকে কেটে কেটে ঘরে তুলছে। আজ সেই কাটনে-ওয়ালাকেই স্বীকার করে নিতে হবে।

সাড়ে চার বছর আগেকার কথা। এই থানার সামনেই গুলিবেঁধা, রক্তমাখা প্রবোধকে তুলে নিয়ে পিছিয়ে এসেছিলো ওরা, থানা দখল করা হয়নি তখন।

প্রবোধ হাঁপিয়ে-ওঠা গলায় ক্রমাগত চেঁচাচ্ছিলো, 'আঃ, কেন পিছিয়ে আসছো? এই নিয়ে যাও পতাকা, থানার ওপর না ওঠানো পর্যন্ত থামা চলবে না।' তখন কিন্তু উপায় ছিল না, ক্রমাগত গুলিবর্ষণ আর চারটি মৃত্যুর ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। প্রবোধের অমন সুন্দর রক্তশকাশ মুখখানি শাদা হয়ে গেছে। দু'এক বিন্দু ঘাম তখনও ছড়িয়ে রয়েছে কপালের ওপর। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে সে জানতে চেয়েছে, 'হল? ওড়াতে পেরেছো পতাকা—থানার ওপর?'

সেদিন জবাব দিতে পারেনি, আজ সুবোধের কণ্ঠস্বর গর্জন করে উঠতে চায়, 'না পারিনি। তোমার সেই রক্ত-দেওয়া দিনটুকু লুঠ করে নিয়েছে যে, সে তোমার পতাকা নয়। এই অবিশ্বাস্য পরিণতির কথা কোনোদিন কি ভেবেছিলে তুমি—জানতাম কি আমরা সে-কথা!'

সুবোধের ডানহাতখানি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, চোখ দু'টি চক্‌চক্ করে ওঠে প্রতিজ্ঞায়। দৃঢ় এবং দ্রুত পদক্ষেপে এগোতে শুরু করে সে, মার্চ করে এগোচ্ছে যেন।

পীরতলায় কলমুখরিত জনতার সামনে বক্তৃতা হচ্ছে, 'ভাইজান, আজকের এই শুভদিনটিতে—'

সুবোধ ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসে বক্তৃতামঞ্চের দিকে। একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে হাত-পা নেড়ে চলেছে, উত্তেজনায় মুখখানি লাল। সাদা পায়জামা, আর হাঁটুতক ঝোলানো কালো-বহির্বাস। মাথায় লালরঙের ফেজটুপিতে ধাতুনির্মিত চাঁদতারা।

সুবোধ অবাক হয়ে যায়, কি করে এত অনায়াসে ওরা বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। এ-অধিকারবোধ ওরা পেলো কোথা থেকে। কোনোদিন তো ওরা এখানে দাঁড়ায়নি

একদিনও তো ওড়েনি এখানে ওদের সবুজ পতাকা। প্রবোধকেই মানাতো আজ ওখানে।

'আমরা কঠোর সংগ্রামের পর আজকের এই দিনটি পেয়েছি।'

মিথ্যা কথা। তোমরা করোনি কোনো লড়াই।

সুবোধের কানে প্রবোধের কণ্ঠস্বর বেজে উঠছে—এখানে দাঁড়িয়েই শুনেছিল সে—অনেক সংগ্রাম এখনো বাকি আছে আমাদের, এই তো সবে শুরু।'

'আজ আমরা আজাদী পেয়েছি। এই দেশ আমাদের, জমি আমাদের, এই আদালত, থানা—সব আমাদের।'

জনতা হৈ-হৈ করে উঠলো। পরিপূর্ণ প্রাপ্তির আনন্দে ওরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

প্রবোধের জনতা কিন্তু হৈ-হৈ করে ওঠেনি। প্রবোধ চেঁচাচ্ছিলো, এই দেশ, এই মাঠ, এই আকাশ, এই রহব, এই আদালত—কিছুই আমাদের নয়, কিছুই না। কিন্তু তা আমরা মানবো না, সব দখল করে নেবো।

'তাই বলে একথা ভুললে চলবে না যে, আমাদেরই গড়ে তুলতে হবে এই দেশ, নতুন করে।'

আহা, এই নতুন করে গড়ে তোলার কী একটি নিবিড় আনন্দে মশগুল ছিলো প্রবোধ। প্রবোধ সেদিন বলেছিল—মনে রাখবেন, আমরা যে আজ ভেঙে ফেলার অভিযানে এগিয়ে চলেছি, সে শুধু গড়ে তোলার জন্যই। আমাদের নিজেদের মতো করে গড়ে তুলবো বলে। এই সংগ্রামে আমাদের অনেককেই হয়তো জীবন দান করতে হবে, কিন্তু পিছিয়ে গেলে চলবে না আমাদের। মাতৃভূমির সেবায় অনেক শহীদের প্রয়োজন, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।

'পরিশেষে, যে সমস্ত শহীদের জন্য আমরা আজাদী পেয়েছি, আমি আহ্বান করছি, আসুন হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই।'

ব্যাপারটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সুবোধের। কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ, এ যেন পরিষ্কার করে বোঝা যায় না আর। সব একাকার হয়ে যাচ্ছে যেন। ওই দণ্ডায়মান ছেলেটি কে? না, ও প্রবোধ নয়।

'ভাইজান, সভা শেষ হবার আগে একটি কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, এই নতুন রাষ্ট্র কারো একার নয়, হিন্দু-মুসলমান সবারই এই রাষ্ট্র। আমরা সবাই ভাই-ভাই।'

কিন্তু প্রবোধেরই কণ্ঠস্বর এই কথাটিতে ধ্বনিত হচ্ছে যেন। সুবোধ পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখখানা মুছে নেয়।

হঠাৎ বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল: আল্লাহো আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদ-এ আজম জিন্দাবাদ।

চম্‌কে উঠল সুবোধ। একি, প্রবোধ নেই তার তাহলে এখানে। সবই ভুল, সবই ধাপ্পা বলতে হবে। যে-ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হচ্ছে, তার সঙ্গে ছেলেটির বক্তব্যের কোনো মিল নেই। প্রবোধের স্বীকৃতি পাবার অবকাশ কোথায় সেখানে।

সুবোধ জনতা থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এলো। ওদের এই উল্লাসধ্বনি তার কানে খোঁচা দিয়ে দিয়ে জানিয়ে দেয়, এখানে তার ঠাঁই নেই।

প্রবোধকে আর ওই ছেলেটিকে ভালোবাসা যায় না এক সঙ্গে। যে-স্বপ্ন একটি সুনিশ্চিত পরিণতির দিকে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, এ যেন তারই তীব্র প্রতিবাদ। সমন্বয়ের ভাষা নেই সেখানে।

মামার কথাই হয়তো ঠিক তাহলে—ধীরে ধীরে অলক্ষিত পদক্ষেপে মনে আসে কথাগুলি : হিন্দু-মুসলমান মিলতে পারেনা কখনো, তেলেজলে মিশ খায়না যেমন।

কতদিন প্রবোধ আর সুবোধ তাঁর কথার প্রতিবাদ জানিয়েছে, তাঁর অদ্ভুত মত নিয়ে হাসাহাসি করেছে। সুনিশ্চিত বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে যাচাই করার প্রয়োজন হয়নি তাদের নীতির। আজ ভীত হয়ে সুবোধ লক্ষ্য করে, পরাজয়টা শেষে এমন করে এদিক দিয়ে এলো! এ যেন অপ্রত্যাশিতের আকস্মিক আবির্ভাব, স্নায়ুজালকে মূর্ছিত করে দেবার মতো।

'এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'—মামার দুদিন আগেকার কথাগুলি আজ সত্যের নির্দেশ বলে মনে হয়, 'আমাদের জন্য ওরা এতটুকু সহানুভূতি বাকি রাখেনি। আমরা কাফেরই রয়ে গেলাম ওদের চোখে। তোরা হয়তো বলবি, একদিন এ পাগলামি থাকবে না, কিন্তু সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা চাইতো।' মামাকে একটু বিচলিত দেখাচ্ছে যেন, অমন হাসিহাসি অমায়িক মুখখানা আজ ভারি হয়ে গেছে অকস্মাৎ। 'রাস্তাঘাটে চলা যায় আজকাল? কী এক করুণাভরা চোখে তাকায় ওরা মুখের দিকে। যেন কৃতার্থ করে দিয়েছেন এতদিন-তক আমাদের বাঁচিয়ে রেখে।' মামার কথার মধ্যে এত লঘু ভঙ্গী ছিলনাতো আগে। 'অথচ আমরাই ইস্কুল দিয়েছি ওদের লেখাপড়া শেখার জন্যে। জমি দিয়েছি চাষবাসের, আকালে যথাসাধ্য বাঁচিয়েছি ফেনভাত দিয়ে।' মামার মুখখানা অসহায় হয়ে আসছে ক্রমশ। 'এসবও সহ্য করা যেত মুখ বুঁজে, কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকতে পারেনা—এই, এইগুলোর জন্যে।' টুকরো টুকরো কয়েকখানা কাগজ সুবোধের সামনে মেলে ধরেন তিনি।

বারোখানি চিঠি—মামাতো-বোন বাসন্তীকে সাদী করার প্রস্তাব। স্বেচ্ছায় না হ'লে জোর খাটাতে পেছপা হবেনা প্রস্তাবকেরা।

'শুধু হুমকি নয় সুবোধ'—ফাঁদে-পড়া সিংহের মতো করুণ কণ্ঠস্বর, 'ওরা পরশু রাত্রে মাধব গোঁসাইয়ের মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে। কাল দিনের বেলা মোহনসা'র খামার থেকে জোর করে ধান নামিয়ে নিয়েছে। পনেরোই আগস্টের জন্যে আমার

কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে আড়াইশো—জোর করে।' এরপর ধীরে ধীরে প্রকাশ করেন তাঁর সিদ্ধান্ত, 'হাওড়ার শিবপুরে ভাড়া পেয়েছি একখানা ফ্ল্যাট। আমার জন্যে নয়, বাসন্তীদের জন্যে, কানু-মীনুর জন্যে আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে—' একটু থেমে বললেন, 'তোমাকেও।' তখন তাঁকে মতামত জানানো হয়নি কিছু, আজ সুবোধ মনে মনে উচ্চারণ করে, হাঁ মামা, তুমি ঠিকই বলেছ। আমাকেও চলে যেতে হবে। আমারও স্থান নেই এখানে।

বাড়ি ফিরে সোজা ঘরের ভেতর ঢুকেই সুবোধ দেখলো, বাসন্তী একরাশ ধুতি-শাড়ি-শার্ট ভাঁজ করে করে তোরঙ্গের মধ্যে তুলছে। সুবোধ গিয়ে সেই গাদার ওপর ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'কিরে, ব্যাপার কিরে বাসু?'

'কালই না আমরা হাওড়া যাচ্ছি।'

'এত তাড়াতাড়িই বা কিসের?'

'নয় বুঝি? গাঁয়ের থেকে কত লোক এ পর্যন্ত চলে গেছে জানো? আমরাই পেছনে পড়ে গেলাম।'

বাসন্তীর আফশোষে কৌতুকবোধ করে সুবোধ, 'না, জানিনা তো। কারা কারা চলে গেছে বল দেখি।'

'মণি চাটুজ্যে, শ্রীনিবাস কাকা, বুলুবা, শিবু কায়েত, আরো কতো।'

'ওঃ—এতো!'

'হুঁ। তুমি তো শুধু চাঁদপুর-নোয়াখালি করে বেড়িয়েছ এতদিন, গাঁয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর রাখো?'

নিটোল ঘাড়খানি বাঁকিয়ে তাকালো বাসন্তী। শুধু কথায় নয়, অভিযোগটুকু যেন তার শরীরে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সুবোধ দৃষ্টি মেলে দেখলো, লালপাড় শাড়িটার ওপর ঘন কালো চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে। নগ্ন বাহুদুটি, আলতোভাবে তোরঙ্গের ওপর পাতা। কালো চোখদুটি অসম্ভব উজ্জ্বল, স্বচ্ছ দৃষ্টি মর্মস্পর্শী।

ছবিটি নতুন বলতে হবে। এমন করে সুবোধ কখনো বাসন্তীকে দেখেনি। কতদিন এক সঙ্গে কাটিয়েছে তারা। তখন কানু-মীনুরা হয়নি, প্রবোধ সুবোধ আর বাসন্তীরা ছিল খেলার সাথী। বয়েসে বাসু অনেক ছোট ছিল তখন। ওরা যখন বারো আর চোদ্দ, বাসু তখন সাত বছরের। সেই বাসু আজ এই হয়েছে। মামার বাড়িতে মানুষ। মাকে মনে পড়ে কিছু কিছু, বাবাকে তো নয়ই। কখনো অভাব-বোধও করেনি সুবোধ। মামাতো ভাই প্রবোধ আর মামাতো বোন বাসন্তী যেন নিজেই ভাইবোন। মামীমা যেন নিজের মা-ই।

ছুটে-বেড়ানো মাঠঘাট আর নালানদীর কথা মনে পড়ে একে একে। তিনটি

ছেলেমেয়ের বিনি-খাজনার রাজত্ব যেন। শৈশবের শুধু নয়, সুবোধ বুঝতে পারে তার জীবনের ইতিহাস এখানকার আকাশে-মাঠে-নদীতে ছড়িয়ে আছে। সেই ইতিহাসকে আজ পেছনে ফেলে রেখে যেতে হবে, নতুন করে শুরু করবার জন্য। যেতে হবেই, এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। বাসুর অভিযোগ অত লঘু নয়। সুবোধ আস্তে আস্তে উঠে পুবধারের জানালাটার কাছে দাঁড়ালো। 'অনেকদিন জানলাটা খুলিসনি মনে হচ্ছে।' সুবোধ খুলে দিয়ে বলল, 'আলো-বাতাস আসা চাইতো।'

বাসন্তী ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'না না, বন্ধ করে দাও জানলাটা।'

সুবোধ ওর প্রতিবাদ দেখে বিস্মিত হয়, 'কেন বলতো।'

বাসন্তী ইতস্তত করছে দেখে সুবোধ এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ায়, 'বাসু, কি হয়েছে বল।'

'আমি বলছি বন্ধ করে দাও।'

'কেন না বললে কিছুতেই নয়।'

সুবোধ দেখলো বাসন্তীর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, ঠোঁটদুটি কেমন বেদনার্ত দেখাচ্ছে যেন। শেষে মরীয়া হয়ে বললো বাসু, 'ওপাশে মোতাহেরদের বাড়ি না ?'

অন্ধকার কেটে এক ঝলক আলো এসে পড়ল যেন, সুবোধের মনে পড়ল, মোতাহেরের কথা শুনেছে সে। মনে পড়ল মামার কথা, 'বাসু আজকাল বেরোতে পারে বাড়ি ছেড়ে ? বাইরে তাকাতে পারে জানলা দিয়ে একবারো ?' বাসন্তীর নয়, সুবোধের মনে হ'ল এক বন্দিনী রাজকন্যার প্রাণটুকু কৌটোর মধ্যে পুরে রাখা হয়েছে। তাকে মুক্ত করা চাই।

জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে সুবোধ বলল, 'বাসু, কাল নয়, চল আমরা আজই পালাই এখান থেকে।'

একটি মৃদু হাসি বাসন্তীর ঠোঁটদুটিতে ফুটে ওঠে, 'এত তাড়াতাড়িই বা কিসের ?'

কিছুটা ম্লান হলেও ওরা হো হো করে হেসে উঠলো।

হঠাৎ মীনু কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে কোথা থেকে। 'মণ্টুদা, কানুদা আমায় মেরেছে।

কানুও পেছনে পড়ে থাকবার নয়। 'না, মারবে না। আচ্ছা, মণ্টুদা, আমি যদি সিল্কের ব্যাজ না কিনতে পারি। আমার কাছে তিন আনা পয়সা যদি না থাকে। আমার চার পয়সার কাগজের ব্যাজই ভালো। ও কেন ভেংচি কাটবে আমায় সে জন্যে।'

'সে জন্যে বুঝি। তুই কেন বল্লি আমার সঙ্গে আড়ি। জানো মণ্টুদা, ও শুধু হিংসে করে আমায় মেরেছে, ওর সিল্কের ব্যাজ নেই কিনা।'

'ফের—' কানুর ডান হাতটা মুঠো হয়ে উঠতে চায়।

মারমুখো কানুকে থামিয়ে বলল সুবোধ, 'ছিঃ, মারামারি করে না ভাইবোনে।'

সুবোধ দেখলো চাঁদ-তারা-আঁকা দু'টি ব্যাজ্ কানুর শার্ট আর মীনুর ফ্রকের ওপর আলপিন দিয়ে আঁটা। দু'জনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ফুলছে।

হঠাৎ বাসন্তী বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে ব্যাজ্ দুটো খুলে নেয়। 'আহা-হা, কি বোকা তোরা! এই ব্যাজ্ আবার কিনে পরে! বলেছিলুম না আজ ওদের কিছু কিনবিনা। তা নয়, আবার ঝগড়া হচ্ছে ব্যাজ্ নিয়ে।'

কানু কিছুটা খুশি হ'ল বলতে হবে, মীনু সরে এসে সুবোধের পাশে দাঁড়াল। এমন সময় ওঘর থেকে মামীমা এসে বললেন, 'কই মীনু কই? মীনুর মুখখানা ছোট হয়ে গেছে ততক্ষণ।

'মুখ পোড়া মেয়ে, ফেব বাইরে বেরিয়েছিলি। যদি ধরে নিয়ে যেত, আটকে বেখে দিত কোথাও?'

পর পর কীল চালিয়ে যাচ্ছেন মামীমা। টান্তে টান্তে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন মীনুকে। বাসন্তী ছুটে গেল মার থামাতে, 'আর যাবেনা, ছেড়ে দাও এবার।'

কানু এই ফাঁকে সুবোধকে বললে, 'আচ্ছা মন্টুদা, ব্যাজ কেনা কিসের দোষ বলোতো। কত ছেলে তো কিনেছে, বলাই-সুনীল-কাদের-পরিতোষ-দুলু। সকালে তুমিও তো কিনেছ একটা ফ্লাগ্?'

সুবোধ জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করলো সে, কানুর প্রশ্নের সঠিক-জবাব তার জানা নেই। অথচ একটু আগেই মনে হচ্ছিল যেন জবাবটা খুবই সোজা, হোঁচট খাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিলনা সেখানে।

ঠিকই তো, ব্যাজ কেনার দোষটা কি!

সুবোধ দেখল, কানু-মীনুরা সবুজ ব্যাজকে পর ভাবতে পারেনি। সকালে যারা পতাকা তুলে দিয়ে গিয়েছিলো, তাদের সঙ্গে বলাই-সুনীল-পরিতোষ-দুলু-কানুর তফাৎটাই বা কোথায়? ওরা তো পুরনোকে জানেনা, ওদের সামনের সবটাই নতুন। 'একটি কথা আপনাদেব মনে কবিয়ে দিতে চাই, এই নতুন রাষ্ট্র কারো একার নয়।'—কে বললে পীরতলার সেই ছেলেটির কথা এদের জীবনে সত্য হয়ে উঠবে না।

সত্য হয়ে উঠতে পারে—সুবোধ নিজে নিজেই জবাব খুঁজে পায় যেন—যদি এরা সমস্ত অতীতটাকে ভুলে যেতে পারত। কিন্তু তা কি পারবে? মামার কথাগুলি মনে পড়ে অনিবার্যভাবে, সোমনাথ থেকে আজ পর্যন্ত খতিয়ে দেখ, যখনই মিলবার চেষ্টা হয়েছে, তখনই ওরা ভেঙে দিয়েছে। নোয়াখালি আকস্মিক ঘটনা নয় সুবোধ, তোমরা মৈত্রীর বাণী প্রচার করে তাকে আকস্মিক প্রমাণ করতে পারবে না।'

কিছুদিন আগে হলে সুবোধ জোর গলায় প্রতিবাদ করত, পাল্টা ইতিহাসের

নজীর উদ্ধৃত করে মামার এই উক্তির অন্তর্বিরোধ কোথায় তা দেখিয়ে দিত। কিন্তু আজকে কেমন যেন গুলিয়ে যায় সুবোধের। বুঝতে পারেনা কোনটা সত্যি।

দুটি বিরোধী স্রোত পরস্পর ধাক্কা লেগে একটি ঘূর্ণীর সৃষ্টি করে তুলেছে যেন।

এ অস্বস্তি সইতে পারা যায় না। সুবোধ ভাবে, আর একবার বাইরে বেরিয়ে পড়লে হ'ত, কিন্তু চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওদের আজকের আনন্দোচ্ছ্বাস: যা তাকে পদে পদে মনে করিয়ে দেবে এখানে তোমার ঠাঁই নেই। এখানে নয়, এখানে নয়। তার থেকে এই ছোট্ট ঘরটুকুর মধ্যে পায়চারি করা ভালো। হঠাৎ দাঁড়াতে গিয়ে সুবোধের চোখ পড়ল, টেবিলে হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসার হাতবাক্সটির ওপর। চমকে উঠলো সুবোধ। জিভ কামড়ে ধরে সে, 'আরে যা:, কাল না সুধা বলে গিয়েছিল তার বাবার অসুখ। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।'

সুবোধ ডাক্তার নয়। কানু-মীনুর সর্দি-কাশি-অম্বল হ'লে ও বই দেখে দেখে মোড়লি করত একবার। খেয়ালের বশে শুরু করেছিল, দায়িত্ব নিয়ে শেষ করতে হয়েছে।

প্রথম প্রথম কেউ ওষুধ চাইতে এলেই বলত সে, 'আমি তো ডাক্তার নই,?

একটি প্রশ্নের একটি জবাব নয়, অনেকগুলি কথা শুনতে হত ওকে:

আপনিই গরীবের মা-বাপ, আপনিই আমাদের ডাক্তার।

পয়সা আছে ডাক্তারের ভিজিট দেবার? ওষুধের দাম কি আমরা জোগাতে পারি। খেতেই পাইনা, তাব আবার ওষুধের দাম!

এর ওপর কথা চলেনা। সুবোধ চুপ করে যায়।

সুধাদের বাড়ি এসে রোগী দেখে বললে, 'আমাশাটা পুরনো হয়ে গেছে। কি খায়?'

'ভাত।'

'সে কি! আজ থেকে বার্লি দিয়ো পাতি-লেবুর রস দিয়ে। কিছু কিছু ফলের রসও দেওয়া চাই।'

সুধা চুপ করে গেল।

ক্ষীণকণ্ঠে আস্তে আস্তে বলল রোগীটি, 'একমাস কাজ-কর্ম নেই আজ। ম্যালেরিয়ার পর আমাশায় ধরেছে। জনমজুর আমরা, পয়সা পাই কোথায়। মেয়েটা আজ দুদিন একবেলা খেয়ে আছে।'

সুবোধ দেখল, তালপাতা দিয়ে ছাওয়া চালটার একটা কোণ ফুটো হয়ে গেছে। মাটির হাঁড়ি, ছেঁড়া ময়লা বিছানায় দারিদ্র্যের জানানি সুস্পষ্ট।

বুকের ভেতর অস্বস্তির ঘূর্ণীটুকুকে কেমন তুচ্ছ মনে হয়। এদের কাছে

সুবোধের জগতের সমস্ত সমস্তাকে মনে হয় যেন ছেলেমানুষী। সুবোধ অনেকবার ভেবেছে একথা, কিন্তু আজকের মতো স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়নি কখনো।

সুবোধ সেদিন পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ালো। এক কুটির থেকে আর এক কুটিরে। একটি অদৃশ্য হাতছানি অনুভব করা যায় যেন, আজকের দিনটির পটভূমিকায় একটি না-বোঝা তাগিদ।

বুড়ো খলিল মল্লিক বললে, 'জ্বরটা যাতে ভালো হয়ে যায় তাই করুন। ছেলেটা খেটে খেটে মারা গেছে, বিবিটার পা ভেঙে গেছে পড়ে গিয়ে। মরণও যে হয় না।' পরে ধীরে ধীরে বললে, একটুখানি হাসি মুখে টেনে, 'আমরা আজ নাকি আজাদী পেলাম ?'

সেকি, সে-খবর পাওনি এখনো!

রঘু-ডোমের বিধবা বউ বলল, 'ছেলেটা বাঁশ কাটতে গিয়ে পা কেটে হাসপাতালে পড়ে আছে, পথ্য দিয়ে আসতে পারিনে। আচ্ছা বাবু, আমাদের কি এ দুঃখু ঘুচবে না!'

আহা, রাষ্ট্রপতির ঘোষণা কানে পৌছাল না তোমার!

গোলাম মামুদ কেঁদে ফেলে হাউ হাউ করে, 'ভাইটার আজ দুদিন হলো জেল হয়ে গেছে বাবু। পেটের জ্বালা সইতে না পেরে মিঞা সাহেবের ধান চুরি করেছিল। হা-আ রে—'

এ সব কাহিনীর শেষ নেই। সম্পূর্ণ একটি নতুন জগতের অবিচ্ছিন্ন ঐক্যতান। এদের সঙ্গে মিল নেই সুবোধের জগতের। সব কিছুর মাপকাঠি যেন আলাদা করে তৈরি এখানে, সুবোধদের চিন্তাধারণা দিয়ে হদিশ পাওয়া যায়না কিছুরই।

যেমন বাসুকে দিয়ে মাপা যায়না সুধাকে। মামা আর সুধার বাবাকে তুলনা করা চলেনা একটুও।

এইসব কথাই ভাবছিল সুবোধ, তার পরের দিন স্টেশনের প্লাটফর্মে বসে। ট্রেণ আসতে দেরি আছে এখনো। বাসু-কানু-মীনুরা সুটকেশ-তোরঙ্গ বিছানার ওপর বসে আছে। ছোট-ছোট গল্প করছে; লাইনের দিকে তাকাচ্ছে ঘনঘন, এলো নাকি ট্রেণ ?

সুবোধের কেবলই মনে হতে লাগল, তারা যেন কি একটা পেছনে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। তাকে বোঝা হ'ল না, শোনা হয়নি তার কথা।

বাসন্তী বলছিল, 'এ গুণ্ডাদের দেশ ছাড়তে পারলেই বাঁচি!'

না বোন্, শুধু গুণ্ডারাই নেই, সামশুল-গোলাম-খলিলও আছে। এদেরকে ছেড়ে যাচ্ছ না তুমি ?

'জানো মণ্টুদা, হিন্দু মেয়েদের আর একদণ্ড এখানে থাকা নিরাপদ নয় !'

সুধাকে জানো ? তালপাতার কুটির তো তার যৌবনকে ঢাকা দিতে পারেনি।

'যত সব নচ্ছার-পাজী লোক। ইতর। মানুষ নয় ওরা।'

ছিঃ বাসু, এমন করে বলে ! তুমি তো বুঝলে না, অসুস্থ মানবতা আর্তনাদ করে মরছে। নিঃস্বতায় তারা কি করুণ !

ঢং-ঢং-ঢং। গাড়ির ঘণ্টা পড়ল।

হঠাৎ সুবোধের কি মনে পড়ল যেন। বাসন্তীর চোখের ওপর চোখ রেখে বলে, 'বাসু, প্রবোধকে ছেড়ে এলাম না আমরা ?'

'মানে ?' বাসন্তী দেখ্‌লো কি একটি অসুস্থতা সুবোধের চোখ দুটিতে ফুটে উঠতে চায়।

প্রবোধ, তুমি বলতে, অসহায় মানুষগুলিকে ফেলে যাওয়া চলবে না। আজ যে তোমাকেও ফেলে রেখে যাচ্ছি।

তুমি বলেছিলে, স্বাধীনতার বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু পনেরোই আগস্ট সুধা-খলিল-গোলামদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠেনি। পারিনি আমরা।

তোমার কথা ছিল, রাজভয়, মারী-ভয় রাখা চলবে না। ভাই, সব রকম ভয়ে যে আজ এবা মুহ্যমান। আমিও যে আজ পালাচ্ছি।

ঝক্‌-ঝক্‌-ঝক্‌। ট্রেণ স্টেশনে ঢুক্‌ছে।

'ওঠো মণ্টুদা, তাড়াতাড়ি করো।'

বাসু, তুমি ছেড়ে যাবার এত আগ্রহ পেলে কি করে। তোমার কি কান্না পাচ্ছে না একটুও।

মামা বললেন, 'তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই। গাড়ি দশ মিনিট থামবে এখানে।' সুবোধ দেখলো, অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে কামরায়। পাদানি পর্যন্ত ঠাসা।

'কিন্তু উঠব কি করে, পা-গলাবারই ঠাঁই নেই।' মামীমা বললেন।

...আচ্ছা, এত লোক কি সবাই চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে ? কেউ-ই কি ফিরবে না আর !

'ইণ্টার ক্লাসে না হয়, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়ি। পরে দাম দিলেই হবে।' বাসু সমস্যার সমাধান করতে চায়।

কানু-মীনু-বাসু-মামীমাকে উঠিয়ে দিয়ে মামা উঠলেন। সুবোধ খোলা দরজার কাছে হাতল ধরে দাঁড়াল।

প্লাটফর্মের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, গ্রামের সবুজ-মাঠ ছড়িয়ে রয়েছে দিগন্ত পর্যন্ত। শেষ বেলাকার পড়ন্ত রোদ্দুরে কেমন ম্লান দেখাচ্ছে যেন। মনে হয়

সারা গ্রামখানা সুবোধের মুখের দিকে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। একটি মূর্তিমতী মিনতির মতো।

...আঃ, এ সময় যদি দুটো সান্ত্বনার কথা বলা যেতো ওকে। যদি দিয়ে যেতে পারতাম কিছু।

যদি বলতে পারতাম, সুধা চলে এসো আমাদের সঙ্গে।

সুধার বাবা, এই নাও তোমার ফলের ঝুড়ি, রস নিংড়ে খাবে।

ডোম-বৌ, এই তোমার ছেলের পথ্য।

মাসুদ, তোমার ভাইয়ের মুক্তি।

'গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল মণ্টুদা, উঠে পড়ো।'

খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেলো, ওপাশের প্লাটফর্মের ওপর যাত্রীগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওধারেও আসছে একখানা গাড়ি।

...আচ্ছা, ওই গাড়িতে যারা ফিরছে, তারা কারা। এই গ্রামের লোক? আস্তে আস্তে গাড়ির গতি বাড়ছে। সুবোধ হাতল ধরে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। পা-দানিতে পা দুটো উঠতে চায় না যেন।

'সুবোধ, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।' মামা তাড়া দিলেন।

...আচ্ছা, ওই যারা ফিরে আসছে তাদের মধ্যে ধুতি-শাড়ি-শার্ট আছে নিশ্চয়! সুধার সঙ্গী হবার মতো কেউ কি নেই?

দেখিই না, কারা আসে। এই গ্রামেরই কেউ কেউ আছে হয়তো।

সুবোধ হাতলটা ছেড়ে দিল।

পরপর তিনখানা মুখ গাড়ির তিনখানা জানলায় ভেসে ওঠে।

'উঠলে না সুবোধ?' মামা প্রশ্ন করেন।

'সে কি!' বিস্ময়াহত মামীমার মুখ।

'মণ্টুদা, আসছ না তুমি?' বাসুর কণ্ঠস্বরটা কী মিষ্টি।

গুণময় মান্না

মাস্টারদা

অগ্নিযুগের নেতাদের কথা কল্পনা করতে গিয়ে জনসাধারণ অনেক সময় তাদের রূপকথার নায়কে পরিণত করে ফেলে। কল্পনার রঙীন তুলি দিয়ে তারা মনের মত করে নানা-রকম বিচিত্র ছবি এঁকে নেয়। বলা বাহুল্য, অগ্নিযুগের অন্যতম-শ্রেষ্ঠ নেতা সূর্য সেন সম্বন্ধেও দেশের সাধারণ লোক নানা কাহিনী, নানা জনশ্রুতি রচনা করেছে। মুখে মুখে সে সব রঙীন কাহিনী হাওয়ার মত ছড়িয়ে গেছে দেশের সর্বত্র—জনসাধারণের স্বরচিত ইতিবৃত্তের রোমাঞ্চকর সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। সেই রূপকথার সূর্য সেন কখনও নারীর বেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে, কখনও বা বৃদ্ধা সেজে মিলিটারিকে ফাঁকি দিয়েছে, আবার কখনও বা মন্ত্রবলে শত্রুর দুর্ভেদ্য বেষ্টনীর ভেতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে! সূর্য সেন নামটি উচ্চারণ করতেই তাদের মানসদৃষ্টি দেখতে পায় এক বলিষ্ঠ দেহ প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন অদ্ভুত-কর্মা পুরুষের মূর্তি—দৈহিক বিক্রমে যে অদ্বিতীয়, দু হাতে রিভলভার ছুঁড়ে অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদ করা যার কাছে ডাল ভাত খাওয়ার মতই সহজ, চারতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে অক্ষত দেহে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যার জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, ইত্যাদি!

সত্যিকারের সূর্য সেনকে যদি তারা দেখত তাহলে কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হত।

মাস্টারদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমার এখনও মনে আছে। মাত্র মাস দুয়েক হল দলে ঢুকেছি, অনন্তদা (অনন্ত সিংহ) ও গণেশদা (গণেশ ঘোষ) ছাড়া অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে তখনও পরিচয় হয়নি। এমনি সময়ে একদিন অনন্তদা বললেন, "আমাদের পার্টির যিনি সবচাইতে-বড় তাঁর সঙ্গে তোমায় দেখা করতে হবে। কাল বিকেল পাঁচটার সময় আমার বাসায় আসবে; সেখানে দেখা হবে।—তাঁর নাম কি জান? তাঁর নাম সূর্য সেন। আমরা সবাই ডাকি মাস্টারদা বলে।"—মাস্টারদা যে জেলফেরত স্বদেশীদের ভেতর প্রধান স্থানীয়, তা এর আগেও কানাঘুষোয় শুনেছি। অবশেষে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সুযোগ ঘটবে!—সেদিনটা মাস্টারদা সম্বন্ধে নানারকম কল্পনা করতে করতে কেটে গেল। নানা ভাবনাও হল—আলাপ পরিচয়ের পর মাস্টারদা আমার সম্পর্কে না জানি কি ধারণা করবেন, আমায় কাজের উপযুক্ত মনে করবেন কিনা কে জানে, ইত্যাদি কত কি ভাবনা। পরদিন যথাসময়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম অনন্তদার বাসায়। ঘরে ঢুকেই উৎসুক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালাম। দেখলাম ঘরের এক কোণে এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন, আর তাঁর কাছে বসে রয়েছেন অনন্তদা, ঘরে তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই। উপবিষ্ট ভদ্রলোকটির চেহারায়

কোন বৈশিষ্ট্য নেই, অতি সাধারণ স্বল্পাকৃতি চেহারা—মাথার অনেকটা জায়গা জুড়ে টাক। আমি ভাবলাম হয়ত মাস্টারদা তখনও এসে পৌছাননি। একটু অপ্রস্তুত হয়ে অনন্তদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন: "এই যে মাস্টারদা, যাঁর কথা তোমায় বলেছিলাম।"—আমায় বসতে বলে অনন্তদা উঠে চলে গেলেন। "এই যে মাস্টারদা" শুনেই আমি চমকে উঠেছিলাম। মনে মনে ভাবলাম এই সেই মাস্টারদা যাঁর কথায় দলের সবাই ওঠে বসে—দেখতে তো তিনি যেন অতি সাধারণ নিরীহ এক ভদ্রলোক! কাছে গিয়ে বসে ভাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। চোখে চোখ পড়তেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম—এই সর্বপ্রথম অনুভব করলাম। অসাধারণ এক জোড়া চোখের তীক্ষ্নদর্শী দৃষ্টি। একটু আগেও যাকে আপাতদৃষ্টিতে অতি নিরীহ বলে মনে হয়েছিল, এখন আর তা মনে হল না। মাস্টারদার সমস্ত ব্যক্তিত্ব যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তাঁর সেই চোখ দুটোর ভেতর। নিরঞ্জন সেন তাঁর "বীর বিপ্লবী সূর্য সেন" পুস্তিকাখানায় মাস্টারদার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন: "চেহারার বিশেষ কোন পরিপাটি ছিলনা, দেখতে খুব ছোট, লোকের চোখেও পড়েনা—ইনিই চাঁটগাঁর সূর্য সেন।......আজ যে তাঁর এই দেশজোড়া নাম, তখন কিন্তু তা শুধু আমাদের মত অল্প কিছু লোক জানত।"—সত্যিই তাই। লোকের চোখে পড়ার মত কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁর ছিলনা। শুধু তাই নয়, মাস্টারদার দৈনন্দিন জীবন এমন এক নিভৃত পরিবেশের ভেতর কাটত যে চট্টগ্রামে তাঁর সেই প্রভাবশালী অস্তিত্ব খুব কম লোকই অনুভব করত।

যে সব রোমাঞ্চকর গুণ থাকলে সহজে লোকের বাহবা পাওয়া যায় তার কিছুই ছিল না মাস্টারদার। সভা-সমিতিতে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে আসর গরম করা বা নেতা-সুলভ কর্তৃত্ব ফলিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া—এ সব ব্যাপারে মাস্টারদা মোটেই কৃতি ছিলেন না। মাস্টারদাকে কোনদিন কোন ক্লাবের ব্যায়াম প্রদর্শনীতে দর্শনীয়দের স্থানে দেখা যেত না, কোন খুব-অনুষ্ঠানে তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হবার কোন অবকাশই পেতনা দর্শকবৃন্দ, কোন জনসভায় মাস্টারদাকে কেউ কোনদিন বক্তৃতা দিতে শোনেনি।

এ হেন এই নেপথ্যচারী মানুষটি তাহলে কি করে যাদুকরের মত এতগুলি যুবকের ওপর এ রকম অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করলেন?—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে মাস্টারদার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

মাস্টারদা কর্মীদের শ্রদ্ধা অর্জন করতেন কোন বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে নয়, তাঁর ভেতর এমন এক স্বচ্ছ আন্তরিকতা ছিল যা কর্মীদের মুগ্ধ করত। নেতাসুলভ অহমিকা নিয়ে নিজেকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা বা আত্মসচেতনভাবে নিজের চারপাশে রহস্যের জাল বুনে কর্মীদের চোখে রোমাঞ্চকর হয়ে থাকা—এ রকম সস্তা নেতাগিরি মাস্টারদা মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। সত্যিকারের নেতৃত্ব তখনই সম্ভব যখন আত্ম-

সমালোচনার সৎসাহস যুগিয়ে নেতা দলকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন। মাস্টারদা ছিলেন এই দুর্লভ গুণের অধিকারী। তাঁর নিজের জীবনের যা কিছু অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা, ত্রুটি, বিচ্যুতি—সব কিছু তিনি, অবিচলিতভাবে খুলে ধরতেন কর্মীদের সামনে যাতে তারা সত্যিকারের সৎসাহস আয়ত্ব করার শিক্ষা পায়। নেতা ও কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর যাতে কোন ফাঁকে এতটুকু লুকোচুরির প্রবঞ্চনা ঢুকতে না পারে সেজন্য তিনি তাঁর অনুগামীদের যেমন সতর্ক করতেন নিজেও তেমনি সজাগ থাকতেন। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনের দু একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবেনা :

সশস্ত্র সংগ্রামের নির্মম কর্মপন্থা অনুসরণ করে চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হবার সময় নানারকম মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী। নেতৃস্থানীয়দের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে খাটে। নানারকম বিরুদ্ধ অনুভূতির আলোড়ন তাঁদের মনকেও সমস্যাসঙ্কুল করে তোলে,- নানারকম পিছুটান তাঁদেরও মানসিক প্রস্তুতিকে ব্যাহত করে। অনন্তদা তাঁর আত্মজীবনীর এক জায়গায় এই ধরনের মনস্তাত্বিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে যা লিখেছেন তাতে দেখা যায় যে আত্মসমালোচনার ক্ষেত্রে মাস্টারদা প্রথম থেকেই ছিলেন আদর্শস্থানীয় :

"পরৈকোরা-ডাকাতির (চট্টগ্রামে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম ঘটনা) পর চট্টগ্রামে নতুন কোন কাজ হয়নি। এই নিষ্ক্রিয়তা আমার কাছে অসহ্য মনে হ'ত। আমি আওয়াজ তুললাম : কাজ চাই, কাজ চাই, কাজ চাই। আমার নিজের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে আমি আমার সহকর্মী ও দাদাদের মনস্তত্বও উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আমার তখন প্রায়ই মনে হ'ত যে যুবকদের নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক দল গঠনের ভেতর একটা বেশ মজার নেশা আছে, আসল সংগ্রামাত্মক কাজ এড়িয়ে গিযে শুধু দল পাকাতেই যেন ইচ্ছা করে। মনের এই যে অবচেতন বিচ্যুতি এটা আমার খুব খারাপ লাগত। আমার মনের ভেতর এই যে সব দুর্বলতা এসে নাড়া দিত, তা আমি মাস্টারদাকে খুলে বললাম। শুধু তাই নয়, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে আমি নির্ভীকভাবে তাঁরও সমালোচনা করলাম। মাস্টারদা যে শুধু আমার সমালোচনা সহানুভূতির সঙ্গে শুনলেন তা নয়, তিনি আমার সেই অপ্রিয় কথাগুলো একটু ইতস্তত না করে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।"

—একজন বয়োকনিষ্ঠ সহকর্মীকে এ রকম অবাধ সমালোচনার অধিকার দেওয়া মাস্টারদার মত নেতার পক্ষেই সম্ভব ছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তখন অস্ত্রাগার আক্রমণের আর অল্প কয়েকদিন মাত্র বাকী। সে সময়কার কথা লিখতে গিয়ে অনন্তদা এক জায়গায় লিখেছেন :

"তরুণদের পক্ষে মৃত্যুকে বরণ করা অনেক সহজ। জীবনের অপরিণত স্তরে থাকার দরুণ সংসারের নানারকম মোহ তাদের আচ্ছন্ন করতে পারে না। কিন্তু যাঁরা 'দাদা' স্থানীয়—বিশেষ করে জেল খেটে যাঁরা বেশ বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন—তাঁদের

অনেক সময় জীবনের প্রতি নতুন আকর্ষণ জন্মিয়ে যায়। তাই "অবিরাম দল গঠনের" নেশা মাঝে মাঝে আমাকেও পেয়ে বসত। এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিজের মনের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার করে তুলতাম। মৃত্যুকেই আমাদের কার্যক্রমের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে বরণ করে নেবার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করে তুলতে উদ্যোগী হতাম। আমার অন্যান্য সহকর্মীদের মনের অবস্থা কি ছিল জানি না, কিন্তু এ সম্পর্কে মাস্টারদার মনে কি হত তা খুব খোলাখুলিভাবে জানার সুযোগ আমার ঘটেছিল।

"আর দু'মাসের মধ্যেই আমাদের প্রস্তুত হবার কথা (অস্ত্রাগার আক্রমণের জন্য), কিন্তু তবুও যেন দেরি হতে লাগল। কেন এরকম হল? নানারকম অসুবিধা অবশ্যই ছিল, নানারকম অপ্রত্যাশিত ঘটনাও আমাদের কার্যক্রমকে কম ব্যাহত করেনি। কিন্তু তবুও আমার মনে হয় এই দেরির পেছনে আরও একটা অদৃশ্য কারণ ছিল—তা হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি "জীবনের সব কিছু" শেষ করে না ফেলার একটা অবচেতন ব্যাকুলতা। সৌভাগ্যক্রমে আমার মনের ভেতর এই অনুভূতি জন্মানো মাত্রই আমি তা টের পেয়ে হুঁশিয়ার হতে পেরেছিলাম।

"অস্ত্রাগার আক্রমণের দিন পনেরো আগে একদিন একা একা মাস্টারদার সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে প্রাণখোলা আলোচনা হল: আমি তাঁর কাছে অবাধ আত্ম-সমালোচনা করলাম এবং আমাদের এই একটু একটু করে দেরি হবার মূলে যে ঐরকম একটা মানসিক প্রবণতা রয়েছে তাও তাঁকে খুলে বললাম। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার প্রত্যেকটি কথা শুনলেন। আমি তখন তাঁর মনের অবস্থা জানতে চাইলাম। তিনি খুব খোলাখুলিভাবেই আমায় বললেন যে তাঁর মনের ভেতরও এরকম মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।

"সেদিনকার আলোচনার পর আমি মাস্টারদাকে বললাম—আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই যে আজ থেকে ১৫ দিনের ভেতর আমরা আমাদের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করব, কারণ আমরা যদি এইভাবে কঠোর প্রতিজ্ঞার বাঁধনে নিজেদের না বাঁধি, তাহলে কেবলই বিলম্ব ঘটতে থাকবে—এই রকম একটা আশংকা আমাদের পেয়ে বসেছিল। যাক, সেদিন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম যে একটা নির্দিষ্ট দিনের ভেতরই আমাদের যেমন করে হোক কাজে নামতে হবে—তার চাইতে একদিনও দেরি করা চলবে না।

"এমনিভাবে নির্মম প্রতিজ্ঞা নেবার সময় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল রক্তাক্ত সংঘর্ষ আর মৃত্যুর বীভৎসতা! ভেতর থেকে কি রকম একটা কাঁপুনি অনুভব করলাম। মাস্টারদাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কি রকম বোধ হচ্ছে? তিনি বললেন, 'এত শীগ্‌গির সব শেষ হয়ে যাবে ভাবতে যেন সত্যি কেমন লাগছে। আমি ঠিক আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারছি না। চিরকালের জন্য আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, আমাদের পরে ভবিষ্যতে দেশের কি হবে তা দেখার বা জানার কোন

উপায় আমাদের থাকবেনা। জীবন বড়ো মধুর, কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া আরও মধুর'।" (অনন্তসিংহের আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃত)—এই স্মৃতিকাহিনীটুকুর ভেতর থেকে মাস্টারদার বিপ্লবী চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ফুটে বেরিয়েছে। এই নৈর্ব্যক্তিক আত্মপ্রতিষ্ঠাই ছিল মাস্টারদার ব্যক্তিত্বের মূল কথা।

মাস্টারদা জন্মেছিলেন চট্টগ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯১৬ সাল থেকে। তিনি তখন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র, বি. এ. পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। এমন সময় একদিন পুলিশ এল তাঁদের হোস্টেল খানাতল্লাসী করতে। পরে জানা গেল যে তাঁর সহপাঠীদের ভেতর কয়েকজন নাকি ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতিতে লিপ্ত ছিলেন—তাই এই খানাতল্লাসী। উৎসুক আগ্রহ নিয়ে মাস্টারদা তাদের সঙ্গে মিশতে লাগলেন। এই প্রথম তিনি রাজনৈতিক সংস্পর্শে এলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর যুবমন দেশপ্রেমের অদম্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। বি. এ. পরীক্ষা দিয়েই মাস্টারদা চট্টগ্রামে ফিরে এলেন—তখন থেকেই তিনি কৃতসংকল্প যে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

ইতিমধ্যেই কিন্তু মাস্টারদার বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে আছে। বি. এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বিয়ে করতে হবে—এই হচ্ছে তাঁর আত্মীয় স্বজনের সুপরিকল্পিত সংকল্প। তখনকার দিনে কোন বিপ্লবী কর্মীর পক্ষে বিবাহিত জীবন যাপন করা রীতিবিরুদ্ধ ছিল। মাস্টারদা মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন।—এদিকে তাঁর ভাবী শ্বশুরই এ যাবৎ স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর কলেজ পড়ার খরচ জুগিয়ে এসেছেন, কারণ নিজের খরচে বি. এ. পর্যন্ত পড়ার মত আর্থিক সঙ্গতি তাঁর ছিল না। এ ক্ষেত্রে শেষ অবস্থায় এসে বিয়ে না করাটা হবে নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞতা। বাধ্য হয়ে মাস্টারদাকে বিয়ে করতে হল।—ঘটনাচক্রে এমনই হল যে তাঁর বিবাহ-অনুষ্ঠান আর "স্বদেশী ব্রতে দীক্ষা" গ্রহণের অনুষ্ঠান প্রায় একই সময়ে ঘটল। বিয়ের পরদিনই চট্টগ্রামের চট্টেশ্বরী মন্দিরে শপথ গ্রহণ করে বিপ্লবী দলের সভ্য হন—তখনকার দিনে এমনি আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ নিয়ে স্বদেশী ব্রতে দীক্ষা নিতে হত। কিন্তু বিবাহিত জীবন ও স্বদেশী জীবন—একসূত্রে এই দুই জীবনের সমন্বয় হতে পারেনা, এই ছিল সেই অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষাধারীদের কঠোর নিয়ম। সুতরাং মাস্টারদার বিবাহ শুধু অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত হয়ে রইল। বিবাহিত হয়েও তিনি অবিবাহিতের মতই নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখলেন স্ত্রীর সংস্পর্শ থেকে। এর জন্যে তাঁর স্ত্রীকে কম দুঃখ পেতে হয়নি। পাড়াগাঁয়ে যা ঘটে তাই ঘটল।—স্বামী জীবিত থাকতে কেন স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেনা এই নিয়ে পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে কতো লাঞ্ছনা কতো সামাজিক নিপীড়ন সইতে হয়েছে তাঁকে।

মাস্টারদার স্ত্রীর নাম ছিল পুষ্পকুন্তলা দেবী। যারা তাঁকে দেখেছেন, তাঁদের কাছে

শুনেছি যে তিনি নাকি অসাধারণ রূপসী ছিলেন। গ্রামের সাধারণ মেয়ে ছিলেন তিনি, কিন্তু স্বামীর আদর্শের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল স্বামীর কর্মজীবনের সঙ্গিনী হওয়া, কিন্তু তখনও বিপ্লবীদলে মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে মাস্টারদার পরিচয়ের প্রথম সুযোগ চট্টগ্রামবাসী পায় কংগ্রেসের প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময়। সরকারী স্কুল কলেজ তখন বর্জন করা চলেছে। ছাত্রদের শিক্ষার শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য চট্টগ্রামের স্বদেশী কর্মীদের উদ্যোগে সবে গড়ে উঠেছে নতুন এক জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—ন্যাশনাল স্কুল। যে কয়জন স্বদেশ প্রেমিক সেই স্কুলে শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অল্পদিনের মধ্যেই সবাই অনুভব করল। বলা বাহুল্য সেই জনপ্রিয় শিক্ষক সূর্য সেন ছাড়া আর কেউ নয়। তখন থেকেই তিনি চট্টগ্রামের স্বদেশী মহলে মাস্টারদা নামে খ্যাত হলেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল তখনও অতি ক্ষুদ্র, দলের কর্মীর সংখ্যা মাত্র কয়েকজন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দলটি যেভাবে সেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। মাস্টারদার সংগঠন প্রতিভার বিকাশ এইসব ঐতিহাসিক ঘটনার ভেতর দিয়েই প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। স্কুল কলেজ আদালত বর্জনের আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে, বুলক ব্রাদার্স স্টিমার-ধর্মঘট, আসাম-বেঙ্গল রেল-ধর্মঘট প্রভৃতি প্রত্যেকটি আন্দোলনেই চট্টগ্রামবাসী এই দলের কর্মীদের অসাধারণ সংগঠন দক্ষতার পরিচয় পেয়েছে।

অসহযোগ আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মাস্টারদা কংগ্রেসের অহিংস নীতির স্বরূপ বুঝতে পারেন। প্রথমে তাঁদের ধারণা ছিল যে অহিংস নীতি গান্ধীজীর একটা সংগ্রাম-কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। প্রয়োজন হলে তিনি হয়তো কৌশল পরিবর্তন করে শর্তহীন সংগ্রামের পন্থা অবলম্বন করবেন। কিন্তু সরকারী দমননীতি চরমপর্যায়ে পৌঁছবার পরও তিনি যখন অহিংস নীতিকেই চিরন্তন নীতি বলে আঁকড়ে রইলেন তখনই প্রথম মাস্টারদা ও তাঁর সহকর্মীরা কংগ্রেস রাজনীতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ পেলেন। এই নতুন উপলব্ধির সঙ্গেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক সম্পর্ক বদলে গেল। কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে যুবসমাজের সামনে একটা স্বতন্ত্র স্বাবলম্বী শক্তিরূপে দাঁড়ানো—তখন এই ছিল তাদের সামনে প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য। তা না হলে কংগ্রেস আন্দোলনের গড্ডালিকা প্রবাহে একাকার হয়ে গিয়ে নিজেদের বিপ্লবী স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা ছিল। এদিকে তখন ব্যাপকভাবে কংগ্রেসকর্মীদের ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে—এমনি সময় তাঁদের কংগ্রেস থেকে এভাবে দূরে সরে পড়া অনেকের কাছেই বোধগম্য হল না। সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরাও অনেকে

তাঁদের ভুল বুঝল। এমন কথাও রটল যে সূর্য সেন, অনন্ত সিং এরা সব ভীরুর দল, ধরপাকড়ের ভয়ে তারা এখন কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ইত্যাদি কত কি! তখনকার সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে অনন্তদা লিখেছেন :

"আমাদের এই নীতির ফলে সর্বসাধারণের ভেতর আমাদের সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব দেখা গেল। এতদিন আমরাই আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এসেছি, কিন্তু এদিকে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে, অথচ আমরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমাদের বিরুদ্ধে নানারকম সমালোচনা চারদিকে গুঞ্জরিত হতে লাগল। সাধারণের চোখে আমার অবস্থাও এত খারাপ হয়ে গেল যে যার যা খুশি তাই বলতে লাগল আমার বিরুদ্ধে। নিজের বন্ধু, মুখের সামনে ভীরু অপবাদ দিতেও তাঁরা কেউ কসুর করেনি। তখন আমাদের কি অসহ্য অবস্থা! সে সময় আমাদের যে কি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তা প্রকাশ করে বোঝান যায় না! যাক্, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সব কিছুই আমরা মুখ বুঁজে সহ্য করে গিয়েছিলাম।"

১৯২৩ সালে চট্টগ্রামবাসী আবার নতুন করে চিনল "সূর্য সেনের দল"কে! দুঃসাহসিক "আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ডাকাতি" ঘটল এই সময়। ঘটনার ২।৩ দিনের ভেতর সর্বত্র রটে গেল যে একদল দুর্ধর্ষ স্বদেশী যুবক আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানীর ১৭০০০৲ টাকা দিন দুপুরে সশস্ত্র প্রহরীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরা অনুমান করলেন এ নিশ্চয় সূর্য সেনের দলের কাজ। পুলিশ উঠে পড়ে লেগে গেল তাঁদের খোঁজে। মাস্টারদা, অম্বিকাদা, অনন্তদা, রাজেন দে ও দেবেন দে—এই ক'জন তখন চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে "সুলকবহর কুঠি" নামে এক পরিত্যক্ত বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। চারদিকে মুসলমান পাড়া, অথচ তার ভেতর অজানা কয়েকজন হিন্দু যুবক এসে সেখানকার সেই পরিত্যক্ত বাড়ীতে বাস করছে—বলা বাহুল্য ব্যাপারটি অল্প কয়েক-দিনের ভেতরই স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অবস্থা নিরাপদ নয় বুঝে মাস্টারদারা সবাই অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজিয়ে এক ঘোড়ার গাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় থামল। আগন্তুক চট্টগ্রামের কুখ্যাত পুলিশ দারোগা আবদুল মজিদ, আর তার ২।৩ জন পুলিশ অনুচর। "সুলকবহর কুঠি"র এই অভিনব অধিবাসীদের দেখে ত দারোগা সাহেবের চক্ষুস্থির। কিন্তু তক্ষুনি কাউকে গ্রেপ্তার করার সাহস তার হল না, কারণ যথেষ্ট সংখ্যায় পুলিশ সে তার সঙ্গে নিয়ে আসেনি। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সে এমন ভাব দেখাল যেন এমনিই সেখানে বেড়াতে এসেছে। তারপর সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। দারোগা সাহেব চলে গেল বটে, কিন্তু যাবার আগে স্থানীয় মোড়লদের হুকুম দিয়ে গেল যে পুলিশ নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা যেন সদলবলে সেই বাড়ীর ওপর নজর রাখে।

মাস্টারদারা তখন ছ'জন ছিলেন সে বাড়ীতে। একটু পরেই যে সদলবলে পুলিশ এসে উপস্থিত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, অতএব সময় থাকতে সরে পড়তে হবে। ইতিমধ্যে কিন্তু স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীরা বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাবভাব দেখে মাস্টারদার আর বুঝতে দেরি হলনা যে পুলিশের হাতে তাঁদের ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই তারা দল বেঁধে এসেছে—অনুরোধ উপরোধে কাজ হবেনা। অগত্যা সংহার মূর্তি ধারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় তাঁরা দেখলেন না। খোলা রিভলভার ও মসার পিস্তল হাতে নিয়ে তাঁরা সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক রকম ভয় দেখিয়েই সেই জনতার বেষ্টনী ভেদ করে এগিয়ে চললেন। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁদের অত সহজে ছাড়ল না—তারা মাস্টারদাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে ডি. এস. পি. ব্রজবিহারী বর্মনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ এসে সেই অনুসরণরত গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিল। মাস্টারদারা তখন নাগারখানা পাহাড়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অনেকক্ষণ ধরে চলল উভয়পক্ষের ধাবমান সংঘর্ষ। পুলিশ পক্ষে একজন হাবিলদার নিহত এবং কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। এদিকে শত্রু-পক্ষের গুলিতে মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও রাজেন দে গুরুতররূপে আহত হয়ে পড়ে যান। পুলিশ যাতে কাউকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করতে না পারে সেইজন্য মাস্টারদারা প্রত্যেকেই সঙ্গে করে পটাশিয়াম সায়ানাইড নিয়ে রেখেছিলেন। আহত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদা অম্বিকাদা ও রাজেন দে এই তিনজনই পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণের ভেতর তাঁরা অচেতন হয়ে পড়লেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনজনই অতি আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন—তিনজনের কারুরই মৃত্যু হয়নি। এই বিষ খাবার ঘটনাকে নিয়ে নানা সূত্রে নানা রকম রটনা রটেছে এ পর্যন্ত। কেউ অতিরঞ্জিত রূপ দিয়ে ঘটনাটিকে অলৌকিক ব্যাপারে পরিণত করেছেন, আবার কেউ বা অবিশ্বাসের হাসি হেসে এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আসল ঘটনাটা এই-যে মাস্টারদারা যে বিষ খেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই বিষের রাসায়নিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল না। বিশেষজ্ঞদের মতে যে শিশিতে সেই পটাশিয়াম সায়ানাইড ছিল, সেই শিশিরই কোন দোষে, কিংবা হয়তো বহুক্ষণ পর্যন্ত বাতাস লাগার দরুণ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই সায়ানাইডের রাসায়নিক গুণ অনেকটা বদলে গিয়েছিল—তাই তাঁরা এমনি আশ্চর্য রকমে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

নাগারখানায় অজ্ঞান অবস্থায় ধরা পড়ার পর মাস্টারদা'দের বিচারাধীন বন্দীরূপে এনে চট্টগ্রাম জেলে রাখা হয়। মাস্টারদার জীবনে কারাবাস এই প্রথম। এর কিছুদিন পরেই অনন্তদাও ধরা পড়েন। "আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ডাকাতি" নাম দিয়ে মাস্টারদার বিচার শুরু হল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কলকাতা থেকে এলেন

আসামীদের পক্ষ সমর্থন করতে। অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি সরকার পক্ষের সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ ধূলিসাৎ করে আসামীদের "নির্দোষ" প্রমাণ করলেন। মাস্টারদারা সবাই মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন কঠোর দণ্ডের অপেক্ষায়—এমন কি ফাঁসিও হতে পারত, কারণ খুনের অভিযোগও আনা হয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রমাণাভাবে তাঁরা মুক্তি পেলেন। পুলিশ মহাপ্রভুরা প্রমাদ গুণল। মাস খানেকের ভেতরই অর্ডিনান্স আইন জারি করা হল এবং বেছে বেছে বাংলার চরমপন্থী যুবনেতাদের সেই আইনের জোরে বিনা বিচারে বন্দী করা হল। চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতারা অনেকেই ধরা পড়ে গেলেন, কিন্তু মাস্টারদা আগেই হুঁশিয়ার হয়েছিলেন। পুলিশ তাঁর বাসায় গিয়ে হানা দিতেই তিনি পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সহকর্মীরা তখন সবাই জেলে এবং সে অবস্থায় চট্টগ্রামে থাকাও বিপজ্জনক। কিছুদিনের মধ্যে মাস্টারদা কলকাতা গিয়ে সেখানকার বিপ্লবী সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। কলকাতায় এভাবে গা ঢাকা দিয়ে থাকার সময় একদিন প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যান। তিনি তখন কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে মিলে শোভাবাজারের এক বাড়ীতে বোমা তৈরি করছিলেন—এমন সময় পুলিশের উপস্থিত সেখানে। মাস্টারদা ছিলেন তেতলায়। পুলিশের এই হঠাৎ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তৎক্ষণাৎ সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য তাড়াতাড়ি তেতলা থেকে পাইপ বেয়ে নীচে নামার সময় পড়ে গিয়ে ভীষণ চোট পান। অতি কষ্টে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোন রকমে পুলিশের নাগালের বাইরে গিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। অত্যন্ত অসহায় অবস্থা তখন তাঁর। আস্তে আস্তে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলেন—অনেকক্ষণ পর্যন্ত পা জলে ডুবিয়ে রেখে একটু সুস্থ বোধ করার পর সেখান থেকে গেলেন এক আত্মীয়ের বাসায় শ্যামবাজারে, কিন্তু সেখানে আশ্রয় পেলেন না। পুলিশের ভয়ে তাঁর সেই আত্মীয় তাঁকে এমন কি ঘণ্টা খানেকের জন্যও সাহায্য দিতে রাজী হল না। অবশেষে মানিকতলায় এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে তিনি তখনকার মত আশ্রয় পেলেন।

শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ সালে মাস্টারদা ধরা পড়ে রাজবন্দী হলেন। এই ছ' বছর আত্মগোপন করে তিনি নানা জায়গায় ঘুরেছেন এবং নানা কর্মীর সংস্পর্শে এসেছেন। বিভিন্ন বিপ্লবী দল ও উপদলগুলির ভেতর কি করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায় এই নিয়েও তাদের সঙ্গে তাঁর অনেক আলাপ-পরামর্শ হয়েছে এই সময়।

রাজবন্দী অবস্থায় তাঁকে প্রথম রাখা হয় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। গনেশদা এবং নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশি প্রমুখ বিপ্লবী যুবনেতারাও তখন সে জেলে। প্রথম সাক্ষাতে মাস্টারদাকে কি রকম লেগেছিল সে বর্ণনা দিতে গিয়ে নিরঞ্জন সেন লিখেছেন :

"মেদিনীপুরে পৌছানোর পর সূর্যবাবুর সঙ্গে গণেশ আমার পরিচয়

করে দিল। খুব অমায়িক গণেশের এই মাস্টারদা। তাদের চাটগাঁ দলের নেতা, অথচ বুঝবার কারো সাধ্য নেই। কথাব কোন ঝঙ্কার নেই, কোন ব্যাপারেই যেন নিজেকে জাহির করতে চান না। গণেশেব আমি সমবয়সী। অন্য দলেব হলেও তার সঙ্গে খাতির বেশ জমাট বেঁধে গেছে। তাই তার দেখাদেখি আমিও সূর্যবাবুকে 'মাস্টারদা' ডাকতে শুরু করলাম। মাস্টারদার চালচলন দেখে আমি সত্যি গণেশকে একদিন বললাম —'তোমাদের নেতা যে মাস্টারদা এ বোঝার কারু সাধ্য নেই। নিজেকে একটিবারের জন্যেও সামনে আনতে চান না।' গণেশ আমার কথাগুলি শুনে যেন এড়িয়ে যেতে চাইল, কিন্তু পীড়াপিড়ি করাতে জবাব দিয়েছিল—"মাস্টারদা ঐ ধরণেরই। আমাদেবই সব সময় প্রকাশ হওয়ার পথ করে দেন, কোন কাজে নিজের নাম ছড়িয়ে পড়ে এ তিনি চান না।"

১৯২৮ সাল পর্যন্ত মাস্টারদা বিভিন্ন জেলে রাজবন্দী জীবন যাপন করেছেন। নেতৃস্থানীয় বন্দীদের বাংলাব জেলে রাখা নিরাপদ নয় মনে করে তাঁদের অন্যান্য প্রদেশেব জেলে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মাস্টারদাকে মেদিনীপুর থেকে স্থানান্তবিত করে বম্বেব রত্নগিরি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপব আবার তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে বেলগাঁও জেলে রাখা হয়েছিল— তখন নিরঞ্জন সেনও তাঁর সঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।

বন্দীজীবনে মাস্টারদা পড়াশুনা করে তাঁর সময় কাটাতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি তাঁব তখন থেকেই ছিল গভীর অনুরাগ - যদিও তখনকার দিনে বিপ্লবী মহলে সাহিত্যিক রুচিবোধকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত না। এ বিষয়ে বন্দীজীবনে মাস্টারদা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে নিরঞ্জন সেন লিখেছেন :

"মাস্টারদা রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে বলতে গর্বিত হয়ে উঠতেন। আমাদের জাতীয় জীবনের কত বড় সম্পদ—তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এই শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তাঁর সজাগ মন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কত যে খোরাক পেয়েছে। রত্নগিরিতে থাকাব সময় জেল সীমানার ভেতরে পাহাড়ের যে উঁচু শিখর—সেখানে আমরা সকাল সন্ধ্যা বেড়াতে যেতাম। সেখান থেকে বিশাল আরব সাগর আমাদের চোখের সামনে এসে দেখা দিত। স্তব্ধ হয়ে বসে বসে সে দৃশ্যের দিকে আমরা চেয়ে রয়েছি। মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ করে মাস্টারদা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়াতেন। আমার কানেও তার থেকে কিছু কিছু ভেসে আসত। আমি কবিতায় বড় বেশি গা মাখাতে চাইতাম না। মাস্টারদা সে সব জেনে শুনেই আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন— 'কবিতাকে ভালবাসলে তুমি অবিপ্লবী হয়ে যাবে না, বাংলার বিপ্লবীদের জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়ানো...।' রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি তাঁর ছিল খুব প্রিয়। মাঝে মাঝে তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেতাম সেই কবিতার প্রাণস্পর্শী উদ্ধৃতি :

'...এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার—তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তা'রে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।'......"

১৯২৮ সালে মাস্টারদার স্ত্রী গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়েন। পীড়িতা স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ তাঁকে পাহারাধীন অবস্থায় কয়েকদিনের ছুটি মঞ্জুর করে। ছুটি পেয়েই মাস্টারদা ফিরে এলেন চট্টগ্রামে—তাঁর স্ত্রীর তখন শেষ অবস্থা। অনেক করেও তাঁকে বাঁচানো গেলনা। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল।

ছুটি ফুরোতে তাঁকে আর আটক-বন্দী হিসাবে জেলে না রেখে তাঁর গ্রামের বাড়ীতেঅন্তরীণ করে রাখা হল। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে বিনা শর্তে মুক্তি পেয়ে মাস্টারদা চট্টগ্রাম সহরে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর পুরনো সহকর্মীরাও প্রায় সবাই ছাড়া পেয়ে গেছেন। মুক্তি পেয়ে চট্টগ্রামের রাজনীতির সংস্পর্শে আসার কিছুদিন পরেই মাস্টারদা চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন। চট্টগ্রামের জীর্ণ শীর্ণ কংগ্রেস অফিসের এক ছোট্ট ঘরে ছিল তাঁর আশ্রয়। দু' তিনটি ছেলে পড়িয়ে যা উপার্জন হত তাই দিয়েই তাঁর অন্নসংস্থান। সেদিন-গুলোর কথা এখনও মনে আছে। কোন কোন দিন কংগ্রেস অফিসে গিয়ে দেখতে পেতাম মাস্টারদা নিজের হাতে ভাত রাঁধছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় নেতৃস্থানীয়রা যতই নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে উঁচুতে ওঠেন ততই তাঁদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীও যেন বদলে যায়। আভিজাত্যের বিকৃতি আসে তাঁদের জীবন-যাত্রায়। তাঁদের সম্মানবোধের মাপকাঠিও যেন বদলে যায়। সাধারণ কর্মীর পক্ষে অস্বাচ্ছন্দ্যকর যে সব কাজ স্বাভাবিক বলে ধার্য হয়ে থাকে তা এই শ্রেণীর নেতাদের পক্ষে অসম্মানজনক বলে গণ্য হয়! তাই যখনই দেখতাম আমাদের দলের শ্রেষ্ঠ নেতা নিজের হাতে রান্নার উনুন ধরাচ্ছেন তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতাম তাঁকে। মাস্টারদা ঠাট্টা করে বলতেন : "তোমাদের তো মা-বাবার হোটেল

রয়েছে—ভাত রাঁধার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়না।...কিন্তু আমার তো আর তোমাদের মত মা-বাবা নেই, তাই নিজের ভাত নিজেই রেঁধে নিতে হয়।"

প্রত্যেক রাজনৈতিক সংগঠনের ক্রমবিকাশের পথে মাঝে মাঝে অভূতপূর্ব সমস্যা এসে দেখা দেয়। কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত সংকটের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সাধারণ কর্মীরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে—সংগঠনের সুস্থ রাজনৈতিক-বোধ বিপন্ন হয়। এই রকম সন্ধিক্ষণে সংগঠনকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারার ওপরই নির্ভর করে নেতৃত্বের যোগ্যতা। মাস্টারদার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রথম পরিচয় পাওয়ার সুযোগও আমাদের ঘটেছিল এমনি এক সংকট-মুহূর্তে—আমাদের তরুণ সহকর্মী সুখেন্দু দত্তর মৃত্যু ঘটনা উপলক্ষে। শহীদ সুখেন্দু দত্ত স্থানীয় কংগ্রেস নির্বাচনের সময় কি ভাবে গুণ্ডার ছুরিকাঘাতে নিহত হয় সে মর্মান্তিক কাহিনী আগেই বলেছি *। এরকম একটা নৃশংস ঘটনা যে সবার ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করবে তাতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু তখন অস্ত্রাগার আক্রমণের মূল পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেছে। এমন সময় এই নিষ্ঠুর হত্যা ঘটনা দলের সবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিল। সুখেন্দু ছিল একজন অতি কৃতি কর্মী। বয়সে ছোট হলেও তার কর্মদক্ষতার গুণে সে দলের সবার কাছে ছিল অত্যন্ত আদরের। সুতরাং এরকম একজন আদর্শস্থানীয় কর্মীর হত্যা যে সবাইকে ভীষণ নাড়া দেবে তা তো খুবই স্বাভাবিক। দলের ভেতর প্রচণ্ড বিক্ষোভের ঝড় উঠল। "রক্তের বদলে রক্ত চাই"......"যারা সুখেন্দুর হত্যার জন্ত দায়ী তাদের মাথা চাই"—প্রতিহিংসার এই সব উন্মত্ত রব উঠল দলের ভেতর। নেতাদেরও কারু কারুর ধৈর্যচ্যুতি হবার উপক্রম হয়েছিল। একমাত্র মাস্টারদা শেষ পর্যন্ত নিজেকে স্থির রাখতে পেরেছিলেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে অবিচলিত দৃষ্টি রেখে তিনি কর্মীদের এই সমবেত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। একমাত্র তিনিই শুভবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রেখে একথা বলতে পেরেছিলেন: "সুখেন্দুর মৃত্যু আমি কারুর চাইতে কম অনুভব করিনি। কিন্তু আমরা কি শুধু দলাদলির আত্মঘাতী সংঘর্ষে নিজেদের শক্তিক্ষয় করব? ইংরেজ তো তাই চায়। আমরা যদি আসল সংগ্রাম ভুলে গিয়ে নকল সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ি ইংরেজ তো তাহলেই সব চাইতে খুশি হয়।"

---

* ১৯২৯ সালে কংগ্রেস নির্বাচনের সময় সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—এই দুই নেতাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের দুই পক্ষের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ঐ নির্বাচনে আমাদের পক্ষের প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়েছিলেন মাস্টারদা—অপরপক্ষের প্রার্থী ছিলেন মহিমচন্দ্র দাস। আমাদের পক্ষে ছিল সুভাষচন্দ্রের সমর্থন আর অপর পক্ষে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘর্ষে পরিণত হল। গুণ্ডার ছুরিকাঘাতে সুখেন্দু গুরুতর রূপে আহত হয়ে চট্টগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে তাকে চিকিৎসার জন্ত কলকাতায় কারমাইকেল হাসপাতালে আনা হয়। কিন্তু তাকে বাঁচান গেল না—কলকাতায় আনার অল্প কয়েকদিন পরেই সুখেন্দুর মৃত্যু হয়।

তখনকার দিনে যুগান্তর-অনুশীলনের দলাদলি বাংলার যুব-আন্দোলনকে যে কতটা ব্যাহত করেছিল সে কাহিনী আজ আর কারুর অজানা নেই। সে সব দিনগুলোর কথা মনে হলে আজ কৌতুক বোধ করি,—কিন্তু তখন আমরাও সেই দলাদলির প্রবাহে পড়ে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলতাম। দলাদলির নেশা অনেক সময় উভয় দলের কর্মীদেরই পেয়ে বসত। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বের করে তাই নিয়ে হাসি ঠাট্টায় কোনও দিনও মাস্টারদাকে যোগ দিতে দেখিনি। বন্দী-জীবনে মাস্টারদার সঙ্গে নিরঞ্জন সেনের এই সব দলাদলির সমস্যা নিয়ে অনেক প্রাণখোলা আলোচনা হয়েছে। নিরঞ্জনদা তখন অনুশীলন দলের সভ্য আর মাস্টারদা যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত। সেই আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মাস্টারদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে বেরিয়েছে :

"জেলে বসে বসে আমি মাস্টারদার সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছি। বাইরে আমরা নিজেদের ভেতর ঝগড়াঝাঁটি করে শক্তি ক্ষয় করি এটা তিনি মোটেই চাইতেন না। তাই প্রায়ই আমাকে বলতেন 'তোমার আমার, আমাদের সকলেরই এ বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। এক বিপ্লবীদলের বিরুদ্ধে অন্য বিপ্লবী দল, এ কলঙ্কিত অধ্যায়ের এবার যবনিকা টেনে দিতে হবে। আমাদের সবাইকে শপথ নিতে হবে, ঝগড়া-ঝাঁটি নিজেদের মধ্যে নয়, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে।' ("বীরবিপ্লবী সূর্য সেন" থেকে উদ্ধৃত)

মাস্টারদার নেতৃত্ব-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর ফেরারি জীবনে। মাস্টারদাকে ধরার জন্য সরকার পক্ষের উদ্যোগ-আয়োজনের অন্ত ছিল না। কলকাতা থেকে পুলিশ ও গোয়েন্দা-বিভাগের বাছা বাছা কৃতি পুরুষদের আমদানি করা হয়েছিল চট্টগ্রামে তারই জন্য। পিউনিটিভ ট্যাক্স, কার্ফু, আইডেনটিটি কার্ড, মারপিট, ধরপাকড় প্রভৃতি সর্বপ্রকার দমন ব্যবস্থার সমাবেশ হয়েছিল এই একটিমাত্র লোককে লক্ষ্য করে। সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে এই সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মাস্টারদা যে শুধু আত্মগোপন করেছিলেন তা নয়—একের পর এক সশস্ত্র প্রতি-আক্রমণ পরিচালনা করে শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিদ্রোহের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মাস্টারদা যদি শুধু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য আত্মগোপন করে থাকতেন তাহ'লে তিনি অনায়াসে শেষ পর্যন্ত পুলিসের নাগালের বাইরে নিজেকে রাখতে পারতেন। তাঁর কাছে এমন প্রস্তাব এসেছিল যে তিনি যাতে দেশের বাইরে কোথাও গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে পারতেন। কিন্তু মাস্টারদার কাছে সে প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। ইতিহাসের দুর্বার বিধান তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছিল বিদ্রোহী যুব আন্দোলনের সর্বাধিনায়কের আসনে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাস্টারদা তাঁর সেই মহান ঐতিহাসিক ভূমিকার পূর্ণ গৌরব অক্ষুন্ন রেখে গেছেন।

মাস্টারদা উচ্ছ্বাসপ্রবণ ছিলেন না,—তিনি ছিলেন চিন্তাপ্রবণ, তাই রাজনৈতিক প্রগতির সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় তাঁর পরবর্তী জীবনে। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির একটা মস্তবড় অসম্পূর্ণতা ছিল এই-যে, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কি হবে সে সম্পর্কে কোন সুচিন্তিত প্রোগ্রাম প্রস্তুত করার দিকে মনোযোগ দেওয়া হত না। মাস্টারদার ফেরারি জীবনের শেষের দিকে আমরা এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাই। পাহাড়তলি ইওরোপীয় ক্লাব আক্রমণের সময় শহরে যে সমস্ত ইস্তাহার ছড়ান হয়েছিল তাতে ভারতের শাসনতন্ত্র কি হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। সেই ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয় যে ভারতের শাসনতন্ত্র হবে 'Federal Republic'.

পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর আত্মহত্যার ঔচিত্য সম্বন্ধেও মাস্টারদা পরে মত পরিবর্তন করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই আত্মহত্যার পন্থা অবলম্বন করাই সঠিক বিপ্লবী নীতি বলে গণ্য হয়ে এসেছে। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর একাধিক বিপ্লবীর আত্মহত্যার ঘটনা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৯২৩ সালে মাস্টারদা নিজেও যে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন সে কথাও কাহিনী প্রসঙ্গে বলেছি। এমনি ভাবে মৃত্যু বরণ করার ফলে বিপ্লবী প্রচারের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করে ফেলা হত। গ্রেপ্তারের পর ইংরেজের আদালতকেও যে রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্রে পরিণত করা যায় সে চেতনার সত্যিই খুব অভাব ছিল আমাদের সবার ভেতরে। মাস্টারদাই কর্মীদের ভেতর এই নতুন উপলব্ধি এনে দেন। দেশের জন্য শুধু মৃত্যুকে বরণ করাই যথেষ্ট নয়, সে মৃত্যু যাতে বিপ্লবী আন্দোলনকে পুষ্ট করতে পারে সে কথাটি সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার। কালারপোল-সংঘর্ষের পর (সেখানে চার জন বিপ্লবী আহত হয়ে পড়া মাত্রই নিজেদের গুলিতে আত্মহত্যা করেছিলেন) মাস্টারদা এ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশ দেন: "সশস্ত্র অবরোধের পর পুলিশের বাধা ভেদ করে মুক্ত হওয়া যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে পুলিশের হাতে বন্দী হওয়ার ভেতর অপমানের কিছু নেই। পুলিশ আমাদের বন্দী করুক, আদালতে আমাদের বিচার করুক—বিচারের পর আমাদের ফাঁসি দিক। এর ফলে দেশবাসী আমাদের কর্মজীবনের সঙ্গে বিস্তৃত ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। এক একটি বিচারের সুযোগে দেশের হাজার হাজার যুবক যুবতীদের ভেতর সঞ্চারিত হবে রাজনৈতিক জ্ঞান ও বিপ্লবী উদ্দীপনা। তা না করে আমরা যদি আত্মহত্যার পথে সংক্ষিপ্ত নেপথ্য মৃত্যু বরণ করে নিই তাহলে আমাদের চাইতে ইংরেজেরই লাভ বেশি।"

মাস্টারদা সুলেখক ছিলেন। শেষের দিকে তিনি নিজের আত্মজীবনী লিখেছিলেন। লেখাটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। এ ছাড়া কয়েকটি প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু ধরা পড়ার পর তাঁর সব লেখাই পুলিশের কবলে পড়ে চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে চলে গেছে। "তৃতীয় অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" মামলার

সময় তাঁর লেখা দু' একটি প্রবন্ধের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় মামলার রায়ে। তিনি 'বিজয়া' নাম দিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে এক জায়গায় আছে "নরেশ, বিধু, টেগরা (হরিগোপাল), ত্রিপুরা, মধু, অর্ধেন্দু, প্রভাস, নির্মল, পুলিন, যতি, শশাঙ্ক, আশু (হিমাংশু সেন), অমরেন্দ্র, মনা (মনোরঞ্জন সেন), রজত, দেবু (দেবপ্রসাদ গুপ্ত), স্বদেশ, মাখন (জীবন ঘোষাল), রামকৃষ্ণ, নির্মল সেন, ভোলা প্রভৃতি স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত হয়েছে।"—তিনি 'Internee' নাম দিয়ে আরও একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কিন্তু সেই প্রবন্ধের কোন অংশই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

১৯২৮-এর পর মাস্টারদার কর্মজীবনের ইতিহাস আর নতুন করে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই—চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বিস্তৃত কাহিনীর ভেতর দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ঘটনাবহুল ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি কৃতিত্ব মাস্টারদার এই সময়কার জীবনের এক একটি জীবন্ত সূত্র। তাই চট্টগ্রামের সেই দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিহাস এবং মাস্টারদার কর্মজীবনের ইতিহাস এক ও অভিন্ন।

এবার মাস্টারদার গ্রেপ্তার ও গ্রেপ্তারের পর কিভাবে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ শোনা যাক তাঁর সহবন্দী ব্রজেন দাসের মুখ থেকে (ইনি ঘটনাস্থলে মাস্টারদার সঙ্গে ছিলেন এবং একই সঙ্গে বন্দী হন) :

"১৬ই ফেব্রুয়ারী—(১৯৩১ সাল) রাত ১০টার সময় হাবিলাস দ্বীপের কাছাকাছি গৈড়লার সীমান্তে একটা বড় বিলের মাঝখানে এক নির্জন পুকুর পাড়ে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে, বিশেষ করে তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে এক জরুরী আলোচনায় যোগ দেবার জন্য মাস্টারদা—কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত ও আমি—এই ক'জনকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। তখন সান্ধ্য আইন বলবৎ রয়েছে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত। তবুও গ্রামবাসী জরুরী কাজে জীবন বিপন্ন করেও ৯টার পর থেকে লুকিয়ে চলাফেরা করত। তাই এই ১০টায় নিঝুম রাত্রে বিপ্লবীদের যাত্রাক্ষণ। প্রথমেই তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে আশ্রয় নেন ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে। বাড়ীর সামনের অঙ্গন পার হয়ে সোজা গ্রামের রাস্তা ধরা যাবে—এই জন্যই ঐ পথে যাত্রা শুরু হল। প্রথম আমি, তার পেছনে মাস্টারদা, কল্পনা দত্ত এবং অন্য সকলে সারি বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ীর সীমানার ঘেরার কাছে এলাম। বাড়ীর চারদিকে বাঁশঝাড় ও গাছপালা—ঘুটঘুটে অন্ধকার। কাছের মানুষকেও খুব ঠাহর করে না দেখলে হদিস মেলে না, এমনি রাত। আমাদের ক'জনের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এমনি সময় আওয়াজ এলো "কোন হ্যায়"—বোঝা গেল স্থানটি ঘেরাও করেছে। নিরুত্তরে সে পথ পরিত্যাগ করে নিভৃত এক গোপন পথে আমরা ছুটতে লাগলাম—এ পথটি সে গ্রামের লোক ছাড়া অন্য কেউ চিনত না। কিন্তু একটা বাঁশের ঘেরা অতিক্রম করে অন্য একটি বাড়ীর সীমানায় খড়ের

গাদার পাশ দিয়ে যাবার সময় মিলিটারি টের পেয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ দুই পক্ষ থেকেই গুলিবর্ষণ সুরু হল। একটু পরেই ধরা পড়ে গেলাম। মাস্টারদা ছাড়া অন্যান্য সবাই উত্তর দিক দিয়ে সরে পড়তে সক্ষম হয়। কিন্তু মাস্টারদা মিলিটারির বেষ্টনীর মধ্যে আটকা পড়ে যান। মিলিটারি তখন হাউই-আলো (Illumination Rocket) জ্বালিয়ে সারা গ্রাম আলোয় আলোকিত করে ফেলেছে। মাস্টারদা মিলিটারি বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেননি। গুর্খারা তাঁকে দেখতে পেয়ে দুই পাশ থেকে দৌড়ে এসে ধরে ফেলে। মাস্টারদা আর আমার হাত, পা ও বুকে শক্ত বাঁধ দিয়ে ঐ খাসের গাদার নিচে ফেলে রাখে। সারা রাত ধরে আমাদের ওপর চলল অবিরাম নির্যাতন। অশ্রাব্য গালাগালি থেকে আরম্ভ করে বুটের লাথি, বন্দুকের গুঁতো, প্রশ্রাব বর্ষণ—কিছুই বাদ গেল না। পরদিন ভোরে আমাদের দুজনকে হাতকড়ি পরিয়ে আর কোমরে শিকল দিয়ে বেঁধে বেশির ভাগ রাস্তা উলঙ্গ অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে পটিয়া ক্যাম্পে এনে হাজির করে। তখন বেলা প্রায় ৮টা হবে...দুজনকেই এক খোলা মাঠে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে বহুক্ষণ পর্যন্ত রৌদ্রে ফেলে রাখে। বিকেল প্রায় ৬টা পর্যন্ত আমাদের এ অবস্থায় রাখা হয়।...আমাদের দুজনকে একই হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ওপর হুকুম ছিল যে আমরা একজন আর একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারব না। তবু পুলিশের অলক্ষ্যে মাস্টারদা বলে গেলেন তাঁর কথা—অনবরত আমায় সাহস জুগিয়ে গেলেন : বিপ্লবের পথ ছেড় না—জেল থেকে বেরিয়ে আবার কাজ শুরু করবে। বিপ্লবী আন্দোলন এখনও অল্প-সংখ্যক যুবকের ভেতর সীমাবদ্ধ রয়েছে...কিন্তু ১০-১২ বছর পর এর চাইতে অনেক ব্যাপক আকারে বহুতর শক্তিশালী গণঅভ্যুত্থান দেখা দেবে, কারণ গণসভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে দেশের মানুষ ক্রমেই অধিকতর পরিচিত হচ্ছে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে তাই ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সম্ভাবনা অনেক বেশি উজ্জ্বল...বিদেশী অত্যাচারের শাস্তিবিধান একদিন না একদিন হবেই···। তারপর যেন খানিকটা আফ্‌শোষ করেই বললেন—এখনও অনেক কাজ বাকী ছিল...জীবনের অনেক পাতাই শাদা রয়ে গেল।...

তাঁর যে ফাঁসি হবেই, একথা দিনের আলোর মতই তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল। মিলিটারি ক্যাম্পে আনার সঙ্গে সঙ্গে থানা আর ক্যাম্পের বাইরের সীমানার রাস্তায় ও রেললাইনে অগণিত লোকের ভীড় নিশ্চল বিষাদে সারাদিন দাঁড়িয়ে, কেউ সরে না—ক্রমেই দর্শন-লোভাতুরের দল বাড়তে লাগল। ছাত্ররা স্কুলে যায়নি, কোর্টে কোন লোক নেই, মাস্টার-উকিল-হাকিম সবাই সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে, কারও মুখে কোন কথা নেই। হাজার হাজার লোক নিস্তব্ধ, নির্বাক। এতলোক যে পটীয়ায় কোত্থেকে এল, তা বলতে পারব না। দূরের গ্রামগুলো থেকেও যে শুনেছে, সেই বোধহয় ছুটে এসেছিল তাদের সূর্য সেনকে দেখতে। সূর্য সেন ধরা পড়েছে—এ যেন তাদের কাছে অবিশ্বাস্য সংবাদ, তাই তাদের বিস্ময় কৌতূহল বোধহয় সেদিন কোন বাধা মানেনি।

পটীয়া থেকে চট্টগ্রামগামী শেষ ট্রেনে ললিত ঘোষ নামে একজন পুলিশ-কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে বহু শুর্খা ও পুলিশের পাহারায় একটা রিজার্ভ গাড়ীতে করে আমাদের নিয়ে এল যোল-শহর স্টেশনে (চট্টগ্রামের আগের স্টেশন)। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে কাঠখোট্টা এক ইংরেজ সার্জেন্ট্ ও কয়েকজন উচ্চপদস্থ বাঙালী আই. বি. কর্মচারী মহোল্লাসে আমাদের কামরায় এসে ঢুকল। সাহেব সার্জেন্ট্‌টি আই. বি. দের জিজ্ঞেস করল—Who is great Surja Sen—that old man? এই বলেই সেই বর্বর জানোয়ারটা মাস্টারদার মুখের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল। তাঁর নাক মুখ দিয়ে অবিরাম ধারায় রক্ত ছুটল—মাস্টারদা জ্ঞান হারিয়ে আমার গায়ের উপর এলিয়ে পড়লেন। বিচারের আগে বন্দী অবস্থায় মাস্টারদা পাছে মারা যান এই ভেবে আই. বি.রা প্রমাদ গুণল। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা জল দিয়ে তাঁর মাথা আর নাক ধুয়ে অপেক্ষমান মোটর লরীতে করে ওই স্টেশন থেকেই চট্টগ্রামের ডি. আই. বি. অফিসে নিয়ে আসা হয়।

ডি. আই. বি. অফিসার যোগেন্দ্র গুপ্ত মাস্টারদার জ্ঞান ফিরে আসার পর তাঁকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপাত্মক স্বরে জিজ্ঞেস করল: সূর্যবাবু, প্রীতিকে তো খেলেন, কল্পনাকে কোথায় রেখে এলেন? সে আবার কাকে নিয়ে পড়ে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডি. আই. বি. অফিস ইংরেজ সাহেবে ভর্তি হয়ে গেল। এ. এস্. পি. স্প্রিংফিল্ড্ মাস্টারদার কাছে পাওয়া রিভলভার নিয়ে এসে তাঁর বুকের ওপর সজোরে আঘাত করতে লাগল এবং তাঁর কানের ওপর ক্রমাগত থাপ্পড় মারতে লাগল। একজন অফিসার তাঁর সংজ্ঞাহীন হবার কথা বলায় সে থামে। চারদিন পর্যন্ত ডি. আই. বি. অফিসে রেখে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়, তারপর তাঁকে চট্টগ্রাম জেলে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়।

১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ সাল—রাত বারোটার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের ইংরেজ বড়কর্তারা দল বেঁধে মাস্টারদার সেলের কবাট খুলে ভেতরে ঢুকে হিংস্র পশুর মত তাঁর ঘুমন্ত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মম প্রহার শুরু করে। তাঁর পাশের সেলে তারকেশ্বর দস্তিদারও এতে জেগে যায় এবং এই অত্যাচারের প্রতিবাদে চিৎকার করে ওঠে। তারকেশ্বরের চিৎকার শুনে জেলের ডেটিনিউ ইয়ার্ডের বন্দীদের ভিতরও সোরগোল পড়ে যায়। তাদের সমবেত প্রতিবাদ-ধ্বনি সারা জেল প্রকম্পিত করে তোলে। তারকেশ্বর দস্তিদারকেও সেই বর্বর পশুরা বাদ দেয়নি। মুখ বন্ধ করার জন্যে তাকেও নিষ্ঠুর প্রহারে অচৈতন্য করে ফেলা হয়। প্রহারের ফলে মাস্টারদার প্রায় সমস্ত দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। অচৈতন্য অবস্থায় দুই জনকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।—কেউ বলে তাঁদের মৃতদেহ নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে, কেউ বলে বয়লারের মধ্যে পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে—সঠিক খবর এখনও অজানা রয়ে গেছে।"

বজ্রাহতের মত চট্টগ্রামবাসী শুনল তাদের সূর্য সেনের ফাঁসির সংবাদ। বিষাদের কালো ছায়া নেমে এলো চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে। এই একটি লোকের জন্ম তাদের কত লাঞ্ছনা, কত দুঃখই না সহ্য করতে হয়েছে।—পিউনিটিভ ট্যাক্স, আই-ডিণ্টিটি কার্ড, কার্ফু, ও নিত্যনতুন সরকারী বাধা নিষেধের কত পীড়নই না তাদের সহ্য করতে হয়েছে এই সূর্য সেনের জন্ম।—কিন্তু যেদিন এই সূর্য সেন ফাঁসির মঞ্চে চট্টগ্রামের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেল, তখন তাদের সেদিনকার সেই বিক্ষুব্ধ মনের অবর্ণনীয় অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চট্টগ্রামের সর্বত্র সেদিন অশ্রুসিক্ত সমবেদনার অস্ফুট কলরোল—সবার মুখে সেদিন শুধু এক কথা: "আমাদের সূর্য অস্ত গেল···চাটগাঁর এই রাত কি আর প্রভাত হবে?"

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ মাস্টারদাকে হত্যা করেছে—কিন্তু ইতিহাস তাঁকে দিয়েছে গভীর শ্রদ্ধার আসন, অমর অস্তিত্ব। ক্ষুদ্র চট্টগ্রামের সীমা অতিক্রম করে সেই অমর অস্তিত্বের পরিধি আজ সুদূর বিস্তৃত—সূর্য সেনের অমর স্মৃতি আজ আর শুধু বাংলার নয়। সারা ভারতের মুক্তিকামী জনতার গৌরবের বস্তু। বিপ্লবী যুবশক্তি যখনই যেখানে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রামের সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই সে স্মরণ করেছে সূর্য সেনকে, প্রীতি ওয়াদ্দাদারকে, জালালাবাদ, কালারপোল, চন্দননগর, ধলঘাটের তরুণ শহীদবৃন্দকে। সহস্র সহস্র বাঙালী তরুণ যখন ইংরেজের লাঠি ও গুলিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রসিদ আলী-দিবসে কিংবা নৌ-বিদ্রোহীদের পাশে পাশে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে মুক্তিযুদ্ধের পণ নিয়ে, তখন গর্বে বুক ফুলে ওঠে, মনে পড়ে মাস্টারদাকে—ভীরু বাঙালীকে বীর বাঙালীতে পরিণত করার যে কঠোর সাধনা নিয়ে তিনি আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁর সেই সাধনা সার্থক হয়েছে। কিশোর রামেশ্বর ও আবদুস সালাম যখন ইংরেজের গুলির সামনে বুক পেতে দেয়, তখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে সতের বছর আগেকার রক্ত-রঞ্জিত জালালাবাদের তরুণ শহীদদের কথা—মনে পড়ে টেগরার কথা, ত্রিপুরা সেনের কথা, কিশোর নির্মল লালার কথা, আর মনে হয় তাদের আত্মদান বৃথা যায় নি।

কিন্তু যে স্বাধীনতার আশা বুকে নিয়ে সূর্য সেন ও ভারতের শতশত শহীদ তাঁদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের সে আশা আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে। যে স্বাধীন সুখী সমাজের স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন, সে সমাজে শোষণের স্থান নেই, বঞ্চনার স্থান নেই। কিন্তু তাঁদের সে স্বপ্ন আজও পূর্ণ হয়নি।— দেশজোড়া শোষণের মসনদ আজও ভিত্তিচ্যুত হয়নি। বঞ্চনার সর্বগ্রাসী নাগপাশ আজও দেশের জনসাধারণকে দুঃসহ নরকে বন্দী করে রেখেছে। দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তো আজও অত্যাচারী বিদেশী ধনকুবেরদের করায়ত্ত; শাসনতান্ত্রিক রক্ষা-কবচ দিয়ে সে অন্যায় অধিকারকে পবিত্র অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। মাস্টারদা এবং শত শত শহীদের রক্তে যে সব

দেশশত্রুরা তাদের হাত কলঙ্কিত করেছে, আজও তাদের শাস্তিবিধান হয়নি, তারা আজও শাস্তিদাতার ক্ষমতাবান ভূমিকায় সমাসীন।

ভারতের অগণিত শহীদের সমাধির ভেতর থেকে তাই আজ ধ্বনিত হচ্ছে তাঁদের অতৃপ্ত আত্মার বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা—এই কি সেই স্বাধীনতা, যার জন্যে ভারতের কোটি কোটি জনতা যুগ যুগ ধরে আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে তাকিয়ে ছিল? এই কি সেই স্বাধীনতা যার জন্য আমরা আমাদের জীবন-যৌবন অকাতরে উৎসর্গ করেছিলাম?

আনন্দ গুপ্ত

[লেখকের যন্ত্রস্থ পুস্তক "চট্টগ্রাম-বিপ্লবের কাহিনী"র একটি অধ্যায়। আগামী মাসে বইটি প্রকাশিত হবে।]

প্রতিবেশী

ফিল্‌ম্‌-এ ঠিক যেমনটি হয়। একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করে ওরা ঢুকল। অভাব শুধু একটা ঘোরানো দরজার। আর চারতলায় আমাদের এই ছোট ঘরটার ভেতর আটজন লোক গাদাগাদি করে দাঁড়াবার পর ঘরের ভেতর বাতাস চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গেল যেন। বিশেষ করে এই গ্রীষ্মের সময়ে।

আর একটু হলেই আমরা খেতে বসে যেতাম। বিজলী-বাতির খরচ বাঁচাবার জন্যে রাত্রিবেলা আমরা তাড়াতাড়ি খাই। রান্নাঘর থেকে চিৎকার করে পলিন বাতি নিভিয়ে দিতে বলল আর জানালো যে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কথাটা শুনে ওদের কী প্রচণ্ড হাসি! ঝোলের বাটিটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে পলিন আশ্চর্য হয়ে গেল। ওর হাত থেকে বাটিটা প্রায় পড়ে গিয়েছিল আর কি। আমাদের ঘরদোর খুব বড় নয় বা শৌখিনভাবে সাজানোও নয়, কিন্তু এ আমাদের নিজস্ব। অনেক দিনের পুরনো জিনিসের ওপর আপনা থেকেই মায়া পড়ে যায়। আসবাবপত্র আমাদের যতটা না আছে, তার চেয়েও বেশি আমাদের স্মৃতি—কথাটার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হবে না বোধ হয়।

ওরা আট জন। মোটা লোকটা কর্তা গোছের, টুপিটা পেছনের দিকে ঠেলে সরিয়ে মাথা চুলকোচ্ছে। ওপাশের হাড়-জিরজিরে লোকটার দুটো প্রকাণ্ড হাত, মনে হয় যেন একটা গলদা-চিংড়ী দুটো প্রকাণ্ড দাঁড়া বাড়িয়ে আশেপাশের সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করবার জন্যে উদ্যত। বাকি যারা...সোজা কথায়, ওরা সকলেই ঠিক কাগজের ছবির মত।

দুই হেঁচকা টানে ঘরের ভেতরটা একেবারে ওলোট-পালোট হয়ে গেল। গিয়ে মোটা লোকটার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চেষ্টা করলাম, কারণ আমার ধারণা ওদের সঙ্গে যা হোক একটা কিছু হুকুম-নামা থাকার কথা। শুনে ওদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। ওসব কাগজপত্রের বালাই আজকাল বোধ হয় আর নেই।

পলিনের প্রথম উত্তেজনার কারণ ঘটল ওর বিছানার চাদরের দুর্দশা দেখে। এক ঝটকায় বিছানার ওপর থেকে চাদরটা তুলে নিল ওরা, তারপর দুমড়ে মুচড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল ময়লা রুমালের মত।

একজন হাতড়াচ্ছে খাবারের আলমারিটা, আর একজন কাপড়ের বাক্স। চারদিকে কাগজপত্র উড়ছে। এক বাক্স-ভর্তি আলপিন উল্টে ফেলা হয়েছে মেঝের ওপর। আনাচে কানাচে উঁকিঝুঁকি মারছে সকলে, লম্বা লম্বা কাঁটা ফুটিয়ে পরীক্ষা করছে আসবাবপত্রের ভেতরটা। দু'তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ আর বিশ্রী হট্টগোল শুরু করেছে।

আর সে কী ভাষা! হাড়-জিরজিরে লোকটা যখন পলিনকে 'এই বুড়ী' বলে ডাকল, আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'দেখো বাপু,...' কিন্তু কথাটা শুনে আবার সেই হুল্লোড় শুরু হল। সমস্ত ব্যাপারটাই ওদের কাছে যেন একটা তামাসা।

যে লোকটা আমার শরীর পরীক্ষা করছিল সে আমার টাকার থলিটা হাতে নিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিল। এক রাশ টুকরো টুকরো বাজে কাগজ বেরিয়ে এল ঝর ঝর করে—নেহাৎ কুড়েমির জন্যেই কাগজগুলো আমি এতদিন ফেলে দিইনি। কাগজ-পত্রের সঙ্গে আমার সাবানের রেশন-কার্ডটাও ছিল। লোকটা নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল আমাকে, ওর কেমন একটা দৃঢ় ধারণা যে আমার রিংএর চাবিগুলো দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যায়। ইতিমধ্যে মোটা লোকটা চিঠির বাক্সের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে; বাক্সটার চারিদিকে সামুদ্রিক ঝিনুক লাগানো, ওটা আমরা ত্রেপোর থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আলফ্রের চিঠি আর গ্যাসের বিলগুলো ভাল করে পড়ে নিয়ে ও আমাব কাছে জানতে চাইল ফটোয় যাদের দেখা যাচ্ছে তারা কে।

যুদ্ধের তিন বছর আগে ম্যোদোঁতে তোলা ওই ফটোটায় খুড়তুতো ভাই মোরিসের পেছনে দাঁড়ানো লোকটা যে কে আমার মনে নেই। জাঁদরেল চেহারা লোকটার, গালে একটা জন্মচিহ্ন। বোধ হয়, পিশেরেলের কোন বন্ধু। এ ছাড়া আমি আর কিছু জানতাম না। কিন্তু আমার কথা শুনে মোটা লোকটার কেমন সন্দেহ হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পলিনকে খোঁচাতে লাগল। ওর মতলব, আমাদের দুজনের মধ্যে পরস্পর কথা কাটাকাটি করিয়ে সমস্ত কথা বার করা। সাধারণত যেমন হয়, আমি যা বলেছি ঠিক তার উল্টো কথাটি বলে বসল পলিন: 'কাকে তুমি পিশেরেলের বন্ধু বলছ? কী যে সব উদ্ভট ধারণা ঢোকে তোমার মাথায়! ও তো মাদাম জানোর ছোক্‌রা-বন্ধু। সেই যে গো, মাদাম জানো, খুব ভাল ব্লাউজ তৈরী করতে পারত।'

একথা শুনে আমি বোকার মত বলে বসলাম, মাদাম জানোর বন্ধুটি ছিল সোনালী চুল আব এ লোকটির চুল কালো। চুলের রং নিয়ে চুলচেরা তর্ক শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে......মোটা লোকটা উৎসাহে একেবারে লাফিয়ে উঠল।

বলল, 'এই তো, এইবাব? দুজনের দু রকম কথা—এটা কি রকম হল?'

কথাটা শুনে মেজাজ চড়ে গেল। মাদাম জানোর বন্ধুকে নিয়ে ওর এত কাজ কি?

শুনে লোকটা বলল, 'সে আমার কাজ আমি বুঝি। আপনাকে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।' কথাটা বলে মাথার টুপিটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। ঘরের ভেতর বাকি যারা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা ঠায় দাঁড়িয়েই রইল কাঠের সেপাইয়ের মত।

শেষকালে আমি বললাম, 'কোন লোকের বাড়ীতে ঢুকলে কতকগুলো সাধারণ

ভদ্রতার নিয়ম মেনে চলতে হয়। আর এখানে আগাগোড়া লণ্ডভণ্ড করে দিয়েও কি আপনাদের আশ মেটেনি ?'

পলিন তো রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দিল। ফর্সা ধবধবে বালিশগুলোর ওয়াড় টেনে টেনে খুলে ফেলছে লোকগুলো। ওয়াড়গুলোকে আবার কাচতে হবে, ওদের ওই নোংরা হাতের ছোঁয়া...

হাড়-জিরজিরে লোকটা বিশ্রীভাবে পলিনের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙিয়ে উঠল, 'থাম্‌রে মুটকী থাম্।'

'খবরদার বলছি!' আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল, কিন্তু লোকটা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না।

ওদের মধ্যে লাল গোঁফওয়ালা বেঁটেমত লোকটাকে দেখতে ঠিক রাস্তার বাউণ্ডুলে ছোঁড়ার মত। সেলাইয়ের কলটা নিয়ে ও উঠেপড়ে লেগেছে। একেবারে নিখুঁত কাজ, একটি জিনিসও হাত ফসকাচ্ছে না। টানাটা খুলে ফেলে ভেতরকার জিনিসপত্র মেঝের ওপর উপুড় করে ঢেলেছে, মাকুটা খুলে ফেলেছে, সুতো আর রেশমের গুলিগুলোর পাক খুলে ছড়িয়েছে চারিদিকে। কেমন একটা উদগ্র কৌতূহল নিয়ে ধাতব টুকরোগুলো নাড়াচাড়া করছে লোকটা—মুড়ি ভাঙবার যন্ত্র, নানা খুঁটিনাটি কলকব্জা—যেগুলো পলিনের কাছে মহামূল্য সম্পদের মত—কিছুই বাদ যাচ্ছে না। দেখা শেষ হলে কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে খুশিমত। ঘরের সর্বত্র এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ছে জিনিসগুলো। একজন ইয়ারবন্ধুর গর্দানে একটা এসে লাগতেই ঝগড়া শুরু হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'মশাই, দয়া করে...'

এবার আর ওরা হেসে উঠল না। দুজনেই আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সরকার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করল।

আমার আর উত্তর দেওয়া হল না, কারণ ওদিকে পলিন প্রাণপণে চিৎকার শুরু করেছে। প্রকাণ্ড একটা লোকের সঙ্গে ও প্রায় ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে আমাদের বিয়ের ছবিটা লোকটার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টায়। সেই যে ছবিটা রুপোর কাঠামোয় বাঁধানো। তারপর যখন তাকের ওপর থেকে রূপোর চামচগুলো ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝের ওপর ছিট্‌কে পড়ল তখন সেদিকে তাকিয়ে আমার মুখে একটিও কথা ফুটল না।

শেষকালে আমি ওদের দেখালাম—অগ্নিকুণ্ডের ওপরকার তাকে মর্যাদার আসনে বসানো মার্শাল পেতাঁর ছবিখানা। মার্শাল একটা কুকুরকে আদর করছে, এই ভঙ্গীতে তোলা ছবিটা (আলফ্রে বলে, ওটা মার্শালের পারিবারিক চিত্র)। ওরা কিন্তু ছবিটাকে বিশেষ আমল দিল না।

মুখ খিঁচিয়ে মোটা লোকটা হেঁড়ে গলায় বলল, 'থাক্, থাক্, ঢের হয়েছে। সব বেটাই ঘরের ভেতর অমন এক-একটা ছবি টাঙিয়ে রাখে।'

অন্য সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল। স্পষ্টই বোঝা যায়, এসব ব্যাপার ওদের জানা আছে।

'আমাদের অপরাধটা শুনতে পাই কি?' সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলে পলিন জিজ্ঞেস করল।

মোটা লোকটা এমন দৃষ্টিতে তাকাল যে দেখলে শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি ধরে।

বলল, 'মাদাম, কোন একটা বিশেষ অপরাধে আপনারা অভিযুক্ত নন। ব্যাপারটা তার চেয়েও খারাপঃ আপনাদের সন্দেহভাজন বলে মনে করা হচ্ছে।'

ব্যাপারটা যে খারাপ তাতে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই। হাড়গিলে লোকটা একটা কুশান টিপে টিপে দেখছিল—আমার শ্যালিকা মিশো অন্ধ হয়ে যাবার পর ওটার ওপর ছুঁচের কাজ করেছে। হঠাৎ ও হো-হো শব্দে ফেটে পড়ল।

'কি বলছিলাম যেন?' বলল ও।

ও কি বলছিল আমি জানি না, কিন্তু আমি খুব ভাল করেই জানি যে ততক্ষণে লোকটা সেই মিহি ছুঁচের কাজ করা কুশানটা ছিঁড়ে ফেলেছে আর পালক টেনে ছড়িয়েছে বালিশের ভেতর থেকে। পরে ও জোর গলায় বলেছে যে বালিশ আর কুশানের ভেতর শক্তমত কি যেন ওর হাতে ঠেকেছে। হয়ত সত্যিই ঠেকেছিল, কিন্তু বালিশের ভেতর থেকে সে জিনিসটা আর ও খুঁজে পায়নি।

ওদিকে পলিন প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছে। হাড্ডিসার লোকটার দুঃসাহস বলতে হবে যে গলদা-চিংড়ির দাঁড়ার মত থাবাটা বাড়িয়ে মুখ চেপে ধরেছে পলিনের। আর ওকে বাধা দিতে গিয়ে আমি কি সেই থাবাটা আঁকড়ে ধরেছিলাম! কিন্তু আমার বয়সটা তো বাষট্টি বছর। ভদ্র চালচলনে আমি অভ্যস্ত, দেশের আইনকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ওরা যদি মহিলাদের সঙ্গে পর্যন্ত বিশ্রী ব্যবহার করে...

'আরে, ঘেমে যে নেয়ে উঠেছেন,' লালমুখো লোকটা বলল। সত্যি ঘরের ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন।

ওদিকে টেবিলের ধারে বসে দু বেটা ঝোলের বাটিতে চুমুক লাগিয়েছে, খানিকটা করে মদও ঢেলে নিয়েছে দুজনে, টুং টাং শব্দ হচ্ছে গেলাস ঠোকাঠুকির। এ সম্পর্কে মোটা লোকটাকে বলতেই সে বলল, 'মিথ্যে কথা-ঘোরাবার চেষ্টা করবেন না।'

চেষ্টা করলেও কথা ঘোরাতে পারতাম না। আর কথাটা যে কি তাই আমি জানি না। ওদের এই আগমনের হেতুটা মনে মনে আঁচ করতে চেষ্টা করলাম। বোধ হয় কোন বেনামী চিঠি...লোকের মনে আজকাল এত নীচতা এসেছে...কিন্তু চিঠিটায় এমন কি লেখা থাকতে পারে?

একটা আসনের ওপর পলিন বসবার চেষ্টা করতেই হাড়-জিরজিরে লোকটার

মনে সন্দেহ হল। ঠেলে সরিয়ে দিল পলিনকে এবং আসনের ঝালরটা ছিঁড়ে হাত গলিয়ে দিল ভেতরে। পলিন চেষ্টা করল একটা জানলা খুলতে, কিন্তু ঘরের ভেতর এত গরম সত্ত্বেও ওরা জানলা খুলতে দিল না। বোধ হয় ওরা ভেবেছে, পলিন চিৎকার করে পাড়াপ্রতিবেশীকে জাগিয়ে তুলবে।

আমি বললাম, 'মহাশয়গণ, দয়া করে বলবেন কি, আমাদের কি এমন সৌভাগ্য...'

'সৌভাগ্য! কি বললেন,—সৌভাগ্য? বাঁদর পেয়েছেন নাকি আমাদের?'

স্বীকার করতেই হবে যে কথাটা একটু অতি-উক্তি হয়ে গেছে। ওদের মত ভদ্রলোকদের আগমনকে ঠিক সৌভাগ্য বলা চলে না। কিন্তু...

'কিন্তু কি?' আমার প্রিয় লাল-বাদামী আরাম-কেদারাটায় গা এলিয়ে দিয়ে মোটা লোকটা জিজ্ঞেস করল। ভঙ্গীটা এমন, যেন এই সব হাঙ্গামা আর ওর সহ্য হচ্ছে না। বলল, 'দেখুন, আমার মেজাজ চড়ে যাচ্ছে কিন্তু। আপনার ওই 'যদি' আর 'কিন্তু' ছাড়ুন তো। আপনি দেখছি আমাকেই পালটা প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন! ওহে পেফের! জিনিসগুলো যে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে ফেললে দেখছি!'

হাড়গিলে লোকটা ফিরে তাকাল। ঘড়িটার কলকব্জা খুলবার কাজে ও এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল। ভারি সুন্দর আমার এই ঘড়িটা—কাঁচের পেছনে ভেতরের সমস্ত কলকব্জা পরিষ্কার দেখা যায়, তিন মাস চলে এক দমে। কিন্তু এখন ঘড়িটার যা হাল হয়েছে, একেবারে আগাগোড়া সারিয়ে না নিলে আর বোধ হয় চলবে না।

'কি বলছেন, কর্তা?' জিজ্ঞেস করল ও।

অপর জন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'পেফের, এই ভদ্রলোকটিকে আমি প্রশ্ন করছি, না ভদ্রলোকই আমাকে প্রশ্ন করছেন? তোমার কি মনে হয়, পেফের?'

'তাই তো ভাবছি..' ও বলল।

'আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে,' কথাটা বলে কর্তা আমার দিকে ফিরে তাকাল, 'আচ্ছা, এইবার বলুন তো মালটা কোথায়? শুধু জায়গাটা বলে দিন, চট্ পট্ মিটে যাবে।'

'কি মাল?' আমি বললাম।

আমি শপথ করে বলছি, সত্যিই আমার কোন ধারণা ছিল না কিসের কথা ও জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু ও মনে করল আমি কথা ঢাকছি। তখন ও অন্য একটা চাল চালল। 'লাভালের রাজনীতি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?'—হঠাৎ এই প্রশ্ন করে বসল আমাকে।

রাজনীতি সম্পর্কে আমার মতামত? টপাটপ উত্তর দেওয়াটা উচিত বুঝতে পারছি, দেরী করলেই প্রমাণ হয়ে যাবে ধারণাটা আমার তেমন সুবিধের নয়।

বললাম, 'আজ্ঞে...আপনিই তো বলেছিলেন...'

লোকটা কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল: 'এর বিশ্বাসের দৃঢ়তাটুকু পর্যন্ত নেই।'

আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম যে প্রশ্নটা আমাকে হকচকিয়ে দিয়েছে, কারণ এ ধরনের কথা এর আগে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি।

'এর থেকেই বোঝা যায় কি ধরনের লোকের সঙ্গে আপনার মেলামেশা।' মোটা লোকটার কথার টানে দারুণ একটা আত্মসন্তুষ্টির ভাব।

হাড়গিলে লোকটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জানাল যে ওরও এই মত।

এখানে আমার যুক্তিটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী লাভালের রাজনীতি নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, যেমন মাথা ঘামাইনি অন্য কোন প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি নিয়ে। কতগুলি লোক আছে যাদের রাজনীতি নিয়ে ভীষণ মাথাব্যথা। আমি সে দলে নই। সরকারী পরিচালনার ভার একজন লোকের হাতে দেওয়া হয়, এর পেছনে কারণ আছে নিশ্চয়ই। যেহেতু আমি জানি না সেই কারণগুলো কি, সুতরাং তার রাজনীতি সম্পর্কে আমার ধারণা থাকবে কি করে? অবশ্য রাজনীতিটা যাই হোক না কেন, তার কাজ সেই রাজনীতি পালন করা...সুতরাং...অবশ্য এসব কথা আমি মোটা লোকটাকে বুঝিয়ে বলতে পারিনি। কোন কথাও শুনবে না। মনে হল, ওর প্রশ্ন করার পেছনে উদ্দেশ্যটা আর কিছু নয়, শুধু নিজের গলার স্বর বারবার শুনে নিজেই আনন্দ পাওয়া।

ওদিকে আমার আর পলিনের সমস্ত জামাকাপড় মেঝের ওপর ছড়ানো। লাল গোঁফওলা বেঁটেমত লোকটা একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তাকের ওপরকার বাক্সপেঁটরাগুলো লণ্ডভণ্ড করছে। টুক্‌রোটাক্‌রা কত রকম জিনিস যে লোকটা টেনে টেনে বার করছে। এক গাদা পুরনো নকল ফুল, সেই কালো পোষাকটা যেটা পরে আলফ্রে স্কুলে যেত, এমনি আরো কত কি। ঘরের ভেতর সে এক দৃশ্য। টেবিলের ধারে যে দু'জন বসেছিল, তারা ঝোলের বাটিটা শেষ করে বলল, 'কই গো, আর কি রান্না হয়েছে?'

কথাটা শুনে কোমর চেপে ধরে সবার সে কী হাসি। অনেকক্ষণ ধরে প্রাণভরে হেসে নেবার পর মোটা লোকটা ভুরুর ওপর টুপিটা টেনে নামিয়ে বলল:

'এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে যে বিদেশী বেতারের খবর শোনেন আপনি, কি বলেন?'

এই তো, যা বলছিলাম ঠিক তাই। হ্যাঁ, বেনামী চিঠি। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

'নিজের দেশের বেতারই আমি শুনি না।' সাদাসিধে গোবেচারা মানুষ আমি, সত্যি কথাই বললাম।

'হুঁ-হুঁ! নিজের দেশের বেতার শোনেন না, কেমন? শুনলে তো পেফের? আমাদের এই বীরপুরুষ বন্ধুটি বুক ফুলিয়ে বলছেন যে আমাদের বেতার উনি শোনেনই না।'

'কিন্তু...'

'কিন্তু টিন্তু নেই। দেশী বেতার না শুনে বিদেশী বেতার শুনতে যাওয়া কেন? বিদেশী বেতারে বুঝি বেশী মধু? কত রকমের মিষ্টি মিষ্টি খবর, না? যত সব জঞ্জাল!'

'কি দিয়ে আমি বেতার শুনব বলতে পারেন?' একটু ফাঁক পেয়ে কোন রকমে বললাম।

'কি দিয়ে? ন্যাকামি করতে হবে না! আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কি দিয়ে! আমাব পশ্চাদ্দেশটি দিয়ে...হাঁদারাম, রেডিও যন্ত্রটার কথা বুঝি মনে নেই।'

'কিন্তু আমার তো পশ্চাদ্দেশ নেই।'

কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বলতে চাইছিলাম, আমার রেডিও যন্ত্র নেই। ওদের হাসিতে ঘরটা কেঁপে উঠল।

'ওহে ধাগী পাঁঠা, মতলবটা কি? মস্করা হচ্ছে বুঝি? এই কথাটা ধরে নিয়ে যদি এমন একটা ব্যবস্থা করি যাতে ওই পশ্চাদ্দেশটি আর না থাকে, তবে কেমন মজা হয়?'

আমার মুখটা বীটপালং-এর মত লাল হয়ে উঠল। যথাসাধ্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলাম। কিন্তু ওরা আমাকে এমন ঘাবড়িয়ে দিয়েছিল যে কি বলেছি তা আমি নিজেই জানি না। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমার রেডিওযন্ত্র নেই সুতবাং আমার পক্ষে দেশী বেতার শোনা সম্ভব নয়।

'বটে, রেডিওযন্ত্র নেই...আচ্ছা, আছে কি না আছে দেখতে হবে। কিন্তু যদি বেডিও না-ই থাকে তবে ওই বিদেশী বেতার শোনা হয় কি করে?'

'ঠিক এইটাই তো আমারও প্রশ্ন।'

'প্রশ্ন! দেখ পেফের, উনি আমাকে প্রশ্ন করছেন! আবার সেই ওলোটপালোট ব্যাপার। কে কাকে প্রশ্ন করে? ঠিকঠাক জবাবটি এইবার শুনি, আমার কথাটা ছিল বিদেশী বেতার শোনা হয় কি করে?'

'কিন্তু আমি তো শুনি না!'

মোটা লোকটার মুখ দিয়ে একটা লম্বা শিস বেরিয়ে এল। বলল, 'আর একটু বাড়িয়ে বললেই হয়? এটুকু বানাতেই তো যথেষ্ট সময় লেগেছে। আর একটু বাড়িযে বলবার ক্ষমতা নেই বুঝি? এই এক কথা তো সবাই বলে। আপনি আর একটু কল্পনাশক্তির পরিচয় দিলে পারতেন।'

'কিন্তু কল্পনা করবার দরকারটা কি আমার?'

'দরকার বৈকি, সব সময়েই দরকাব। আর নিজেই নিজেকে যে জাযগায় এনে ফেলেছেন, সেখান থেকে বাঁচবাব জন্যে তো আবো বেশি দরকার।'

'কোন জায়গা?'

'দেখুন, প্রশ্ন আমি করছি, আপনি নন। কথাটা ভাল করে সমঝে নিন। এইবার মাদাম, আস্থন।'

পলিনকে আমার দিকে ঠেলে দিল পেফের। ওদের মধ্যে কয়েকজন আমাদের চারদিকে খাড়া দাঁড়িয়ে, ঠিক যেন কতকগুলো মোমবাতি, মুখে কথা নেই। আমি পলিনকে অভয় দিতে চাইলাম। ইচ্ছা হল বলি যে সব ঠিক হয়ে যাবে, এসব নিশ্চয়ই কোন বেনামী চিঠির ফল। কিন্তু আমার মুখের ওপর চটাস্ করে হাতচাপা দিয়ে পেফের ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'উঁহু, কিচ্ছু বাৎলানো চলবে না!'

লালমুখো লোকটা পর্দাগুলো নিয়ে খেলা করছিল, ঠিক এই সময়ে একটা পর্দা ছিঁড়ে খুলে পড়ল। কী দুর্দশা।

মোটা লোকটা দেশী আর বিদেশী বেতার সম্পর্কে হাজার প্রশ্ন তুলে পালিনকে উদ্ব্যস্ত করে তুলল।

পলিন যখন শপথ করে বলল যে আমাদের কোন রেডিও নেই, লোকটা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'স্বামী বলেছে কিনা, তাই স্বামীর কথাতেই সায় দেওয়া হচ্ছে।'

আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম যে, তাই যদি হয় তো এই রকম ঘটনা আমাদের পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে আর কোন দিন ঘটেনি, এই প্রথম। কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দিল না।

'আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের রেডিও নেই।' পলিন বলল।

লোকটার টুপিটা হড়কে গিয়ে ঘাড়ের দিকে হেলে পড়েছিল। দেখা গেল, সামনের দিকে খানিকটা অংশে টাক। পলিনের দিকে তর্জনী শাসিয়ে ও বলল :

'দয়া করে আর একটু বুদ্ধিবিবেচনার সঙ্গে কথা বলুন, মাদাম। এখানে যে জিনিসটা নেই, তা আমি দেখতে পাব কি করে বলুন? আপনি নিতান্তই মেয়েমানুষ। জানো তো পেফের, স্ত্রীলোকের কাছে দুটি জিনিস কখনো আশা করতে নেই—বুদ্ধিবিবেচনা আর সময়ের জ্ঞান।'

'বটেই তো, বিশেষ করে ঘড়িটা যখন চুরমার করে ফেলা হল!'

কথাটা সত্যি, কিন্তু পলিনের সাহস দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। মনে মনে প্রশংসা করলাম ওকে। সব সময়েই আমি ওর অনুরাগী, কিন্তু ও-ই আমাকে গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে জ্বালিয়েছে।

'মাদাম, কি বলছেন খেয়াল থাকে যেন। ঘড়িটা চুরমার করে ফেলা হল, হুঁঃ। কথাটা বলা সহজ...'

'আর করাও সহজ।'

'...কিন্তু প্রমাণ করতে হবে তো। ঘড়িটা যে চলছিল তা আমি জানব কি করে। আব ওর ভেতর তো লুকোনো ইস্তাহার থাকতে পারত ?'

'জানি না কি করে পারে যখন কাঁচের ভেতর দিয়ে সমস্ত কলকব্জাই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।'

'আহা মাদাম, আপনি সত্যিই ভারী বুদ্ধিমতী। আপনাব কাছ থেকে এমন সঙ্গত মন্তব্য আমরা আশা করিনি।'

হাতসটা ছুঁড়ে ফেলল পলিন। কারণ ও মনে করেছিল লোকটা বলেছে 'অসঙ্গত'। আমাকেই থামাতে হল ওকে। বললাম, কাজটা ওর পক্ষে ঠিক হচ্ছে না, অবশ্য খারাপ কিছু আমরা করিনি। শুনে পলিনেব সমস্ত রাগ এসে পড়ল আমার ওপর। তাতে সুবিধা হল না কিছু।

মোটা লোকটা বলল 'আচ্ছা, এবার সেই বিদেশী বেতারের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। আপনারা দাবী করছেন যে যেহেতু আপনাদের রেডিও নেই, সুতরাং আপনারা ওসব শোনেন না।'

কথাটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার। কিন্তু ওর কাছে নয়।

'আপনি শুধু বলছেন, 'আমার রেডিও নেই'—ব্যস, যেন ওখানেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু...'

কথাটা বলে ও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল তারপর হাঁটুর ওপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে ঝুঁকে বসল সামনের দিকে। ওর বাঁ হাতের কব্জিতে একটা সোনাব বন্ধনী নজরে পড়ল আমার। ও বলল, 'কিন্তু...আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনার রেডিও নেই ?'

'আপনি নিজেই খুঁজে দেখুন আছে কিনা।'

গম্ভীর ভারিক্কী গলায় ও বলল, 'রেডিও যে নেই সেটা প্রমাণ করবার দায়িত্ব আমার নয়। সে দায়িত্ব আপনাদের।' বলে একটা আঙুল দিয়ে প্রথমে আমার দিকে তারপর পলিনের দিকে দেখাল।

'আচ্ছা ধরুন যদি আমাকে প্রমাণ করতে হত যে আপনাদের রেডিও নেই, তাহলে ব্যাপারটা চমৎকার হত কিন্তু! আমি কি করে জানব, আপনার রেডিও আছে কি নেই ? আপনি বলবেন, চোখে দেখা যাচ্ছে না। ওটা কি একটা কারণ হল ? প্রথমত দেখতে হবে, আমার দেখাটা...'

ঘরের বিশৃঙ্খল জিনিসপত্রের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ও বলল, 'আমার লোকরা শুধু ওপর ওপর তল্লাশী করেছে।' একটু হেসে যোগ করে দিলে, 'রান্নাঘরে কিছু পাওয়া গেছে, পেটিট্‌পয়েন্ট ?'

ঝোলের বাটিটা শেষ হবার পর পেটিট্‌পয়েন্ট আর তার সঙ্গীটি রান্নাঘরের

তাকগুলো হাতড়াচ্ছিল, দু' জনে একসঙ্গে উত্তর দিল, 'কিছু না, কর্তা।' কথা শুনে বোঝা গেল, দুজনেরই মুখ ভর্তি। ভাঁড়ারের অবস্থা অজানা নয়, কিন্তু মুখে পুরবার মত খাদ্যবস্তু কোথা থেকে যে ওরা খুঁজে পেল, তা আমার কল্পনাতীত। অবশ্য বরাবরই পলিনের হাতে কিছু গোপনসঞ্চয় থাকে, এখান-ওখান থেকে খুঁটে খুঁটে যেটুকু পারে সরিয়ে রাখে ও।

মোটা লোকটা বলে চলল, 'এর থেকে কি প্রমাণ হল? আপনার রেডিও হয়ত অন্য কোথাও আছে। হয়ত সারাতে দিয়েছেন, কিংবা আগে থেকেই খবর পেয়ে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেছেন। একথাও মনে রাখতে হবে, আমরা যখন এলাম আপনি খুব যে আশ্চর্য হয়েছিলেন তাও নয়। এ সমস্ত জবাব আপনার তৈরি করাই ছিল।

'আমি শপথ করে বলছি যে আমরা...'

'শপথ করবেন না। অভ্যেসটা ভাল নয়। পরে অনুতাপ করতে হয়। যাক গিয়ে ওসব কথা। এবার শুধু একবার স্বীকার করুন যে বিদেশী বেতার আপনি শোনেন। এতক্ষণ যে আমরা কথা বললাম, সেটা যে নেহাৎ বাজে সময় নষ্ট নয়, সে কথাটা আপনার মুখে শুনতে চাই।'

হঠাৎ ও ভদ্রতা আর বন্ধুত্বসূচক স্বরে কথা বলতে লাগল।

'আপনাকে বিশ্বাস করে চুপি চুপি একটা কথা বলছি শুনুন। বিদেশী বেতার শোনাটা যে খুব একটা অপরাধ তা নয়। সবাই শোনে। আমরা খুব ভাল করেই জানি। আর যারা শোনে তাদের যে খুব একটা দোষ দেওয়া চলে তাও নয়। আমাদের বেতারের তুলনায় বিদেশী বেতারে কত বেশী খবর, কেমন গানবাজনা, কেমন সব চমৎকার অনুষ্ঠান—না?'

আমি একগুঁয়ের মত বললাম, 'আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না, কারণ বেতার-অনুষ্ঠান শুনি না আমি।'

একটা কাঁধ-ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো তুলে ও বলল, 'আচ্ছা, নিজেদের মধ্যে এই সব মিথ্যে অভিনয় করে লাভ কি? এখানে তো আর বাইরের কেউ নেই। আমি কি আর বুঝতে পারি না যে এত দিন ধরে যুদ্ধ চললে কি ভীষণ বিশ্রী লাগে? আমার নিজেরই তো লাগছে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে এমনিই একদিন আপনি যখন রেডিওর পাশে বসে আছেন...

'কিন্তু রেডিও তো আমার নেই!'

'দেখুন, কথার মাঝখানে বারবার এভাবে বাধা দেবেন না। ওটা ভদ্রতার পরিচয় নয়। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, একদিন রেডিও শুনতে শুনতে আপনি এমনি হয়ত একটু ডায়ালটা ঘুরিয়েছেন। ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ হয়ত দু-একটা অস্পষ্ট কথা ভেসে আসে। আপনি ভাল করে শুনতে পান না, কিন্তু কথাগুলো যাতে আরো

স্পষ্ট হয় সে চেষ্টাটা আপনার থাকে। তার মানেই আপনি যে কিছু একটা অনিষ্ট করতে চাইছেন তা নয়। এটা একটা খেলা। বিদেশী বেতার শোনেন বলেই যে আপনি একজন ষড়যন্ত্রকারী তা তো নয়। তা যদি হয় তো দেশের সমস্ত লোককেই ষড়যন্ত্রকারী বলে ধরে নিতে হয়। অবশ্য, যদি সত্যি কথাই বলতে হয়, তবে কথাটা যে একেবারেই মিথ্যে তাও নয়। যাই হোক, এটা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। বদ মতলব না থাকলেই হল। তাহলে আপনি স্বীকার করছেন তো?'

আমি মাথা নাড়লাম। তারপর ওর গলার স্বর বদলে গিয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, 'আপনি তথ্য অস্বীকাব করতে চান? বেশ। আপনি এখনও আমাদের সবটা দেখেননি। প্রধানমন্ত্রী লাভাল সম্বন্ধে আপনি যে রকম সন্দেহজনক সব কথা বললেন, তারপরে আর...'

'দেখুন...'

'না, আমি দেখব না। বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এজন্যেই তো দেশেব এই দুর্দশা। প্রধানমন্ত্রী লাভালের বিরুদ্ধে কথা বলে এমন লোকও প্রচুব আছে। ওইখানেই আপনার একটা 'যাচাই' হয়ে গেছে। 'যাচাই' কথাটার মানে কি আপনি হয়ত জানেন না। দেখ পেক্কের, উনি জানেন না, 'যাচাই' করা কাকে বলে?''

কথাটা বলে ও ক্লান্ত আর হতাশ ভঙ্গীতে কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল। 'যাচাই' করা কাকে বলে আমি যদি জানতামও তো বলবার সুযোগ পেতাম না। এখনও পেক্কেরকে জ্ঞানদান করছে, 'দেখ পেক্কের, এই কাজে আমার মত পুরনো হবার পর একটা জিনিস তুমি বুঝতে পারবে—এমন সব লোকের সঙ্গে আমাদের কারবার করতে হয় যে মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। পণ্ডিতদের ভাষায় বলতে গেলে, এই ...ইয়ে...মানে...ওরা সবাই একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে রয়েছে। সব সময়ে চেষ্টা করতে হবে ওদের স্তরে নেমে যেতে, ওরা বুঝতে পারে এমন ভাষা ব্যবহার করতে। জান পেক্কর, ওদের ভাষাজ্ঞান অবিশ্বাস্য রকমের দুর্বল। কাজেই ওদের সঙ্গে থেকে কার্যোদ্ধার হবে, এমন আশা করবে কি করে? আর সহজবোধ্যতা ও সারল্যের দিক থেকে ফরাসী ভাষা তো আদর্শস্থানীয়। জার্মান ভাষার কথা একবার ভাবো দিকি! ফেল্ড্‌গেন্‌ডারমেরির একজন অফিসার সেদিন আমাকে বলছিলেন যে জার্মান ভাষায় সত্তরটা অক্ষরের শব্দ পর্যন্ত আছে। কল্পনা করতে পার? আর এরা সব এমন বোকা যে একটা চার অক্ষরের সোজা ফরাসী কথা নিয়েই একেবারে নাজেহাল।'

কথা বলতে বলতে এমনভাবে ও থামল যেন হঠাৎ ওর মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

'চারটি মাত্র অক্ষর, পেক্কের...তুমি একটা কিছু মন্তব্য করবে আশা করেছিলাম কিন্তু। চার অক্ষরের ছোট্ট একটা শব্দ। কি হে?'

পেক্কেরকে অত্যন্ত বিপন্ন দেখাল। কর্তা কি বলতে চাইছেন? চার-অক্ষরের

একটা শব্দ ? একথার উত্তরে হেসে ওঠা উচিত কিনা তাও ও বুঝে উঠতে পারল না। সঙ্গীদের মুখের দিকে ও তাকাল। সব তালপাতার সেপাই। কোন কিছু হদিশ পাওয়া গেল না।

'ছোট্ট একটা ফরাসী শব্দ পেক্ষের। হ্যাঁ ফরাসী শব্দ। তুমি যে এমন মূর্খ জানতাম না! শব্দটা ফরাসী নয়, ইংরেজী! অমন আঁতকে উঠলে কেন বাপু। ইংরেজভক্ত না হ'য়েও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন ধরা যাক, 'বিশ্বাস' শব্দটা...হ্যাঁ, এটা ইংরেজী শব্দ। তবুও আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শব্দটি জড়িত। ঠিকমত বুঝতে হলে ওদের খুব ভাল করে চিনতে হবে। 'যাচাই' নয়, 'বিশ্বাসের' কথা বলছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তুমি একটি গণ্ডমূর্খ পেক্ষের।'

পলিন ওর কথায় বাধা দিল—কাজটা ওর পক্ষে ভুল হল। ওর স্বভাবই এই, কতবার বলেছি, কিন্তু আমার কথায় ও কানই দেয় না।

পলিন বলল, 'বিশ্বাসের কথাই যদি ওঠে, আপনারা সেই মাত্রাও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন না কি ?'

স্বীকার করতেই হবে যে কথাটা অত্যন্ত রূঢ় হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ কোন অর্থও ছিল না কথাটার। মোটা লোকটা এবং পেক্ষের তর্জনগর্জন শুরু করে দিল। কথাটা চাপা দেবার জন্যে আমি যা হোক একটা কিছু বলতে চেষ্টা করলাম, 'ইন্‌স্‌পেক্টর মশাই, পলিনের কথায় কিছু মনে করবেন না, ওর স্বভাবই ওইরকম। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে...'

খেঁকিয়ে উঠে ও বলল, 'পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আপনি হয়ত এসব সহ্য করেছেন কিন্তু আমি পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ডের জন্যেও সহ্য করতে প্রস্তুত নই !'

ঠিক এই সময়ে রান্নাঘরের ভেতর থেকে সেই লোক ছুটো তেলের বোতলটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। পেটিটপয়েন্টকে দেখে মনে হল যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

'দেখুন কর্তা, চোরা বাজার। প্রায় তিন পোয়া তেল আছে এখানে।'

পলিন বলল, 'বোতলটা নেহাৎ ছোট। এই তেলটুকু আমার জুলাই মাসের রেশন।'

পলিনের কথায় কান না দিয়ে মোটা লোকটা বলল, 'চোরা বাজার। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চোরা বাজার। ওদিকে বিদেশী বেতার শোনা হয়, এদিকে চোরা বাজারে তেল কেনা !'

কথাটা শুনে আমি তর্ক করতে প্রবৃত্ত হলাম। অবশ্য, তর্ক করাটা নেহাৎই বোকামি। তবে, এবার আমি অন্য ভাবে কথা বললাম, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম এভাবে কোন কাজ হবে না। হাত-পা ছুঁড়ে মোটা লোকটা সমানে চিৎকার করতে লাগল, 'এ সমস্ত আমি বাজেয়াপ্ত করব। হ্যাঁ, না কবি তো কি বলেছি! দেশে

তেলের এত অভাব...আব এখানে তো দেখছি ছড়াছড়ি, সপ্ত ব্যঞ্জন রান্না হয় বুঝি ?'

পলিন একেবারে মুষড়ে পড়ল। ওর এত সাধের তেল...

মোটা লোকটা চিৎকার করে উঠল, 'ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে ! যত খুশি দল পাকান, ষড়যন্ত্র করুন, কিন্তু গরীবদের খাদ্যে হাত দেবেন না। আপনাদের মত লোক যত দিন আছে, ফ্রান্সেব উন্নতি নেই।'

আবার ওর গলার স্বরে সেই আগেকার মতই অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এল।

'আচ্ছা, এবার বলুন তো, কে আপনার কাছে এই তেল বিক্রী করেছে ?'

পলিন বলল, 'কে আবার, মাদাম দেলাভিঞেৎ।'

'শুনলে তো পেক্ষের ? দেলাভিঞেৎ। দেলা...'

'হাঁ। মাদাম দেলাভিঞেৎ, আমাদের মুদী।' পলিন বলল।

'এই রাস্তাব ওপরেই যার দোকান ?'

'এই তো, এই পাশের বাড়ীতেই। এক পা বাড়ালেই যখন মুদীর দোকান, তখন অন্য কোথাও আর যাবাব দবকার কি ?'

'আচ্ছা, এই তেলের দাম কত দিতে হয়েছে ?'

'ঠিক মনে নেই। আচ্ছা দাঁড়ান, ভেবে দেখি...'

'আটশো ফ্রাঁ পোয়া, না কি ?'

'পাগল ন্যাকি ? আরে !...কিছু মনে করবেন না ইন্‌স্‌পেক্‌টর-মশাই।'

কথাটা শুনে ওরা আবাব তৎপর হয়ে উঠল। এক গাদা জিনিষ জড়ো করা হল টেবিলের ওপর : আমার পুবনো নোটবইটা, গ্যাসেব বিলগুলো, তেলের বোতলটা, একটা গোয়েন্দা-গল্পের বই—বইটার নাম 'ভিশির হত্যাকাণ্ড' দেখেই ওদের সন্দেহ হয়েছিল, এবং আবও নানা রকম জিনিস। যাবা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন প্রাণপণে চেষ্টা করছিল একটা বিবৃতি তৈরি করতে। ওতে আমাকে সই করতে হবে। সই করবার আগে বিবৃতিটা আমি পড়ে দেখতে চাইলাম। কিন্তু দেখলাম, ও-সব বালাইতো আজকাল নেই। শেষ কালে ওদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দিলাম একটা সই করে। কাগজটা হাতে নিয়ে মোটা লোকটা সই-এর ওপর ফুঁ দিতে লাগল, তারপর লেখাটা পড়বার জন্যে চোখ থেকে একটু দূরে ধরল কাগজটা। একবার পড়ে ভুরু কুঁচকে আবার ভাল করে পড়ল লেখাটা, তারপর একেবারে ফেটে পড়ল, 'এসব ধাপ্পাবাজীর মানে কি ? কি সই করা হয়েছে এখানে ?'

সামনের দিকে ঝুঁকে আমি বললাম, 'আমার নাম। দুর্ভাগ্যক্রমে ওটাই আমার নাম।'

'দুর্ভাগ্যক্রমে ! তার মানে ? আপনি কি বলতে চান যে আপনার নাম...'

'পেতাঁ। রবের পেতাঁ। এই নামটার জন্যে পাড়ার লোকজনের উৎপাতও

সহ্য করতে হয় বৈকি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কিছু করবার নেই। ওটাই আমার নাম। না, না, মার্শাল পের্ত্যার সঙ্গে আমার কোন আত্মীয়তা নেই।'

ইন্‌স্পেক্টর-মশাই তো চটে আগুন। সেটা কি আমার ভেতরেও সঞ্চারিত হয়েছিল! শেষ কালে আমি আমার পরিচয়পত্র বার করে ওকে দেখিয়ে দিলাম যে আমি ধাপ্পাবাজ নই, ওটাই আমার আসল নাম, আমার বাবারও ওই নামই ছিল। বেচারা, যদি তিনি একবারও জানতেন তো নিশ্চয়ই বদলে ফেলতেন নিজের নাম। কিন্তু আমার বাবার সময়ে এই নামের অন্য কোন তাৎপর্য ছিল না, অন্য যে কোন নামের মত এটাও একটা।

টুপিটা চোখের ওপর টেনে নামিয়ে ও বলল, 'থাক, হয়েছে। ঠাট্টাতামাসার সময় নয় এটা। আপনার কথামত ওটাই যদি আপনার নাম হয়, তবে সেলিয়াব কে? সির্মঁ সেলিয়াব? আপনি বলছেন যে আপনি নন। কী দুর্ভোগ! নিঃসন্দেহেই বলছেন তো? সির্মঁ সেলিয়াব নামে একজন লোকের ঘর তল্লাশী করবার পরোয়ানা নিয়ে আমরা এসেছি। আচ্ছা, এটার নম্বর কত?'

'নম্বর?'

'মানে এই বাড়ীর নম্বর।'

'আঠারো।'

'দুর ছাই! সেলিয়ার থাকে ষোল নম্বরে।'

স্বভাবসিদ্ধ তৎপরতার সঙ্গে পলিন ভাবল যে এবার ও একচোট নিতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে শুরু করল, 'কি কাণ্ড! আঠারো পর্যন্ত গুণবার ক্ষমতাটুকুও নেই, কিন্তু লোকের ঘরদোর ভাঙবার বেলায় তো ওস্তাদ দেখছি...'

এবারেও কথাটার বিশেষ কোন অর্থ হল না, কারণ বাড়ীর নম্বরগুলো এক থেকে আঠারো পর্যন্ত পর পর নেই। একদিকে সমস্ত জোড় সংখ্যা, অপরদিকে বিজোড়। আর যদি ধরে নেওয়াও যায় যে আঠারো পর্যন্ত ওরা ঠিকমত গুণতে পারে, তাহলেই যে লোকের ঘরদোর ভাঙবার অধিকার থাকে তা তো নয়। কিন্তু মোটা লোকটা এক কথায় পলিনকে উড়িয়ে দিলে।

বলল, 'তাছাড়া, বিবৃতিতে সই করেছেন, এখন আর কোন কথা নেই। এ বিষয়ে তদন্ত চলবে।'

জানলে আমি কিছুতেই সই করতাম না—প্রতিবাদে একথা বলে কোন লাভ হল না। আমি একবার সই করেছি এবং সেটাই চূড়ান্ত কথা।

পলিন বলল, 'এবার ঠেলা সামলাও। যেমন তোমার স্বভাব।'

চকিতে টুপিওলা মোটা লোকটা আর সেই নয়জন তালপাতার সেপাই উঠে দাঁড়াল। যেমন ঠেলাঠেলি করে ওরা ঢুকেছিল, তেমনি ভাবেই গেল বেরিয়ে। সঙ্গে নিয়ে গেল তেলের বোতল, গ্যাসের বিল আর শেষ মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া কিছু খাবার।

হাড়-জিরজিরে লোকটা গেল সবার শেষে। যাবার আগে দরজার হাতলটা মুঠো করে ধরে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'হুর্-রে!' এটাই ওদের শেষ কথা।

আর এদিকে ঘরদোরের যা অবস্থা। নরকের জঞ্জাল যেন ছড়িয়ে আছে! ছেঁড়া পর্দা আর ছড়ানো পালকগুলোর জন্যেই এত ভয়ংকর দেখাচ্ছে দৃশ্যটা। শূন্য থালা বাটি আর বোতলের দিকে আমি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম (আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত আর মদ পাওয়া যাবে না)।

পলিন তো রেগে আগুন। সবই তো আমার দোষ! আমাকে কী গালাগালটাই না দিলে! মাদাম জানোর ছোকরা-বন্ধুর ব্যাপারটাই ওর সব চেয়ে বেশি লেগেছে। বারবার ও বলছে, আমি কি জানি না যে ও পিশেরেলের বন্ধু? কিন্তু পিশেরেলকে এ ব্যাপারে তুমি জড়ালে কেন? পুলিশের সামনে ওদের নাম কেন তুমি উল্লেখ করলে?'

কেন উল্লেখ করব না তার কারণটা কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না।

ও বলল, 'না বুঝবার কি আছে, তুমি খুব ভাল করেই জান। নিজের বোকামির পরিচয় আর দিও না। জান না যে ওদের ছেলে স্তু গলের দলে যোগ দিয়েছে?'

'জানি, কিন্তু পুরনো একটা ফটো দেখেই একথাটা ওরা জেনে ফেলত না নিশ্চয়ই। তাছাড়া, ছবিতে যে লোকটি আছে, সে পিশেরেলের বন্ধু মাত্র। এখন আর কে তার খোঁজ রাখে? হয়ত গাড়ীচাপা পড়েছে বা নিউমোনিয়ায় মারা গেছে, কত কি হতে পারে।'

হঠাৎ পিশেরেলের সম্পর্কে পলিনের সমস্ত কৌতূহল একেবারে উবে গেল। বাইরের বাতাস ঘরের ভেতর ঢুকতে দেবার জন্যে আমি একটা জানলা খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ও বাধা দিল।

'জানলা থাক এখন,' বলে ও রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে পেছনের দেওয়ালের দিকে ছুটে গেল। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আরে, তাই তো! তারপর দেওয়ালে কান লাগিয়ে গ্যাস-উনুনটার পাশে আমরা বসলাম। পাশের বাড়ী থেকে একটা উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে:

'আজ, ফরাসী জনসাধারণের মুক্তি-সংগ্রামের ৭৫৩-তম দিনে...'

মুষ্টিবদ্ধ হাতটা আন্দোলিত করে ক্রুদ্ধস্বরে পলিন বলল, 'ওই হারামজাদা-গুলোর জন্যে আর একটু হলেই আমরা রেডিওটা শুনতে পেতাম না!'

লুই আরাগঁ

[অনুবাদ: অমল দাশগুপ্ত]

'প্রতিবেশী' প্রতিরোধ-আন্দোলনের সময় লেখা আরাগঁর একটি অত্যন্ত জীবন্ত ও জনপ্রিয় গল্প। বালি কাগজের ওপর পুস্তিকাকারে গল্পটিকে গোপনে ছাপিয়ে হাজারে হাজারে বিলি করা হয়েছিল। আরনো স্তু স্যাঁ রম্যাঁ—এই ছদ্মনামে গল্পটি লেখা।

ফিল্মে বাস্তববাদ ঃ মঁসিয়ে ভের্দু

ভের্দুর কাহিনী বর্ণনের প্রয়োজন নেই। সমালোচনার বন্যায় সে কাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। 'প্রগতিশীল', 'ধনতন্ত্র-বিরোধী' বলে চ্যাপলিন নিন্দিত ও অভিনন্দিত হয়েছেন। বর্তমান সমাজের ভয়াবহতাকে রূপায়িত করার জন্য চ্যাপলিনকে প্রগতিশীল শিল্পী, ভের্দুকে প্রগতিশীল, বাস্তববাদী ফিল্ম হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে।

অথচ এমন নয় যে ভের্দুর প্রগতিশীলতা, বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা অন্যান্য ফিল্ম-এ প্রকাশ পায়নি। 'উয়ারেজ', 'গ্রেপ্‌স অফ্‌ রথ', 'মিষ্টর ডীড গোস টু টাউন,' 'সিটিজেন কেইন' ইত্যাদি বহু ফিল্ম-এ ধনতন্ত্রী সমাজের কঠোর সমালোচনা আছে, বিপ্লবী বিরোধিতাও নেই এমন নয়। চ্যাপলিনের 'গ্রেট ডিক্টেটর' ফ্যাসিবিরোধী ফিল্ম হিসাবে জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। যুদ্ধকালে 'নর্থস্টার,' 'দিস্ ল্যাণ্ড ইজ মাইন,' 'ওয়াচ্‌ অন দি রাইন,' 'কাউণ্টার অ্যাটাক্' ইত্যাদি অসংখ্য ফিল্ম-এ ফ্যাসিবিরোধিতার উৎকৃষ্ট শিল্পরূপ দেখা গিয়েছিল। বহু সোভিয়েট ফিল্ম-এর বিপ্লব-রূপায়ণ শিল্প হিসাবে ক্লাসিকের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছে।

কিন্তু এই সমস্ত ফিল্ম-এর সঙ্গে মঁসিয়ে ভের্দুর মৌলিক পার্থক্য আছে। এর ভাবভঙ্গী ভিন্ন, আবেদনের পরিধি ভিন্ন, এর প্রগতিশীলতার প্রকৃতিতে, বক্তব্যের পরিসরে সর্বত্রই একটা অনন্যতার ছাপ সুস্পষ্ট।

এই পার্থক্য কি ?

সচরাচর প্রগতিশীল ফিল্ম-এ বাস্তবকে যেভাবে রূপায়িত করা হয়, চ্যাপলিন তার বিপরীত পথ নিয়েছেন। যেমন অন্যান্য শিল্পে তেমনি ফিল্ম-এও বাস্তবের প্রকৃতিভেদ আছে। এক প্রত্যক্ষ বাস্তব, আরেক অন্তর্নিহিত গভীরতর বাস্তব। ভের্দুর, অর্থাৎ আজকের সাধারণ বুর্জোয়ার জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকতে গিয়ে চ্যাপলিন অন্তর্নিহিত বাস্তবকেই ফোটাবার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রগতিশীল বক্তব্যকে এই মাধ্যমে পেশ করার চেষ্টা ফিল্মে প্রায় বিরল। 'গ্রেপ্‌স অফ রথ'-এর স্টাইনবেক-লিখিত কাহিনীতে এক ধরনের কাব্যিক, রূপক বাস্তব ছিল, কিন্তু সেটাও চ্যাপলিনের অর্থে অন্তর্নিহিত বাস্তব নয়। মঁসিয়ে ভের্দুতে বাস্তবের চূড়ান্ত প্রকাশ হয়েছে অবাস্তবের মধ্য দিয়ে। ব্লুবেয়ার্ড কাহিনীর উপর অবস্থিত এই স্ত্রীহত্যার লীলা উক্ত কাহিনীর মতোই অবাস্তব, অবিশ্বাস্য। কল্পনার চেয়ে অদ্ভুত যে বাস্তব ফিল্মে তার স্থান নেই। সাধারণ ঘটনাপ্রবাহ থেকে

সরে আসার ফলে দর্শকের মনে সেটা কল্পনা হিসাবেই প্রভাব বিস্তার করে, বাস্তব হিসাবে নয়। চ্যাপলিনের ফিল্মে Realityর প্রকাশ হয়েছে Illusion-এর মধ্য দিয়ে। এটি ফিল্ম-এর মত প্রত্যক্ষ বাস্তব-ঘেঁষা মাধ্যমে প্রায় অভূতপূর্ব। সম্ভবত কেবল 'আইডিয়া' নামধারী ফরাসী ফিল্ম-এর সঙ্গে এর সামান্য তুলনা চলতে পারে। উক্ত ফিল্ম-এ 'সত্য'কে কুমারী মূর্তি দিয়ে সংসারে তার নানা-বিধ লাঞ্ছনাকে প্রকাশ করা হয়েছিল। আজকের সংকটকে সাধারণ ব্যক্তির দিক থেকে একান্ত নিবিড়ভাবে, মূর্তভাবে প্রকাশ করার জন্যই চ্যাপলিন এমন এক অদ্ভুত কাহিনীকে আশ্রয় করেছেন বলে মনে হয়। অধিকংশ প্রগতিশীল ফিল্ম-এর মত তাঁর সৃষ্টিতে একটি বিমূর্ত আইডিয়া বহুমানবের জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়নি। একটি চরিত্রের জীবনে সংঘার্তের চেহারার মধ্য দিয়ে সমগ্র সংকট ভয়াবহভাবে রূপায়িত হয়েছে। শিল্পের মধ্যে মানুষের মন প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে সরে যেতে চায়। সেটাকে পলায়নী মনোবৃত্তি মনে করা ভুল, কারণ কল্পনা যদি সত্যধর্মী হয় তবে সেই সরে যাওয়ার সর্বশেষ ফল হয় কাছে আসাই। চ্যাপলিনের রূপকথার জাহাজে চড়ে দর্শক যে ডাঙায় নামে সেখানে তারই জাগতিক পরিস্থিতির বাহুল্যবর্জিত, মূল চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যের সংকেতের মতো। এইখানে চ্যাপলিনের শিল্পদৃষ্টির স্বচ্ছতা, এর জন্যই তিনি স্ট্রাইক-মিটিং গরম বক্তৃতা, ঠোকাঠুকি বাদ দিয়ে বিশ্বব্যাপী সার্ব-জনীন সমস্যাকে মানবিক রূপ দিয়ে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি হিসাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন। মৃত্যু সেখানে স্ট্যাটিস্টিক্স্ নয়, পরম ক্ষতি।

চ্যাপলিনের প্রগতিশীলতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর বক্তব্যের 'অসম্পূর্ণতায়'। বর্তমান ব্যবস্থার বীভৎসতা আছে, কিন্তু সংগ্রামের আহ্বান নেই। সহজেই সে বক্তব্যকে এখানে প্রবিষ্ট করা যেতো, কিন্তু চ্যাপলিন তা করেননি। কারণ তিনি হিউম্যানিস্ট। তাঁর আর্টের আবেদন প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়, পৃথিবীব্যাপী জনসাধারণের দিকে প্রসারিত। 'প্রগতিশীল' বলতে আমরা সাধারণত যে সাহিত্য ও শিল্প বুঝি তার আবেদন অনেক সময়ে স্বপক্ষীয়ের পরিধি পেরোয় না। এটা সোভিয়েট শিল্পের দেখাদেখি বহু ধনতন্ত্রী দেশের প্রগতিশীল মহলে সঞ্চারিত হয়েছে। সোভিয়েটে শিল্পের প্রচার যাদের জন্য তারা ধনতন্ত্রী সমাজের আবহাওয়া থেকে বহুদূরে; তাদের সমাজ-ব্যবস্থা, তাদের সমস্যা, দৃষ্টিভঙ্গী সমস্তই ভিন্ন জাতের। তাই আজ সোভিয়েট ফিল্মে ক্রমশই সাধারণ অর্থে 'বিপ্লবী' ফিল্ম-এর পরিবর্তে দেশীয় ঐতিহ্যগত ভিন্ন অর্থযুক্ত বিপ্লবী ফিল্ম সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন 'আইভান দি টেরিব্‌ল' 'অ্যাডমিরাল পাখিমভ্' ইত্যাদি। চ্যাপলিনের প্রতি সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসযুক্ত মানুষের প্রাণে বলসঞ্চার করার উদ্দেশ্যে রচিত নয়, ধনতন্ত্রীসমাজের প্রতি মানুষের কাছে সেই সমাজের মূল

চেহারা উন্মোচন করেই তাঁর কর্তব্যের শেষ। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর যুগে সাধারণকে যুদ্ধে আহ্বান করার একটা আবেদনভূমি ছিল, যুদ্ধোত্তর বিভ্রান্তির মধ্যে সেটা অচল হয়ে উঠেছে। চ্যাপলিনের ছবি শুধু স্বপক্ষীয়ের জন্য নয়, সেই অগণিত জনসাধারণের জন্য, যারা প্রতিপক্ষের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বিমূঢ় হয়ে অথবা আত্মবিস্মৃত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুগের সীমানায়, ভবিষ্যতের পথ যাদের কাছে অন্ধকার, বর্তমানের চেহারা যাদের মনে ভবিষ্যতের নির্দেশ দেয় না। ফ্যাসিবাদকে তারা শত্রু বলে চিনেছিল, বর্তমানের সম্বন্ধে আশংকা তাদের মনে স্পন্দন তোলে তবু স্থির আলোক চোখে পড়ে না কোনোদিকে। আজকের অতি জটিল রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী বিপজ্জনক ভূমিতে অপেক্ষারত এই জনসাধারণকে চ্যাপলিনের ফিল্ম দেবে ভয়াবহ পরিণতির সংকেত। এই সংকেতে সন্তুষ্ট থেকেই চ্যাপলিন প্রগতিশিল্পের পক্ষে অতি দুর্লভ শ্রেষ্ঠ আর্টের সার্বজনীনতা অর্জন করতে পেরেছেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের দেশে যখনই প্রগতিশীল বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা দেখা দিয়েছে তখনই তার অবশ্যম্ভাবী বাহন হয়েছে বাহ্য, প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। 'অভিযাত্রী' ফিল্ম প্রগতিশীল হয়েও সাধারণের সমাদর কেন লাভ করেনি সেটা এই প্রসঙ্গে বিচার্য (যদিও সেখানে আঙ্গিকের অনুত্তীর্ণতা রসকে ক্ষুণ্ণ করেছে)। সংগ্রামের আহ্বান জানাবার অতিরিক্ত ব্যগ্রতা এদেশের প্রগতিশীল কাহিনীমাত্রেই প্রকট। সরাসরি লড়াই-এর ডাক না দিয়েও দর্শকের মনে এমন আবেগভূমি সৃষ্টি করা সম্ভব যাতে আবেগের কর্মরূপ দেবার তাগিদ দর্শকের চিত্তে স্বতই জাগ্রত হয়। "বিশুদ্ধ" আর্ট ও প্রচার সহজেই মিলতে পেরেছে ভের্দুতে।

মূল প্রশ্নে ফেরা যাক। Illusion ও Reality সম্পর্কে পূর্বে যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছি সেটা মূলত সত্য হলেও শেষ কথা নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে Illusion থেকে ফিল্ম ক্রমশই Realityর দিকে অগ্রসর হয়েছে। কাফে রয়ালে বসে ভের্দু যখন আত্মকাহিনী বর্ণনা করে তখন সে একথা স্পষ্টই বলেছে যে দীর্ঘ তিন বৎসর সে একটা ঘোরের মধ্যে ছিল, সেই ঘোর তার কেটেছে সবেমাত্র। শেষ দৃশ্যে ভের্দুর চেতনা স্পষ্ট উজ্জ্বল ; আঘাতে আঘাতে সে চেতনা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছে। ত্রিশ বৎসর ছিল ব্যাঙ্কের অনুগত, বিশ্বস্ত কেরাণী। তার বিশ্বাস ছিল যে সমাজে ন্যায় আছে, বিশ্বস্ততার মূল্য আছে, বাঁচবার দাবী আছে প্রত্যেকের। অন্যতম সমালোচকের মতে সে ছিল perfectly intigrated bourgeois। যেদিন সংকটের ফলে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো তার জীবিকার অবলম্বন গেল, সেদিন সে সোজাসুজি ট্রেড ইউনিয়নের আপিসের দিকে হাঁটা দেয়নি। জীবনে সমস্যার সমাধান এত সহজে মেলেনা, যদি মিলতো তা হ'লে সমাজতন্ত্রের লড়াই ফতে হয়ে যেতো কোন কালে। তার ভুল ভাঙ্‌লো ; সে দেখলো জীবনের নীতি সেবা করা

নয়, শোষণ করা; বিশ্বাস রাখা নয়, বিশ্বাস ভাঙা। দুর্বলনিধনের মধ্য দিয়েই সংসারের ভারসাম্য। স্ত্রী পুত্রের মুখ চেয়ে তাই সে এই নীতি অনুসারে প্রবৃত্ত হল ব্যবসায়। এই single fight তার রুচিকর নয় কিন্তু "Business is business"। বুর্জোয়ার দুর্বলতা তার নখদর্পণে। তাই যৌন কামনাগ্রস্ত প্রৌঢ়াদের অসুস্থ বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে তাদের সম্পদ আয়ত্ত করা তার পক্ষে কঠিন হল না। বুর্জোয়া রোমান্টিসিজমের বুলি তার ঠোঁটের গোড়ায়, সেগুলি অর্থহীন তা সে জানে, কিন্তু এও জানে যে তার আবরণের তলায় আছে কেবল কামনার লোলতা যা কোন বীভৎসতাতেই অপারগ নয়। এই কামনাতুর চরিত্রদের সে চেনে বলেই মাদাম ভানির নিকট বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও তার অধ্যাবসায়ে ভাঁটা পড়েনা, বারবার আঘাতে ফল ফলবেই। এ বিষয়ে সে নিশ্চিত—ব্যবসায়ে অধ্যবসায়ের মূল্য অসীম। বাইরে তাতে নানা বর্ণের প্রলেপ কিন্তু ভিতরে ছুরি। সে চলে বাঁধা সড়কের বাঁধা ঢঙে, কিন্তু আন্তরিকতার অঙ্গভঙ্গী ফোটায় অবিরাম। বাইরে তার জাঁকজমক, ভেতরে সে ফাঁপা। আসলে সে তুচ্ছ, তাই তার পোষাকআশাকের চালচলনের এত গাম্ভীর্য। আসলে সে হীনরুচি, অধম, তাই গোলাপ ফুলের প্রশংসা তার মুখে ধরে না। সব মিলিয়ে সে হীন, জঘন্য, তুচ্ছ, অথচ জগতের সিংহাসনে সে সমাসীন হয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে। সত্যের ও বাহ্যদৃশ্যের মধ্যে এই যে অসংগতি একে চ্যাপলিন রূপ দিয়েছেন হাস্যরসের মধ্য দিয়ে। ভের্দু যখন মাদাম ভানি-কে প্রণয় নিবেদন করতে করতে বুক চাপড়িয়ে ব্যথা জ্ঞাপন করে তখন আমাদের হাসি পায়। প্রেমের ঠিক শিখরে যখন এসে সে পৌঁছেছে তখন জানালা দিয়ে তার পতন। কিন্তু এতই লজ্জাহীন সে, ব্যবসা তার কাছে এমনই, আত্মজ্ঞানের বদলে আত্মাভিমানই বুর্জোয়া ব্যবসায়ীকে এমনভাবে আশ্রয় করেছে যে পরমুহূর্তে টুপিটা তুলে নিয়ে সে আবার গম্ভীর মুখে প্রণয়ের অভিনয় করতে প্রবৃত্ত হয়। প্রথম দিকে তার যেটুকু গাম্ভীর্য থাকে, শেষে সেটুকুও লোপ পায়, মাদাম ভানি-কে করতলগত করবার জন্য সে ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে এক উদ্ভট পাগল নৃত্য শুরু করে। কার্যোদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হলে সবই করা দরকার। আমরা ভাবি সে পরাজিত হল, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখা যায় যে হিসেব কষে দু'সপ্তাহ ফুল পাঠিয়ে সে মাদাম ভানি-কে করতলগত করেছে শেষ পর্যন্ত। যে সোফায় বসে সেটায় তার কনুই পৌঁছয় না, অতএব, প্যারীসীয় সৌখিন পুরুষের গাম্ভীর্যচ্যুতি হয় ক্রমাগত। চায়ের কাপ হাতে সে উল্টে পড়ে যায়, কিন্তু হিসেবী বুদ্ধি এমন সজাগ যে কাপটা উল্টায় না। প্রণয়লীলার আঙ্গিক এমন রপ্ত যে সময় নষ্ট না করে দরজা খুলে যাকে পায় তাকেই মাদাম ভানি মনে করে আলিঙ্গন করতে যায়। প্রৌঢ়ার কামনার লোলতাও এমনই যে এত হাস্যকর বিপত্তি-সত্ত্বেও বিবাহের তারিখ ঠিক হতে দেরি হয় না মোটেই। কেবল একটি প্রণয় নিয়েই আলোচনা করা গেল, কিন্তু প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই বুর্জোয়ার বাহ্য সৌখিনতা পদে পদে

হাস্যকরভাবে হীন প্রমাণিত হয়েছে, তার কদর্যতা প্রকট হয়ে উঠেছে বীভৎসভাবে। জরাকুঞ্চিত মুখে কামনার মূর্তি, তার বুদ্ধিভ্রংশের চূড়ান্ত রূপ শরীর মনকে কণ্টকিত করে তোলে।

অথচ এই বীভৎসতাকে চ্যাপলিন ফুটিয়েছেন হাসির মধ্য দিয়ে, তীর্যক ভাবে প্রত্যক্ষ বক্তব্য দিয়ে নয়। এই হাসিই হচ্ছে এখানে আর্টের illusion।

এই দৃষ্টিতে দেখা যায় যে চ্যাপলিনের সত্তা এই ছবিতে হাসি ও গাম্ভীর্যের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত নয়, মূলত এক। বস্তুত হাস্যরস ও গুরুতর বক্তব্য কি আশ্চর্যভাবে একে অপরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে গেছে সেটাই আশ্চর্য। এখানে মনে রাখতে হবে যে ভের্দু মুহূর্তের জন্যেও পরিহাসের মেজাজে নেই, সে সর্বদাই অত্যন্ত সীরিয়াস। আনাবেলাকে দেখে সে যখন নীচু হয়ে পেটের ব্যথার ভাণ করে তখন সেটা আমাদের হাসাবার জন্য নয়, একান্ত প্রাণের দায়ে। সে হাস্যকর হয়ে উঠছে ঘটনাচক্রে, তার প্রাণের দায়টাই হাস্যকর হয়ে উঠেছে। সুতরাং হাসির কারণটা জোগাচ্ছে সমাজ, ভের্দু না। সে গোড়াতে যেমন সীরিয়স শেষেও তাই। শেষে কিন্তু বেশি, কারণ সংকটে দেউলিয়া হয়ে তখন তার দ্বিতীয় স্বপ্নও ভেঙেছে, সে জেনেছে পুরো সত্যকে। সে দেখেছে যে সবল দুর্বলকে নিধন করছে, এখানেই শেষ নয়, এর পর আরো আছে।

ব্যক্তির ক্ষমতার অতীতে সমাজের সম্মিলিত নিধনশক্তি কার্যরত, তাই যাকে বুর্জোয়া সমাজের নীতি ভেবেছিল তাকে আশ্রয় করেও সে টিকে থাকতে পারল না। বিশ্বাস রেখে সে বাঁচেনি, বিশ্বাস ভেঙেও সে বাঁচল না। বুঝল এ সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। তাই সে কেবল বলেনি "numbers sanctify", এও বলেছে "As for leaving this streak of human existence, I have only this to say, that I shall see all of you, very soon."—এখানে তার ব্যক্তিগত মৃত্যুর করাল ছায়া দিয়েছে সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের আশু মৃত্যুর সংকেত। সে হঠাৎ দার্শনিক হয়ে বসেনি। সে বিশ্বাসপ্রবণ সাধারণ মানুষ ছিল বলেই যখন বিশ্বাস ভাঙে তখন সে জীবনের সম্বন্ধে সত্য কথাটা সহজে বুঝে ফেলতে পারে। সে দার্শনিক এতটুকুই যতটুকু প্রতি মানুষ। বিরাট অভিজ্ঞতায় সাধারণ মানুষের মনও জীবনের অসংগতির কারণ খোঁজে, মোটা মোটা কথায় তার উত্তর দেয়। দুঃখ মানুষকে স্বভাবতই সাধারণ (General) বক্তব্যের দিকে নিয়ে যায়। ভের্দু সমাজের প্রকৃতি বই পড়ে জানেনি, নিজের জীবন দিয়ে দেখেছে। তাই তার কথা এত অন্তর্ভেদী, এত সত্য, মিথ্যার কুয়াশাকে তা বই-পড়া মনের চেয়ে সহজে ভেদ করতে পারে। অথচ সে নিরক্ষর চাষী নয়, সে বুদ্ধিমান শিক্ষিত কেরাণী। তাই শেষ কয়েক মুহূর্তে তার দুঃখের মধ্যেও একটা ব্যঙ্গের রেশ আছে : "I am at peace with god, conflict is with men."

ভের্দুর এই ভুল-ভাঙার দর্শনকে তীব্রতা দেবার জন্যই ফিল্মে কেবল তাকে ও জগৎকে মুখোমুখি করে ধরা হয়েছে। তার সমপন্থীদের অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন স্বীকার করা

হয়নি। এটা ইচ্ছাকৃত। যেখানে অর্থনৈতিক সংকট ও ফাসিবাদের দামামাকে ভের্দুর জীবনে আনা হয়েছে সেখানে সেগুলিকেও ব্যক্ত করা হয়েছে বিরাট পৃথিবী-ব্যাপী ঘটনা বা শক্তি হিসাবে। সংকটে কি ফ্যাসিবাদে বিশেষ বিশেষ মানুষের দুর্দশার কোনো মূর্তি দেখানো হয়নি। ফলে গোটা ভারটাই এসে পড়েছে ভের্দুর ওপর, তার পরিণতিটাই বিরাট মূর্তি নিয়েছে। গোড়ায় যে ছিল একটি ব্যক্তি সে অস্তে হয়ে উঠল মানুষের প্রতিভূ। তার বেদনা হঠাৎ হয়ে গেল আমাদের বেদনা। দূর থেকে তার বিপত্তি দেখে হাসবার জো রইল না। বাহ্য ঘটনাকে এভাবে বাহুল্যমুক্ত, আস্তব-রূপ দিয়ে চ্যাপ্‌লিন ফিল্মের প্রথমার্ধ থেকে দ্বিতীয়ার্ধে হাসির মঞ্চ থেকে ট্র্যাজেডির মঞ্চে একটি বিশেষ মানুষ ও পরিস্থিতি থেকে সমগ্র জগৎ ও মানবসমাজে চক্ষের নিমেষে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। এখানে তাঁর শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পনৈপুণ্য তাঁর পূর্বতন ফিল্মের অশ্রুসজল হাসির প্রতিভাকেও পার হয়ে এসেছে। স্ল্যাপস্টিক থেকে চ্যাপলিন উত্তীর্ণ হয়েছেন ড্রামাতে।

দৃষ্টিভঙ্গীর ও রূপায়ণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বৃহৎ আবেগের মিলনে মঁসিয়ে ভের্দুকে শ্রেষ্ঠ আর্টের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, নাটক ইত্যাদিকে নানা স্তরে উপভোগ করা যায়। হ্যামলেটের মধ্যে কেউ দেখে গভীর আত্মিক সংকটের রূপ, কেউ তার দৃশ্যসম্ভার দেখে অভিভূত হয়, তার কাব্যের শক্তি স্পর্শ করে কারুকে, আবার কেউ বা তার ভূতের দৃশ্য ও অসিনৈপুণ্য দেখেই বাহবা দেয়। মোটের ওপর একটা ছাপ পড়ে সবারই মনে, বিশ্লেষণ করা সম্ভব হোক বা না হোক। বিশেষত নাটকের ক্ষেত্রে বহু দৃশ্য মনের মধ্যে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে যায়। ভের্দুর ক্ষেত্রেও তাই। হাসির খোরাক প্রচুর, তাই একান্ত বাহ্যবস্তুর বেশি যে দেখে না তারও পরিতৃপ্তি ঘটে। যার যত দেখার ক্ষমতা দেখে তত বেশি। বারবার দেখে নতুন নতুন অর্থ ক্রমশ ধরা পড়তে থাকে। বক্তব্যের বিরাটত্ব আছে বলে স্টাইল হয়েছে সহজ, ঋজু, ক্যামেরার ও আলোকশিল্পের কায়দার লড়াই অনুপস্থিত। অর্থপূর্ণতায় ভের্দুর প্রতি মুহূর্ত ঠাসা। প্রথমেই শুনি মৃত ভের্দুর কণ্ঠস্বর। যেন জীবনযুদ্ধে যে প্রাণ দিয়েছে সে সাবধানবাণী দিয়ে যাচ্ছে জনসাধারণকে। গল্প বলার দিক থেকেও এটি অত্যন্ত সুবিধাজনক কায়দা। ফ্ল্যাশব্যাকের সুবিধাটা এতে হাতের কাছে এগিয়ে দিল। এর পরেই আমরা পৌঁছোই ফ্রান্সের কোনো গ্রামে। এই দৃশ্যটি পরিকল্পনার দিক থেকে দুর্বল। ভের্দুর কোনো শিকারকে দিয়ে কাহিনী আরম্ভ করাই যুক্তিযুক্ত। তাতে আগে থেকে ভের্দু চরিত্রের একটা প্রস্তাবনা হয়ে থাকে, কিন্তু দৃশ্যটিকেও জমাট করা দরকার, কাজেই অযথা কতগুলি হাস্যকর ঘটনাকে স্থান দিতে হয়েছে। থেল্‌মার ভগিনীদের দেখে আমরা ভের্দুর শিকারের সামাজিক চেহারাটা দেখতে পাই বটে, কিন্তু প্লেট ভেঙে যাওয়া, ক্রমাগত ঘণ্টা বাজা, গৃহকর্তার গায়ে জল পড়া, ইত্যাদি ঘটনাগুলোর মধ্যে নিছক হাসি ছাড়া কোনো অর্থপূর্ণতা থাকে না। দর্শকের ঔৎসুক্যও

তেমনভাবে গল্পের কাছে বাঁধা পড়ল না। সমগ্র ফিল্ম-এর মধ্যে এই সিকোয়েন্সটিতেই চ্যাপলিনকে খানিকটা অন্ধকারে হাতড়াতে হয়েছে। এর পরে আমরা যখন বাগানের দৃশ্যে চ্যাপলিনকে দেখতে পাই তখন ছবির গতি তালে তালে পড়তে শুরু করেছে। কাঁচিটা হাতে নিয়ে কটকট করা, গোলাপ ফুল শোঁকা, শুয়োপোকাটাকে সযত্নে গাছে তুলে দেওয়া—এই তিনটি জিনিসেই চরিত্রের অর্ধেক বলা হয়ে গেল। এল মাদাম ভানি-কে বাড়ী বিক্রীর পর্যায়টি—সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই সময় থেকে ছবির প্রতিটি ক্ষুদ্রতম ঘটনাও অর্থের ভারে বোঝাই হতে শুরু করেছে। হাসির বারুদ সবচেয়ে বেশি আছে আনাবেলাকে হত্যা করার চেষ্টায়। এই সিকোয়েন্সটিতে পুরোনো চ্যাপলিন নতুন চ্যাপলিন মিশে একাকার। চুম্বন করতে গিয়ে মুখ থেকে প্রণয়ীর কোটের ফার বিকৃতমুখে বার করা, বিষ মনে করে মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া, নদীতে হত্যার চেষ্টায় বারবার বাধা পড়া,—এ সমস্তের মধ্যে হাসি ও অর্থপূর্ণতা একত্র মিলিত। এই সিকোয়েন্স ও মাদাম ভানি-র সঙ্গে বিবাহের সভার দৃশ্য, দুই মিলে ফিল্মের হাসির অধিকাংশকেই ঠেলে ধরেছে। লক্ষ্যণীয় এই যে এই হাসির তুফান এসেছে ঠিক ভের্দুর পতনের পূর্বমুহূর্তে। আনাবেলা প্রাণোজ্জ্বল নারী, বয়স সত্ত্বেও কামনা তার শোভা পায়, তাই হয়তো তাকে হত্যা করা ভের্দুর সাধ্যের অতীত। তাছাড়া এই ব্যর্থতার মধ্যে তার নিয়তিরও সংকেত। আরো লক্ষ্যণীয় যে আনাবেলার সঙ্গে পিঠেপিঠে ধাক্কা লেগেও ভের্দু ধরা পড়ল না; কারণ সে ধরা পড়ে না, ধরা দেয়। দেউলিয়া হবার পর সে কাফে রয়ালে পালাবার সুযোগ পেয়েও পালালো না। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। তার পালাবার তাগিদ চলে গেছে। কাফে রয়ালের সিকোয়েন্সটিতে তার পরিবর্তন অপূর্বভাবে সূচিত হয়েছে। একদা তার শিকার হতে চলেছিল যে দরিদ্র মেয়েটি তাকে সে দেখে চিনতে পারল না। মাদাম ভানি-কে অবশ্য সে দেখেই চিনেছিল। তার পরে যেখানে সে কাফে রয়ালে মেয়েটির সঙ্গে প্রবেশ করছে সেখানে ফিল্ম-কাব্যের একটি অপূর্ব শিখর। প্রথমে ক্যামেরায় দেখা দেয় একটি নৃত্যরতা তন্বী সুন্দরীর মূর্তি। সুদৃশ্য যুবকের বক্ষসংলগ্ন হয়ে সে ট্যাঙ্গো নাচছে, রূপালি জামায় আবৃত ঊর্ধাঙ্গ এক দিক থেকে আরেক দিকে আন্দোলিত হচ্ছে, যেন কাশের গুচ্ছের মতো। তারপর ভের্দুকে দেখা গেল। তার দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ, চোখে বিচিত্র হাসি। প্রেম, সৌন্দর্য, জীবন তার সামনে আন্দোলিত হচ্ছে সংগীতের তালে তালে। যা কিছু তার জীবন থেকে চলে গেছে সবেরই প্রতিমূর্তি। বাঁচার সংগ্রামে সে এমন ভাবে অভিনয়ে মেতে ছিল জীবনকে সে চোখ মেলে দেখতে পায়নি। যখন পেল তখন জীবন তার নাগালের অতীতে। তাই বধ্যভূমিতে নীত হবার আগে ওরা যখন রাম্-এর পাত্রটা এগিয়ে দেয় তখন সে প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে। তারপর হঠাৎ বলে "দাও, I've never tasted rum in my life"। তারপর সেলের দরজার দিকে এগিয়ে আসতেই বাইরের আলো পড়ল তার মুখে। মুখ শাদা হয়ে গেল, যেন মৃতের মত। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেল বধ্যভূমির দিকে। হাত দুটো পিছনে বাঁধা, চারিদিকে সেপাই-সান্ত্রী, দূরে একটা বিরাট তোরণের মত দরজা বাইরের আলোয় আলোকিত, তার পর বধ্যভূমি। নিস্তব্ধ একটি শোভাযাত্রা স্থির পদে সোজা হেঁটে চলেছে বধ্যভূমির দিকে। আজকের মানুষের প্রতিচ্ছবি শেষ হল এইখানেই।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

জীয়ন্ত

পূর্বানুবৃত্তি

গম্ভীর মনোযোগের সঙ্গে দু'চার মিনিট এ ফাইল ও ফাইল দেখার বিরাম দিয়ে দিয়ে ঘোষাল তাদের সঙ্গে সাময়িক ভাবে আলাপ চালিয়ে যায়, ভৈরবের খবরা-খবর জিজ্ঞাসা করে, প্রতিমার কাছে জোড়াগড়ের ভগ্নস্তূপের বিবরণ ও ইতিহাস শোনে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে নিজের মত শোনায়, কাজের কথায় আসে না। কালটন একবার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট তার সঙ্গে কথা বলে যায়, এক নম্বরের বেশি তাকায় না পাকাদের দিকে। এমনি তার আশ্চর্য সংযম! অথবা? পাকা ভাবে। ঘোষাল তাদের চা খাওয়ায়, চায়ের সঙ্গে লোচন ময়রার বিখ্যাত সন্দেশ। পাকা ভাবে, চায়ের সাথে সন্দেশ ছাড়া মানাবে কেন।

দেওয়ালের নীচের দিকটা আলকাতরা রঙ, মাথার ওপরে নিশ্চল পাখা, মেঝের মাঝখানে ভারি মোটা সরকারী টেবিল চেয়ার ছাড়া এতবড় ঘরটাতে শুধু রুক্ষ শূন্যতার গাম্ভীর্য—দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত ঝোলানো নেই। জানালা দিয়ে চোখে পড়ে কম্পাউণ্ডের সদর গেটে পাহারার ও সশস্ত্র সিপাহীর কোমর থেকে ওপরের অংশটা, রাস্তার ওপারে উঁচু দেয়াল ঘেরা মেটে লাল রঙের জেলের বাড়ীর ওপরের দিকটা। কি রকম চেহারা জেলের ভেতরটার? সাইকেলে, পায়ে হেঁটে কত শতবার জেলটার সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে কিন্তু ভেতরে কি আছে দেখবার সাধ তো কখনো পাকার হয়নি!

নলিনী চুপচাপ বসিয়ে রেখেছিল দু'ঘণ্টা, এখানেও ঘণ্টাখানেক কাটল। কি বিশ্রী শান্ত শিষ্ট ভদ্রভাবে এরকম প্রতীক্ষা করা। জেলটার পেছনে সূর্য আড়ালে পড়েছে।

আমাদের ধরেছেন কেন?

আমি ঠিক জানিনা। আমি আজ মোটে এসেছি।

পাকা জানে এটা মিছে কথা। ঘোষাল এবং আরও অনেককে নিয়ে কলকাতা থেকে কাল ভোরে স্পেশাল ট্রেণের আবির্ভাব তাদের অজানা নয়।

প্রতিমা সবিনয়ে বলে, আমি একটু ইয়েতে যাব।

বেশ তো, বেশ তো!

ঘোষাল আর্দালি ডেকে হুকুম দেয়। আর্দালির শুধু উর্দি সম্বল, অস্ত্রশস্ত্রের বালাই নেই। দরজার কাছ থেকে তাই আরও একজন প্রতিমার সঙ্গে যায়। সে অস্ত্রধারী।

তুমি একটু বসো পাকা।

ঘোষালও উঠে যায়। যায় নলিনী দারোগার ঘরে। নলিনী তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়।

মেয়েটাকে ছেড়ে দিন। জেরা করে নেবেন, যদি কিছু বলে ফেলে। তবে ছুঁড়িটুড়িকে ওরা আসল কারবারে টানে না।

ইয়েস সার।

ছেলেটাকেও ছাড়তে হবে।

নলিনী শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়।

আজ নয়, কাল। যদি না কনফেস করে। ভৈরব চাপ দেবে, ওপরে গিয়ে চাপ দেবে, তালুতে। বুঝলেন? আসল কাউকে পেলেন না, ওই রেকর্ডে এইটুকু একটা বাচ্চাকে আটকেছেন জানলে ওপর থেকে জুতো আসবে, আস্ত জুতো। বুঝেছেন?

ছোঁড়াটা জানে সার, অনেক খবর জানে।

বার করুন খবর। আমি দেখছি চেষ্টা করে। আমায় কিছু না বললে আজ রাতটা পাবেন, আপনারা চেষ্টা করে দেখুন। কাল ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।

ঘোষালকে এক মুহূর্ত আনমনা দেখায়। মনে হয় কাব্যচিন্তা করছে।—কিন্তু মরে যেন না যায়। বাইরে যেন প্রথম না হয়। বুঝলেন?

ইয়েস সার!

প্রতিমার ডাক পড়ে নলিনীর কাছে। আর সে ফেরে না।

ঘোষাল কথা বলে পাকার সঙ্গে, তার ছেলেবেলার কথা, তার মার কথা। সেই পুরনো কথা, আরও বিস্তারিত, রঙ ছড়ানো—কত নিবিড় স্নেহভরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল পাকার মার সঙ্গে ঘোষালের, কত যত্নে কতরকম আচার করে, খাবার করে সে খাওয়াতো ঘোষালকে। পাকা জানে তার মাকে টেনে আনার মানে। মার কথায় সে ছেলেমানুষ বনে যায় এটা ঘোষাল টের পেয়েছিল গতবার ভৈরবের বাড়ীতে যখন দেখা হয়। ফাঁপর ফাঁপর লাগে, অসহ্য ঠেকে। কিন্তু এটা ভৈরবের বৈঠকখানা নয়। হিসেবী সতর্ক হয়ে গেছে পাকার মন। সেও খানিকটা অভিনয় করে। একটু অভিভূত হবার ভাব দেখায়।

তারপর এক সময় নলিনী ঘরে আসে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে চুপি চুপি কথা হয় ঘোষালের। কথার শেষে চিন্তিত গম্ভীর দেখায় ঘোষালের মুখ।

বড় মুস্কিলে ফেললে পাকা তুমি। মেয়েটিকে এরা ছেড়ে দিচ্ছে। প্রতিমা নাম নয় মেয়েটির? প্রতিমা সব কথা খুলে বলেছে।

কিসের কথা?

এতক্ষণে তবে কাজের কথা উঠল, আক্রমণ সুরু হল! ভেতরটা শক্ত হয়ে যায় পাকার। ভয় করে। অসাবধানে কিছু বলে ফেলার ভয়, বোকামি করে সন্দেহ জাগাবার ভয়। প্রতিমাকে ছেড়ে দিয়েছে কি দেয়নি কে জানে। তাকে তফাৎ করা হয়েছে, একা করা হয়েছে। এবার একা তাকে সামলাতে হবে সব।

ঘনিষ্ঠ, আপন হয় ঘোষাল। পাকাকে সে বাঁচাবেই যে করে হোক। সে ক্ষমতা তার আছে। পাকার বাবা ঘোষালের আপন বড় ভাইয়ের মত—ছেলেবেলা থেকে পরিচয়। স্নেহ দিয়ে পাকার মা ঘোষালকে চিরদিনের জন্য বেঁধে রেখে দিয়ে গেছে। কিন্তু খুলে বলতে হবে সব কথা পাকাকে। না বলার কোন মানে নেই। প্রতিমা সব বলে দিয়েছে। পুলিশও জানে। পাকা সব জানাক ঘোষালকে, নিজের দায়িত্বে সে তাকে ছেড়ে দেবে। নয়তো কি যে বিপদে পড়বে পাকা, সে যদি বুঝতো—

কি বলব বলুন না? খালি বলছেন বলতে হবে: আমি কিছু করিনি, মিছিমিছি আমায় ধরে এনে—

পাকা নিজেই বোঝে তার অভিনয় ভাল হচ্ছে না, একটু কেঁদে ফেলতে পারলে হত। কিন্তু কান্না না এলে উপায় কি। তাছাড়া এরা যদি বুঝতেও পারে সে না জানার ভাণ করেছে তাতেও বেশি কি এসে যাবে। তাকে বেশ সন্দেহ করেই ধরেছে, মিছিমিছি নয়। হয় তো অনেক কিছু জেনে শুনেই ধরেছে। সে কিছু বলবে না এটুকু অন্তত বুঝুক।

বাইরে আলো ম্লান হয়ে আসছে। আর্দালি ঘরে একটা আলো ঝুলিয়ে দিয়ে যায়, টেবিলেও একটা আলো দেয়।

ছেলেবেলা আমায় একজন গাঁজা খেতে শিখিয়েছিল, পাকা। তাকে কাকা বলতাম—কাকাই বটে! কি ভক্তিই যে করতাম! তোমার মতই বয়স হবে। বাবা একদিন টের পেয়ে বললেন: তুমি ছেলেমানুষ, তোমার দোষ নেই, তোমায় কিছু বলব না। কে তোমায় শিখিয়েছে তার নামটা বল। কি বোকাই তখন ছিলাম। বাবাও ছাড়বেন না, আমিও কিছুতে বলবো না। শেষে দড়ি দিয়ে আমায় বেঁধে—মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে ঘোষাল তার বাবার অতীত কর্তব্য পালনে সায় দেয়।—বাবা সত্যি আমায় বাঁচিয়েছিলেন। নয়তো গাঁজা খেয়ে কি হতাম কে জানে! যে মুহূর্তে নাম বললাম, বাবা আমায় ছেড়ে দিলেন।

গাঁজা খেতেন? ছি ছি! আমি হলে বাবা জিজ্ঞেস করা মাত্রে বলে দিতাম কে খেতে শিখিয়েছে।

সে সময়কার ঘোষালের মুখ পরবর্তী জীবনে অনেকবার মনে পড়েছে পাকার। বিশেষভাবে মনে পড়েছে যখন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বা আনমনে শক্ত কিছুতে কামড় দিয়ে জোড়া লাগানো ভাঙা চোয়ালের হাড় টন টন করে উঠেছে। তিনটি আঙুলের একেবারে বদাকার নখ চোখে পড়েছে।

পরবর্তী জীবন, সে রাত্রির পরের।

যন্ত্রণার এক অজানা নতুন জগতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের রাত্রি। কতটুকু আঙুল মানুষের, দেহের কতটুকু অংশ। সেই আঙুলের নখের নীচে একটা ছুঁচ ঢুকতে থাকলে যে জগৎটা বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায়, কিন্তু যায় না। ক্ষুদ্র গোপন অঙ্গটি পিষ্ট হলেও তাই। চেতনার সীমায় তোলা যাতনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সেই অনুভূতির জগতে সর্বাঙ্গ একাকার। এই অসহ্য অদ্ভুত জগতের সঙ্গে যে রাত্রির ঘনিষ্ঠতা ছাড়া, শুধু ওরকম নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছাড়া যে জগতের কোন মানে মানুষের কাছে থাকে না, চেতনাকে কোনদিন পাকা এমন অন্তরঙ্গভাবে চিনতে পেতনা। মনে হয়ত কাব্য আর কল্পনা হয়েই থাকত চিরদিন, মনের জোরে মানুষের যন্ত্রণা জয় করাকে একটা দুটো মানুষের খেলো নাটুকে বাহাদুরী বলেই জেনে রাখত। মনের জোর যেন দু'চারজন মানুষের একার সম্পত্তি, কোটি কোটি দুর্বল মনের ব্যতিক্রম, যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধে মানুষ হার মানবে এই নিয়মের অনিয়ম। যন্ত্রণাকে জয় করাই স্বভাব মানুষের, তার চেতনাটাই যন্ত্রণার সঙ্গে পাল্লা দেবার মত ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে চেতনাও, আযত্নে রেখে রেখে ব্যথাতেই কেন্দ্রীভূত হতে থাকে ছড়ানো জগত থেকে সরে এসে এসে, যন্ত্রণাহীন অকাতর বলে জগৎ থাকে না, জীবন থাকে না, কিছুই থাকে না। যন্ত্রণাই অস্তিত্ব, যন্ত্রণাই সব। যন্ত্রণার যত উন্মত্ত আক্রমণ, সেই আক্রমণেই তত ভোঁতা হয়ে যায় যন্ত্রণাবোধ। একটা সীমার পর চেতনা নিজেকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মানে হারিয়ে মিথ্যে হয়ে যায় যন্ত্রণা।

ভয়ানক বলে কোন ব্যথা নেই, যন্ত্রণা নেই। কোন মানুষ কোনদিন ভীষণ কষ্ট পায়নি, পাবে না। ভয়ানক শুধু ভয়টা। যন্ত্রণা পাবার আগে মিথ্যা কল্পনার মিথ্যা যন্ত্রণা। যন্ত্রণার শেষ কথা মরণ। শুধু ভয়ের ফাঁকিতে যন্ত্রণা আর মরণ মানুষকে কাবু করে রেখেছে।

ভয় মানুষের তৈরি, স্বার্থপর মানুষের। ঘুমোতে না চাইলে পাকার মা পর্যন্ত পাকাকে ভয় দেখাতো। মার কি ভয় ছিল না যে ঘুমিয়ে অসুখ করে পাকা মরে গেলে আদর করার সোহাগ করার বুকে করে মেতে থাকার কেউ থাকবে না? পুতুল হারানোর ভয়ে মাও যদি ছেলের জন্য ভয় সৃষ্টি করে, কানাকড়ি হারানোর ভয়ে মানুষ কেন পরের জন্য ভয় সৃষ্টি করবে না।

হঠাৎ একদিন চরম দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করে পাকা বীরত্বের মর্ম বুঝেছে, জেনেছে যে যন্ত্রণা আর মৃত্যুকে জয় করা মানুষেরই বাস্তব জীবনের সাধারণ বাস্তব ধর্ম। অথচ মাঝে মাঝে খেয়াল হলেও সে কখনও মানতে পারেনি তার মা তারই দুরন্তপণার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য ভয় সৃষ্টি করত।

যাই হোক, নির্যাতনের ফলে একটা উপকার হয়েছে। মনের গতিটা

ঘুরেছে পাকার। দ্রুত অনিবার্য বেগে, অন্তর্জগতে একটা বিপ্লব ঘটার মত। জ্ঞান ফেরার পর, তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে, প্রতিমা খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গেই শুধিয়েছিল, কিছু বলেছ কিনা মনে আছে ?

বলিনি।

তখনি একটা অস্পষ্ট স্বস্তি অনুভব করেছিল। না বলাটা তার বাহাদুরি হয় নি, একটা বিচ্ছিন্ন বিশেষ ঘটনা ঘটেনি তার জীবনে, মানুষের একটা রীতি, সাধারণ নীতি পালিত হয়েছে মাত্র—অনির্দিষ্ট মানুষেব মধ্যে নিজের ছড়িয়ে যাওয়া এই অনির্দিষ্ট অনুভূতিতে যেন মোটামুটি একটা মীমাংসা হয়ে গেছে তার মর্মান্তিক বিরোধের সারা জগতের সঙ্গে একা ঝগড়া কবার। এসব অনুভূতি নিজে বুঝবার মত পুষ্ট হতে দানা বাঁধতে বহুকাল লেগেছিল, কিন্তু অভিশপ্ত শত্রু-জগতেব সঙ্গে আত্মীয়তা তার সুরু হল জ্ঞান ফিরে আসাব সঙ্গে সঙ্গে। পচা আবদ্ধ ভদ্র জীবনের ওপর রাগ করে বেচারী মরিয়া হয়ে রীতি নীতি নিয়ম কানুন বাধা-নিষেধের দেয়াল শুধু ভেঙেই চলেছিল, নিজের ঘৃণা আর জ্বালার চাবুকে পাগল হয়ে বাড়িয়েই চলেছিল দিশেহারার মত ছুটে বেড়াবার জন্য আবো বড়ো—আবো বড় জগৎ : জগৎ যত বড় হয়েছে, চলা ফেবা মেলা মেশার জগৎ, দিবারাত্রির জগৎ, নিয়মহীনতার জগৎ, তত তাকে গুটিয়ে আসতে হয়েছে নিজের মধ্যে। ভদ্র স্নেহেব বাঁধন ছিঁড়ে কি হবে, কি হবে মিষ্টি হাসি গান গল্প গন্ধ শোভা ভরা সাজানো ঘর ছেড়ে পথে পথে ধূলোব হেঁটে, নরম বিছানায় স্বপ্নালু ঘুমেব বদলে চাষার বস্তিতে হৈ চৈ করে, সাপ জঙ্গলের ঝরণার ধারে একাব ভাব রাজ্য গড়ে তুলে, সাইকেলে দূব গাঁয়ে পাড়ি দিয়ে, বিপদজনক মরণব্রতে অংশ নিয়ে, কাউকে যদি সে আপন না কবে, কাউকে ভাল না বাসে। নিজেকে না দিলে কে তাকে আপন করবে, কার সাধ্য আছে : কিসে তার সাধ মিটবে, শুধু তাবই জন্য জগতে কে আছে।

ভীরু আত্মীয় বন্ধুবা পাকার খবরও নেয় না, দেখতেও আসে না। সে বিপজ্জনক হয়ে গেছে। গবর্নমেন্ট তাকে শত্রু মনে করে, ইংরেজের নিষ্ঠুর একরোখা সর্বজ্ঞ গবর্নমেন্ট। ভদ্রতা বা আত্মীয়তা রাখতে গিয়ে কিসে কি হবে কে জানে, যখন খুশি যাকে খুশি যে কারণে খুশি ধরে নিয়ে যতদিন খুশি আটক বাখাব যা খুশি করার আইন পর্যন্ত আছে। শত্রু হলেও অহিংস কংগ্রেস সম্পর্কে গবর্নমেন্ট বরং অনেকটা উদার। পাকার মত মারাত্মক জীবদের যারা ছায়া মাড়ায় তাদেরও গবর্নমেন্ট ক্ষমা করে না।

তা হোক, জগতে সবাই ভীরু নয়, ভীরুই জগতে সব চেয়ে কম। পাকা কাউকে ভাল না বাসুক, তাকে অনেকে ভালবাসে। শুধু তার অশান্ত অবাধ্য উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণটুকু, তেজী প্রাণটুকু কত প্রাণে টান জন্মিয়েছে সে হিসাবও পাকা কখনও রাখেনি, পাকাকে যাদের আপন ভাবার অধিকার তারাও ভাবেনি। ছেলে বুড়ো মেয়ে

পুরুষ এত লোক তাকে দেখতে আর খবর নিতে আসে, জাত বেজাতের লোক, যে খাপছাড়া ঠেকে ব্যাপারটা সবার কাছে। সংখ্যায় তুলনায় কম হোক, ভদ্র জাতও অনেকে আসে। সংখ্যার স্বল্পতাটা ফাঁপিয়ে দেয় স্কুল কলেজের ছাত্ররা—স্কুলের ছেলে পাকার যে এত কলেজীর বন্ধু আছে কে তা জানত। দোকানী মিস্ত্রী ফিরিওয়ালা আসে—গঙ্গা কামার সপরিবারে, বাচ্চাকে পর্যন্ত কাঁধে চাপিয়ে। খবর পেয়ে চামার বস্তি ফাঁকা হয়ে এসে নিঃশব্দে জমা হয় ভৈরবের বাড়ীর সম্মুখে, বেডি জেনে নেয় পাকা বেঁচে আছে এবং অবশ্য অবশ্য বেঁচেই থাকবে, চুপচাপ সকলে আবার বস্তিতে ফিরে যায়। আটুলিগাঁর মত আব কতকগুলি গ্রাম পাকার কুশল চায়। এত তাড়াতাড়ি কি করে চারিদিকে খবর ছড়ালো কেউ ভেবে পায় না।

অমিয়া প্রতিমাকে বলে, দেখেছো কাণ্ড ?

চোখের নীচে কালি পড়েছে নতুন মামীর। পাকার মাথায় আইসব্যাগ চেপে ধরে সে থাকে প্রতিবাদের হতাশার প্রতিমূর্তির মত, পাকার গরম মাথা বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করার ভরসা যেন তার চিরতরে মুছে গেছে, এ শুধু নিয়ম পালন।

প্রতিমাও কম আশ্চর্য হয়নি। পাকাকে সে ছেলেমানুষ বলেই জানত। কোন ফাঁকে সে এত বড় হয়ে গেছে টেরও পাওয়া যায়নি। আজ এ ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে তারও প্রথম খেয়াল হয়েছে অমিতাভের চেয়েও পাকা বেশি চ্যাঙা।

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

পরের বছর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় বসন্ত কাল এল। দখিনা আর কোকিলের কলরব তো বটেই, গুটি বসন্তের একটু উগ্রতর মহামারী নিয়েও। পরীক্ষা দিয়ে পাঁচু ফিরেছে আটুলি গাঁ। পাকা গিয়েছে দেশ ভ্রমণে, অনন্ত আর নতুনমামীর সঙ্গে। ভ্রমণে নতুনমামীর শ্রান্তি এলেই পাকার কেটে পড়ার ইচ্ছা। একা খুশিমত বেড়াবে। ভারতের এদিক ওদিক।

এতকাল পরে পাকার বাবা আরেকটা বিয়ে করেছে। ছেলের স্বদেশীওলাদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তার চাকরীর দারুণ অবনতি ঘটেছে। ভবিষ্যতে কি আছে কে জানে। অবাধ্য বিপথগামী ছেলে মন ভেঙে দিয়েছে। বিয়ের কারণ অবশ্য সেটা নয়।

পাকা বলেছিল পাঁচুকে, বয়ে গেল। সৎমা তো আর মা নয়! বাবার শখ হয়েছে বিয়ে করেছে, আমাব কি ?

কিন্তু পাঁচুর কাছে পাকা প্রায় স্বচ্ছ। তার আঘাত আর অপমান পাঁচুর কাছে গোপন থাকেনি।

লেখাপড়ার লম্বা ছুটি, পাঁচুর কাজের অভাব নেই। ভাবনা চিন্তা মানস কল্পনার অভাবও ঘটে না। গেরস্ত চাষীর বড় সংসার, জমিজমা গরু-বাছুরের সম্পদ কম। কম বলেই ছোট বড় খুঁটিনাটি সব কাজ নিজেদের করতে হয়, লোক রাখার সাধ্য নাই। ঘরের কাজ, মাঠের কাজ, বাজারের কাজ, হাট-বাজারের কাজ—সব কিছুরই অংশ পাঁচুর জুটে যায় পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। চিঠি আর দরখাস্ত লেখবার জন্য অনেকে আসে, বাড়ীতে ডাকে। পাঁচুর হাতের লেখা মুক্তার মত সুন্দর চিঠি লিখতে এক পয়সা ও দরখাস্ত লিখতে দু'পয়সা মজুরি নেয় পাঁচু। লেখাপড়া শিখতে অনেক খরচ, বড় কষ্টের পয়সা খরচ।

পরীক্ষার খরচ যোগাতে পাঁচুর মার একটি গয়না গেছে। রূপোর গয়না, ওইটিই তার শেষ সম্বল ছিল।

পরীক্ষা দিয়েই যেমন তেমন সাময়িক একটা চাকরী করার সাধ ছিল পাঁচুর, ধনদাস রাজী হয়নি। তাছাড়া, চাকরীই বা কোথায়। তার চেয়ে ঢের বেশি পাশ করা ঢের ছেলে বেকার বসে আছে। দেশের হালচাল বড় খারাপ। অনেককাল চাকরী করছে এমন অনেকের চাকরী পর্যন্ত খসে যাচ্ছে।

আর কি লেখাপড়া হবে ? মাঝে মাঝে এ ভাবনাটা পাঁচুর মনে আসে, তেমন জোরালো আকাঙ্খার রূপে নয়। লেখাপড়া শিখে বড় হবার উগ্র উচ্চাকাঙ্খা তার জন্য নয়, ওসব কামনার শিকড় তার জীবনেও গভীর স্তরে পশে না, রস পেয়ে পুষ্ট হয় না। জজ ম্যাজিস্টর অন্য জগতের জীব, অন্য জগতের জীবনের সার্থকতা তার জগতের নয়। লেখাপড়া শিখে জজ ম্যাজিস্টর হওয়ার সাধ বা স্বপ্ন তার জগতে এত কৃত্রিম যে রাজা হওয়ার আশীর্বাদটা বরং ঢের বেশি বাস্তব আর স্বাভাবিক শোনায়।

তবে কলেজে পড়ার ইচ্ছা পাঁচুর হয়। পাশ করে পাকা নিশ্চয় কলেজে ভর্তি হবে। পাকার সঙ্গে পড়তে পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাতেও ওই জগতান্তরিত হবার দরকার থাকার অসুবিধা। কলেজে পড়তে এদিকে বাপখুড়োকে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হবে। যেমন আশা করেছিল, পরীক্ষা তত ভাল হয়নি, পাঁচ দশ টাকা বৃত্তি যদি পাওয়াও যায়, বাড়ীর অবস্থা কাহিল হওয়া তাতে ঠেকবে না। তার চেয়ে বড় কথা, ওরকম সর্বস্ব পণ করে লেখাপড়া শিখতে গেলে শুধু আরেকটা পাশ করে থেমে যাওয়ার মানে হয় না। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে শেষ করা যায়, চাকা এক পাক ঘুরল, তার সমাজ সংসারে গণ্য হওয়ার মত মূল্য বাড়ল। চাকা আবার ঘোরালে অন্তত বি-এ পাশ পর্যন্ত আরেকটা পুরো পাক ঘুরতে দেওয়া চাই। চার বছর পড়া, চার বছর পড়ে অন্য সমাজ সংসারের মানুষ হয়ে যাওয়া, কারণ ওখানে ছাড়া তার আর তখন নিজের জগতে মূল্য নেই, সে সীমা পার হয়ে গেছে।

ভদ্রলোকের জগত সম্পর্কে পাঁচুর যথেষ্ট মোহ আছে। কিন্তু চাষভুষোর জগত তার এমন আপন, এত প্রিয় যে তাকে বিগড়ে দেওয়া সামান্য মোহের কাজ নয়।

যেটুকু ঘষামাজা পেয়েছে তাতেই তার চোখে তার জগত বেশ খানিকটা নিঃস্ব অর্থহীন কুৎসিৎ হয়ে গেছে তবু! কি যে তার অবস্থা হত কে জানে, হয় তো গাঁয়ের চাষীর জীবন আর চাষী আত্মীয় বন্ধুর প্রতি ভালবাসা অশ্রদ্ধায় বিষিয়ে যেত, পাকা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ভদ্রজীবনে পাকার বিদ্বেষ, অমার্জিত চাষাড়ে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার জন্য তার ব্যাকুলতা, এ খড়ের বাড়ীতে এসে তার মূর্খ নোংরা গরীব বাপ-খুড়ো পিসী মাসী ভাইবোনদের মধ্যে বিনা সমালোচনায় সহজ শ্রদ্ধা সহজ আনন্দে বাস করা, পাঁচুর নজরকে নতুন ভঙ্গি দিয়েছে। তার কাকা একগুঁয়ে জ্ঞানদাসের গেঁয়ো উগ্রতাকে বিদ্রোহের মর্যাদা দিয়ে চিরদিনের জন্য পাঁচুকে পাকা আত্মমর্যাদার ভিত্তি দিয়ে গেছে।

মনে মনে সে কাকার পরম ভক্ত, মাঝখানে শুধু কিছুদিনের জন্য একটা খটকা লেগেছিল: কাকা বুঝি তার শুধু মাথা গরম গোঁয়ার, দেশও বোঝে না, স্বাধীনতাও বোঝে না, ষাঁড়ের মত শিং নেড়ে শুধু গুঁতোতে জানে। পাকা জ্ঞানদাসকে খাঁটি বীরের সম্মান দিয়ে তার মনের সংশয়ের মেঘ কাটিয়ে দিয়ে গেছে।

দেশ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিখ্যাত কত ভদ্র নেতার সম্পর্কে পাকার সাংঘাতিক অভক্তি আর কটূক্তি পাঁচুকে চমকে চমকে দিত। সেই পাকা জ্ঞানদাসকে—তার গোঁয়ার-গোবিন্দ কাকাকে—শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে গেছে। পাঁচুর কি আর সংশয় থাকে।

ঝাড় থেকে বাড়তি বাঁশ কাটা হয়েছে গোটা আষ্টেক। কাল হাটবার, গাড়ীতে হাটে বেচতে পাঠাতে হবে। পাঁচুও হাত লাগিয়েছে। ধারালো দা দিয়ে কাটা বাঁশের কঞ্চি সাফ করতে করতে তার মনে হল একটা কথা।

হাটে না পাঠিয়ে—

অাঁ?

হাট দু'কোশ তো? সদর সাত কোশ। হাট থে' বাঁশ লেবে লোচন রসিক না তো খলিমুদ্দীরা। ফের সদরে চালান দেবে, লাভ করবে। তার চেয়ে মোরা যদি—

হুঁ?

বসন্তের কাছারি বাড়ী সংস্কারের জন্য দুটি বাঁশ দিতে হবে, ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে পৌছে দিয়ে আসতে হবে।

ধনদাস ঠেক্‌না বাঁশের লাঠি কাটছিল। ডগার সরু দিক থেকে বা শাখা থেকে লাঠির মত এরকম ঠেক্‌না নিতে হয়, মাথায় বাঁশ বইতে হলে, দম ফুরিয়ে গেলে একটু থেমে জিরোবার সময় মাথার বদলে এই ঠেক্‌না লাঠিতে দিতে হয় বাঁশের ভার। দু'টি বাড়্‌তি সবুজ বাঁশের ওজন কত সেই জানে যে বাঁশের জোড়া মাথায় চাপিয়ে

বয়। পুষ্ট মোটা তিনটি বাঁশ বইবার সাধ্য যোষান মদ্দেরও হয় না। দম ফেটে যাবে, ঘাড় বেঁকে যাবে। হাট বাজারে মাথায় যারা বাঁশ বয়ে নেয়, দুটির বেশি বাঁশ বড় দেখা যায় না।

সদরে দরটা কেমন ?

তা কে জানে! পাঁচুকে মানতে হয়, তবে কিনা হাট থে' কিনে সদরে তো চালান দেয়। মোবা যদি সিধে সদরে যাই—

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে না ধনদাস, জ্ঞানদাস। একজন বাঁশ ঝাড়টার দিকে, আরেকজন বাতাবি লেবু গাছের বাড়্তি রংলাগা ফলটার দিকে দু'চারক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারাই খরচ করে পাঁচুকে সদর স্কুলে পড়িয়েছে, তারাই যদি এখন পাঁচুর মতামতকে যথেষ্ট পরিমাণ মর্যাদা না দেয় তাহলে চলবে কেন।

কথাটা মন্দ নয়!

জ্ঞানদাস প্রথম সায় দেয়। কী মৃদু তার কথা, স্নেহ-শ্রদ্ধা, মায়া-মমতায় কী স্নিগ্ধ সুমিষ্ট তার উচ্চারণ। এই জ্ঞানদাস নাকি জমিদার বসন্তের প্রাপ্য খাতির দেয় না, বেকার খাটতে ডাকলে কর্কশ জবাব দেয়, বসন্তের লেঠেলের মাথা ফাটিয়ে রক্তপাত করে।

ধনদাস শুধু বলে, তা দেখি একবার। তোমরা বলছ।

সেদিন তারা সপরিবারে এই নতুন প্রচেষ্টার রোমাঞ্চ ভোগ করে। বড় একটা শোল মাছ ধরে ঝাল রান্না হয়। মাছটা ধরে আনে পিসী সুভদ্রা। পরের পুকুরে দু'বছর ধরে পোষা মাছ, এমনি দরকারের জন্তই বুঝি সুভদ্রা এঁটোকাটা ভাতের কণা কুড়িয়ে দু'বছর প্রতিদিন দুপুরের খাওয়ার পর ডোবার ঘাটে গিয়ে বাঁ হাতে জলে ছল্ছল্ শব্দ করে ডান হাত জলে ডুবিয়েছে—হাত ঠুকরে ঠুকরে শোল মাছটা খাবার খেয়ে গেছে! আজ খপ্ করে কান্কোর নীচে চেপে ধরে তাকেই অনায়াসে ধরে এনে সুভদ্রা মাছের ঝাল রান্না করল।

ভোর রাত্রে যাত্রা। অন্ধকার থাকতে। ভাখো, আটুলিগাঁর আকাশেও আজ চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। চাঁদের অস্ত যাওয়ার মহিমায় ভোর রাত্রির প্রবাদ-বাক্যের অন্ধকার আজ আম, জাম, বকুল পলাশের দীর্ঘ ছায়ায় ঠাঁই পেয়েছে। গাছ যেন রোদেই ছায়া দেয়, দিনের বেলায়। সবাই যখন সজাগ। ভোর রাত্রের ঘুম-কাতর চোখকে যেন গাছের ছায়া আশ্রয় আর বিশ্রাম দেয় না।

গরুর গাড়ীতে সদর বাজারে বাঁশ বিক্রী করতে গেল খুড়ো-ভাইপো। মন্থর, দীর্ঘ পথ, সাইকেলেও সদর এত দূর নয়। পৌছতেই দুপুর হয়ে গেল, বাজার তখন ভেঙে গেছে। এদিকে রাত দুপুরে রওনা দেওয়া উচিত ছিল। অতুলের বাঁশ-কাঠের আড়ত পাঁচুর জানা ছিল। দর সুবিধে পাওয়া গেল না। সে বেলার মত বাজার ভেঙে গেছে বলে নয়, মাছ তরকারীর মত বাঁশের বাজারের এবেলা ওবেলা

নেই দরটাই পড়ে গেছে এসব জিনিসের, মাটিতে যা জন্মায়। গাঁয়ের হাটে আট ন' আনা পেত, সদরে এসে গড়ে এগার আনা। তারই জন্য দুটো মানুষ দুটো গরুর দিন ভোর খাটুনি।

না, বাণিজ্য তাদের পোষাবে না। গাড়ীটা পুরো বোঝাই বাঁশ এনে বেচলে কিছু হত, দশটা বারটা বাঁশ এনে ব্যবসা হয় না।

ফেরার আগে বিকালের দিকে পাঁচু ভৈরবের বাড়ীতে পাকার খবর আনতে যায়। এ বাড়ীতে সে অচেনা নয়, কিন্তু পাকা নেই, কে আদর করে বসাবে। পাকা? পাকা নেই। কোথায় আছে? কে জানে, ক'দিন আগে শ্রীনগর থেকে একটা চিঠি এসেছে।

সাইকেলের দোকানে কানাই কেরোসিন তেলে ফ্রি-হুইল সাফ করছিল। পরীক্ষা দিয়ে সেও দোকানের কাজে বেশি মন দিয়েছে। তারও লেখাপড়ার সম্ভবত এই ম্যাট্রিকুলেশনেই সমাপ্তি। নলিনী দারোগার বৌয়ের গয়না-ডাকাতির ব্যাপারে মারধোর খেয়ে কানাই-এর জ্বর এসেছিল, বড় ডাকাতির ধাক্কাও গেছে তার ওপর দিয়ে। মার খেয়েছে, মাস দুই আটক থেকেছে, সে এখন আছে নজরে নজরে, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাক পড়ে। শুধু সন্দেহ, সন্দেহজনক গতিবিধি আর মেলা-মেশা ছাড়া তার রেকর্ড নির্দোষ, নিষ্পাপ। তার চেয়ে বরং পাকার রেকর্ড খারাপ ছিল। অথচ পাকাকে শুধু দলের বন্ধু বলা যায়, দলের ঘনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী। কানাই শান্ত শক্ত, চাপা ছেলে। যেটুকু তার ছেলেমানুষী ছল্‌কে বেড়ানো, সে শুধু বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য, তার দলের খাতিরেই। দলের জন্য উপযুক্ত ছেলের প্রাথমিক খোঁজ আর বাছাই তার কাজ। এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও এজন্য পাকা তাকে কখনো বুঝতে পারেনি, একসঙ্গে বিড়ি, তামাক টেনে আড্ডা মারার মধ্যেও তার চরিত্রের একটা গোপন কঠোরতা তাকে পীড়ন করেছে, তাকে ত্যাগ করে দূরে সরে যাওয়ার জ্বালায় কাবু হয়েছে। কোন গুণে কানাইকে কালীনাথ তার চেয়ে বিশ্বাস করেছে বেশি মূল্য দিয়েছে পাকা কখনো ভেবে পায়নি।

কিন্তু পাঁচু খানিকটা অনুমান করতে পারে। ভাবপ্রবণতায় তার বিচারবুদ্ধি ঝাপ্‌সা নয়। তা থেকেই এসেছে সংসারে সাধারণ চালচলনের রীতিনীতি-বোধ। কানাইয়ের গোপন বিপ্লবী জীবন একটা আছে আন্দাজ করেও কোনদিন সে তাকে কোন প্রশ্ন করেনি, কৌতূহল প্রকাশ করেনি।

আজ বিচার বিবেচনা করে সে শুধায়: কালীদা ধরা পড়েনি, না?

না।

অন্য নতুন কেউ?

না।

আর কিছুই সে জিজ্ঞাসা করে না এ বিষয়ে। তার এ স্বাভাবিক সংযম জানে

বলেই কানাইও এমন জবাব দিয়েছে যার স্পষ্ট মানে এই যে কালীনাথদের খবর সে রাখে। নয় তো সে শুধু বলতো : আমি কি জানি ?

কানাই-এর ন'বছরের নোলকপরা বোন রাধি দুটো কাঁসার বাটিতে তাদের মোয়া দিয়ে যায়। হাত না ধুয়ে দু'পরল কাগজ দিয়ে ধরে কানাই মোয়া খায়, বলে, শ্যামলবাবু আছে কেমন ?

তেমনি আছে।

শ্যামলের খবরটা তার নিজে থেকে দেওয়া উচিত ছিল, পাঁচু ভাবে। এদের জগতের লোক সে। কবে শেষ হয়ে গেছে শ্যামলেব বিপ্লবী জীবন, ক্ষীণ অশক্ত শরীর নিয়ে কোনমতে সে টি'কে আছে একটা গাঁয়ের একপ্রান্তে, তবু তার কুশলটাই কানাইদের কাছে মূল্যবান, সে তাদের আপন জন, একদিন সে বিপ্লব করেছে। কাঞ্চনপুর থেকে কেউ আটুলিগাঁয়ে তাদের বাড়ী এলে সে যেমন জিজ্ঞাসা করত তার মামার খবর, আটুলিগাঁ থেকে সে এসেছে বলে তেমনিভাবে কানাই জিজ্ঞেস করছে শ্যামলের কথা। কানাইয়ের কাছে আটুলিগাঁয়ে একজন মানুষ থাকে পুরানো বিপ্লবী শ্যামল।

তাই বটে। আত্মীয়তার মানেই তাই।

এই রাধি লো! জল দিবি নে ?

মুখচোখ কুঁচকে ফোকলা দাঁত বার করা একরাশি হাসি দিয়ে এই ত্রুটি ঢেকে রাধি জল আনে। ধনদাস সম্প্রতি পাঁচুর বিয়ের কথা বলছে, এই বয়সী এই রকম একটা মেয়ের সঙ্গে, হয় তো দুধে দাঁত খসে এমনি ফোকলাও হবে! ভাবলে পাঁচুর গা ঘিন ঘিন করে না। আত্মীয়-কুটুম-স্বজাতির ঘরে ঘরে এই বয়সের কেন এর চেয়ে কচি কচি বৌ দেখাই তার অভ্যাস, সংস্কার। তবে কিনা বিয়ের সাধ তার নেই। জ্ঞানদাসেরও অমত। বিয়ে কি পালায় ব্যাটাছেলের ? যাক না কিছুকাল, সাত-তাড়াতাড়ি বাঁধনের কি দরকার !

আজকেই ফিরে যাবি ? কানাই বলে।

নইলে থাকবো কোথা ?

এখানে থাক না আজ।

কথাটা বড় ভাল লাগে পাঁচুর। পাকার মধ্যস্থতায় তার কানাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব। পাকা না থাকায় আজ সে দূরত্ব বোধ করছিল, বন্ধুর কাছে এসেও বন্ধুকে না পাওয়ায় কষ্ট বোধ করছিল। এক মুহূর্তে সে খুশি হয়ে উঠল।

দাঁড়া তবে বিদেয় করে আসি কাকাকে।

বন্ধুর বাড়ী একটা দিন কাটাবার লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় পাঁচুর। পাঁচ ঘণ্টা থানায় কাটিয়ে আটুলিগাঁ ফিরতে হয়। হয়রানির একশেষ। [ক্রমশ]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

"সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য"

পৌষের পরিচয়ে আইয়ুব সাহেব বামপন্থী সাহিত্যের বিরুদ্ধে তাঁর পুরাতন অভি-যোগকে একটা নূতন পোষাক পরিয়ে আসরে নামিয়েছেন। খানিকটা এগিয়ে এসে বামপন্থীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তিনি এবার তাঁর খসড়া পেশ করেছেন। তিনি মেনে নিচ্ছেন, (১) পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা দরকার; (২) তার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন; (৩) সাহিত্য বিপ্লবী শক্তির হাতে ধারালো অস্ত্র এবং এই অস্ত্রের সম্যক ও পূর্ণ ব্যবহার অবশ্যই কাম্য।

"রাষ্ট্রিক বিপ্লব বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থান্তর ঘটানোর প্রচেষ্টায় ধারালো অস্ত্ররূপে—" যে সাহিত্য ব্যবহৃত হয় তার নাম তিনি দিয়েছেন ফলিত সাহিত্য। বিপ্লবের জন্য এই সাহিত্যের প্রয়োজন। বিপ্লব যদি কাম্য হয়, এই সাহিত্যও কাম্য। তাই এই সাহিত্যের একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল বা উপকরণ মূল্য আছে। আইয়ুব সাহেব এই সাহিত্যের ভূয়সী প্রচার কামনা করেছেন। বামপন্থীরা কষে ফলিত সাহিত্য রচনা করুন, যথা, পোস্টার, হ্যাণ্ডবিল, পুস্তিকা, সংবাদসাহিত্য, সমাজবৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, এমন কি বোধ হয় ডকুমেন্টারি গল্প, উপন্যাস ও নাটক পর্যন্ত। আইয়ুব সাহেবের তাতে আপত্তি নেই। উপকরণ মূল্যের গণ্ডী অতিক্রম না করে সাহিত্য পার্টির নির্দেশ মেনে চলতে চায় তো চলুক। তাতেও আইয়ুব সাহেব বিচলিত হবেন না।

তাহলে তাঁর অভিযোগটা কি? অভিযোগটা কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্যিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। মার্ক্‌স্ ও লেনিন উভয়েই চেয়েছিলেন, সাহিত্যিক পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে সাহিত্য রচনা করুন। পার্টি বহির্ভূত বা পার্টি বিরোধী সাহিত্যিকের প্রতি তাঁদের ছিল প্রগাঢ় অবজ্ঞা, এমন কি ঘৃণা। এই জায়গাটাতেই আইয়ুব সাহেবের প্রবল আপত্তি। সাহিত্য যদি ষোল আনা পার্টি-সাহিত্যে পরিণত হয়, যেমন হয়েছে সোভি-য়েট রাশিয়ায় বা যেমন হতে চলেছে অন্যান্য দেশের মার্কসিস্ট লেখকদের রচনা, তা হলে সমগ্র সাহিত্যই হয়ে পড়বে ফলিত সাহিত্য। বিশুদ্ধ সাহিত্য আর রচিত হবে না। সত্য, শিব ও সুন্দর এই উচ্চতম মূল্যত্রয় সাহিত্য ও সমাজ থেকে নির্বাসিত হবে। কালচারের ঘটবে অপমৃত্যু। সাম্যবাদী আর্থিক ব্যবস্থা নিছক পেটপূজায় পরিণত হবে। যে সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দর এই চরম মূল্যত্রয় নিন্দিত ও অন্তর্হিত, সে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু তোড়জোড় করে একটা "বিপ্লব"ই বা ঘটাতে হবে কেন, তারও কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতএব আইয়ুব সাহেব আহ্বান জানিয়েছেন, সাহিত্যিকরা মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বিশুদ্ধ সাহিত্যের ও সত্য-শিব-সুন্দর মার্কা উচ্চতম মূল্যত্রয়ের সাধনা করুন। তাহলে "বিপ্লব" সার্থক হবে, সোশ্যালিস্ট সমাজ আর পেট-পূজায় পর্যবসিত হবে না, সেখানে সভ্য মানুষের উপযুক্ত বাসস্থান রচিত হবে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, আইয়ুব সাহেবের যুক্তিমৃগয়ার আসল শিকার সোভিয়েট রাশিয়া, যদিও সোভিয়েট রাশিয়ার নামগন্ধ পর্যন্ত তিনি কোথাও করেননি। কি হবে বিপ্লব করে যদি তার ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার মতো একটা শিশ্নোদর পরায়ণ সমাজই প্রতিষ্ঠিত হয়। কালচার কোথায় সোভিয়েট সমাজে? সোভিয়েট সমাজে কাব্য, উপন্যাস, নাটক, শিল্প ও সঙ্গীত, সবই মোটা ধরনের। উচ্চতম শিল্পাদর্শ সোভিয়েট রাশিয়ায় পরিত্যক্ত হয়েছে। সুতরাং সেখানে সভ্যতার অধোগতি হয়েছে। ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে যদি মার্ক্সিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অনুরূপ সমাজ স্থাপিত হয়, তাহলেও ঠিক ওই ভাবেই কালচারের ও সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটবে। অতএব বিপ্লব কিসের জন্য?

বামপন্থী শিবিরে এসে আইয়ুব সাহেব লাল জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু আমরা সবাই জানি আজকের দিনে লাল জুজুর আতঙ্ক সৃষ্টি করা দক্ষিণপন্থী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেরই একটা চাল। আইয়ুব সাহেব অবশ্য অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় কালচার ও শিল্প অধঃপাতে গেছে। তা করুন। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছা করে, এর কি কোনো প্রমাণ আছে? কথাটাকে কি আমরা আইয়ুব সাহেবের মতো "সহৃদয়" ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির আপ্তবাক্য বলেই গ্রহণ করব? কই কোনো প্রমাণই তো আইয়ুব সাহেব দেননি। এমনকি ব্যাপারটা সম্বন্ধে যে আরেকটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত থাকতে পারে এরূপ সন্দেহ পর্যন্ত তাঁর মনে উদিত হয়নি। মার্ক্সিস্ট সাহিত্য = ফলিত সাহিত্য = অসভ্য, অশিব ও অসুন্দর সাহিত্য, এই ইকোয়েশুনটা কাগজকলমে লিখে ফেললেই কি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে? বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মানসিক গোঁড়ামিটাকেই কি আইয়ুব সাহেব শিল্প, সাহিত্য ও কালচারের মূল্যবিচারের চরম মাপকাঠি হিসাবে আমাদের দিয়ে গ্রহণ করাতে চান?

অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জবাব দিচ্ছি, আইয়ুব সাহেবের অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। সোভিয়েট রাশিয়ায় সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাই হল কালচারের অভাবনীয় অভিব্যক্তি, প্রগতি ও ব্যাপ্তি। খোলা মন নিয়ে যাঁরাই সোভিয়েট রাশিয়ায় গেছেন, কমিউনিস্ট না হলেও তাঁরা মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সোভিয়েট রাশিয়ায় যেভাবে স্বীকৃত, সংরক্ষিত ও চর্চিত হচ্ছে, অন্য কোনো দেশে তার তুলনা মেলে না। থিয়েটার, অপেরা, ফিল্ম স্টুডিও, মিউজিক হল, নৃত্যশালা, মিউজিয়ম ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের

প্রত্যেক ভূখণ্ডে এমন দ্রুত প্রসারলাভ করেছে যে শুধু সংখ্যাবৈজ্ঞানিক বিচারেও তাতে সত্যই চমক লাগে। সংবাদপত্রের প্রচলন, সাহিত্যিক রচনার প্রকাশ, ইত্যাদি যারই হিসাব পরীক্ষা করা যায়, দেখা যাবে, প্রগতি ও প্রসারই সোভিয়েট সভ্যতার মূল কথা। মধ্য এশিয়ার যেসব দেশের জনসাধারণ জারের আমলে অজ্ঞানের ও কুসংস্কারের পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল, মোল্লারা যেখানে ইস্লামীয় সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রচারের দ্বারা অকথ্য সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করতো, আজ সেখানকার স্বাধীন জনসাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অনুশীলনে কতদূর অগ্রসর ও কর্মতৎপর তার সাক্ষ্য বহু ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজকের লেখায় মেলে। এ সমস্ত তো কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো, পুঁজিতন্ত্রের অবসানের ফলে, নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলেই এই সব সম্ভব হয়েছে।

চারিত্র্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, ব্যক্তিচৈতন্যের ব্যাপ্তি, গভীরতা ও বস্তুজগতের উপর নেতৃত্ব, আত্মিক আনন্দানুভূতি, ইত্যাদি যে কোনো তথাকথিত অজড়বাদী মাপকাঠি দিয়ে আইয়ুব সাহেব সোভিয়েট দেশের সোশ্যালিস্ট সভ্যতার বিচার করুন, তিনি দেখতে পাবেন, ঠিক এই সব আধ্যাত্মিক মূল্যগুলিই সোভিয়েট সমাজে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং এটাই সেই সমাজের সব চেয়ে গৌরবের কথা। আইয়ুব সাহেবের মতো তীক্ষ্নধী ব্যক্তি যখন ইহসর্বস্বতার ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে কাল্পনিক একটা পাঁচিল খাড়া করে প্রমাণ করেন, সোশ্যালিস্ট বা সোভিয়েট সভ্যতা শুধু পেটপূজা, তখন বাস্তবিকই দুঃখ হয়। এটা কি আদৌ সদ্‌যুক্তি হল। মানুষের আত্মা ফুলের মতো বিকশিত হয়ে যতই তার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করবে ততই কি তার রূপ, রস ও গন্ধ সামাজিক জীবনের প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে না? সোশ্যালিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম ও শেষ কথাই হলো ব্যক্তিত্বের বিকাশ। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের দ্বারা প্রকৃতির ওপর মানবচৈতন্যের পূর্ণ নেতৃত্ব,—এরই নাম সোশ্যালিজ্‌ম্‌। এই পথেই সোভিয়েট রাশিয়া এগিয়ে চলেছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ জানে এবং জেনে আতংকিত হয় যে সোভিয়েট রাশিয়ায় এটম বোমার চেয়েও একটা সাংঘাতিক অস্ত্র আছে। সেটা হল সেখানকার মুক্ত, স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল, শিক্ষিত, আনন্দময় মানব।

সোশ্যালিস্ট সমাজে যেসব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক মূল্য বিকশিত হয়, বিপ্লবের মধ্যেই থাকে তার বীজ বা অংকুর। অর্থাৎ লেনিন যে বিপ্লবী পার্টি বা নেতৃত্ব গড়তে চেয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্যই ছিল জ্ঞানচর্চা, সংগঠন ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এমন সব খাঁটি মানুষ তৈরি করা যারা ভয় পাবে না, যাদের মানসিক চৈতন্য অজ্ঞানের ও বিভ্রান্তির কুজ্ঝটিকা থেকে মুক্ত, যাদের সৃজন-শক্তি যে কোন বাধা বা সমস্যার মধ্যে দিয়ে পথ কেটে এগিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত, যাদের আধ্যাত্মিক বল শত

পরাজয়ের মধ্যেও তাদেরকে করে অপরাজিত ও অপরাজেয়। বলছি না যে এই লক্ষ্য বা আদর্শ পুরোপুরি সফল হয়েছে, কিন্তু এটাই আদর্শ এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থও হয়নি এটা। সুতরাং আইয়ুব সাহেব যখন বলেন বিপ্লবের অর্থ শুধুই একটা আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা যার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই, তখন একথার কোনো মানে খুঁজে পাই না।

বিপ্লবকে সফল করে তোলার জন্য একটা সংকীর্ণ ফলিত সাহিত্যের প্রয়োজন মেনে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সভ্যতার বিকাশের জন্য ও উচ্চতম সাংস্কৃতিক মূল্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রয়োজন, মার্ক্সিস্ট সাহিত্য সম্বন্ধে আইয়ুব সাহেবের এই আধা-স্বীকৃতি সম্পূর্ণ অস্বীকৃতিরই সামিল। আইয়ুব সাহেবের মূলগত ভ্রান্তি হল বিপ্লবকে শুধু আর্থিক ব্যবস্থা চালু করার মেকানিজ্‌ম্‌ হিসাবে কল্পনা করা। কাজেই বিপ্লবী সাহিত্যকে বা ফলিত সাহিত্যকে তিনি মার্ক্সিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর একটা তালিকা হিসাবে দেখছেন। এই দেখাটা সম্পূর্ণ ভুল দেখা। মার্ক্সিস্ট লেখক যে সাহিত্য রচনা করেন বা করতে চান, বিপ্লবের আগেই হোক বা পরেই হোক, সেটা আদৌ ফলিত সাহিত্য নয়। সেটা শুধুই সাহিত্য, শিল্পধর্মী ও প্রগতিশীল। পোস্টার, হ্যাণ্ডবিল, প্রচার পুস্তিকা, সংবাদ-পত্র ইত্যাদিকে আইয়ুব সাহেব ফলিত সাহিত্য বলতে চান তো বলুন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। এই ধরনের ফলিত সাহিত্য দক্ষিণপন্থী, প্রতিবিপ্লবী শিবির থেকেও যথেষ্ট প্রকাশিত হয়, কিন্তু সে বিষয়ে আইয়ুব সাহেব নীরব। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ফলিত সাহিত্য বলতে আইয়ুব সাহেব মার্ক্সিস্ট লেখকের লেখা কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদিরই উল্লেখ করছেন। তাই আমার জবাব হচ্ছে, এগুলি আদৌ ফলিত সাহিত্য নয়, শুধুই সাহিত্য।

মার্ক্সিস্ট পার্টির নেতৃত্ব লেখককে বলে, দেখছো না বুর্জোয়া সাহিত্য অধঃপাতে গেছে, বুর্জোয়া সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক সম্পর্কের নগ্ন ও ঘৃণিত রূপ পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের যুগে ক্রমশই প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তাই এখন বস্তুজগতের দিকে চোখ পড়লেই বুর্জোয়া সাহিত্যিকের পক্ষে মুশকিল। তাহলেই শ্রেণী সংগ্রামের চেহারাটি সাহিত্যে এসে পড়বে এবং বুর্জোয়া সাহিত্যকে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে সরাসরি ফাশিস্ট প্রচারবাদী সাহিত্যই রচনা করতে হবে। তাই বুর্জোয়া সাহিত্যিক বাস্তব সম্পর্ককে কল্পনা করেন abstract অর্থাৎ বস্তুবিশ্লিষ্টরূপে, মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়ায় আইডিয়ার সহিত আইডিয়ার সম্পর্ক। এই ধরনের রূপান্তর পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের একটা বিশেষত্ব। শ্রেণী সংগ্রামটা হয়ে দাঁড়ায় সত্য, শিব, সুন্দর ইত্যাদি চরম মূল্যের সহিত বিরুদ্ধ মূল্যের সংগ্রাম। সত্য, শিব, ও সুন্দরের জন্য লড়াই করেন বুর্জোয়া সাহিত্যিক বুর্জোয়া শিবিরে থেকেই—যেমন ট্রুম্যান ও ভ্যাণ্ডেনবার্গ মার্শাল প্ল্যান চালু করতে চান

গণতন্ত্র, ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবমুক্তি, বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য। অর্থাৎ বুর্জোয়া লেখকের রচিত ডেকাডেন্ট যুগের তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্যটা আদৌ সাহিত্য নয়, সেটা দক্ষিণপন্থী শিবিরের প্রচারবাদী সাহিত্য বা সাহিত্যের বিকৃতি। সেই সাহিত্য সাধারণ মানবের ব্যক্তিচৈতন্যকে হয় একটা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রত্যয়ের দ্বারা বিভ্রান্ত ক'রে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, আর নয়তো বামপন্থী শিবিরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে সম্পূর্ণ প্রতিবিপ্লবী ক'রে তোলে। সত্য-শিব-সুন্দর-মার্কা বিশুদ্ধ সাহিত্য দক্ষিণপন্থী শিবিরের একটা হাতিয়ার। বামপন্থী আইয়ুব সাহেবের কাছ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদই আমরা আশা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রতিবিপ্লবী ও ডেকাডেন্ট বিশুদ্ধ সাহিত্যের পতাকা উড়িয়ে তিনি সাহিত্যিককে মার্কসিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সদম্ভে বিদ্রোহ করতে বলছেন।

বামপন্থী লেখকের পক্ষে প্রথম দিকে দক্ষিণপন্থী সাহিত্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠা কঠিন। তাই পার্টি নেতৃত্ব তাকে বলে, তুমি পার্টির ভেতরে এসো, তোমার একটা world outlook বা সামগ্রিক দৃষ্টি জন্মানো দরকার, বৈপ্লবিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণের দ্বারা ও মার্ক্সিস্ট শিক্ষার দ্বারা এই দৃষ্টিটা তুমি লাভ করবে; তোমার ব্যক্তিচৈতন্য এখন শূন্যগর্ভ, পার্টির ভেতরে এলে তোমাব ব্যক্তিচৈতন্য সম্পদশীল হবে এবং সার্থক সৃষ্টির ভেতর দিয়ে তোমার ব্যক্তিত্ব সংস্কৃতির ও সমাজের উপর ছাপ রেখে যাবে; তা না হলে আজকের দিনে দক্ষিণপন্থী সাহিত্যের আক্রমণ তুমি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং নূতন সাহিত্য সৃষ্টির পথও খুঁজে পাবে না।

এই পথটা লেখককেই খুঁজে বের করতে হয়। মার্ক্সবাদ শুধু লেখককে সচেতন করে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে। বহু পেটি বুর্জোয়া বামপন্থী লেখক নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হলেও বুর্জোয়া ব্যক্তিচৈতন্যের খোলস ভেদ করে বের হয়ে আসতে পারেন না। Abstract relation বা বস্তুবিশ্লিষ্ট আইডিয়াল সম্পর্ক, absolute value বা চরম মূল্য, form বা আঙ্গিকের মধ্যেই শিল্পের আসল সত্তার কল্পনা,—এই সব বিভ্রান্তি তাঁদের দূর হয় না বলেই তাঁরা পার্টির বিরুদ্ধে প্রথমে বিক্ষুব্ধ ও পরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁরা ও যাঁরা সরাসরি দক্ষিণপন্থী সাহিত্যিক উভয়েই হয়ে ওঠেন শ্রমিকবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল কুসাহিত্যিক। তাই লেনিনকে বলতে হয়েছিল, Down with non-party writers! Down with literary supermen! আইয়ুব সাহেব এই উক্তিকে কালচারের বিরুদ্ধে, সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টির বিরুদ্ধে অভিযান বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? আমরা তো জানি, সাহিত্যকে ও সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্যই লেনিন এই আওয়াজ তুলেছিলেন।

বামপন্থী সাহিত্যকে পার্টির নির্দেশ মতো আঙ্গিকের দিকে নজর না দিয়ে যেন তেন প্রকারেণ দৈনন্দিন সংগ্রামের কনটেন্ট ঢুকিয়ে সাহিত্য রচনা করতে হয়, এই রকম একটা ভয় আইয়ুব সাহেবের মনে বোধ হয় আছে। তা যদি হয়, প্রশ্নটিকে

পরিষ্কার করে উত্থাপিত করা উচিত ছিল। ফর্ম্‌ ও কন্‌টেন্টের ঝগড়া মার্কসিস্ট মহলেও চলেছে। সে সম্বন্ধে আইয়ুব সাহেবের বক্তব্য কি, শুনতে পেলে ভাল হোত। শুধু ফর্মের ভেতর দিয়েই কি সত্য-শিব-সুন্দর নিজেকে প্রকাশ করে? কথাটা বিশ্বাস কবি কেমন করে? সত্য-শিব-সুন্দরের একটা আইডিয়াল ফর্ম্‌ আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের সত্তায় নিহিত রয়েছে—একথা যদি সত্য হয়, তাহলে জানতে ইচ্ছা হয়, বেচারী মার্ক্‌স্‌বাদী সাহিত্য সাধনা করলেই ঈশ্বর তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে পড়বেন কেন? ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহলেই কি প্রমাণ হয়, তিনি দক্ষিণপন্থীদের শিবিরে?

সে যাই হোক পার্টি নেতৃত্ব লেখককে আঙ্গিক, টেক্‌নিক্‌, craftsmanship, এসব কলাকৌশল অবজ্ঞা করতে বলে না। একথাও বলে না যে শুধু-প্রচারবাদী সাহিত্য রচনা কর। বিপ্লবের হাতিয়ার রূপে সাহিত্য কাজ করবে মানবচৈতন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার জন্য সাহিত্যকে হতে হবে শিল্পধর্মী ও বাস্তববাদী। কালচারের প্রসার, ব্যক্তিচৈতন্যের বিকাশ, চারিত্র্যের ঐশ্বর্যসাধন, মানবাত্মার স্বাধিকার-লাভ, এই সবই বিপ্লবী তথা সোশ্যালিস্ট সাহিত্যের উদ্দেশ্য। তাই এটা ফলিত সাহিত্য নয়, সত্যকার সাহিত্য বা শুধুই সাহিত্য। একদিক থেকে বলা যেতে পারে, এর একটা উপকরণ মূল্য আছে, যথা, এটা বিপ্লবকে এগিয়ে দেয় বা গতিশীল সোশ্যালিস্ট সমাজকে পরের ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। অন্যদিক থেকে দেখা যায়, একটা বিশেষ স্তরে বা সময়ে ওই সাহিত্যের মধ্যেই সাংস্কৃতিক মূল্য পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং ওর আছে চরম মূল্য। চরম মূল্য ও উপকরণ মূল্যের বিভেদ কেন সৃষ্টি করছেন আইয়ুব সাহেব? বস্তুজগতে তো এরূপ কোন বিভেদই নেই। চরম মূল্য ও উপকরণ মূল্য একই মূল্যের এপিঠ এবং ওপিঠ।

সমসাময়িক তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের চরম মূল্য বা উপকরণ মূল্য, কোনো মূল্যই নেই। ওটা হলো হয় পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভ্রান্তিপ্রসূত একটা ধারণা, নয়তো বিপ্লবকে ও জনসাধারণের চৈতন্যকে আঘাত করবার জন্যে দক্ষিণপন্থীদের একটা হাতিয়ার। ওর কোনো মূল্য থাকতেই পারে না।

মার্ক্‌সিস্টরা চরম মূল্য স্বীকার করে না, আইয়ুব সাহেবের এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলব, চরম মূল্যের অর্থ যদি অনড়, অচল, শাশ্বত মূল্য হয়, সেরূপ কোনো মূল্য নেই বলেই তাকে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। সত্য, শিব ও সুন্দর যদি বিশুদ্ধ abstraction হয়, তাকে স্বীকার করাও যা, অস্বীকার করাও তা। অর্থাৎ সেটা হবে সত্যের মুখোস এবং সেই মুখোস পরে যে কোনো অসত্য যষ্ঠি সঞ্চালন করে আমাদের বলতে পারে—আমিই একমাত্র সত্য, আমাকে ভজনা কর। ইতিহাসে এরূপ ব্যাপার বহুবার ঘটেছে। ধরুন স্বীকারই করলাম সত্যকে। কিন্তু সত্যে পৌছবো কি করে। আইয়ুব সাহেব বিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন না, তাঁর বিশ্বাস, বিজ্ঞানকে বর্জন করে direct experience বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার

দ্বারা সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কার্যত এটা হয়ে পড়ে নিছক গুরুবাদী দর্শন এবং এই গুরুবাদের দ্বারা সত্যের অতীত আবর্জনাকে মানুষ আঁকড়ে থাকে। মার্ক্সিস্টরা মনে করে, বিজ্ঞানের ও কর্মের দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হয় এবং এক সত্য থেকে অপর সত্যে মানুষ অগ্রসর হয়। চরম সত্য কোনটা এবং কোথায়? আবার ধরুন শিবকে বা মঙ্গলকে স্বীকার করলাম। মার্ক্সিস্টরা চায়, বিশ্বশান্তি ও শ্রেণীহীন সমাজ যেখানে মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে কোনো বিরোধ থাকবে না। কিন্তু আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে এবং ঔপনিবেশিক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পৃথিবীকে রক্তের বন্যায় ডোবাতে চায়। সুতরাং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রাম এ দুটোই মঙ্গলের পথ। শান্তিকে যদি চরম ও শাশ্বত মঙ্গল বলে ধরে নিই, তাহলে কার্যত শোষণ ও যুদ্ধকেই সমর্থন করা হবে। সুন্দর সম্বন্ধেও ওই একই কথা। সুররিয়ালিস্ট কর্মের সৌন্দর্যকে চরম সৌন্দর্য বলে যদি মেনে নিই তাহলে এই সংগ্রামশীল ও ব্যাপক গণচেতনার যুগে কোনো নূতন কাব্যই রচিত হবে না, সংস্কৃতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ নূতন সমাজ স্থাপিত করার প্রেরণা পাবে না। তাহলে কার্যত নূতন কালচারের অভাবে সৌন্দর্য অপমানিত হবে, সামাজিক জীবনে সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠাই হবে না। চিরস্থায়ী চরম মূল্য কোথায়?

আইয়ুব সাহেবের বক্তব্য মেনে নিতে না পারলেও, এটা ভেবে দেখা দরকার, কেন তাঁর মতো সাহিত্যরসিক মার্ক্সিস্ট সাহিত্যকে গ্রহণ করতে পারেননি। বহু মার্ক্সিস্ট সাহিত্যিকের একাগ্র শিল্পসাধনার অভাব আছে। অনেকেই শস্তায় কিস্তিমাত করতে চান। টেক্‌নিক্ ও কলাকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা অনেকেই করেন না। বস্তু জগত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও প্রগতিশীল অভিজ্ঞতাও অনেকের নেই। অপরের চৈতন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁরা অনেকেই অর্জন করেননি। সুতরাং আইয়ুব সাহেবের প্রবন্ধটিকে একটা হুশিয়ারি হিসাবেও নিতে হবে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

পুস্তক পরিচয়

CONGRESS AND LABOUR MOVEMENT IN INDIA—P. P. Lakshman (with a Foreword by Shankarrao Deo). Economic & Political Research Department, A. I. C. C. Rs 2/8/-.

মুখবন্ধে শ্রীশঙ্কররাও দেও লিখেছেন, কংগ্রেস যে পুঁজিপতিদের স্বার্থে-পরিচালিত নয় সেটা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যেই শ্রীপি, পি, লক্ষ্মণের বই প্রকাশিত হয়েছে।

১৯২০ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৭ সালে 'জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর আবির্ভাব পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করে লেখক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে কংগ্রেস বস্তুত শ্রমিকদের স্বার্থেই পরিচালিত। অবশ্য এ কথাও লেখক বলেছেন (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) যে কেবল শ্রমিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে কোন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার মতই ক্ষতিকর। তাই কংগ্রেস কৃষক-শ্রমিক-মালিক ইত্যাদি সকলের স্বার্থের সমন্বয়ের আদর্শই গ্রহণ করেছে। এই সমন্বয়ের আদর্শই নাকি ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। ফ্যাসিবাদী দর্শনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা এই সমন্বয়ের দর্শনে কংগ্রেসের মৌলিকত্ব স্বীকার করবেন না নিশ্চয়ই। তাছাড়া, বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থের সমন্বয়ই যদি কংগ্রেসের আদর্শ, তবে আবার "কিসান-মজদুর রাজ" কেন? অথচ শঙ্কররাও দেওর মুখবন্ধে এবং লেখকের শেষ অধ্যায়ে এটা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে কৃষক-শ্রমিকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য।

কংগ্রেস বনাম মালিক সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে (পৃঃ ৪২) লেখক বলেছেন, ভারতের মালিকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ইতিপূর্বে কংগ্রেস থেকে কেবল দূরে সরে থাকেনি, কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছে; কিন্তু যুদ্ধপরবর্তীকালে তারা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকেছে। এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার সম্ভাবনা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মালিকশ্রেণী কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছে। কংগ্রেসের প্রচারে ইদানীং স্বাধীনতার তাৎপর্য যেভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেটা রাজনৈতিক দর্শনে প্রচলিত নয়। যথা, স্বাধীন ভারতে ধর্মঘট হওয়া অসঙ্গত কিংবা স্বাধীন ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়ে বা পুলিশের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ধর্মঘটের সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতার সম্পর্ক আছে কি নেই সেটা আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। আর ব্যক্তি-স্বাধীনতা তো স্বাধীন দেশেই সম্ভব। যাই হোক, শ্রীপি, পি, লক্ষ্মণের মতে,

স্বাধীনতারই যাদুমন্ত্রে ভারতের মালিকশ্রেণী কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছে। কিসান-মজদুর-প্রজা রাজ প্রতিষ্ঠিত করাই যার উদ্দেশ্য স্বাধীন ভারতেই বা মালিকশ্রেণী কেন তার শক্তিবৃদ্ধি করবে সেটা বুঝিয়ে বলা লেখকের উচিত ছিল।

১৯২৯ সালের ট্রেড্ 'ডিস্‌পিউট্‌স্ অ্যাক্ট্'-এর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা ব্যাখ্যা করে গ্রন্থকার বলেছেন, এই আইন শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক হরতাল এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করে একদিকে শ্রমিক আন্দোলন এবং অপর দিকে শ্রমিকের ঐক্য বিপন্ন করে তুলেছিল। ঠিক তার পরের পৃষ্ঠায় বোম্বের 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্‌স্ বিল' (১৯৪৬) এবং ১৯৪৭এ রচিত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্‌পিউট্‌স্ অ্যাক্ট্'-এর সমর্থনে বলছেন, এই আইনের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, সহজে বিরোধের মীমাংসা হবে, ঘন ঘন ধর্মঘটের আতঙ্ক থেকে মালিকশ্রেণী রেহাই পাবে। ১৯২৯ এবং ১৯৪৭ এক কথা নয়; তাই বোধহয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রমিক-মালিক সমস্যা বিচার করেছে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের প্রচার বিভাগ।

লেখকের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা খুব সুস্পষ্ট হলেও অভিযোগটা খুব প্রাঞ্জল নয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে কমিউনিস্ট আধিপত্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, সততা কিংবা কোন নীতির বালাই না থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে (পৃঃ ৩৫)। কমিউনিস্টদের আওতায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ক্রমশই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে (পৃঃ ১১)। ১৯২৯এ কমিউনিস্টরা স্থির করেছিল যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দখল করতে না পারলে ঐ প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেবে (পৃঃ ২২)। ১৯৩৭এর পর কংগ্রেস গভর্নমেণ্টকে বিব্রত করবার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা যেখানে সেখানে অকারণে ধর্মঘট সুরু করল (পৃঃ ৩৩)।

কংগ্রেস কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পরিত্যাগ করবার কারণ দেখাতে গিয়ে লেখক বলছেন, ১৯৪২ সালে যারা দেশের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সহযোগিতা অসম্ভব। কিন্তু যারা কেবল ১৯৪২এই নয় বরাবর শাসন, শোষণ এবং নিপীড়নে সাম্রাজ্যবাদীর প্রধান অস্ত্র এবং সহায়—সেই জমিদার, আমলা এবং পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস কেন সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হল, সে প্রশ্ন লেখক তোলেননি। যাই হোক, লেখকের মতে শ্রমিকের স্বার্থে 'জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর মত একটা "জাতীয়" এবং "গণতান্ত্রিক" প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। একথা সত্যি হলে, এ প্রয়োজন বরাবরই আছে। আজকে নতুন করে এর প্রয়োজনীয়তা কেন, সেটা বিচার করা হয়নি। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটি কি অর্থে "জাতীয়" এবং কোন মূলনীতির দরুণ বিশেষ করে গণতান্ত্রিক, সেটা ভাল করে বোঝানো উচিত ছিল।

এন, এম, জোশি 'জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'কে কংগ্রেসের একটা অংশবিশেষ বলে অভিহিত করায় লেখক তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন যে এ প্রতিষ্ঠানের শাসনতন্ত্রে কোথাও লেখা নেই যে এটা কোন রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠানের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিছক এব উদ্দেশ্যের সঙ্গে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের মিল আছে বলেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নির্দেশ দিয়েছেন যে কংগ্রেস কর্মীরা যে সব ইউনিয়ন গড়ছে বা গড়বে সেই সব প্রতিষ্ঠানকে 'জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

শ্রমিক সম্বন্ধে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্দেশ করতে গিয়ে লেখক বলছেন, কৃষক, শ্রমিক এবং জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করে সত্যিকারের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। তবে ভারতের এই সমাজতন্ত্র সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের মত আমলাতান্ত্রিক নিষ্পেষণে গুঁড়িয়ে যাবে না। রুশ আমলাদের দৌরাত্ম্যে ওদেশের সমাজতন্ত্রই বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তারপরই অবশ্য লেখক বলছেন যে ওদেশ সমাজতন্ত্রেই আটকা পড়েছে, সাম্যবাদের দিকে এগোতে পারছে না। ভারতবর্ষে তা হবে না; এখানে আমরা একেবারে সাম্যবাদের স্তরে গিয়ে পৌছাতে পারব।

সমাজতন্ত্রে পৌছাবার পাকা সড়কও কংগ্রেস তৈরি করে দিয়েছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে গণভোটাধিকার দাবী করে কংগ্রেস সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে উপরোক্ত সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে দিয়েছে ("By insisting on adult franchise as the basis of political democracy, it has made possible the achievement of social democracy by peaceful and democratic methods.")। অন্য দেশের ইতিহাস যাই বলুক, কংগ্রেস যখন সকলের জন্য ভোটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে তখন এদেশে কৃষক-শ্রমিকের রাজ্য অনিবার্য! আপাতত ব্যাপক ছাঁটাই, বিনিয়ন্ত্রণ ও মূল্যবৃদ্ধি, ইংরেজের সৃষ্ট আমলা আর পুলিশের বিশেষ ক্ষমতা মেনে নিয়ে দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করে আমরা কিসান-মজদুর-প্রজা রাজের আগমন সহজ করে তুলি!

পরিমল ঘোষ

WORLD MONOPOLY AND PEACE—James S. Allen. Indian Edition: The Bookman. Rs. 6/8/-.

THE MENACE OF DOLLER IMPERIALISM—A. Leontiev. Peoples' Publishing House. -/12/-As.

অ্যালেনের বইটি ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে লেখা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী শক্তিগুলির আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যবাদ বড় রকমের ঘা খেয়েছিল বটে, কিন্তু মরেনি। আজ সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে সংকট আরো গুরুতর, আরো ব্যাপক। দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যে গণতন্ত্রের মুখোস পরে সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে কিছুটা বাঁচাতে পেরেছিল। আজ সেই মুখোস যথাসাধ্য বজায় রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমশ খুলে

পড়ছে। দুনিয়াজোড়া পুঁজিতন্ত্রের নেতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ স্পষ্টই মারমুখী ও ফ্যাশিস্ট। তবু তার সামরিক কায়দার মধ্যে কিছুটা নূতনত্ব ও স্বকীয়তা আছে। গণতন্ত্রের নামে ফ্যাশিস্ট-স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, জাতীয় স্বাধীনতার টিকিট লাগিয়ে, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রত্যেক দেশে মার্কিন আধিপত্য ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা, স্বাধীন বাণিজ্যচুক্তির সাহায্যে সর্বত্র মার্কিন পুঁজির একাধিপত্য স্থাপিত করা, অবাধ বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে মার্কিন বাজারে পরিণত করা, অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিকল্পনার দ্বারা প্রত্যেক তাঁবেদারী রাষ্ট্রের ওপর অর্থনৈতিক দাসত্ব চাপিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি সমরকৌশল বেশ কিছুটা মার্কিন মৌলিকতা দাবী করতে পারে।

লড়াইয়ের পূর্বে ও লড়াইয়ের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কি ক'রে বিস্তার লাভ করেছে ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের কোথাও কোথাও সাময়িক বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও সংকোচন, এমন কি বিনাশ ঘটেছে—তার তথ্যমূলক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ লেনিনিস্ট পদ্ধতিতে গ্রন্থকার করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করার দুরূহ কাজে অ্যালেন যথেষ্ট যোগ্যতার ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বাস্তব ভিত্তি হল মার্কিন একপুঁজিত্বের (মনোপলির) দ্রুত ও অসম বিস্তার, অন্যান্য দেশের তুলনায়। পুঁজিতন্ত্রের অসম বিবর্তনের তথ্যমূলক সাম্প্রতিক ইতিহাস অ্যালেনের বইটির সব চেয়ে মূল্যবান অংশ। অন্য কোনো একখানি বইয়ের নাম করতে পারা যায় না, যাতে এত তথ্য একত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। অ্যালেনের লিখনপদ্ধতি খুব প্রাঞ্জল, ভাষাও সহজবোধ্য। আজকের দিনে দুনিয়ার অর্থনীতি আর আন্তর্জাতিক রাজনীতি যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের কাছে অ্যালেনের বইটি অপরিহার্য, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

যুদ্ধের পূর্বে আন্তর্জাতিক কার্টেল চুক্তির ভেতর দিয়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ "শান্তিপূর্ণ" উপায়ে নিজের নিজের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করতো। অবশ্য "শান্তিপূর্ণ" উপায়ে তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সমাধান হয়নি, হতে পারে না। তাই বাধলো যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আবো দ্রুত অর্থনৈতিক বিস্তার ঘটেছে এবং তুলনায় ঠিক ততখানি অধোগতি ঘটেছে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের। জার্মানীতে ও জাপানে সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি ঘটেছে, যদিও সেখানে পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ ঘটেনি। সুতরাং সমরোত্তর পুঁজিতান্ত্রিক জগতে দেখতে পাচ্ছি ডলার সাম্রাজ্যবাদের অবিসংবাদী নেতৃত্ব। অবশিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গাঁটছড়া বাঁধছে "শান্তিপূর্ণ" উপায়ে, যথা আন্তর্জাতিক কার্টেল চুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচুক্তি, আন্তর্জাতিক ঋণ ও সাহায্য চুক্তি, "গণতান্ত্রিক" সরকার প্রতিষ্ঠা (জার্মানীতে ও জাপানে), ইত্যাদি।

ফলে দেখা যাচ্ছে, পুঁজিতান্ত্রিক জগতে প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র আর কোথাও নেই,

একমাত্র মার্কিন খাসমহলে ছাড়া। মহাপরাক্রান্ত জার্মান ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আজ তো বিলুপ্ত এবং সেখানকার মনোপলি পুঁজিতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবেই ডলার সাম্রাজ্যবাদের ছত্রচ্ছায়ায়। তার ওপর আন্তর্জাতিক কার্টেল চুক্তির শক্ত দাঁড়ায় পরোক্ষভাবে আক্রমণ তো চলছেই। চমৎকার নাটকীয় অভিনয় চলেছে। "গণতন্ত্রের" দোহাই দিয়ে আজ মার্কিন প্রভু জার্মান কার্টেলের ফ্যাশিস্ট কর্তাদের রাষ্ট্রীয় গদিতে বসাতে বদ্ধপরিকর। যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জার্মানির কার্টেল সংগঠন অটুট ছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংকল্প, এই কার্টেল সংগঠনটিকে বজায় রাখা ও গ্রাস করা। এই ভাবে গড়ে উঠবে, "স্বাধীন", "গণতান্ত্রিক" জার্মানরাষ্ট্রে মার্কিন আধিপত্য ও সোভিয়েটবিরোধী চক্রান্তের মার্কিন ঘাঁটি। অনুরূপ ঘটনা, কিছু হেরফের সত্ত্বেও জাপানেও ঘটেছে। জার্মানি ও জাপান কি করে ডলার সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিতে পবিণত হয়েছে, তাব অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পট অ্যালেন সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন।

ফ্রান্সে ও ইতালিতে মনোপলি পুঁজির মালিকরা, স্বীয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে ডলার-প্রভুর কাছে বিক্রয় করেছেন। দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতারা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে জাতীয় জীবনেব ওপর মার্কিন ফ্যাশিজ্‌মের আক্রমণকে সযত্নে আগলিয়ে রাখছেন জনসাধারণের দৃষ্টি ও ক্রোধ থেকে। ফ্রান্স ও ইতালি সম্বন্ধে অ্যালেন বিশেষ কোনো আলোচনা করেননি। পশ্চিম ইউরোপীয় ব্লক সম্বন্ধে ব্রিটিশ পরিকল্পনার আলোচনা অ্যালেন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এই পরিকল্পনার পেছনে আছে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা। ব্রিটেন চাচ্ছিল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে পশ্চিম ইউরোপকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত করা এবং রূঢ়্ শিল্পের ওপর স্থাপিত জার্মান ফ্যাশিস্ট কার্টেলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা। আজ অবশ্য ঘটনার স্রোত অনেক বদলেছে। রূঢ়্ শিল্প ও জার্মান ফাশিজ্‌মকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চলেছে, পশ্চিম ব্লকও সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সবই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হাত পা ছোঁড়া আর মান অভিমান এখনও চলেছে বটে কিন্তু তাঁদের বিষদাঁত আমেরিকা ভেঙে দিয়েছে। এখন ব্রিটেন স্পষ্টই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কনিষ্ঠ অংশীদার।

পুঁজিতন্ত্রের শিবিরে আজ তেমন আর আত্মকলহ নেই যাতে পৃথিবীর পুনর্বিভাগের জন্য অদূরে একটা সাম্রাজ্যবাদী মহাসমর বাধতে পারে। মনোপলি পুঁজিতন্ত্রের চরম পরিণতি আজ দেখা দিয়েছে মার্কিন পুঁজিতন্ত্রের সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক জগতের ওপর একচেটিয়া আধিপত্যের ভেতর দিয়ে। আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রযুক্ত হচ্ছে এই আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করার জন্য। কন্‌ট্রোল, ডিকন্‌ট্রোলের বিসংবাদে এই মূল সত্যটি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যে আজ আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রীয়শক্তি নিযুক্ত হচ্ছে মনোপলি পুঁজিতন্ত্রকে "নিয়ন্ত্রিত" করে শক্তিশালী করার জন্য। নাই বা থাকল মূল্যনিয়ন্ত্রণ বা রেশনিং। সেটা তো যুদ্ধের দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করে অসম্ভব

পুঁজি বাড়ানোর জন্ত প্রযুক্ত হয়েছিল। আজো প্রতি মুহূর্তে কন্‌ট্রোল চলেছে ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন রূপে। রাষ্ট্রীয়শক্তির প্রয়োগ ভিন্ন মার্কিন পুঁজিতন্ত্র এক দণ্ডও বাঁচতে পারে না। সংকট ঘনীভূত হলে কন্‌ট্রোলের আবার অধিকতর প্রত্যক্ষরূপ দেখা দেবে।

মনোপলি পুঁজিতন্ত্র আজ কেন্দ্রীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে একচ্ছত্র মার্কিন রাষ্ট্রীয় মনোপলি পুঁজিতন্ত্রে। পুঁজিতন্ত্রের আজ তাই সত্যসত্যই শেষ দশা। মার্কিন পুঁজি-পতিদের কেউ কেউ স্বপ্ন দেখছেন মার্কিন বিশ্বব্যাপী ট্রাস্ট গড়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জগতকে শাসন করার। অ্যালেন লেনিনের অনুসরণ করে দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদীদের শান্তি চুক্তি অর্থনৈতিক হোক রাজনৈতিক হোক, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সামরিক শক্তিবিন্যাসের ওপর নির্ভর করে। পুঁজিতন্ত্রের অসম বিকাশের ফলে এই শক্তি স্থায়ী হয় না, চুক্তিও ছিঁড়ে ফেলা হয়, শান্তিও হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। দেখা দেয় তীব্র সংকট ও সমরসজ্জা। কথাটা খুবই ঠিক। কিন্তু আজকের দিনে তার চেয়েও বড় কথা হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী গণপ্রতিরোধ ও গণবিপ্লব। বিপ্লবী গণশক্তির বজ্রমুষ্টি আজ মার্কিন ওয়ার্ল্ড মনোপলি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে উদ্যত। তারই ভয়ে আজ সমগ্র জগতের পুঁজিবাদীরা মার্কিন নেতৃত্বে একত্রিত হয়েছে। এটা "শান্তিপূর্ণ" আলট্রা-ইম্পিরিয়ালিজম্ নয়, একটা পরিণত বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে প্রতিবিপ্লবী শক্তির সামরিক ঐক্য। এটা মনোপলি পুঁজিতন্ত্রের চরম-সংকট, তার শেষ দশা, তার সঙ্গে গণশক্তির শেষ দ্বন্দ্বের অধ্যায়। আলট্রা-ইম্পিরিয়ালিজম্ ও ওয়ার্ল্ড ট্রাস্ট তো দূরের কথা, নিজের ঘর সামলাতেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

না, আমেরিকা শান্তি চায় না, সে চায় যুদ্ধ। ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা সমস্ত শান্তিকামী গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির উপর যার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েট রাশিয়া আর তার মিত্র নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলি। আমেরিকার সমরপ্রস্তুতিকে বাধা দেওয়ার জন্ত প্রত্যেক দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে আজ রুখে দাঁড়াতে হবে এবং তাঁবেদার জাতীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। প্রকৃত শান্তিকামীর পক্ষে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা করার এই একমাত্র পথ। মনোপলি পুঁজিতন্ত্রকে তার বিপরীত, অর্থাৎ সোশ্যালিজ্‌মে পরিণত কর, যুদ্ধের বীজাণু যার মধ্যে জন্মায় সেই সব জঞ্জালস্তূপকে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে দাও। উপসংহারে অ্যালেন এই কথাই বলেছেন, যদিও সাম্রাজ্য-বাদী ও পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ওপর তিনি একটু অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন।

অ্যালেন নয়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে 'স্টেট্ ক্যাপিটালিজম্' বলেছেন। তা বলুন, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু 'স্টেট্ ক্যাপিটালিজ্‌ম্' কিছু পরিমাণে সেখানে আছে বলেই যে সেখানকার রাষ্ট্র বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক রাষ্ট্র—একথাটা আদৌ ঠিক নয়। নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একপ্রকার সোভিয়েট

ও সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্র। সেখানে 'স্টেট্ ক্যাপিটালিজ্‌ম্' শুধু এই অর্থে আছে বলা যায় যে সেখানে ক্যাপিটালিজ্‌ম্ রাষ্ট্রীভূত গণশক্তির দ্বারা শাসিত, নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং পুঁজিবাদ সেখানে ক্রমাগত কোণঠাসা ও সংকুচিত হয়ে সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা হারিয়ে বিনাশের পথেই চলেছে। তাই সেখানে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোশ্যালিজমে পৌছানো সম্ভব। নয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে অ্যালেনের মন্তব্য একটু পুরনো হয়ে পড়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখোস তিনি খুলে দিয়েছেন বটে এবং তার বিশ্বজয়ের ক্রমবর্ধমান অভিযানের পূর্বাভাস দিয়েছেন বটে কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপটা এবং মনোপলি পুঁজিতন্ত্রের চরম সংকটের অবস্থাটাও তাঁর বইয়ে পুরো ফোটেনি। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনের জন্য এটা ঠিকমত ধরা পড়েনি। বইটা নানাদিক থেকে একটু পুরনো হয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তথাপি সমরোত্তর সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা হিসাবে বই-টি অত্যন্ত মূল্যবান এবং রাজনীতির প্রত্যেক ছাত্রের অবশ্যপাঠ্য।

লিয়েন্টিয়েভের বইটি ক্ষুদ্রাকার, মাত্র দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ডলার সাম্রাজ্যবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়ার পর গ্রন্থকার ডলার সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি আলোচনা করেছেন এবং তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে কি করে তার সংকট উদ্ভূত হচ্ছে, এই বিষয়টির অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। যুদ্ধের মধ্যে কন্‌ট্রোলের দ্বারা ও সরকারি ফরমায়েস মতো অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে ডলার কোটিপতিরা যে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করেছিলেন ও পুঁজিকে অতিস্ফীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যুদ্ধের পরে তাই বজায় রাখতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। তাই উঠলো কন্‌ট্রোল, তাই হলো ইন্‌ফ্লেশন। তারই ফলে মার্কিন জনসাধারণের ওপর গিয়ে পড়ল তাঁদের আঘাতটা। জনসাধারণের যুদ্ধকালীন সঞ্চয় উবে গিয়ে জীবনধারণের মান আরো খাটো হয়েছে। স্বদেশী বাজারের সংকোচের দরুন, সমস্যা দাঁড়াল, উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ও উদ্বৃত্ত পুঁজির। পুঁজি-তান্ত্রিক উপায়ে এই সমস্যার সমাধানের উপায় খুঁজছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তাই ট্রুম্যান নীতি, তাই মার্শাল প্ল্যান, তাই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জেনিভা ও হাভানা চুক্তি ও আরো কত কি। পুঁজিতন্ত্রের অনিবার্য গতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে মনোপলি পুঁজিতন্ত্র চরম সংকটে উপনীত হচ্ছে ধ্বংসের পথে। এই সমস্ত ব্যাপারটির মার্ক্‌সীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ লিয়ন্টিয়েভ করেছেন। লিয়ন্টিয়েভ মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে একজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত। তাঁর বর্তমান পুস্তিকাটি যেমন সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য, তেমনই যুক্তি, তথ্যসন্নিবেশ ও বিশ্লেষণের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক মনের পরিচায়ক। জগতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করতে হলে এই ছোট্ট বইটি পড়া একান্ত আবশ্যক।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

সংস্কৃতি সংবাদ

গডসের পথ

৩০শে জানুয়ারী নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে পৃথিবীর সম্মুখে আমাদের বর্তমান ইতিহাসের গভীরতম সংকটের কথাই রক্তাক্ত অক্ষরে ঘোষণা করেছে। গান্ধীজীর হত্যা আকস্মিক নয়, ব্যক্তিবিশেষের বিকৃতিমাত্র নয়, এ কথা বারে বারে স্মরণীয়। দেশের ও বিদেশের নানা চিন্তা ও কার্যের সূত্রে এদেশে ক্রমেই যে ইতরতার বেসাতি রাষ্ট্রীয় বর্বরতার অভিযানে পরিণত হয়েছে, গড্‌সে তারই এক মুখপাত্র। সেই বিশেষ নৃশংসতার সূত্র-জালে যাদের সন্ধান পাওয়া যায়, ক্ষমা মৈত্রী অহিংসার মহৎ দণ্ডে বা বিচার বিধানের সাধারণ দণ্ডে যে ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা হোক, গড্‌সের পথ তাই বলে লুপ্ত হয়ে যায় নি, যাবে না। যাবে না এ জন্যেই যে রাষ্ট্রশক্তি তা সর্বদিকে নিরুদ্ধ করতে অগ্রসর হচ্ছে না, এবং জনশক্তি তার কুটিল গতি সম্বন্ধে এখনো সচেতন নয়।

এ সত্যেরই ইঙ্গিত লাভ করা যায় ২৭শে ফেব্রুয়ারী ডিক্‌সন্ লেনের হত্যাকাণ্ড থেকে।

সে ঘটনার বিবরণ এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বঙ্গীয় শাখা ডিক্‌সন্ লেনে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীযুত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সেদিন সন্ধ্যায় "দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে" সমাগত সোভিয়েট, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, চীন, বর্মা প্রভৃতি বিদেশীয় প্রতিনিধিদের আলাপ আপ্যায়নের জন্য একটি মজ্‌লিসের আয়োজন করেছিল। বৈঠকে জমেছিলেন প্রধানত সংঘের শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞরা, তাঁদের পরিবার পরিজন শিশু পুত্র কন্যা—বিদেশী অতিথিদের দেখবার জন্য যাঁরা ছিলেন বিশেষ আগ্রহান্বিত। তারপরে যা ঘটে সে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে: অতিথিদের সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হল আততায়ী—সুপরিচিত বোমা, পিস্তল, ব্রেন্‌গান। শ্রীমান সুশীল মুখোপাধ্যায় ও ভাবমাধব ঘোষকে হত্যা ও আরও জন চারেক কর্মীকে আহত করে মিনিট দশ-পনের ধরে বিকট উল্লাস ও পৈশাচিক অট্টহাস্যের পর সে গৃহ-প্রাঙ্গণ ছেড়ে আততায়ীরা প্রস্থান করে। যথা নিয়মে—অর্থাৎ যথেষ্ট সময় ক্ষেপণ করে—পুলিশ আসে; যথা নিয়মে—অর্থাৎ উপস্থিত পুলিশ কর্মচারীদের অভ্যস্ত ঔদাসীন্য এড়িয়ে বিদেশী প্রতিনিধিরা লাট সাহেবের মিলিটারি সেক্রেটারির সঙ্গে ফোনে তক্‌রার করবার পর—ঘণ্টা চারেক পরে অতিথিদের পুলিশ পাহারায় অক্ষতদেহে বাসস্থানে প্রেরণ করা হয়; এরূপ যথানিয়মেই হাসপাতালে আহতদের

দু'জনার মৃত্যু হয় ; এবং এখন যথানিয়মে চলছে পুলিশের তদন্ত। এই নিয়ম-বাঁধা কার্যা-বলীর মধ্যে কোনো নিয়মহীন কথা এখানে বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু স্মরণ করতে পারি সুশীল মুখোপাধ্যায় (লেডি অবলা বসু তাঁর অভিভাবিকা হিসাবে যে জীবন চিত্র দিয়েছেন তাতেই তাঁর পরিচয় সুস্পষ্ট) ও ভাবমাধব ঘোষের কথা—একজনার বিধবা মাতা ও অন্য জনার নবপরিণীতা স্ত্রীর কথা, ভ্রাতা ও আত্মীয়দের কথা।

আমাদের ব্যক্তিগত বেদনা-বিক্ষোভের সঙ্গে তবু এ কথা কয়টিও মনে পড়ে—কলকাতার এক বিশিষ্ট শিল্পী-গৃহে আহূত হয় শিল্পীদের এ বৈঠক। শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মর্মান্তিক ক্ষোভে আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—এ গৃহে ভারতবর্ষের একালের প্রধানতম সঙ্গীতজ্ঞদের ও কলাবিদদের সঙ্গীতের বৈঠক বসেছে কতবার ; বর্বরতার হাতে তাই বলে কোনো মর্যাদা নেই সে গৃহের, উপস্থিত নারী-শিশুর, এমন কি, পাশের ঘরে পাঠরত বালকটিরও। যাঁদের বিরুদ্ধে এ আক্রমণ—তাঁরা অবশ্য নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের যুবক-যোদ্ধা, বর্বর প্রতিক্রিয়ার নানা রূপের সঙ্গে তাঁরা সুপরিচিত। তাঁরা হয়ত তাই প্রতিক্রিয়ার এ শ্বাপদ বৃত্তিতে বিস্মিতও হবেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁরা এসেছিলেন অতিথি। সে মর্যাদা বিনষ্ট করে আমাদের কোন মর্যাদা বৃদ্ধি হল ? তা ছাড়া যে সংঘের কর্মীরা নিহত হলেন ও আহত হলেন, সে গণনাট্য সংঘ অবশ্য কোনো দলের প্রতিষ্ঠান নয়। সত্য বটে তাদের অনেক সদস্যই শ্রমিক-শ্রেণী ও কমিউনিস্ট্ পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু এ সংঘেরও একটি সতেজ শিল্পাদর্শ আছে, একটি সবল সমাজ-বোধ আছে। আর তেমনি আছে এদেশের গত চার বৎসরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার অবিস্মরণীয় দান—যা পণ্ডিত জওহরলাল ও সরোজিনী নাইডুরও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। এবং বোমা বন্দুক পিস্তলের মুখে এ দেশের কমিউনিস্টদেরও এ পরীক্ষা তো নতুন নয়, আগেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে, হচ্ছে নিজাম-রাজ্যে, কংগ্রেস-রাজ্যে, হচ্ছে লীগ শাসনেও। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তাঁদের চল্তে হবে—এ তাঁদের অন্তত অজানা নেই।

কিন্তু কথা এই যে, এই পথের স্বরূপ দেশের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিত ও সংস্কৃতি-বান মানুষ চিনেছে কিনা। ডিক্‌দন্ লেনের হত্যা লীলা পুলিশ বা 'কর্তৃপক্ষের' থেকে যে দৃষ্টিই লাভ করুক, কলিকাতার সংবাদপত্র, অধ্যাপক, শিল্পী, সাহিত্যিক তার ক্রূরতায় ও পাশবিকতায় চমকিত হয়েছেন। শ্রীযুত অতুল গুপ্ত ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, এবং অধ্যা-পক মণ্ডলীর এ সম্বন্ধে বিবৃতি ছাড়াও শ্রীযুত শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর প্রমুখ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বিবৃতিতে সে বেদনা ও গুরুত্ব বোধের আভাস দেখছি :—

"মর্মান্তিক বেদনাহত চিত্তে আমরা বাংলাদেশের জনসাধারণের নিকট এবং বাংলার ও পৃথিবীর শিল্পী-সাধারণের নিকট আজ বলতে বাধ্য হলাম—মানুষের সাধারণ অধিকার ও শিল্পীর জন্মগত অধিকার আজ এদেশে—কলকাতা শহরের বুকের ওপর রক্তের পঙ্কে লুটিয়ে পড়েছে। গত শুক্রবার ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বৈঠকে সমাগত

দেশ-বিদেশের যুবক প্রতিনিধিদের লক্ষ্য করে যে নৃশংস আক্রমণ হয়েছিল, আমাদের কেউ কেউ তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, কেউ কেউ তার বলি। অন্তত দু'টি তরুণ প্রাণ আর আমরা ফিরে পাবনা। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এ আক্রমণ, এ হত্যা, রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ। আর বিদেশীয় অতিথির যে মর্যাদা ভারতবর্ষ চিরদিন দিতে অভ্যস্ত, তাও আজ এইভাবে নিঃশেষপ্রায়। যাঁরা শাসক, তাঁদের মর্যাদা এই ঘটনাবলীতে কতটুকু অক্ষুণ্ণ রইল জানি না, কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের মানমর্যাদা আজ অবনমিত। গড্‌সের পথই এদেশের বুকে রাজনৈতিক পথ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়। সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাত্রা থেকে শিল্প, সংস্কৃতি, সভ্যতাবোধ, ক্ষীণতম মানবতা বোধ—সমস্ত কিছুর চিতাশয্যা রচনা হচ্ছে আমাদের চোখের ওপর। এই শ্বাপদ-সংকুল পৌর-জীবনের মধ্য থেকে তবু আমরা শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও দেশের জনসাধারণ আর একবার আমাদের মহাগুরুর নাম স্মরণ করে জানাই—নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস; আজ এর বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে এদেশের মানবতার প্রতিই আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব।"

সুস্থ মানুষের কথা এবং সংস্কৃতির দুর্দিন তাঁদের চোখে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে—"ততঃ কিম্?" প্রশ্ন শুনেছিও আমরা—"যে দেশে মহাত্মাজীকে খুন করে, সে দেশে কি করব আমরা?" এ হতাশার কারণও আছে। কারণ এই, যে রাষ্ট্রনায়কদের তাঁরা এখনো শ্রদ্ধা করেন—তাঁদের অক্ষমতা, এবং তাঁদের ক্ষমতার বাড়াবাড়ি, তাঁদের ক্রমাধোগতি—এবং ক্রমিক জনস্বার্থ-বিরোধিতা—আজ এই শিক্ষিত জনসমাজকে শুধু বিভ্রান্ত করেনি, হতাশও করেছে। তাই গড্‌সের পথ যে চিরন্তন নয়—এমন কি, আসলে এ যে কাপুরুষতারই কুটিল ঔদ্ধত্যমাত্র, এ গভীরতম সত্যও তাঁরা সাহস করে উপলব্ধি করতে পারছেন না। আবার সে বিভ্রান্তির বশেই ভাবছেন গড্‌সের পথ বুঝি একটি বিশেষ চক্রান্তের পথ। বুঝতে চান না—চক্রান্তটাই বর্বরতার একমাত্র প্রকাশ নয়। অনেক পরিচিত বিকৃতির মধ্য দিয়েই বর্বরতা পরিচিত হয়ে ওঠে, গা-সওয়া হয়ে যায়; তারপর ক্রমে দানা বেঁধে ওঠে সে প্রতিক্রিয়া হিটলারী-মুসোলিনী বিকৃতি-বিলাসে। তাই গড্‌সের পথ—শুধু ডিক্‌সন্ লেনে নয়, সে পথই বিস্তৃত গলিতে গলিতে, একেবারে দিল্লী-করাচীর দরবারে দপ্তরখানায় পর্যন্ত!

এ সত্য এখনো হয়ত তত পরিষ্কার নয় আমাদের চোখে। কিন্তু পরিষ্কার হলেও আবার হতাশায় মূহ্যমান হই—"আমরা কি করব?" এর উত্তর কি আমরা জানি না—আমরা যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি আর দেখেছি—হিটলার-মুসোলিনিদেরও অনিবার্য নিয়তি?

পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা

বাঙালীর রাষ্ট্রভাষা নিয়ে পূর্ব-বাংলায় উত্তেজনা ও আন্দোলন অবশেষে মাথা তুলেছে। তর্ক, আলোচনা চলেছিল প্রথম থেকেই। পূর্ব-বাংলা পূর্ব-পাকিস্তানে পরিণত হতেই সংশয় জন্মেছিল অনেকের মনে—তাদের রাষ্ট্রভাষা কী হবে। এই

খণ্ডিত বাংলার বাঙালীরা সমস্ত পাকিস্তানে সংখ্যায় অধিক। সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বালুচী (ও ব্রাহুই), পশ্‌তু (সীমান্ত প্রদেশের) প্রভৃতি ভাষা-ভাষী জাতিরা সকলে মিলেও সংখ্যায় বাঙালীদের থেকে পাকিস্তানে অল্প। উর্দু অবশ্য এদের কারো মাতৃভাষা নয়, কিন্তু উর্দু লেখা-পড়ার ভাষা এদের "অনেকের।" কিন্তু সে লেখাপড়া জানেই বা কয়জন ? গড়ে সে 'পশ্চিম পাকিস্তানের' শত করা দশজনও নয়; পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দু জানিয়ে নেই হাজারে একজনও। কিন্তু কথা হল এই—ইংরেজি জানাও ছিল না হাজারে এক-জন, তবু তো ইংরেজি হয়েছিল এ দেশের রাষ্ট্রভাষা। কারণ, ইংরেজ ছিল এ দেশের শাসক। তেমনি, শতকরা দশজনও যদি উর্দু জানা হয় পাকিস্তানে, তারাই পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠী; অন্যেরা শাসিত-শ্রেণী। এই অত্যন্ত নিষ্করুণ ও অমোঘ যুক্তিতেই উর্দু পূর্ব ও পশ্চিম সমস্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পদ গ্রহণ করবে এই ছিল আশঙ্কা।

সে আশঙ্কা যে মোটেই অমূলক নয়, করাচীতে পাকিস্তান বিধান পরিষদে সম্প্রতি তা'ই ঘোষিত হয়েছে—পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও ইংরেজি। লিয়াকত আলী স্মরণ করিয়ে দিলেন—ইস্‌লামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা ইস্‌লামী ভাষাই হবে—আর সে ইস্‌লামী ভাষা উর্দু। পূর্ব-বাংলার মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করলেন—সাধারণ বাঙালী মুসলমান নাকি উর্দুই চায়। অন্যান্য বাঙালী মুসলমান উজীর ওমরাহ্‌রা তবু মুখব্যাদন করলেন না, মেনে নিলেন করাচীর লীগ-চালকদের সিদ্ধান্ত। এতদিন পূর্ব-বাংলার শাসক-বর্গেরও অনেকে বাংলাভাষীদের নানা রকম স্তোকবাক্য দিতে বাধ্য হয়ে-ছিলেন। কিন্তু করাচীতে তার প্রয়োজন হয়নি—সেখানে বাঙালী কই ?

পূর্ব-বাংলার মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণী করাচীর এ সিদ্ধান্ত পেয়ে ক্ষোভে ও বেদনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। যথা নিয়মে শাসকবর্গও তাঁদের উত্তেজনা প্রশমিত করছে—সভা-সমিতি বন্ধ করা হয়েছে, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা চলছে, প্রয়োজন হলে ব্যাটন-বন্দুকও আসবে; (১১ই মার্চের হরতালে তা এসেও গিয়েছে—সঃ)। অন্তত কায়দে আজম্‌ আসছেন। অবশ্য খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ জানাচ্ছেন যে, বাংলাভাষা করাচীর বিধান-পরিষদে (অর্থাৎ দপ্তরে, দরবারে বা সরকারী কাগজ-পত্রে নয়) তার প্রেসিডেণ্ট সাহেব অনুমতি দিলে এখনো বলা চলবে, যেমন বলা চলত ইংরেজ-কর্তৃত্বের আমলেও। এক কথায় পীড়নে ও প্রতারণায় বাঙালীর উষ্মাকে প্রশমিত করবার সব আয়োজনই হচ্ছে, হবে।

লিয়াকৎ আলী বা খাজা নাজিমুদ্দীনের যুক্তির হাস্যকরতা এ সম্পর্কে অবশ্য প্রমাণ করা সহজ—"ইসলামিক ভাষা" কবে থেকে হল উর্দু ? আর "ইসলামিক" ভাষাই যদি একমাত্র মানদণ্ড, তাহলেও ইংরেজি পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হল কোন সূত্রে ? যতদূর বুঝি, ইংরেজি অন্তত ইসলামের ভাষা নয়—এ ভাষা সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের ও তাদের তাঁবেদার শিক্ষিতদের, লিয়াকৎ-নাজিমুদ্দীনের। তারপর তুর্কী যদি উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে মুসলমান দেশই থাকতে পারে, ইরাক ইরান যদি ফার্সী আরবী নিয়ে রাষ্ট্র চালায়, তবে বাঙালী মুসলমান কেন উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও

রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে আর মুসলমান থাকবে না? 'পাকিস্তানী ঐক্যের' জিগীরও উঠছে। কিন্তু জোর করে ভাষা চাপিয়ে রাষ্ট্রের ঐক্য গড়া যায় না। তা গড়া সম্ভব হলে ইংরেজি ভাষার ঐক্যবন্ধনে ভারতবর্ষই অখণ্ড থাকত; পাকিস্তানের জন্মও হত না। আসলে এ ঐক্য হচ্ছে শাসকবর্গের ঐক্য—শোষণে যাদের স্বার্থ তাদের ঐক্য। তার ফলে পাকিস্তানের পূর্ব-পশ্চিমের সেরা প্রতিক্রিয়াশীলরা ও তাদের তাঁবেদাররা উর্দুর জোরে শাসনযন্ত্রকে নিজেদের কবলে একচেটিয়া করে রাখবে—যেমন রেখেছিল ইংরেজির জোরে ইংরেজ তার দেশী. দালালদের। বাংলাদেশের শতকরা নব্বইটি মানুষ এই অপরিচিত ভাষার দৌরাত্ম্যে না পারবে লেখাপড়া শিখতে, না পারবে বুঝতে রাষ্ট্রের আইন-কানুন, হুকুমনামা, তার শাসনের হিসাবপত্র। বলাবাহুল্য, শোষকশ্রেণীর উদ্দেশ্যই হল তাই—দেশের শাসন-ক্রিয়াটাকে সাধারণের পক্ষে একটা দুর্বোধ্য রহস্য করে তোলা, এবং যত ভাবে সম্ভব আড়াল রচনা করে দেশের মানুষকে এই শাসন-ক্রিয়া থেকে দূরে রাখা। উর্দু ও ইংরেজির আড়াল রচনা করে এক্ষেত্রে সে চেষ্টাই করছে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী আর তাদের দালালরা—আমলাতন্ত্র, উলেমা-মৌলবীরা, জোতদার-জমিদার ও তাদের গুণ্ডাচক্র। এজন্যই যতই এসব যুক্তির হাস্যকরতা প্রমাণিত হোক, আমরা জানি তারপরেও অধিকতর হাস্যকর ও অধিকতর ক্ষতিকর অপযুক্তি ওরকম আরও জুটবে—জুটবে তার সঙ্গে প্রাদেশিকতার অপবাদ, জুটবে 'শিশু-রাষ্ট্রের নিরাপত্তার' নামে ধূম্রজাল, এমন কি হয়ত জুটবে দু'চারটা পুলিশী-প্রণোদিত বিশৃংখলা কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানিও—যাতে আন্দোলন বানচাল হয়।

পূর্ববাংলার মুসলমান-হিন্দু জনসাধারণকেও তাই বুঝতে হবে—আসলে বাংলা-ভাষার ন্যায্য দাবী কি।—উর্দুকে বিতাড়ন নয়, বরং উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে বাংলাকে স্বীকার করা, পাকিস্তানের প্রত্যেকটি জাতির ভাষাকে ও সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পশ্‌তুকেও তেমনি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবী। বড় জোর তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের তর্জমা দপ্তর বেশ বড় হবে। কিন্তু তা না করলে কৃষককে একখানা চিঠির ঠিকানা লিখবার জন্য দৌড়তে হবে মুন্সীর কাছে, মনিঅর্ডার লেখার জন্য ছুটতে হবে কোন এলেমদারের নিকট, জমিজমার প্রশ্ন উঠলে ধর্না দিয়ে সর্বস্ব দিতে হবে উকীলের বাড়িতে, মুহুরির নিকটে; আইন পরিষদের প্রতিনিধিদের বক্তৃতা বৈঠকের এক বর্ণও বোঝা হবে অসম্ভব। এক কথায় সে থাকবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভারবাহী, অংশীদার নয়, তার দাস মাত্র।

আমরা অবশ্য বিশ্বাস করি না—মুসলমান-হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ শাসকবর্গের কথায় প্রতারিত হবে। খাজা নাজিমুদ্দীন না হোক, বাঙালী সংস্কৃতির জন্য তারা গর্বিত। কিন্তু আমরা তাদের বুঝতে বলি—এ দাবীর স্বরূপ। আসলে এ দাবী হচ্ছে জাতি হিসাবে পাকিস্তানের বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী, এবং পাকিস্তানের প্রত্যেকটি ভাষার সমান মর্যাদালাভের দাবী। আর "জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের" দাবী বলেই তা শোষকশ্রেণীর পক্ষে অগ্রাহ্য। হিসাব করলে দেখা যায়, যারা জনগণের জমির দাবী, জীবিকার দাবী, উজাড় করে 'শাসক' হয়েছে, তারাই জনতার জবানকেও অস্বীকার করে তাদের শাসক ভাষাকেই একচ্ছত্র করতে চাইছে।

এর প্রমাণই পশ্চিম বাংলাতেও দেখা যায়, তাও স্মরণীয়। কারণ যে বাংলাভাষা নাকি পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রভাষা হয়েছে তাও কাগজেপত্রেই এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃত রয়েছে; আর দিল্লীর বিধান পরিষদে তার কোনো স্বীকৃতি এখনো নেই। সে দরবারে দপ্তরে বাংলা অস্পৃশ্য।

গোপাল হালদার

পত্রিকাপ্রসঙ্গ

আধুনিক তেলেগু কথা-সাহিত্য

দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্যিক অগ্রগতি সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকদের বিশেষ কিছু জানার সুযোগ হয়নি। দক্ষিণ-ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হলেও সেখানে সাহিত্যে প্রগতির জয়যাত্রা থেমে থাকেনি। বিশেষত তেলেগু ও তামিল ভাষা এদিকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

বিখ্যাত হিন্দী মাসিক পত্রিকা 'হংস্'-এর আগস্ট সংখ্যায় আধুনিক তেলেগু কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে জি, বেঙ্কটরামাইয়ার প্রবন্ধটি এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তেলেগু হল অন্ধ্র জাতির ভাষা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অন্ধ্র-জাতীয়-জাগরণের যে বিশিষ্ট স্থান আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। শোষিত জনগণের সংগ্রামে অন্ধ্র জনতার অমর অবদান সারা ভারতের মুক্তিকামী মানুষের কাছে অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। কথাসাহিত্যে সেই বলিষ্ঠ জীবনস্পন্দনের কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে জানাটা নিশ্চয়ই আগ্রহের বিষয় হবে।

ভারতের অন্যান্য সাহিত্যের মত তেলেগুতেও সত্যকার কথা-সাহিত্য রচনার প্রেরণা এসেছে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে। তার আগে অবশ্য বহু পুরুষ ধরে গল্প-রচনার কাজ চলে এসেছে। "বাল নাগম্মা কথা", "কাম্মা কথা", "ভোজরাজু কথা", "বোব্বিলি কথা" ইত্যাদি অন্ধ্রের পুরনো সম্পদ। এইগুলি বেশির ভাগই গানের আকারে রচিত, তাল লয় যুক্ত। এ সমস্ত গীতিকথা তেলেগু ভাষায় সমগ্রভাবে "বুর্র কথলু" নামে পরিচিত এবং বর্তমানে গণনাট্য আন্দোলনের মারফতে তা গোটা ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশে, বিবাহ, পার্বন প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে বুর্র কথলু গীত হয়। "জঙ্গম" নামে এক জাতি এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ। আজকাল রাজনৈতিক দল এবং গণ-প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রচারের বাহন হিসাবে বুর্র কথা-র সাহায্য নিয়ে থাকে।

প্রাচীন তেলেগুতে গদ্য গল্পও প্রচলিত ছিল। আধুনিক বিচারের মাপকাঠিতে এ গুলিকে অবশ্য কথা-সাহিত্য বলা চলে না। সংস্কৃত কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চ-বিংশতি ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা হতে পারে। গদ্যে রচিত কথাগুলির মধ্যে 'হিতোপদেশ,' 'কাশীমজলীলু,' 'ভেট্টী-বিক্রমার্ক কথলু', 'কাশী-রামেশ্বর কথলু' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ।

আধুনিক তেলেগু কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সবার আগে স্বর্গীয় বীরেশলিঙ্গম্ পন্তলুর নাম করতে হয়। তাঁকে বলা হয়ে থাকে নবীন অন্ধ্র সাহিত্যের পিতামহ। অবশ্য বীরেশলিঙ্গম পন্তলুও সত্যিকার শিল্প-সৃষ্টির দিকে এগোতে পারেননি। তাঁর ভাষাও ছিল জটিল এবং শিল্প সৃষ্টির চেয়ে সমাজ-সংস্কারের ওপর তিনি বেশি জোর দিয়েছিলেন। তবু বলা যায় যে তিনি এদিকে অগ্রগতির পথ নির্দেশ করে গেছেন। তাঁর সব চেয়ে বড় কৃতি হল ইংরেজী আদর্শে রচিত উপন্যাস 'রাজশেখর চরিত'।

প্রকৃত গল্প-সাহিত্যের আরম্ভ হয় বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, 'তেনালী সাহিত্য সমিতি' স্থাপনের পর থেকে। সমিতির মুখপত্র 'সহিতি'তে প্রথম বহু উদীয়মান কথাশিল্পীর রচনা প্রকাশিত হয়। আধুনিক শক্তিমান লেখক দীক্ষিতুলু, বেঙ্কটচলম, নরসিংহারায় প্রভৃতির প্রথম আবির্ভাব হয় এই সময়ে।

গত ত্রিশ বৎসরে তেলেগু কথা-সাহিত্য অনেক এগিয়ে গেছে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব ছাড়াও রুশ সাহিত্য, মোপাসাঁ প্রমুখ ফরাসী সাহিত্যিক এবং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ্রের প্রভাবের ছাপ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। দক্ষিণ ভারতে হিন্দী প্রচার আন্দোলন জোরদার হওয়ায় ফলে হিন্দী গল্পেরও যথেষ্ট আদর হয়।

বর্তমানে তেলেগু ভাষায় মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিষয়ে বহু মৌলিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক গল্প উপন্যাসের নিতান্ত স্বল্পতা চোখে পড়ে। আশা করা যায় সে ত্রুটি শীগগিরই দূর হবে। সমসাময়িক কথাশিল্পীদের নাম উল্লেখ করতে গেলে সর্বপ্রথম আসে চিন্তা দীক্ষিতুলুর কথা। তেলেগু গল্পকে পুরাতন রূপ ও নিয়ম-কানুনের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে যুগোপযোগী রূপ দান করেন দীক্ষিতুলু। প্রহসন, নাটক, কবিতা, গল্প প্রভৃতি বহুদিকে তাঁর প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করলেও, প্রধানত গল্প-লেখক হিসাবেই তিনি প্রসিদ্ধ। বিষয়বস্তুকে মনোবৈজ্ঞানিক এবং জন-জীবনের নিকটবর্তী করার দিকেও তিনি মনোযোগ দিয়েছেন। ভাষা, চরিত্র-চিত্রণ, লেখনভঙ্গী ইত্যাদির দিক দিয়েও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। দীক্ষিতুলুর লেখনী আজ পঁচিশ বছর ধরে সক্রিয়। তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় গভীর সহানুভূতির একটা অন্তরঙ্গ রেশ সবগুলির ভিতরে পাওয়া যায়। তাই যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা হোক্ না কেন, তাঁর সজীবতা প্রশংসার যোগ্য। তাঁর প্রসিদ্ধ গল্পগুলি হল 'একাদশী' 'দীক্ষিতুলুর গল্প' নামে সংগ্রহ, 'গোদাবরী হাসে' এবং 'চেঁচুরাণী'।

মুড়িপারি বেঙ্কটচলম্ গত বিশ বছর ধরে সাহিত্যের সেবা করছেন। তাঁর বিদ্রোহী রচনা গোটা অন্ধ্র প্রদেশকে চঞ্চল করে তুলেছিল। তিনি বাস্তববাদী, এবং তেলেগুতে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তক বিপ্লবী লেখক। শিল্পকে গজদন্ত-মিনার থেকে তিনি নামিয়ে এনেছেন জীবনের সংগ্রাম-সঙ্কুল কঠিন মাটিতে।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হেনেছেন কঠিন আঘাত। বহুশতাব্দী প্রচলিত সংস্কার, প্রথা, অন্ধবিশ্বাস, সামাজিক শোষণ ও অত্যাচার, ধর্মের আবরণে চলে যে ভণ্ডামী আর জুলুম, বিবাহ, প্রেম ও স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রচলিত সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সব কিছুর বিরুদ্ধে চালিয়েছেন কালা পাহাড়ী অভিযান। সমাজের যে সব দুষ্ট ব্যাধিকে সবাই লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়, সেগুলিকে বেঙ্কটচলম্ নির্মমভাবে অনাবৃত করেছেন। তিনি হরিশ্চন্দ্র, প্রহ্লাদ, সাবিত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র ও প্রাচীন গাথাকে নতুন ভাবে গ'ড়ে তুলে জনতার সামনে উপস্থিত করেন। ফলে প্রাচীন পন্থীদের অসন্তোষের পাত্র হ'তে হয়। 'পাপ',' 'প্রান্তর', 'প্রেম-লেখলু', 'বিবাহ', 'দৈবমিচ্যান ভার্যা' ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা।

মুণিমাণিক্যম নরসিংহারাও নবীন তেলেগু সাহিত্যের প্রথম যুগের অন্যতম প্রধান লেখক। 'কান্তম্' নামে একটি নায়িকাকে কেন্দ্র করে একই পরিবেশে দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে মধুর পরিহাসময় বিশটি গল্প লেখেন। অন্ধ্র সাহিত্য রসিকদের কাছে 'কান্তম্', উর্বশী, শকুন্তলা ইত্যাদির মতই সুপরিচিতা নায়িকা। নরসিংহারাওয়ের প্রধান কথাবস্তু পারিবারিক জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা। ভাষাও তেমনি আটপৌরে সতেজ ও সরল।

করুণকুমার সাহিত্যক্ষেত্রে পীড়িত, শোষিত, কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। তাদের আশা আকাঙ্খা, অভাব, দুঃখ, বেদনাকে সাহিত্যে রূপায়িত করে তুলেছেন। জন-সাধারণের বোঝার পক্ষে কঠিন বিষয় নিয়ে লেখার তিনি ঘোর বিরোধী। তাঁর সমস্ত গল্পের পটভূমি গ্রামের দলিত কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন। একমুঠো অন্নের জন্য ব্যাকুল ভিখারী, খাজনা ও ঋণের অসহনীয় ভাবে অবসন্ন কৃষক, নিষ্ঠুর সুদখোর মহাজনের অত্যাচারে আকুল গরীব তাঁর নায়ক নায়িকা। অন্ধ্র প্রদেশের জনগণের চালচলন, আচার, হাসি কান্না, ভাব ও ভাষার সঙ্গে করুণকুমারের অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রতিটি গল্পে প্রতিফলিত। কেবল আর্তনাদ নয়, বিদ্রোহের সুর সেখানে সুস্পষ্ট। "কোওচেপ্প্‌ুল", ও "বেক্কয়া" করুণকুমারের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

বোড্ডু বাপিরাপু জীবনের পীড়া ও বেদনার্ত দিকগুলিকে অবলম্বন ক'রে অনেক গল্প লিখেছেন।

বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ মহাকবি নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ও অর্বাচীন তেলেগু সাহিত্যের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ এবং উপন্যাস রচয়িতা হিসাবেই বেশি পরিচিত। 'একবীরা', 'চেলিয়লিকট্টা', 'বেয়িপড্যালু' নামে তাঁর কয়েকটি উপন্যাস এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শক্তিমান লেখক ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী সত্যনারায়ণ হলেন নবীনতার বিরোধী ও প্রাচীনতার উপাসক। ফলে প্রগতি আন্দোলনে তাঁর স্থান খুঁজে পাননি। অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন।

অডিবী বাপিরাজী ভাবুকতা ও কবিত্বপূর্ণ গল্প-লেখনভঙ্গীর জন্য বিখ্যাত। তাঁর উপরে বৌদ্ধকালীন সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট।

গোপীচন্দ তেলেগুর তরুণ কথাশিল্পী, মাত্র ছয় সাত বছর হল সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করেছেন। ভাষা, ভাব, ভঙ্গী, রূপ, বস্তু সব দিক দিয়ে মৌলিক, প্রকৃত অর্থে প্রগতিবাদী। গোপীচন্দ মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচারের চেষ্টা করেন। তাঁর লেখার মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ছবি ফুটে উঠেছে। সংঘবদ্ধ সামগ্রিক শক্তির দ্বারা জয়যুক্ত হবে যে বিপ্লব, তার প্রাণবন্ত আভাসে গোপী-চন্দের গল্পগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সমাজের নীচের তলার মানুষগুলির জীবন নতুন আলোকে চিত্রিত করার কাজে তিনি আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর 'ভার্যল্লোনেউন্দি', 'দেশমেময়েট্টু', 'আডমলয়ালম', 'গীতাপারয়ণ' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যান্য প্রগতিশীল তরুণ কবি ও কথাশিল্পীদের ভেতর মুদ্দুকৃষ্ণ কুটুম্বরাও, শ্রীপাদ সুব্রহ্মণ্যমশাস্ত্রী, কৃষ্ণরাও ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। নবাগতদের ভেতর কুমার রাঘবশাস্ত্রী, কবি কোণ্ডল বেঙ্কটরাও, মল্লাদি রামকৃষ্ণশাস্ত্রী, অবধানী, ধনীকোণ্ড হনুমন্তরাও প্রভৃতির অনেকগুলি গল্পসংগ্রহ বার হয়েছে। সর্বশ্রী চক্রপাণি এবং বেলুরি শিবরামশাস্ত্রী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির তেলেগু অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কথা-সাহিত্যের দরবারে লেখিকাদের অত্যন্ত কম সংখ্যা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অবশ্য কয়েকজন এদিকে অগ্রণী হয়েছেন।

গত তিন চার বছরের ভেতর তেলেগু কথা-সাহিত্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। নতুন নতুন গল্প লেখকদের আবির্ভাব হচ্ছে। দৈনিক ও মাসিক পত্রের পৃষ্ঠাও গল্প সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

অন্ধ্রের বিপ্লবী জনতার মুক্তি অভিযানকে ফুটিয়ে তুলে তাকে দিক্-নির্ণয়ে সাহায্য করতে প্রগতিশীল তেলেগু সাহিত্য সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে আসবে—এ আশা আজ দৃঢ়তার সঙ্গেই করা যায়।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

পাঠকগোষ্ঠী

['পরিচয়'-এর 'পাঠক-গোষ্ঠী' ও 'আলোচনা' বিভাগ দু'টিতে প্রকাশার্থ আমরা যে-সব পত্রাদি পাচ্ছি তা'তে বিভাগ দু'টির প্রয়োজনীয়তা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি (অগ্রহায়ণে) প্রকাশিত দু'টি প্রবন্ধের ওপরে পত্রাকারে আলোচনা অনেকে পাঠিয়েছেন। শ্রীনীহার দাশগুপ্ত উত্তর দিয়েছেন শ্রীবিষ্ণু দে'র (পৌষে প্রকাশিত) পত্রের। শ্রীঅনিল সিংহও সে সম্পর্কে একটি পত্র প্রেরণ করেছেন। 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' সম্পাদক হিসাবেও শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ আলোচনায় যোগদান করতে চান। মানিকবাবুর সুদীর্ঘ আলোচনা সময়াভাবে ও স্থানাভাবে অন্তত এ সংখ্যায় মুদ্রণ সম্ভব নয়। অন্য পত্র দু'খানি প্রকাশিত হল। পৌষ সংখ্যায় শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরের পরে শ্রীমণীন্দ্র রায় একটি প্রত্যুত্তর প্রেরণ করেছেন। কিন্তু সে আলোচনা আর দীর্ঘতর করতে চাই না। আমাদের এ মতের সঙ্গে শ্রীমণীন্দ্র রায় একমত হওয়াতে আমরা আনন্দিত হয়েছি। 'পুস্তক পরিচয়ের' আবার সমালোচনা প্রকাশ করা এখনো সম্ভব নয়। 'কুবপালা' সম্পর্কে পত্র তাই মুদ্রিত হল না। যাঁরা 'পরিচয়'-এর এসব আলোচনায় যোগদান করেন, তাঁদের অনেকেরই আলোচনা মূল্যবান। কিন্তু অনেক আলোচনা সুদীর্ঘ। ইচ্ছা থাকলেও তাই পত্রস্থ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। উত্তর প্রত্যুত্তর দীর্ঘকাল চললেও তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সকল মতের পাঠকের ও লেখকের এই যোগাযোগ ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনার এ আসর 'পরিচয়' বাংলা সাহিত্যে সার্থক করে তুলতে চায়। সহৃদয় বন্ধু ও পত্র-প্রেরকগণ উল্লিখিত বিষয় মনে রেখে আমাদের সহায়তা করলে আমরা কৃতার্থ হতে পারি। —সম্পাদক]

"পরিচয়" সম্পাদক সমীপেষু,

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার পরিচয়ে 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোট গল্প' শীর্ষক আলোচনায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলাম, তারই প্রতিবাদে গত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে এক পত্রাঘাত করেছেন। এ আঘাত যে আমার অধৈর্য, অজ্ঞান ও স্বজাতিপ্রীতিমূলক সমালোচনাকেই লক্ষ্য করে, বিষ্ণুবাবু তা অকপটেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই অকপটতা প্রশংসনীয়! 'মার্শালী আক্রমণ', 'স্পেশাল পাওয়ার্সের খেলা' ইত্যাদি বামপন্থী স্লোগানের আড়ালে থেকে তাঁর সুকৌশল আক্রমণ উপভোগ্য, কিন্তু এ বিষয়ে কোথাও তিনি এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ রাখেননি যে তাঁর আক্রমণের আসল লক্ষ্য কি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গায়েন' গল্পের সঙ্গে আমি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'মুচিবায়েন' গল্পের তুলনা করেছিলাম। আলোচ্য দুটি গল্পই দুই লোক-শিল্পীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ভিত্তি করে লেখা। দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদে গল্পের গুণগত প্রভেদ কত বিরাট হতে পারে, এই তুলনামূলক সমালোচনায় আমার বক্তব্য ছিল তাই। এই দুটি গল্পের হুবহু একই রকম পরিণতি বা একই রকম 'ট্রিটমেণ্টের' প্রত্যাশা আমি করিনি,

দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতার দরুণ একটি গল্প প্রগতিশীল গল্প হয়ে উঠল, আর সেই স্বচ্ছতার অভাবে আর একটি গল্প প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়ে গিয়ে পৌছল, তাই-ই আমি বলতে চেয়েছিলাম এবং বিষ্ণুবাবুর তা না বোঝবার কথা নয়। তাই তাঁর শিক্-কাবাব ও সন্দেশের পার্থক্য বোঝাবার প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই নিরর্থক। 'মুচিবায়েন' গল্পে কোন "মনুষ্যত্বের করুণ ট্র্যাজিক রূপের" প্রকাশ বিষ্ণুবাবু দেখতে পেলেন? স্বামীর পসার প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য এক পতিপ্রাণা নারীর মহান যৌন আত্মদানের ট্র্যাজেডি? প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে সেই আত্মদান পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভোগ দখল করে গ্রহীতা সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিসর্জন দিয়ে সে তল্লাট ত্যাগ করে চলে গেল কিসের প্রেরণায়? কিংবা এ শুধু নেহাতই কৃতজ্ঞতা? যৌন আত্মদান নিয়েও মহৎ গল্পের সৃষ্টি হতে পারে, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে তার উদাহরণ যথেষ্ট। কিন্তু 'মুচিবায়েন'এর প্রতিটি চরিত্রের এই কদর্য ও বিকৃত রূপায়ণে বিষ্ণুবাবু যদি মনুষ্যত্বের করুণ ও ট্র্যাজিক রূপের প্রকাশ আবিষ্কার করেন, তা নিশ্চিতভাবে তাঁর বন্ধুপ্রীতির গভীরতাকেই প্রমাণ করে। এই সূত্রে অনাথপিণ্ডদ-সুতার বস্ত্রদান কাহিনী ও গুরুদাসবাবু প্রসঙ্গ যে নেহাতই অবান্তর আশা করতে পারি বিষ্ণুবাবুর মত ধৈর্যবান সাহিত্যিক তা বুঝবেন।

অচিন্ত্যবাবুর গল্পের নিষ্প্রাণতার সঙ্গে আদালতের নথিপত্রের কাহিনীর নিষ্প্রাণতার তুলনা করেছিলাম। বিষ্ণুবাবু আমায় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই গোয়েন্দাগিরির অপবাদ দিয়ে বলেছেন যে অচিন্ত্যকুমার হাকিম কিনা তা জানবার প্রয়োজন গল্প-সমালোচনায় নেই! তিনি হাকিম কিনা তা জানবার প্রয়োজন গল্প-সমালোচনায় নিশ্চয়ই আছে, যদি তাঁর হাকিমী তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে প্রভাবান্বিত করে। আনন্দমঠের শেষ পরিচ্ছেদে যেমন জানবার প্রয়োজন আছে বঙ্কিমচন্দ্র হাকিম ছিলেন কিনা। সাহিত্যকার কোন শ্রেণীর সঙ্গে আত্মসমীকরণ করেছেন তা না জানলে তাঁর সাহিত্যকেও সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায় না। এ সম্বন্ধে লেডুক কিছু বলেছেন কিনা জানিনা, কিন্তু লেনিন নিশ্চিতভাবেই বলেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনীর এই নিষ্প্রাণতা তাঁর 'কাঠ-খড়-কেরোসিন' থেকে সুরু করে অধুনা প্রকাশিত 'সারেঙ' বইয়ের অধিকাংশ গল্পেই লক্ষ্যণীয়। অচিন্ত্যবাবু বুদ্ধিমান সাহিত্যিক। এতদিন ধরে যে সমাজ, যে মানুষ আর তাদের যে সমস্যাকে তাঁর গল্পের উপজীব্য করে তিনি আসর মাৎ করে রেখেছিলেন, এবার তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে এই সমাজ, এই মানুষ আর তাদের এই সমস্যা দিয়ে আর আসর মাৎ করা যায় না; তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য অধিকাংশ সাহিত্যিকের মত অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি মানুষ বদলালেন, তার পরিবেশ বদলালেন এবং নতুন যুগোপযোগী সমস্যাকেও উত্থাপন করলেন। অচিন্ত্যবাবু বুঝেছিলেন ঠিকই। কিন্তু হৃদয় দিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে তাকে তিনি "সাহিত্যজাত" করতে পারেননি। তার জন্য যে নিষ্ঠা, যে আদর্শের প্রয়োজন, হয়ত তাঁর সে নিষ্ঠা, সে আদর্শের অভাব। তাই বুদ্ধি দিয়ে আর তাঁর অপূর্ব ভাষা ও আঙ্গিকের দক্ষতা দিয়ে সাধারণ মানুষের যে কাহিনী তিনি রচনা করেন, তাতে থাকে হয়ত সব কিছু, কিন্তু প্রাণসংযোগ হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'যতনবিবি'তে প্রকাশিত কয়েকটি গল্পে দুঃস্থ ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের নিয়ে যে ভাববিলাসিতা তিনি করেছেন, তা মনকে রীতিমত পীড়িত করে। "বাস্তবতায় ও দরদে, প্রগতি সাহিত্যের বহু লক্ষণে" সে গল্প আমাদের কাছে অপূর্ব হয়ে ওঠে না।

শুনেছি বিষ্ণুবাবুর বন্ধু-মহলে তাঁর "সততা ও অনলস অধ্যয়নে"র প্রতি সকলেরই খুব শ্রদ্ধা আছে। সুতরাং তাঁর মতো পাণ্ডিত্যবিলাসীর নিশ্চয়ই জানবার কথা যে রাজনৈতিক দৃষ্টি বা বিচার ছাড়া সাধারণ মানুষের প্রতি "সমানুভূতি" গড়ে উঠতে

পারে না। "সমানুভূতি" তখনই গড়ে ওঠে যখন সাধারণ মানুষকে আর তার সুখ-দুঃখকে তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক বিচার করা হয়। এ বিচার রাজনৈতিক বিচার। প্রগতিশীল গল্পে প্রত্যক্ষে হোক, পরোক্ষে হোক, তাই রাজনৈতিক কাঠামো থাকতে বাধ্য। বিষ্ণুবাবু ঠিকই ধরেছেন। রাজনৈতিক কাঠামো অচিন্ত্যবাবুর গল্পে নেই। তাঁর গল্পে নেই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরই সৃষ্ট সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের বিচার ও বিশ্লেষণ। নিছক মানবপ্রেমে "সমানুভূতি" জন্মে না, জন্মে দয়া। নিছক দয়া বা করুণায় প্রগতিশীল সাহিত্যসৃষ্টি হয় না।

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে গল্পচরিত্রের এই বিচার ও বিশ্লেষণের অভাব একদিকে অচিন্ত্যকুমারের সৃষ্ট গল্পচরিত্রকে যেমন নিষ্প্রাণ ও সেই হেতু অবাস্তব করে তুলেছে, অন্যদিকে তাঁর এই ''অ-জ্ঞান" তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বচ্ছতা দান করতে পারেনি, তাঁর গল্পচরিত্রকে যথার্থ ও সুষ্ঠু পরিণতিতে টেনে নিয়ে যেতে দেয়নি। এক এক সময় তাঁর এই আবিল দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমত শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষ্ণুবাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপ্রাপ্ত "কাঠ-খড়-কেরোসিন"-এর 'কাঠ', 'খড়' বা 'কেরোসিন' গল্পে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে বাধ্য। শঙ্কার কারণ শুধুমাত্র তাঁর বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী বা অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য নয়, পাঠক-সাধারণকে বিভ্রান্ত করার সুকৌশলের জন্য। মঙ্গল চাপরাসী, রমজান বা হাস্নুবিবির মত নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে সমস্ত সমস্যাকে তিনি বিকৃত ও অসৎভাবে চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই আশ্চর্য হই যখন দেখি যে এই ধরনের গল্পকেও বিষ্ণুবাবু প্রথম শ্রেণীর প্রগতিশীল গল্পের লেবেল এঁটে বাজারে চালাবার মহৎ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর থেকে হয়তো বোঝা যাবে —সাহিত্য-সমালোচনায় ব্যক্তিগত "সম্বন্ধপাত" সমালোচককে কতখানি "স্বাধিকার প্রমত্ত" করে তোলে।

বিষ্ণুবাবুর মতে মধ্যবিত্ত বা চাকুরিয়াদের নিয়ে লেখা অচিন্ত্যবাবুর গল্পে নাকি 'তাঁর করুণা বিষয়ানুগভাবে ও বামপন্থী মতানুসারে ঠিকভাবেই প্রখর ব্যঙ্গ, প্রায় নেতিবাচক অবজ্ঞা।' বামপন্থী মতবাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বের দাবী বিষ্ণুবাবু নিশ্চয়ই করেন না। মধ্যবিত্ত বা চাকুরিয়াদের নিয়ে লেখা গল্পের সংকলন 'ইনি আর উনি'র গল্পগুলি উপভোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর এত বাড়াবাড়ি করার কারণ কি? গল্পগুলির হাল্কা হাস্যরস মনে আনন্দ জোগায়—একথা ঠিক। কিন্তু 'ইনি আর উনি'র যে সব গল্পচরিত্র নিয়ে অচিন্ত্যবাবু এই হাল্কা উপভোগ্য হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন, চাকুরিয়া বা মধ্যবিত্তদের মধ্যে তারা মোটেই স্বাভাবিক চরিত্র হিসাবে পরিচিত নয়, তাদের নিয়ে লেখা রসসাহিত্য অবসর সময়ে উপভোগ করা যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু 'বিষয়ানুগভাবে ও বামপন্থীমতানুসারে প্রখর ব্যঙ্গ বা নেতিবাচক অবজ্ঞা'র পাত্র পাত্রী এরা নয়।

বিষ্ণুবাবু আমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর অজস্র ব্যক্তিগত কটাক্ষ করেছেন। 'পরিচয়'-এর সম্পাদকরাও বাদ যাননি। বুদ্ধিবিলাসীর আত্মাভিমানে যখন আঘাত লাগে, তখন তাঁর তথাকথিত ভদ্রতার মুখোস খুলে পড়ে, প্রতিপক্ষের গায়ে কাদা ছিটানো ছাড়া তাঁর আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। আমি যে হেমিংওয়ে-অচিন্ত্যকুমারের রচনাবলী পড়িনি, "আশা করি" এ তথ্য সংগ্রহের জন্য বিষ্ণুবাবুকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়নি, কারণ "আশা" যে "দুর্মর"—সে কথা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সত্যিই "যুগান্তকারী" ভাবেই বলেছেন!

বিষ্ণুবাবু যে বিনীত গ্রহণের কথা বলেছেন, তা কি নির্বিচার গ্রহণ? গত শারদীয়া সংখ্যা 'পরিচয়'-এ তাঁরই এক প্রবন্ধে বিষ্ণুবাবু যখন তারাশঙ্করের সঙ্গে তুলনায়

শরৎচন্দ্রকে "বাঙালী গৃহিনীর মধ্যাহ্ন মনোরঞ্জনে দ্বিপ্রহরের ভোজান্তে পান দোক্তার ভাববিলাসী ঘোর" বলে নস্যাৎ করে দেন, তখন একে বিষ্ণুবাবুর "সংস্কৃত" শ্রদ্ধার চূড়ান্ত উদাহরণ হিসাবেই কি গ্রহণ করব ?

"বাস্তিকর সমালোচক"-এর সাধনায় বিষ্ণুবাবুব এতদিনেও সিদ্ধিলাভ হয়েছে কিনা জানি না। তবে মনে হয় বাজী ধরেছেন তিনি ; এবং সে বাজী ভুল ঘোড়ার ওপর।

নীহার দাশগুপ্ত

"পরিচয়" সম্পাদক সমীপেষু

অগ্রহায়ণ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় নীহার দাশগুপ্ত শারদীয়া সাহিত্যে ছোট গল্পের আলোচনায় যে আপাত অপ্রিয় কথাগুলি বলেছেন, স্বভাবতই তা 'পরিচয়'-এর পাঠক মহলে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তারই প্রমাণ পাই, পৌষ সংখ্যায় বিষ্ণু দের পত্রাঘাতে—ক্রোধ, ব্যঙ্গ, করুণা ও অসংবত ভাবাবেগে যার প্রতিটি ছত্র ভারাক্রান্ত। নীহারবাবুকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিষ্ণুবাবু অনেকগুলি মারাত্মক কথার অবতারণা করেছেন যা নেহাৎই 'ভ্রান্তিবিলাস' বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বাংলা সাহিত্য—বিশেষ করে প্রগতি সাহিত্য—আজ এমন একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে যে এ সময়ে নানা রকম সংশয়, দ্বিধা, ভ্রান্তি ও মোহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই সত্যিকার প্রগতি সাহিত্যের রাস্তার নিশানা মিলবে। বিষ্ণুবাবু বা নীহারবাবুর বিবৃতিতেই তার চরম সমাধান হবে না।

গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে নীহারবাবুর সঙ্গে আমি একমত নই। বরং তাঁর সমালোচনায় কতকগুলি ভ্রান্তি আমার চোখে পড়েছে, সেগুলি এখানে আলোচনা করব। বিষ্ণুবাবুর বক্তব্য ওস্তাদী মারপ্যাঁচের গোলকধাঁধার মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও বুঝে ওঠা নেহাৎ কঠিন নয়। সুতরাং উভয়ের বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই আমার এই চিঠির সূত্রপাত।

গত কয়েক বছর থেকে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ছোট গল্পে যে বিষয়বস্তুগত ও আঙ্গিকগত পরিবর্তন এসেছে তা প্রত্যেকটি কৌতূহলী পাঠকই লক্ষ্য করেছে। অত্যন্ত গভীরভাবেই লক্ষ্য করেছে যে জরাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের কাল্পনিক ও অবাস্তব চরিত্র-চিত্রণের মন-গড়া গণ্ডী ভেঙে চুরে তাঁর সাহিত্য ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে সাধারণ মানুষের দরবারে যেখানে সে অতি রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে ঘর করে বেঁচে আছে। অচিন্ত্যবাবু বদলেছেন ঠিকই। আর না বদলেই বা উপায় কি ? যুগ পালটাচ্ছে। তার সঙ্গে তাল রাখতে হলে তাঁকেও পালটাতে হবে। আসলে রূপান্তরিত অচিন্ত্যকুমারকে যাচাই করতে গিয়েই যত মতবিরোধ।

অচিন্ত্যবাবুর গল্পের বিষয়বস্তু পালটেছে একথা একশোবার ঠিক। তেমনি একশোবার ঠিক তাঁর প্রকাশভঙ্গীর বিন্যাসের পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি। তাঁর ভাষার জৌলুস ও স্বচ্ছতা মনকে আকর্ষণ করে না—একথা বললে নেহাৎই মিথ্যা কথা বলা হবে। তাঁর অধিকাংশ গল্পের চরিত্র মুসলমান চাষী ও সাধারণ নির্যাতিত ও অবহেলিত মানুষ—একথাও সত্যি। তাহলে আসলে গোল বাধল কোথায় ? গোল বাধিয়েছেন অচিন্ত্যবাবু নিজেই। তিনি তাঁর গল্পে যে সব মানুষকে স্থান দিচ্ছেন তারা যখন কথার উর্দি পরে এসে পাঠকদের সামনে উপস্থিত হয়, তখন তাদের চিনতে যে খুব কষ্ট হয় তা নয়, কিন্তু আসলে তাদের মনই পাওয়া যায় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝি—ও লোকটা

চাষী, ঐ লোকটা মুচি, হাঁড়ি বা ডোম, কিন্তু হৃদয় দিয়ে একাত্মীয়তা অর্জন করা যায় না। কেন যায় না? যায় না তার কারণ তারা নথিপত্রের পশ্চাদ্‌পটে ও আদালতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা মানুষ—শ্রেণীবিন্যাসের পশ্চাদ্‌পটে ও বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা পুরোপুরি রক্ত-মাংসের মানুষ তারা নয়। তাই অনেক সময়ে তারা দোকানে সাজানো পুতুলের মত চোখকে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু মনকে টানে না। এতে বিষ্ণুবাবু হয়ত চট্‌ করে আপত্তি করবেন—বলবেন, গোয়েন্দাগিরি সমালোচকদের জন্যে বেআইনী। আমি কিসান সভার রিপোর্ট পড়েই গল্প লিখি আর আদালতের নথিপত্র ঘেঁটেই গল্প লিখি তাতে আপনার কি মশাই? এর উত্তরে আমি বলব—সাহিত্যিককে পুরোপুরি ছেঁটে ফেললে তার সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ সমালোচনা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বা গোর্কীর সাহিত্যকে বিচার করতে হলে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সাহিত্যের উৎস কোথায়—এ তো সর্বাগ্রেই জানতে হবে। সাহিত্য-সমালোচনায় 'হোমরীয় গ্রীবানমন'-এর স্থান নেই। প্রয়োজন হলে 'গোয়েন্দাগিরি' করতে হবে বৈকি।

অচিন্ত্যবাবুর গল্পের চরিত্রগুলি সাধারণ মানুষ—এ কথা অবলীলাক্রমেই মেনে নিয়েছি। কিন্তু সেই সব সাধারণ মানুষকে যখন ছাপার অক্ষরে দেখতে পাই তখন তারা সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষ। তার পেছনে যে ছক-কাটা ঘুণধরা সমাজ মানুষকে তিলে তিলে ক্ষয় করে ফেলছে—সে সম্পর্কে অচিন্ত্যবাবু কতখানি সজাগ? তাঁর গল্পের সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন সংগ্রামের (তেভাগা-রূপী সংগ্রামই যে সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য, এ মূল্যবান খবরটা বিষ্ণুবাবু কোথায় পেলেন?) মধ্যে দিয়ে যে অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে তার কোন আভাসই অচিন্ত্যবাবুর গল্পে মেলে না। সুতরাং তাঁর কিছু কিছু ছোট গল্পকে ততখানিই বিষয়মুখ (objective) বলব যতখানি বিষয়মুখীনতার মর্যাদা ফটোগ্রাফারের প্রাপ্য। ভাল ফটোগ্রাফ তুলতে হলে দরদ ও দক্ষতা থাকা দরকার ঠিকই, কিন্তু ভাল ছবি আঁকতে হলে চিত্রকরের যে মর্মবেদনা, আবেগ ও সৃষ্টির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা থাকা অপরিহার্য, অচিন্ত্যবাবুর আপাত-বিষয়ানুগ ছোট গল্পে তার দৈন্য চোখে পড়ে। অচিন্ত্যবাবুর কোন উৎসাহী পাঠক যদি বলে যে তাঁর হালের গল্প থেকে কোন পরিণতির আভাস মেলে না, ঐতিহাসিক পরিণতি তো নয়ই, তাহলে বিষ্ণুবাবু তার কী উত্তর দেবেন? রূপান্তর আর পরিণতি যে এক জিনিস নয় তা কি বিষ্ণুবাবুর মত চতুরঙ্গ সমালোচক বোঝেন না?

তবু অচিন্ত্যকুমারের হালের সাহিত্যকে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল বলব—এ দুঃসাহস আমার নেই। অচিন্ত্যবাবু প্রগতিশীল আন্দোলনের পরিপন্থী ডজনখানেক গল্প লিখেছেন বলেই তাঁর সাহিত্যকে চট্‌ করে প্রতিক্রিয়াশীল বলা চলে না, কারণ তাঁর সাহিত্য তো ঐটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়—আরও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত তাঁর সাহিত্য। আসলে গোল বেধেছে বিষ্ণুবাবুর মহানুভবতার আধিক্য ও নীহারবাবুর কার্পণ্যের ফলে। বিষ্ণুবাবু অচিন্ত্যকুমারকে তাঁর প্রাপ্যের অনেক বেশি দেবার জন্যে ব্যগ্র, অন্যদিকে নীহারবাবু তাঁর প্রাপ্যটুকুও পুরোপুরি দিতে চান না। বিষ্ণুবাবু বলেছেন, 'অচিন্ত্যকুমারের এই সাযুজ্যবোধ (অর্থাৎ লেখক-চরিত্র সাযুজ্য—পত্রলেখক) যে আকস্মিক ও অসৎ নয়, তার একটা প্রমাণ পাই তাঁর এই রকম গল্পের সংখ্যা, তার বৈচিত্র্য, তার ব্যাপ্তি।' এই সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তিই বিষ্ণুবাবুকে বেসামাল করেছে। কারণ, এই তিনটি গুণ থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণুবাবুর রচনা তো আজও সাধারণ পাঠকের মনকে টানতে পারল না। অন্যদিকে নীহারবাবু বলেছেন, 'মানিকবাবুর "গায়েন" গল্পের সঙ্গে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের "মুচীবায়েন" গল্পের তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদে গল্পের গুণগত প্রভেদ কত বিরাট হতে পারে।' দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদে গুণগত প্রভেদের বিরাটত্বের কথা

মেনে নিয়েও এ কথা বলতেই হয় যে অচিন্ত্যকুমারের 'মুচীবায়েন' গল্পে প্রথম বাজনদারের স্ত্রী যদি তার স্বামীর মর্যাদা, পসার ও ভালবাসা রক্ষার তাগিদে দ্বিতীয় বাজনদারের কাছে যৌন আত্মদান করেই থাকে, তাতে নীহারবাবুর অকস্মাৎ প্রতিক্রিয়া আবিষ্কারের যুক্তিটা কোথায়? মানিকবাবুর 'গায়েন'-এর সঙ্গে এর তুলনা চলে না; কারণ, অচিন্ত্যবাবুর গল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন ঠাটে বাঁধা। অতএব দুটি গল্পের একই পরিণতি কি করে সম্ভব? অবিশ্যি 'মুচীবায়েন' সম্পর্কে আমার নিজস্ব মত হল যে গল্পটি সম্পূর্ণ অসার্থক—অচিন্ত্যবাবুর মুন্সিয়ানার কোন চিহ্নই তাতে নেই। কারণ গল্পটি আগাগোড়া লেখকের লজিক মতো অগ্রসর হয়েছে—গল্পের নিজস্ব লজিক উপেক্ষা করে। নীহারবাবু আর এক জায়গায় বলেছেন, 'বাংলার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ আর তাদের গ্রামীণ কথ্যভাষা অচিন্ত্যবাবুর প্রায় প্রতিটি গল্পের অবলম্বন। তাদের সুখ-দুঃখ, অত্যাচার অবিচারের কথাও তিনি বলে থাকেন।' নীহারবাবু অচিন্ত্যকুমারের প্রতি অবিচার করেছেন, কারণ তিনি তাঁর অনেক ছোট-গল্পেই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, অত্যাচার অবিচারের 'কথাও' নয়—কথাই বলে থাকেন। অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ নয় বলে তাঁর বক্তব্যও অত্যন্ত ম্রিয়মান।

পরিশেষে একটা কথা না বলে পারছি না। বিষ্ণুবাবু নীহার দাশগুপ্তের সমালোচনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—এই কি প্রগতিশীল সমালোচনা? ভাববার মত প্রশ্ন বটে। কারণ নীহারবাবু তাঁর সমালোচনায় উপযুক্ত যুক্তি না জুগিয়ে বিবৃতি দিয়েই খালাস হয়েছেন। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর সমালোচনাকে আদর্শ সমালোচনা হিসেবে মেনে নিয়েই যদি প্রগতিশীল সমালোচনার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপিত হয়, তাহলে বলতে হবে—বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এইখানেই সমাধিস্থ হল।

বিনীত

অনিলকুমার সিংহ
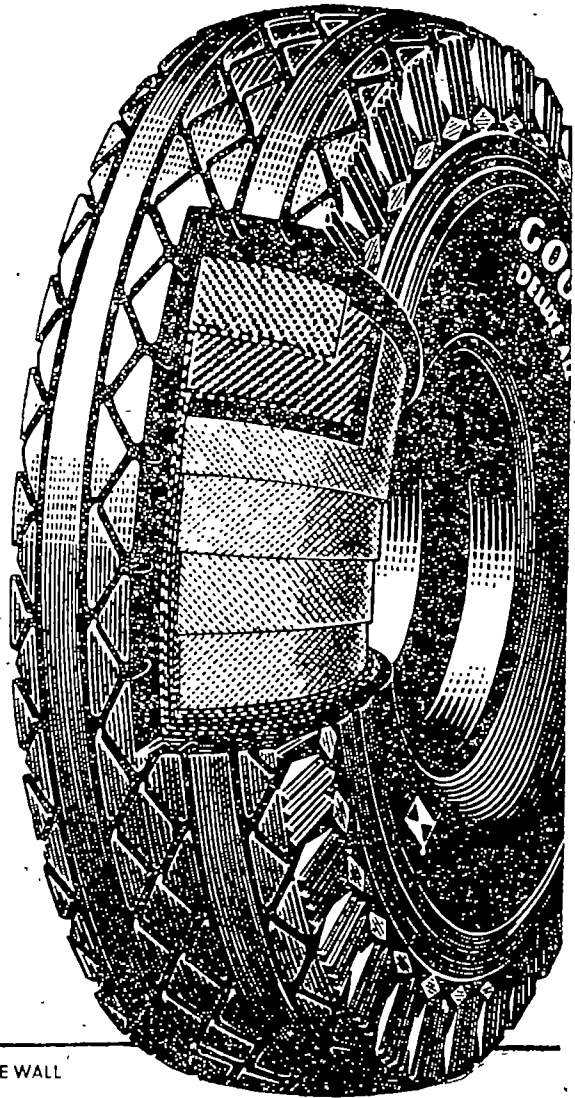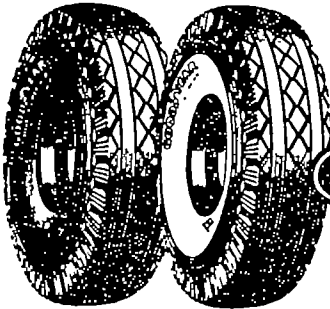
পরিচয়

সপ্তদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৫৪

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২রা পৌষ। আশ্রমের আনন্দলোকের যিনি অন্যতম পূজারী ছিলেন, সেই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের আজ জন্মতিথি। তাঁর কথা বলবার এবং ভালো করে বলবার লোক আশ্রমে এখনো অনেকে আছেন, তবে তাঁর গানের ছাত্র হিসাবে সাক্ষাৎ থেকে তাঁকে বিশেষ দিক দিয়ে জানবার ও জানাবার লোক ক'মে আসছে, নেই বললেই চলে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সামরিক জীবনের যে কথাগুলি আজকের দিনেও বিশেষভাবে মনে পড়ে, তার আলোচনার সার্থকতা রয়েছে দুই কারণে। এক, সেই আলোচনাই আজকের ব্যথিত মনের সান্ত্বনা এবং স্মৃতিপূজাও বটে, দ্বিতীয়ত, যে-প্রাণপ্রবাহ ও কর্মধারার ভিত্তির ওপর শান্তিনিকেতন দাঁড়িয়ে আছে, তার কিছু-কিছু আভাস হয়তো এইরূপ আলোচনা থেকে একালের নিকট ধরা পড়তে পারে।

প্রায় বিশ বছর আগের কথা। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে সেবার রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হয়ে গেছেন। নবনির্মিত হাসপাতাল-গৃহে ভোরবেলা আশ্রমের প্রাত্যহিক উপাসনার আয়োজন হয়েছে। গুরুদেব প্রার্থনান্তে ভাষণ দিলেন। অভয় আশ্রমের তৎকালীন কর্মী হিসাবে বর্তমান লেখককে এই একটি গান যথারীতি গাইতে হয়েছিল, "এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।" জন্মজন্মান্তরের আকাঙ্খিত দেবতাকে প্রত্যক্ষ পেলে লোকের কী অবস্থা হয় জানা নেই, কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথকে সামনে রেখে রবীন্দ্র-সংগীত গেয়ে যাওয়া,—এমন ক্ষুরের উপর দিয়ে চলার দুঃসাহসিক কাজও, শুধু লেখকের বয়সোচিত উৎসাহ এবং তার চেয়ে বেশি সুদুর্লভাসেই সামনে-পাওয়ার আনন্দ-বেদনাতেই মাত্র সম্ভব করে তুলেছিল। যা হোক, সর্বপ্রতীক্ষিত মুহূর্তটিকে তড়িৎ আসন্ন করে তুললেন অভয় আশ্রমের সভাপতি বর্তমান পশ্চিম-বাংলার শ্রমমন্ত্রী ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিকে প্রণতিপূর্বক একটি সংগীতের আবেদন জানিয়ে। গুরুদেব পার্শ্বদিকে ইঙ্গিত করলেন। দিনুবাবুর প্রতি তখন সকলের দৃষ্টি সমুৎসুক। দিনুবাবু গলা ঝেড়ে নিয়ে তৈরি হয়ে বসছেন, হারমনিয়মটি তাঁর সামনে রাখা হচ্ছে, হাতের মৌন ইসারায় তিনি সেটির অনাবশ্যকতা নির্দেশ করলেন। সকলের বিস্ময় হল অপরিসীম। তাঁকে দেখেই অবধি ভাবনা জাগছে—অমন পর্বতোপম দেহ ও

তদোচিত কণ্ঠ থেকে কী সংগীতই না-জানি বেরোবে। আর, তাও কিনা, যন্ত্র-সুরের সহযোগ ছাড়া। আশা করি শান্তিনিকেতনে আজকের দিনে শব্দটাকে "যন্ত্রাসুর" বলে কেউ ভুল শুনবেন না। সেদিন এতগুলি লোকের মধ্যে, বিশেষত রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে, এরকম উপাসনা-ক্ষেত্রের গম্ভীর আবহাওয়ায় ব্যাপারটার সম্বন্ধে স্বস্তি জাগছিল না মোটেই। যন্ত্র ছাড়া গান হওয়া, দিনুবাবু না হলে সে ক্ষেত্রে পাত্রান্তরে পাগলামীর লক্ষণই মনে হত। এমনি ছিল সেইদিন, কিন্তু বাইরে যন্ত্রছাড়া গান-সম্বন্ধে আজও দিনের কী খুব তফাৎ ঘটেছে? সভায় তাঁর গান হল উপরি-উপরি তিনখানা। কণ্ঠ-মাধুর্যে ও সুরশিল্পে সকলকে মুগ্ধ ক'রে সেদিন বাইরের লোকের কাছে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন সংগীতধারার দুইটি বৈশিষ্ট্যের ছাপ তিনি রেখে এসেছিলেন। পাখির মতো অনায়াস গান, প্রাণের সহজ-উৎসারিত আনন্দাবেগই যার মুখ্য তাগিদ, বারান্তরে অনুরোধের অপেক্ষা নেই, তার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের, মান-অপমানেরও নেই গম্ভীর সজ্ঞানতা। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রনিরপেক্ষ হয়ে কণ্ঠ-সুরের স্বাধীন অথচ সুনিয়ন্ত্রিত বিকাশ। দিনুবাবুকে আমার প্রথম দেখবার ও জানবার এই স্মৃতিটি কোনোদিনই কোনো অবস্থাতেই ম্লান হল না।

তখন থেকে যে সুরের স্পর্শ লাগল, তার আকর্ষণ ভেতরে-ভেতরে কিরূপ দুর্বার ছিল, তা বোঝা গেল, দু'বছরের মধ্যেই যখন এসে পড়া গেল শান্তিনিকেতনে, এবং তুচ্ছ একটি জীবিকার কাজ উপলক্ষ্য রেখে একেবারে মাসেকের মধ্যেই জুটে গেল তাঁর ছাত্রত্ব, তাঁরই স্বগৃহ "সুরপুরী"তে। তখন এইরূপ পৌষ-উৎসবের প্রারম্ভ দিন। "নটরাজের" গানগুলি নিয়ে রোজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শিশুবিভাগে যেন সে-কোন সুরলোক নেমে আসে। কী তার সম্মোহ। নানাদিকে গানের ছড়াছড়ি! সকালের বৈতালিক ব্যাপারটা আজো আশ্রমে স্মৃতির বিষয় হয়নি, অব্যাহতই চলছে; কিন্তু রাত্রে শোবার ঘণ্টা প'ড়ে যাবার পর সব যখন নিস্তব্ধ, সেই শান্ত, নিরাবিল পরিস্থিতিতে শ্রান্ত মন যখন চলতি-জীবনের খাতায় একটি ছেদ টেনে বিশ্রাম যেচে শয্যা-মুখী, সে মুহূর্তটিতে শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে মেয়ে এবং ছেলের দলের সমবেত ধীরগম্ভীর সুললিত কণ্ঠে বৈতালিক গান এক পরম শান্তি ও আনন্দের বিষয় ছিল। এখন সেই নিয়মিত প্রাত্যহিক প্রথাটি থেকে আশ্রমবাসী বঞ্চিত।

আশ্রমে "সংগীত-ভবন" তখনো ভূমিষ্ঠ হয় নি, ভ্রূণাকারে "সংগীত বিভাগে"র মধ্যে সে তখন গড়ে উঠছে বর্তমান "দেহলি" গৃহসীমায়। গুরুদেব "দেহলি"র দোতলায় আসেন এবং দিনুবাবুকে নূতন গানের সুরগুলি দিয়ে যান। প্রতি দুপুরে "সুরপুরী" থেকে বিরাট দেহভার নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে একটি ছাতা মাথায় চলে আসছেন দিনুবাবু—এ ছবি এখনো চোখে স্পষ্ট ভাসে। ক্লাস তিনি তাঁর গৃহেই নিতেন। সকালে এক পালা হত, দুপুরে শিশুবিভাগ, তারপরেই বাসায় ফিরে আমাদের নিয়ে কাটত। আমাদের পরে আসত মেয়েরা, তাদের ক্লাস শেষ হতে হতে বিকেল পর্ব শেষ।

এরও ওপর থাকত স্বরলিপি করা, তার প্রুফ দেখা, সর্বোপরি কবির নূতন গানের সুর শেখা এবং অনেক সময় তখন তখনই তা বিশিষ্ট ছাত্রদের ডেকে নিয়ে বসে শেখানো এবং তাছাড়া নানা-উৎসবের গানের রিহার্সেল, নাটকের রিহার্সেল তো লেগেই ছিল। অবৈতনিক কাজের তাঁর শেষ ছিল না, না সময়ে, না পরিশ্রমে। স্বদেশীদের মতো বৈদেশিকরাও তাঁর বন্ধু যেমন ছিলেন, তাঁদের নিয়ে তাঁর খাটুনিও ছিল ক্ষেত্রবিশেষে তেমনি প্রগাঢ় ভাবেই। এদের তিনি বাংলা শেখাতেন তার সাহিত্য-অংশ পর্যন্ত। এবং বাকে-দম্পতিকে নিয়ে ছিল তাঁর গানের ক্লাস। শুধু গান শিখিয়েই পার ছিল না, ইংরেজিতে সে-গানের স্বরলিপি করার ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করতে হত। বাংলা-সাহিত্যের বিদেশী অনুবাদের ক্ষেত্রেও সময় সময় তাঁর সে সাহায্য কম ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ ছাড়া জীবদ্দশায় পরিবারের আর যে-ক'জন ব্যক্তিকে পেয়েছিলেন তাঁর আশ্রমের সাক্ষাৎ কাজে বা তাঁর সৃষ্টির আনুচর্যে, তাঁদের মধ্যে দ্বিপেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় ছাড়া, তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, কিন্তু আসলে দিনেন্দ্রনাথের জুড়ি ছিল না। এই অভিজাত ঘরের সংস্কৃতিবান অমন গুণী ও বয়স্ক ব্যক্তিকে হেঁটে আসতে যেতে এবং ছেলেদের সঙ্গে ছেলে হ'য়ে অমন সহজভাবে গানের বান ডাকাতে দেখে, ভদ্রলোকের আর-কিছু না হোক কায়িক পরিশ্রমটা ভেবে বিশেষরূপেই অনুকম্পা হত। কিন্তু অনেক ভাবনা-চিন্তা সমীহ-সাধ্য-সাধনার শঙ্কভরা গুরু মনোভারকে পুব হাওয়ার মতো একটি সস্নেহ সম্মতিতে উড়িয়ে দিয়ে যেদিন থেকে তিনি তাঁর গৃহে প্রত্যহ দুপুরবেলায় আমাদের গানের ক্লাস সুরু করলেন, সেদিন তাঁর পরিশ্রম আমাদের লজ্জা দিল দিনের পর দিন তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠার নিশ্চল উদ্‌যাপনে। আমাদের যদি বা ক্লাসে-যাওয়া বাদ পড়েছে, তাঁর আগ্রহপূর্ণ অপেক্ষা এবং পরদিনে আবার তার কারণ জিজ্ঞাসায় ছেদ পড়েছে ক্বচিৎ। অথচ আমাদের দলের ছাত্রদের কারো মধ্যে যে তাঁর শিক্ষাকৃতিত্বকে উজ্জ্বল রেখে যাবার নিশ্চিত ক্ষীণাভাস দেখেছিলেন, তা নয়,—অন্তদিক দিয়ে খুব যে কোনো-একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল তাও নয়, শুধু একটু আগ্রহের আঁচ কারো কারো মধ্যে পেয়ে থাকবেন,—পরিচয়-দীন, নগণ্য আমাদের মতো কর্মীকেও নয়তো অতটা কাছে টেনে খেটে অমন দুর্লভ বিদ্যা বিতরণের আর-কোনো সঙ্গত কারণ দেখিনে। নিজের কথাটাকে মাঝে মাঝে টেনে আনতে হচ্ছে এজন্যে যে, কী রকম সাধারণ লোককে নিয়েও তাঁর অহেতুক বিদ্যাদানের প্রীতি-উৎসাহ উৎসারিত হয়েছে সেটা প্রত্যক্ষ উদাহরণে আজো কিছুটা নূতনদের অনুমান করা সহজ হবে। সেই সঙ্গে তাঁর উদারতা ও স্বার্থবিমুখ শ্রমঔদাস্তের পরিমাপটাও তাঁরা করে নিতে পারবেন।

আশ্রমের অনেক লোকই তাঁর এই উদারতা ও লোক-প্রীতির সহজ রসের পথেই গ'লে গিয়ে উচ্চনীচ নির্বিশেষে তাঁর প্রাণের মধ্যে আসন পেয়েছিল। তিনি তাঁদের

·সম্বন্ধে রসিয়ে গল্প করতেন প্রায়ই। শুধু প্রয়োজন-মাফিক গান-চর্চা ক'রেই তাঁর কাছ থেকে উঠে আসা যেতো না। কিছুক্ষণ দশবিষয়ে দশটা আলাপের মধ্যেও না-জড়িয়ে প'ড়ে ছিল না উদ্ধার। তার মধ্যে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ও দেশের কথার সঙ্গে সমানতালে চলত দেশাচার ও লোকচরিত্রের বিশেষ বিশেষ কৌতুক ও কৌতূহলজনক মজার গল্পগুলি। অনুভূতি ও বর্ণনার ঔজ্জ্বল্যে ঘটনার সঙ্গে এক-একটা চরিত্র নিয়ে এক একটি লোক উপভোগ্য হয়ে উঠত অদ্ভুত অনুপম রসে রূপে। এই পর্বে তাঁর ঐন্দ্রজালিক বর্ণতুলিকায় আচার্য-শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীমশায় থেকে কিছু কম ফুটত না তাঁরই বিদ্যাভবনের খুন্‌খুনে বুড়ো চাকর সেই পারুলডাঙাবাসী ওস্তাদ বনাম তিনকড়ি। শিক্ষক অজিত চক্রবর্তী, সতীশ রায়, জগদানন্দবাবু, নগেন আইচ, ক্ষিতিবাবু, নন্দবাবু, এদের সঙ্গে সাধারণ কর্মী রোহিনী কর, কালিদাসবাবু প্রভৃতির প্রসঙ্গও যেমন হত, তেমনি নরভুক, শিবদাস, মণি গুপ্ত, সমরেশ সিং আরো কত ছাত্রদেরই না গল্প শোনা গিয়েছে বিচিত্রবিষয়ে। দেশ-ভ্রমণের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত বদরিকাশ্রম, কাশ্মীর, হরিদ্বার। পরিব্রাজক-রূপে এই প্রসঙ্গেই তাঁর কৃচ্ছ্রতার ভূমিকায় তাঁকে ধনীর দুলাল ছাড়া দেখা যেত আরেক রূপেও। তাঁর একটি কথা মনে পড়ে। বলতেন,—দুখানা গান, আর চাই একটি এস্‌রাজে চলন-সই হাত। ব্যস্, আর কিছু ভাববার নেই। এই সম্বল ক'রে বেরুলেও নেহাৎ না খেয়ে মরতে হয় না। বেশ জানি, অন্তত নিজের পেটটা চালাবার জোগাড় হয়ে যাবেই। তাঁর কালের মতো সংকীর্ণ-প্রচার সংগীত, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রসংগীতের যুগেও এই সংগীত-বিদ্যা, জনরুচি ও বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তিনি কতখানি সশ্রদ্ধ আশাবাদী ছিলেন, এ উক্তিটি থেকে তা জানা যায়।

সংগীতের রস ছিল তাঁর প্রাণের জিনিস। তাঁর নিজের দেহক্ষেত্রেও যেমন ভিতরকার খাঁচা ঐ কঙ্কালের দিকটা বাইরে থেকে বোঝাবার সুবিধা একেবারেই ছিল না, কথায়-কাজে মনের পরিচয়ই লোকে পেয়ে যেতো বেশি, তেমনি তাঁর আলোচিত বিদ্যার ক্ষেত্রেও ব্যাকরণের দিকের চেয়ে সাহিত্যিক সমগ্র-রসের অনুভবটাই ছিল সুলভ। কেবল গান দেবার সময় এটুকু বলতেন, কোন গানটার ছন্দ কী, রাগিনী কী, সুরের টান বিশেষ বিশেষ স্থলে কী ভাবমাধুর্য প্রকাশ করছে, কোন কোন গান কী রকম লয়ে ও ভাবানুসারে স্থলবিশেষে কিরূপ ক'রে জোরে বা আস্তে, বা খেলিয়ে গাইতে হয়। গানের বিষয় কী, কী উপলক্ষ্যে কখন কী পরিবেশে কোন গানটি গাইতে হয়, বা, গানটি রচিত হওয়ারই বা স্থানকাল পাত্রগত ইতিহাস কী। এর ওপর আবার সুরের সঙ্গে, রবীন্দ্রসাহিত্য ও সাধনা সম্পর্কেও রস ও তথ্যগত নানা অনুভব ও জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্র ছিল তাঁর শিক্ষা-আসরগুলি। তার মধ্যে দেশবিদেশের সংস্কৃতির আভাসও তার সঙ্গে বেঁধেই এসে পড়ত।

গানের ভঙ্গির ওপরেই গানের রস বেশি নির্ভর করে—তাঁর শিক্ষায় এই ধারণাই

জন্মেছিল। বই না দেখে গাইবার ছিল কড়াকড়ি। নিজেও যেমন ছিলেন দরাজকণ্ঠ তেমনি সেইজন্যই বড় বড় গানের দলকে একক কণ্ঠের পরিচালনায় যেতে পারতেন বিপদ উৎরিয়ে। কানও ছিল এমন সূক্ষ্মশ্রুতিক্ষম যে বড় বড় দলের মধ্যে ব'সে গান শেখাতে ব্যস্ত থাকার মধ্যেই ঠিক ধরে ফেলতেন কোথায় বেসুরো বাজছে। তা ব'লে আবার গলা-চেপে-গাওয়া প্রশ্রয় পেত না তাঁর কাছে একরত্তিও। শিক্ষার্থী-মাত্রকেই গলা খুলে গাইতেই সাধারণত উৎসাহিত করতেন বেশি। সুরের ভুল কণামাত্র ছিল সহ্যের বাইরে। এক-একটা সমবেত রিহার্সেলে সমগ্র দলকে এমন অদম্য অধ্যবসায়ে ধৈর্যের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বার বার গাইয়ে ছাড়তেন সংশোধনীয় স্থলগুলি। সেদিকে তাঁর কণ্ঠকৃচ্ছ্রতায় ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁর কাছে সর্বোপবি বিষয় ছিল বিশুদ্ধতা। তবু দুঃখহতাশায় যাকে বলে, হাত-পা-ছেড়ে-দেওয়া, সেই ভাবেই একাধিক বার ক্লাসে বসে জানিয়েছেন, আশ্রমেই তাঁর অপ্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে দিনের পর দিন বৈতালিকের পথে বেপরোয়া সুরের কৃত্রিমতার প্রশ্রয় তাঁর চেষ্টাকে কী করে তাঁর অত সতর্কতা সত্ত্বেও বার বারই করেছে ব্যহত। কিন্তু এ সূত্রেই আরেকটি কথাও মনে আসে,—তিনি কি শুধু রবীন্দ্রসংগীতের স্মৃতিধরই ছিলেন? দীর্ঘকালের অভ্যাসে তাঁর সুমিত শিল্পী-প্রতিভা স্থলবিশেষে রবীন্দ্রসংগীতে সুর সংযোজনায় তাঁর অগোচরে তাঁকে দিয়েও কি কিছু কৃত্রিমতার কাজ করায়নি? স্থল বিশেষে স্বয়ং সুরকার রবীন্দ্রনাথই সে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারেননি। তবে কিনা, সে-সংযোজনাব ব্যাপারটা কৃতিত্বময় এতই অপূর্ব সংগতির সঙ্গে সাধিত হয়েছে যে, ক্ষোভে প'ড়ে কবি দিনুবাবুর সেই সন্দেহ-বিষয়ীভূত অধিকার কখনো ব্যহত করেননি, বরঞ্চ তাঁর সুরভাণ্ডারী ঐ দিনুবাবুর ভাণ্ডারে সঞ্চিত নিজ সুরসম্পদকে স্বীকৃত ক'রেই কবি যথাযোগ্য ভাবে শ্রুতিধরের মর্যাদা অক্ষয় রূপে বাড়িয়ে রেখে গেছেন। কবির দপ্তর থেকে যে বিজ্ঞপ্তি একবার দিতে হয়েছিল, এখনো আরেকবার তার প্রয়োগ ক'রে ব'লে রাখা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্র-সংগীতের সুরকার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই, দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সুরধর, সুর-বিতরক ও স্বরলিপিকার মাত্র। তবে যে রকম সংস্কৃতিশীল, গুণী ও প্রাণবান লোকের পক্ষে রবীন্দ্রসংগীতের মূল পরিচালকতা শোভা পায়, দিনুবাবু ছিলেন তার যোগ্যপাত্র।

আমার প্রথম শোনা দিনুবাবুর গান ছিল খালি গলার, গান শেখাতেও দেখলাম বরাবর দিনুবাবুকে খালি গলাতেই গেয়ে। ভাঙা একটি সিংগ্‌ল্ রীডের হারমোনিয়ম তাঁর কাছে থাকত, আর থাকত একটি ছোট এস্রাজও। তিনি তার আশ্রয় নিতেন শুধু সেই কচিৎ ক্ষেত্রেই, যেখানে তিনি দেখতেন শিক্ষার্থীর কানে সুরের বিশেষ বিশেষ পর্দাটি তেমন সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে না। কঠিন মীড় ও কাজের জটিল স্থলগুলিকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে সময়-সময় হাত দিয়েছেন সেই যন্ত্রে। এস্রাজই সে-সবস্থলে ব্যবহৃত হয়েছে, হারমোনিয়ম রয়েছে স্কেল ধরবার বা এস্রাজ বাঁধবার জন্যে। খালিগলার সুরেলা গানকেই তিনি গায়কের শ্রেষ্ঠতম

পরিচয়ের মানদণ্ডরূপে দাঁড় করাবার জন্ত সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। হারমোনিয়ম ছাড়িয়ে নাকী স্বরের কবল থেকে সংগীতকে মুক্ত করে এনে, এস্রাজের সঙ্গে গান গাইবার রীতি প্রচলন ক'রে, দেশোচিত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের পুনরুদ্ধারের দ্বারা শান্তিনিকেতন দেশে আজ এক সাধু কৃতিত্বের অধিকারী; বাইরে গেলে বোঝা যায় এখনো সাধারণের মধ্যে এটা কত বড়ই একটা অসাধ্য সাধনের ধারণা জন্মিয়ে চলেছে, কিন্তু সেইস্থলে খালি গলার গানের এই দিনুবাবু-যুগীয় শান্তিনিকেতনের চেষ্টা সম্পূর্ণতা পেয়ে বাইরেও এমনিতর প্রসার লাভ করলে, কী আশ্চর্যই না তা সকলের জন্মাতে পারে। এদিক দিয়ে আশ্রমের এখনকার সংগীতবিভাগও নিশ্চয়ই আশা করি যথেষ্ট সচেতন ও সাধ্য মতো সক্রিয় আছেন ও থাকবেন। নিম্ন-জনসাধারণের গানের ধারা এখনো এদেশে খালি-গলারই স্বাধীনতা-গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। তথাকথিত মধ্য ও উচ্চশিক্ষিত মহলই খুইয়েছে সে স্বাধীনতা, যন্ত্রাশ্রয়ী হয়ে। শিক্ষিত মহলে নৃত্যগীতকে যেমন শান্তিনিকেতন গ্লানিমুক্ত করে ব্যাপক রূপে প্রচারের কাজ করেছে, তেমনি কণ্ঠসংগীতের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিকাশও এখান থেকেই সম্পাদন ক'রে দিনুবাবুর যোগ্য পূজার কাজ শান্তিনিকেতন করতে পারে।

গানের ঘরোয়া সেই উৎসব-ভাবটি এখন আনুষ্ঠানিকতায় ঢেকে আসছে। গানে, অভিনয়ে, পাঠে তখন আশ্রম জমজমাট। এক্ষেত্রে গুরুদেবের যোগ্যতম দোসর ছিলেন দিনুবাবু—এ-কথা আর-কারো সাক্ষ্য প্রমাণের অপেক্ষায় গুরুদেব অস্পষ্ট রেখে যাননি। তখন নাচ মাত্র দেখা দিচ্ছে। মুখ্যভাবে আসর জমিয়ে নিতে হচ্ছে গানেই। রবীন্দ্রসংগীতের সেই সব দিনগুলি গেছে প্রকৃত পরীক্ষার দিন। গানের ছিল সেদিন সুকঠোর দায়িত্বপূর্ণ একান্ত স্বাধীনতার যুগ। মেয়েদের কণ্ঠের আকর্ষণী সহযোগিতা তখনো দেশে সুলভ হয় নি। "সকল রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারী, সকল রবীন্দ্রনাটের কাণ্ডারী"কে রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রশস্তি পংক্তি অনুরূপ মান বজায় রেখে গড়ে চলতে হয়েছে দেশের রবীন্দ্রসংগীত-পরিমণ্ডল, শুধু একমাত্র কণ্ঠসম্বলেই। কলকাতায় যদিও ছিলেন আদিযুগের স্বনামধন্যা কবিআত্মীয়া প্রতিভাদেবী, সরলাদেবী এবং ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি মহোদয়াগণ, কিন্তু শান্তিনিকেতনে ছিলেন দিনুবাবু একাকী মাত্র। এ পথে সংগীতাচার্য মারাঠী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রীকেও অবশ্য তিনি সহকারী ক'রে তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন নিজের হাতেই। তবে একাকী দিনুবাবুরই প্রাণোৎসাহে ও শিক্ষকতার দক্ষতায় সম্ভব হয়েছিল সেদিন পর্বে পর্বে সাধারণ-কণ্ঠী ছাত্রছাত্রীদের গীত-গানের আসরের সাহায্যে রাজধানীর রুচি সুসংস্কৃত ও প্রসারিত ক'রে নিয়ে দেশের চতুর্দিকে রবীন্দ্রসংগীতকে ছড়িয়ে দেওয়া। এই কাজের ক্ষেত্রে গুরুদেবের সাধনার কথা প্রথম থেকেই অবশ্য এড়িয়ে আসা হয়েছে, ঈশ্বরকে নিজের সৃষ্টিতে মহিমাময় ক'রে ব্যাখ্যান ক'রে চলার দিন আজ নয়, কাদের জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁর সে মহিমা প্রকাশমান বেশি, সেটা দেখাই আধুনিক রীতির অঙ্গ। গুরুদেবের

গান লেখা, সুর যোজনা, সুর শেখানো এবং গান চর্চা ও প্রচারের ক্ষেত্র-সৃষ্টির পরিচয় দিতে হলে সে স্বতন্ত্র-এক প্রশস্ত ক্ষেত্রের এবং দুরূহ প্রয়াসের কথা। সুতরাং তাঁর নামোল্লেখ মাত্র ক'রে এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে এ-সম্বন্ধে মৌনতা অবলম্বনই শ্রেয়। রবীন্দ্র-সংগীত প্রসারের এই কাজের ক্ষেত্রে আগের যুগের অমলা দাশ, সাহানা দেবী, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত এবং মধ্যযুগের পঙ্কজ মল্লিক, কনক দাশ, অনিল বাগচি প্রভৃতির কণ্ঠাগত কাজের সুখ্যাতি অকৃপণভাবেই দিনুবাবুর মুখে অহরহ শোনা যেত। দিনুবাবুর সবল আভিজাত্য সংকুচিত হয়ে সামাজিক জাতের অপেক্ষা রেখে গুণীর বিচারে এগোত না। তাঁর রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের আলোচনা ক্ষেত্রে সাধারণ রঙ্গালয়ের গুণী অভিনেত্রীদের গায়কীর উল্লেখও হয়েছে বিশেষ সম্মানের সঙ্গেই। রঙ্গালয়ের মহড়াক্ষেত্রে তিনি নিজে গিয়েও অনেক সময় তাদের গান শিখিয়ে এসেছেন।

স্বরলিপিযোগে রবীন্দ্রসংগীতকে সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজ দিনুবাবুর অন্যতম কীর্তি। এ কাজে ছাত্রদের মধ্যে তখন তাঁর শ্রমলাঘব ক'রে সাহায্য করেছেন অনাদি দস্তিদার এবং সুকণ্ঠী ছাত্রী স্বর্গীয়া রমা কর। বি, এ, পাশ ক'রেও সে সময় রবীন্দ্র-সংগীতকেই জীবনের একমাত্র বৃত্তিস্বরূপ গ্রহণ ক'রে সর্বপ্রথম এই অনাদিবাবুই ছিলেন কলকাতায় একমাত্র শিক্ষক। আজো অবশ্য তিনি সে কাজেই আছেন। দিনুবাবু তাঁর এই ছাত্রের এই বিশেষ অধ্যবসায়ের উল্লেখ প্রায়ই করতেন। তাঁর অন্য উল্লেখ-যোগ্য ছাত্রদের মধ্যে শান্তিদেব ঘোষ আজ রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম কর্ণধার; এমনি আর একজন ছিলেন বামন শিরোধকার। তাঁর প্রিয় ছাত্রী ছিলেন খুকু ওরফে স্বর্গীয়া অমিতা সেন। এঁর সম্পর্কে যখন-তখন পাখির মতো কলকণ্ঠে গান-গেয়ে-চলার শান্তিনিকেতনী-পৌরাণিক প্রাণন আদর্শের কথাটি সর্বাপেক্ষা প্রযোজ্য। আচার্যের স্মৃতির সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতম শিষ্যশিষ্যামণ্ডলীর চিত্রটিও আজ খুবই মনে পড়ছে। এই মণ্ডলীরই শেষ শাখায় ছিলেন মদ্রদেশীয়া শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, বাঙালী শ্রীমতী অমলা দত্ত এবং গুজরাটী শ্রীযুক্ত পিনাকীন ত্রিবেদী ইত্যাদি।

বর্তমান সংগীতভবনাধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার মশায় বিশ্বভারতী কলেজের রসায়ন অধ্যাপক হয়ে আসার আগে আশ্রমে সর্বপ্রথমে যেদিন পদার্পণ করেন, সে-দিনটিও মনে পড়ছে এ প্রসঙ্গেই। দিনুবাবু আমাদের দুপুরের ক্লাস এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবার নোটিশ জানিয়ে বলে দিলেন, "আসামের মন্ত্রীর জামাই আসছেন,—তাঁকে গান শেখাতে হবে, কয়েকটা দিন ব্যস্ত থাকব। তোমরা এক'টা দিন পরে এসো।" কৌতূহল হয়েছিল—কী গান। শোনা গেল তার অধিকাংশই নাকি রবীন্দ্রসংগীতের আদিযুগের ভারী তাল আর রাগরাগিনী-ঘেঁষা সব ভারী গান। যাঁর জন্য দিনুবাবুর এত আগ্রহ আয়োজন, শুধু কি মন্ত্রীর জামাই আর রসায়ন অধ্যাপক ব'লেই তাঁর এত আদর, না লোকটির গানের দরেও কিছু বিকোবার মতো কদর আছে? মনে আছে এই কৌতূহল দিনুবাবুই কথার ভঙ্গীতে বেশি করে বাড়িয়েছিলেন। তারপরে পাত্রচেনার-

জহুরি হিসাবেও অন্তত দিনুবাবুর যে পরিচয় আছে, আশা করি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ অনুমোদন ছাড়াও শৈলজাবাবু সম্পর্কে রবীন্দ্র সংগীতানুরাগীরা তা আজ স্বীকার করবেন।

এত কথা বলার অর্থ গুণীর গুণের সমঝদারিতায় এবং লোকের যোগ্য পাওনা মেটাতে দিনুবাবু ছিলেন দিলদরিয়া, মুক্তহস্ত। সভায় নয়, নিরিবিলিতে ব'সে তাঁর খালি কণ্ঠের সুর-মাধুর্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য-মণ্ডিত সংগীত উপভোগ করার ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে, শিল্পীর চেয়ে তাঁর শিক্ষকের আসনই ছিল প্রকট। কী গানে, কী অভিনয়ে, সর্বত্রই তিনি সেই শিক্ষকের পরিচয়ই বেশি দিয়েছেন। বড় স্রষ্টার পতাকাধারী হয়ে তাঁর স্বীয় সৃষ্টি যথা গৌরবে ফুটতে পায়নি। অথচ কবি তিনি শুধু ধাতে ছিলেন না, কবিতা লিখতেন, কাব্য ছাপিয়ে প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে "বীণ্" তেমন বাজল না। না বাজলেও স্বল্প রচনার মধ্যেই সংযত শিল্পবৈশিষ্ট্য ও বেদনার প্রাণশক্তিতে দিনেন্দ্রনাথের কবিতা কাব্যজহুরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং "কাব্য-দীপালি" নামক প্রসিদ্ধ বাংলা কাব্যসঞ্চয়নে তার থেকে দিনেন্দ্রনাথ হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত। দিনেন্দ্রনাথের বাংলা গান রচনাও অলংকার মণ্ডিত হয়ে গুরু গম্ভীর ধ্বনি ও ছন্দে সংগীতময়। গান যা লিখেছিলেন, বা, গানে যে-সব সুর দিয়েছিলেন, তাও রবীন্দ্রগীতি-সমুদ্রের তরঙ্গধ্বনির রেশটুকু ধ'রেই সসঙ্কোচে কোণে মিশিয়ে রইল। লেখকের লেখা তিন চারিটি গানে দিনেন্দ্রনাথ সুরযোজনা ক'রে দিয়েছিলেন, "সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা" ও "বিচিত্রা"য় তখন ছাপাও হয়েছিল। "রবীন্দ্র পরিচয় সভা"র তৎকালীন সম্পাদকরূপে শেষ পর্যন্ত তাঁকে দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের বিকাশ ও বিশেষত্ব ধ'রে ধারাবাহিক কিছু লেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। তিনটি বক্তৃতা লিখে তিনি "রবীন্দ্র-পরিচয় সভা"য় পড়েছিলেন। দিনেন্দ্র-রচনাবলীতে সেগুলি এখন অনুসন্ধিৎসুরা দেখতে পাবেন। রবীন্দ্র-সংগীতের ছাত্রমহলে বিশেষ ক'রে সে-কয়টি রচনা নিঃসন্দেহে চিরদিনই শিক্ষণীয় বিষয়ের চাবিকাঠির কাজ করবে। এই ক'টি লেখা রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষালয় মাত্রেই সুনির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত।

আশ্রমে গান ছাড়া সাহিত্য-অধ্যাপনার কাজও তিনি করেছেন। ইংরাজি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন ব'লে তাঁর নাম শুনেছি। "মডার্ন রিভিউ"তে তাঁর কৃত পুস্তক-সমালোচনাও দেখা গেছে। যোগ্য ব্যক্তিরাই বলতেন, ফরাসী সাহিত্যে তাঁর যে অধিকার ছিল তা অনুবাদ-ঘেঁষা নয়, প্রগাঢ় রূপেই তা নাকি ছিল মৌলিক। শিক্ষা তাঁর মধ্যে সার্থকতার নিদর্শন রেখেছিল শুধু বিদ্যাবত্তায় নয়, সংস্কৃতিগত সুকুমার চিত্তবৃত্তিতে ও মার্জিত অথচ সহজ-স্বাভাবিক প্রাণভরা আচরণে। প্রাণের পূর্ণিমার টানে সুর-সাগরে কিরূপে বান ডেকে দেশকে-দেশ ভাসিয়ে নিয়ে শস্যে-সম্পদে উর্বর ক'রে তোলে, তার জীবন্ত ছবিকে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় সেদিন তিনি মূর্ত ক'রে রেখেছিলেন। ছেলেদের-মাথা ফাগে লালে-লাল হয়ে দোল উৎসবে তিনি

বিপুল দেহ-দোলার সঙ্গে গানে গানে শালবীথি পরিক্রমা করতেন এবং সেই উপলক্ষেই তাঁর শ্রীনিকেতনের উৎসব-লীলাও যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, কী ভরা তিনি ভরিয়ে রেখেছিলেন দুই আশ্রমকে প্রাণ দিয়ে। আবার কোনোরূপ মাত্রা-ছাড়ানো উৎকট উৎসাহ বা উচ্ছৃংখলতার আভাস তাঁর পারিপার্শ্বিক সীমায় প্রশমিত হয়েছে শুধু একটিবার চোখ ফেরানোতে, বাক্যব্যয় ছিল নিষ্প্রয়োজন। গোল গোল সে অক্ষি-গোলক দুটি বেসুরোদের পক্ষে গুলিগোলার বাড়া। আশ্রমে তাঁর বৈকালিক বিহারের ছিল একটি বাঁধা জায়গা ও বাঁধা একজন সুহৃদ্—এখনো সেই 'তালধ্বজ' কুটির ও তেজেশ সেন মশায় আছেন তার স্মৃতিবাহী। কিন্তু "সুরপুরী"কে কি আজকের আশ্রমে অনেকেই চেনে ?

প্রতিমাপূজক না হলেও নিরাকার গোঁড়ামিরও দিনেন্দ্রনাথ পূজক ছিলেন না। বাঙালি হিন্দুর পাল-পার্বন, পূজা, ব্রতকথা, সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমান-ভাবেই তিনি উৎসুক ছিলেন মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সব জাতিরই মানুষের ভালোমন্দ খুঁটিনাটি, মানবোচিত সর্ববৈশিষ্ট্য ও ঘটনায় এবং উৎসাহী ছিলেন তার আলোচনাতেও। এক কথায় তিনি মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন মানুষের জীবনরসের বিচিত্র পথ ধ'রে। সেখানে কোনো শাস্ত্র-সংস্কৃতি বাদানুবাদের বাঁধাবাঁধি তাঁর পথ রোধ করত না। আবার তাতে উচ্ছ্বাসের উচ্ছলতাও ছিল না। রবীন্দ্র-সংগীতের দিক ধ'রেই লোকে তাঁর পরিচয় জানে বেশি, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-সংস্কৃতির একজন প্রায় সর্ববিষয়ী প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি। দেশের দিক থেকে বিশ্বের ভদ্রসমাজে দাঁড় করাবার মতো যে-শ্রেণীর পরিমিত সংখ্যক সুনির্বাচিত লোক হ'তে পারে, তাঁকে সেই মণ্ডলীর একজন বললেই যেন তাঁর যোগ্যস্থান তাঁকে দেওয়া হয়। এরূপ লোকপ্রিয় বিদগ্ধ সামাজিক লোকের জীবন্ত আদর্শ রয়েছে আশ্রমের ভিত্তিতে, আশ্রম-বাসীদের আজ এইটিই বিশেষ ক'রে স্মরণ করার দিন।

সুধীরচন্দ্র কর

শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্র জন্মবার্ষিকী সভায় পঠিত।

কবিতাগুচ্ছ

ডাক

অভিশপ্ত, ছিন্ন-ভিন্ন পৃথিবীর 'পর
এসো আজ হাতে-হাতে ধ'রে পুন বেঁধে যাই ঘর
যে ঘরেতে ঠাঁই হবে ঢের
তোমার, আমার,—আরো অনাগত অনেক জনের।
এই এক-ই সোনা রোদ, একই বায়ু, এক-ই আকাশ
সবাই সমানে বারো মাস
ক'রে যাবো ভোগ
রবে নাকো তার তরে বঞ্চনার কোনো অভিযোগ।
আবার এ নীড়াশ্রয়ী প্রাণের কপোত চঞ্চুপুটে
স্বপ্নের শস্যের কণা মাঠের সবুজে খেয়ে খুঁটে
মেটাবে মনের ক্ষুধা স্বচ্ছন্দে, আয়াসে।
আকাশে আকাশে
হারাবে দুরন্ত নীলে স্বপ্ন-মুগ্ধ মন।
প্রণয়ের প্রগাঢ় অঞ্জন
চোখে-চোখে দিই এসো, ভুলে যাই পুরোনো বিচ্যুতি;
দৃষ্টি-বিনিময়ে চিনি নয়নের অপরূপ দ্যুতি!

এইবার খুঁজি এসো অনুরাগ—হৃদয়ে-হৃদয়ে;—
মানুষের প্রাপ্য মূল্য দিয়ে যাই। স্বর্ণ-পিণ্ড লয়ে
কিনেছি অনেক ঘৃণা, অনিশ্চিত বহু বিসম্বাদ।
শোণিত-রঞ্জিত কত ইষ্টকের পিঞ্জর-প্রাসাদ
গ'ড়ে ভেঙে কতবার খেলা হল খেয়ালের খেলা!
ছায়া-ম্লান হয়ে এলো বেলা।

এখনো তো হৃদয়ের মাঝে
ক্রান্তির পরম লগ্নে গভীর আশ্বাস বেঁচে আছে।
উদার মাঠেরা ডাকে এখনো সবুজ ইশারায় ;
দুঃস্বপ্নেরে মুছে নিতে উদাস বাতাস ডেকে যায়।

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষ্যে নিখিলের এত আয়োজন
হৃদয়ের কাছে রোজ পাঠায় বিনম্র আমন্ত্রণ
প্রীত, অবহিত হতে ; সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ফের
এসো আজ স্বাদ লভি পরিচ্ছন্ন, সুস্থ জীবনের !
বিধাতার মত তারপর
নতুন সৃজনে মাতি তুমি-আমি এসো পরস্পর।
আমাদের এসেছে সময়—
আমরা তো যোগসূত্র ;—এসো রাখি অঙ্গীকারময়
অনাগত জীবনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর ;
সৌকর্যে, স্বস্তিতে ধন্য করি এসো মৃত্তিকার ঘর ॥

অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

অভিনন্দন—মণিকে

বোরখার চোখ আকাশ চুরির বদ্‌অভ্যাস
তোমরা কাটাবে।
মাঠে-প্রান্তরে, ঝড়ো রোদ্দুরে
অথৈ আঁচলে দু'হাতে কুড়াবে
ফসলের শীষে ঝিকিমিকি সোনা কী বিশ্বাস !

তোমরা ছড়াবে প্রাণের রং মাঠে ও বনে,
মজা-নদীস্রোতে জাগাবে বান।
মেঘে-ঢাকা গ্লানি সূর্যমুখীর চোখে
তোমরা টুটাবে, ছড়াবে গান
ঝড়ের হাওয়ার অমর উজ্জীবনে।

সময়-বুড়ির উকুনে-জটায় কুসংস্কার
পচা ডোবা আর তালদীঘি-ছায়াঘেরা।
জানি নিশ্চয় নীল দিগন্তে ফিরায়ে চোখ
আযুগ-বোঝাই প্রাণের পণ্য সেরা
বিলাবে তোমরা মরশুমে নব আত্মজিজ্ঞাসার।

সময় ঘুরবে তোমাদের হাতে নতুন বাঁকে :
উড়বে অলক নিশানোড্ডীন মহোৎসবে।
গণ-সংকুল ত্রস্ত পথের হৃদয়-দোলায়
দুলবে তোমরা, অশ্বসেনার ক্ষিপ্ররবে
নেতিবৃদ্ধের রাজ্য ডুবাবে বর্শা-ঝাঁকে।

প্রাণের রোশ্‌নি উথলানো এক সোনার হ্রদে
হাঁসের নিখাদ তোমাদেরো ঠোঁটে উন্মুখর—
মাঘী তুষারের গুটানো সর্পে কিই বা ভয়
তোমরা যখন জাগবে অতঃপর ?
ছুটবে যখন বীরাঙ্গনার মত্তপদে ?

পেয়েছি অভয় তোমাদের সেইদিনের কাছে
হাঘরে যদিও হৃদয় আজকে খেয়েছে ঘুণে।
কালের অর্ঘ্য তোমাদের গলে দুলবে ব'লে
সংঘাতে বাঁচি ভাবীপুরুষের নামতা গুণে,
শুভার্থী-চোখে শিশু-পল্টন তাথৈ নাচে !

অভিনন্দন তোমাদের মণি ! আগাম জানাই :
পদে-পদে মল, নিষেধের ডোর
ছিঁড়বে তোমরা, ছুটবে যখন জোয়ার-স্রোতে।
দুর্গ-শিখরে করতালি দিয়ে প্রাণ-মুখর
কোটি সূর্যের আসন টলাবে, আশীষ তাই।

সানাউল হক

যাই

এবার তবে যাই
এখনো কালো রাতের চোখে ঘুম তো নামে নাই ;
এবার তবে যাই।
বর্গী নাকি পালিয়ে গেছে, তবুও দেশ জুড়ে
বুলবুলিরা ধান খেয়েছে। অনেক পথ ঘুরে
তোমার গাঁয়ে এসেছি আজ রাতের মোহানায়
এখন সবে পা ফেলেছি তোমার আঙিনায়
হঠাৎ এলো ডাক
এবারে যাই তোমার মালা এবার তোলা থাক,
ওরা আমায় ডাকে।
রাত্রিজাগা ক্লান্তিসুরে ঝোড়ো পথের বাঁকে
বন্ধ্যা মাঠে শুকনো ধানচারায় ঘেরা আল
ঘূর্ণি ঝোড়ো হাওয়ায় ভাঙা ঘরের ভাঙা চাল,
চাষী বৌয়ের রিক্ত সিঁথি, শাঁখাবিহীন হাত
রাত্রিচারী পাখীর কালো ডানায় ঝাড়া রাত
ডাকে আমায় ডাকে,
মেঘের বুকে এখনো কত শিশির জমে থাকে
জীবন ব্যথাতুর,
প্রিয়া আমার শোনো না আজ হাওয়ায় কাঁদে সুর
জীবন কতদূর, বলো জীবন কতদূর।
চলোর্মিরা আছড়ে পড়ে মেঘনা মোহানায়
ধানের ক্ষেতে শিরশিরিয়ে বাতাস থেমে যায়,
বণিক রাজা যাবার আগে পাঁচিল দিল তুলে
ওপারে কাঁদে মেঘনা দিদি গঙ্গা এই কুলে।
আহা, ঢেউয়ের ছল্ ছল্,
আকুল ডাকে আমার বুকে কুমার চঞ্চল ;
নদীর ছল্ছল্ আর আকাশ টলোমল।
অনেকদূরে বিপাশাতীরে মায়ের হাহাকার
আমায় ডাকে, হারানো ছেলে খুঁজতে হবে তার,
কাদের পাপে চেনাব নদী বিষের নীলে নীল
কাদের পাপে জ্যোৎস্নারাতে দুয়ারে পড়ে খিল ?
মায়ের চোখে জল।

আমি যে শিব,
আমায় ডাকে নীলিম হলাহল।
দুখিনী মা'র দুখের ছেলে জমাট ভারী পায়
সেখানে নীল আকাশে কাঁচা মনের ছুটি চায়,
মুক্তি তার মেলেনা তবু কিউয়ের ভীড়ে ভীড়ে
কিশোর সোনাস্বপ্ন কড়া আঘাতে যায় ছিঁড়ে।
কিশোর বুক-কাঁপানো ভারি ব্যথার নিঃশ্বাস
রাতের চোখে অশ্রু হয়ে ভিজিয়ে দেয় ঘাস।
শীর্ণা বধূ অন্ধকূপে ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে
মলিনমুখে কিসের আশে এখনো চেয়ে থাকে।
সহুরে রাতে আকাশে কালপুরুষ থেমে যায়
পদ্মদীঘি নিথর কত নাম-না-জানা গাঁয়।
বর্গী বহুদূর
রোদনভরা হাওয়ায় তবু পাতাঝরার সুর,
জীবন কতদূর, আজ জীবন কতদূর ?

সন্ধ্যা নেমেছে তোমার কুটিরে। আমার ডাক
মরণ ছোঁয়ানো দেশ থেকে এলো আকুলস্বর।
কী ক'রে থাকব ? ঝঞ্ঝা-আহত যুগের পার
আমাকে যে আজ বেঁধে দিতে হবে নতুন ঘর।
এই নীল বিষ নিঃশেষে পান ক'রে আবার
প্রাণের ছোঁয়ায় জাগাতে হবে এ বালুর চর।
এদেশ হাসবে সোনায় সোনায়, গাইবে গান ;
সবুজে ও নীলে সে শুভদৃষ্টি স্বয়ংবর।
আমার দৃপ্ত বাহুতে এখনো অঙ্গীকার
আমি অশান্ত আমি দুরন্ত নভেম্বর ;
আবার আসব, হে কুঁচবরণ মেয়ে, তোমার
জীবনে আসব, আমার স্বপ্নজয়ের পর।

দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

মুখ

কখন আকাশ দেখি এসে ভিড় করে
আমার এ মুক্ত জানালায়।
সবুজ শাড়ীতে যেন জেগে-থাকা চাঁদ—
নক্ষত্র কি ডাকছে আমায় ?
হৃদয় দোদুল দ্যোতনায়।
তবু যেন জেগে উঠি আকাশের স্বরে।
একমুঠো জ্যোৎস্না কাঁপে ফ্রেমে আর কাঠে—
মুক্তপাখি জানালার 'পরে।

এমন আশ্চর্য রং কখনো দেখিনি—
অপরূপ সবুজ আকাশ।
নক্ষত্র জমানো ফেনা নীল প্লেটে যেন
—ছবিগুলি আনে কি আভাস ?
চেয়ে থাকি এ এক বিলাস।
তবু যেন মনে হয় এ আকাশ চিনি
—মাকড়্সা-জাল শেষে ;—জানালা-কপাটে
দোল খায় জ্যোৎস্না প্রতিদিনই।

আকাশ যে ভিড় করে মুক্ত জানালায়—
জ্যোৎস্না নয়, মুখ এক মনে পড়ে যায়।

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মৃত্যুঞ্জয়

অন্ধকার উঠোনের উপর দুটো শেয়াল ঘুর ঘুর করছে।

দয়াল তবু ঠায় বসে রইল ঘরের বন্ধ দরজাটার সামনে। মানুষের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারছে না জানোয়ার দুটো।

এদিক ওদিক করে দাওয়ায় সিঁড়িতে উঠে হঠাৎ অন্ধকারে এক জোড়া মানুষের চোখ দেখে শেয়াল দুটো থমকে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই পেছন ফিরে লেজ-গুটিয়ে তীব্রবেগে বেরিয়ে গেল দৌড়ে।

পৌষ শেষ হতে চলেছে, মাঘ আসছে। শীত তার শেষ থাবা বাড়াতে উদ্যত।

দয়াল মনে মনে বলে, কাল সংক্রান্তি। আমার অমর্তের বিয়ের পর প্রথম সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি!...গলাটা দুহাতে চেপে ধরল দয়াল। না, সে কাঁদতে পারবে না, টুঁ শব্দটিও না। ফেটে চৌচির হয়ে যাক তার বুক, দম বন্ধ হয়ে মরে যাক সে—তবু কাঁদতে পারবে না। না, টুঁ শব্দটিও না!...

গত সনের এমন দিনে অমর্তের বিয়ের কথা উঠেছে। তারপর কল ফলতে ফলল এই সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে। অমর্তের বিয়ে দিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে বউ ঘরে নিয়ে এসেছিল দয়াল। ডাগর ডোগর বোঁচা বোঁচা স্বাস্থ্যবতী সরল বউ; দয়াল নিজে পছন্দ করে ছেলের বউ এনেছে ঘরে। তার মা-মরা অমর্তের বউ! সেই অমর্ত!—

—হু-স্!...হু-স্!...

কাল-প্যাঁচা ডাকছে। হাতের কাছের লোহার শিকটা তুলে নিল দয়াল। শিক পোড়ালে কাল-প্যাঁচা পালায়। কিন্তু আগুন নেই। মালসার ছাই পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এক ফুলকি আগুন তো দূরের কথা।

ফেলে রাখল সে শিকটা। কোন অমঙ্গল আশঙ্কায় আর শঙ্কিত নয় সে। বুককে সে পাথর করেছে, মনকে করেছে লোহা।

দুদিন ধরে দয়াল এমনি ঠায় বসে আছে দরজার কাছে। দ্বারী প্রহরী যেমন পাহারা দেয় তেমনি। ছেলের বউকেও ঢুকতে দেয়নি ঘরে। ঢেঁকি ঘরে আস্তানা নিয়েছে বউ।

গাঁয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। মানুষগুলো সব যেন হঠাৎ পথ হারিয়ে হাতড়ে ফিরছে। তবু দু'চারজন এসে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, বলি একি ভিমরতি হল তোমার? ঘরের দরজা আটকে বসে রইলে, গাঁয়ের এমন অবস্থা, বউটাই বা থাকে কোন্ খানে?

দয়াল হাঁ করে চেয়ে থাকে। বুকের পুরনো জীর্ণ বেরিয়ে পড়া হাড় কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। নাকের ঝুলে পড়া ডগা কেঁপে ওঠে তর্ তর্ করে। নিরুত্তরে

তাড়াতাড়ি হাঁটুতে মুখটা গুঁজে দিয়ে হাত নেড়ে লোকজনদের ফিরে যেতে বলেছে। বলেছে : সংক্রান্তির দিন এইস, আমার ঘরে ই গাঁয়ের সগ্‌গলের নিমন্তন্ন।···

সকলের মনে উৎকণ্ঠা হয়েছে। দয়াল কি পাগল হয়ে গেল নাকি ফেরার ছেলের শোকে।

হ্যাঁ দয়াল পাগলই হয়েছে বটে। হু হু করে কি যেন ঠেলে এল দয়ালের গলার কাছে। ঘড় ঘড় শব্দ উঠল কণ্ঠনালীতে। দু'হাতে গলা চেপে ধরল দয়াল। —না। সে কাঁদতে পারবে না।

কালপ্যাঁচাটা তার সোহাগি কান্না থামিয়েছে। দয়াল ভাবছে—

ভাবছে—পরশুদিন গড়ান বেলার কথা।···

—

জোতদার ত্রৈলোক্য সরকারের খামারে উড়ছিল একটা নিশান। গাঁয়ের আধি-চাষী-বাসী মিলে সাব্যস্ত হয়েছে ফসল বাঁটোয়ারার একটা ন্যায্য নীতি। মান রইল জোতদার মহাজনের, তার খামারে বসেই ভাগ হল। হাসিখুশি জোতদার মহাশয় অতি প্রফুল্ল মনে 'বাবা' 'ভাই' বলে কয়ে বেঁটে দিতে লাগলেন। নিজের হাতে, সদাশয় ব্যক্তি লাল নিশান পুঁতে দিয়েছেন খামারে। জোড়-হাতে ক্ষমা ঘেন্না মেগে নিচ্ছেন। কেউ যেন কিছু মনে না করে। অনেকের অনেক ক্ষতি, অনেক সব্বোনাশ করেছে সে। অপরাধ করেছে।

আদ্যিকালের গান নয়। নতুন গান বেঁধেছে সবাই ধান-কাটার। ধান-কাটার নতুন গানের সঙ্গে সকলের ন্যায্য পাওয়ানা ভাগাভাগি করে নিচ্ছে।

দয়ালের জোয়ান ছেলে অমৃত খানিকটা গম্ভিমাস্তি হয়ে উঠেছে। একে একটা কথা বলে, ওকে বলে দুটো কড়া কথা। স্বদেশীবাবুদের মত আবার মোটা কথা বলে দু'চারটে। অনেকে বুঝতে না পেরে ঝাড়াই মাড়াইয়ের কাজ ভুলে বিস্মিত প্রশংসায় চেয়েই থাকে।—হ্যাঁ, দয়ালের ব্যাটা অমর্ত্তই বটে!

আর দয়ালের প্রাণটা খুশিতে উত্তেজনায় হু হু করে উড়তে চাইছে ওই ছোট্ট লাল নিশানটার মত, বাধাবন্ধনহীন খেয়ালীর মত। এত উৎসাহ, এত উল্লাস! ষাট বছরের ময়লা জমা রোমকূপে নোনা ঘামের ঝরণা বইছে। প্রাণের পটে ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে একটা মূর্তি, জোয়ান দয়ালের ঋজু চেহারাটা। গত বছর এমনদিনেই না ত্রৈলোক্য সরকারের পায়ের তলায় রক্তে ঘামে ভিজে উঠেছিল মাটি।—আর আজ!··· হে ভগমান! তুমিই গরীবের মা বাপ!···জোয়ান ছেলেগুলোর দিকে ফিরে তাকাল সে। ফোগলা দাঁতে হাসি ফোটে তার।—ছোঁড়াগুলো নিচ্চয় রঙীন সাড়ী আর ফুলেল তেলের নেশায় অমন অসুরের মত কাজ করতিছে। সব জানে দয়াল, ফাঁকি দিতে পারবে না কেউ,—হ্যাঁ।

কিন্তু ইতিমধ্যে পশ্চাতের আসন্ন ঝড়-সংকেতের মেঘ-ভ্রূকুটি নজরে পড়েনি কারুর। পড়ল তখন—যখন খ্যাপা জানোয়ারের মত গোঁ গোঁ করে উঠল একটা বিরাট দানব—মাত্র একশো হাত পেছনে। মস্ত বড় পাঁশুটে রঙের গাড়ীটা থেকে গোল সাজির মত পেতলের চকচকে টুপি মাথায় দেওয়া মানুষগুলো বন্দুক হাতে নেমে ছড়িয়ে পড়তে লাগল দূরে দূরে।

হকচকানি কাটল না। এলোপাথারি আগুনের টুকরো এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর তালা লেগে গেল কানে।

—বাবাগো!···দয়ালের ছেলে অমৃত পড়ল ছিটকে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল গর্দানা ফুটো হয়ে।

—অমর্তরে!···হামলে উঠল দয়াল।

রক্তগঙ্গায় দাপাদাপি করছে মানুষগুলো। রক্ত-স্নাত অমৃতকে বুকে নিয়ে দয়াল হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে আশ্রয় নিল ত্রৈলোক্য সরকারের পুকুরের ধারে ফণী-মনসার ঝাড়ে।

তারপর সে এক অকথ্য কাণ্ড! অসুরের দল গুলিবেঁধা মানুষগুলোকে টেনে হিঁচড়ে ওঠাতে লাগল মস্ত বড় গাড়ীটার রাক্ষুসে গহ্বরে। ত্রৈলোক্য সরকার লাফ দিয়ে বিচুলীর গাদায় উঠে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়তে লাগল লাল নিশানটা।

তারপর অসুরদের অভিযান চলল গাঁয়ের মধ্যে।···

ক্রমশ রাত্রি হল। অসুরেরা সমস্ত গ্রাম তছনছ করে চলে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশে একটা একটা করে তারা উঠল। সব বাতি নিভল গাঁয়ের। অন্ধকার ঝোপে ঝাড়ে মাঠে শেয়ালের দল বেরুল খাবারের খোঁজে। অন্ধকার আকাশ আর পৃথিবী ভরে উঠল জোনাকী আর নক্ষত্রে।

রাত্রি গভীর হল, গ্রাম হল নিস্তব্ধ। শুধু গাঁয়ের প্রান্তে মধুমতী একটানা গান গেয়ে প্রহর জাগিয়ে চলেছে!···দয়াল তখনও অমর্তের রক্তাক্ত দেহ বুকে নিয়ে ফণী-মনসার ঝাড়ে বসে আছে। পোকা মাকড় মশার প্রচণ্ড আক্রমণ খেয়াল করেনি সে। হাহাকার করেনি একবারও, শব্দ বেরোয়নি গলা দিয়ে একটাও। অমর্ত তার বেঁচে আছে কি মরে গেছে, সেটাও খেয়াল করেনি। শুধু বুকে নিয়ে বসে আছে।

রাত্রি কয়েক প্রহর পরে, যখন সারা পৃথিবী নিস্তব্ধ—অমর্তের দেহ বুকে নিয়ে টলতে টলতে উঠল দয়াল। টলতে টলতে এসে উঠল অন্ধকার উঠোনে।

ঘরের দরজা খোলা। ভয়ে ডরে বউ পালিয়েছে অন্য বাড়ীতে।

ঘরের লেপা মেঝেয় শুইয়ে অমর্তকে ডাকল দয়াল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল। সাড়া পেল না।—তার মা-মরা অমর্ত, গাঁয়ে ঘরের সব্বোজনের

আপনার মানুষ অমর্ত আর কোনদিন কি কথা বলবে না? বসবে না দশজনাকে নিয়ে, পরামর্শ দেবেনা সকলের আপদে বিপদে?

আবার হামলে উঠল কালপ্যাঁচাটা গলা ফাটিয়ে!—

দু'হাতে গলা চেপে ধরল দয়াল। হৃৎপিণ্ডটা ফুলে উঠল দম আটকানো ফানুসের মত। না, সে কাঁদতে পারবে না। টুঁ শব্দটিও নয়!

লোকে জানে অমর্ত ফেরার। আর দয়াল বসে আছে পরশু থেকে এমনি ভাবে। কাউকে ঢুকতে দেয়নি ঘরে; অমর্তের বউকেও না।

দয়াল নাকি পাগল? পাগলের মত সবাইকে নেমন্তন্ন জানিয়েছে পৌষ-সংক্রান্তির। দশজনারে ডেকে বসিয়ে কি বলবে দয়াল! কি বলবে? দন্তহীন চোপসানো ঠোঁটদুটো আবার কেঁপে উঠল তার থর থর করে।

আর বউ?...

অন্ধকার ঢেঁকি ঘরে বসে ছেঁচা বেড়ার ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছে বড় ঘরের উঠোনের দিকে। সেখানেও অন্ধকার—সব শূন্য!

মনটাও অন্ধকার। একটা অজানা শঙ্কায় ভয়ে আর বিস্ময়ে ছেয়ে আছে সারাটা মন।

বুড়ো শ্বশুরের কাণ্ড দেখে একটুও বা প্রত্যয় হয় ব্যাপারটা কি? মানুষগুলান্ এবার সভা সমিতি করে, মাঠে মাঠে কোঁদল করে, মহাগাণ্ডি সরকারের হুকুম গেরাহ্যি করলে না। তৈলোক সরকারের খামারে গেল ন্যায্য পাওনা আদায় করতে।

তারপর ঘটল একটা ডাকাতি কাণ্ড। মানুষগুলোকে শেষ করেছে সরকারের সেপাইরা। কাটা পাঁঠার মত দাপাদাপি করেছে মানুষগুলো। সেপাইরা তবু তাদের গাড়ীর মধ্যে করে তুলে নিয়ে গেছে সদরে।

তার মধ্যে আবার সাদা সিদে শ্বশুরের এই কাণ্ড! খুলে কিছু বলে না, খেতে দিলে খায় না। সেই মানুষটা যে কোথায় গেল, তাও কি ছাই মুখ ফুটে বলে? ওই ঘর আগলে বসে আছে। কি মহা দব্য আছে সেখানে—তা সে-ই জানে।

দেখে শুনে তার চোখের জল আর বাধা মানছে না।

আজ তে-রাত্র পার হয়ে যায়, মানুষটা ফেরার হয়ে গেল কোথায়—কাক-পক্ষীর মুখেও সে খবর নেই। লুকিয়ে বংশীকে সদরে পাঠিয়েছিল সে। সেখানেও নেই।

তবে মানুষটা গেল কোথায়?

নিদ্রাহীন অন্ধকার রাত—কালপ্যাঁচার এ বিরহ-কান্নায় যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার কাছে। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে—সত্য মিথ্যে নানান্ রকম অমঙ্গল আশংকায়।

পোড়া মনে আবার রাগও হয়। কবে কোন্‌দিন সে এমন একলা ঢেঁকি ঘরে রাত কাটিয়েছে! ফেরার বলে কি হতভাগী সুমিকে একবার মনেও পড়ছে না? —তে-রাত্র কেমন করে কাটে সোয়ামী ছাড়া এমন বিপদ আপদের সময়—, একবার কি বিবেচনাও হয় না?

এই ক'মাসের বিবাহিত জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত্রির কথা মনে পড়ে সুমির।

কত চোখের জল আর কত হাসি! স্বপ্ন নয়, পলে পলে বেড়ে ওঠা জীবনের ভাঁড়ার! সুখে দুঃখে গজিয়ে ওঠা নিরালার শত পাঁপড়ি মেলা ফুল!

এই সেদিনেও কত কথা। লড়ায়ে জেতা বীর লড়িয়ের মত বলেছে: ভাবনা কি, লড়ায়ে লেইমেছি। তৈলোকের টিপ সই যারা শাস্তরের কেতাব মধুমতীর জলে ভাসায়ে দিয়ে আইসব। জীবনভর ঠকে না মানুষ—বোজচো?

তারপর কেষ্টযাত্রার ঢংএ আদর করে বলেছে: পান-পেয়সী রাধে আমার, সব দোবায়—যা তুই চাস্!—

সুমি আর কিছু চায় না, শুধু তাকেই চায়। বছর বছর সে লড়াই করবে, আদর করে বলবে শুধু—সব দোবায়।

ফেরার তো কি। আঁধার রাতে একদণ্ড দেখা দিয়ে গেলে কি দোষ আছে? কোন্ মনিষ্যিটা টের পাবে? —মাঠ নিরিয়ে কুপিয়ে পা ধোয়ার সবুর সয় না যে মানুষটার, ধুলো কাদা পায়ে রোজ আসত খুনসুটি বাধাতে, সুমিকে কাঁদিয়ে হাসিয়ে একাকার করত, বহু রাত্রি পর্যন্ত অফুরন্ত উৎসাহে সমিতির কথা শোনাতো, নতুন গান, নতুন জীবনের কথা শোনাত, আজ তে-রাত্রি তিনদিন কোথায় ফেরার হয়ে আছে সে? কেমন করে আছে!

শ্বশুরের কাণ্ড দেখে আর সোয়ামীর ফেরারে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়ে ভয়ে ভাবনায়, নানান্ দুশ্চিন্তায় সে এবার ছেঁচা বেড়ায় মাথা দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। তার ওই ছোট বুকে এত দুর্ভাবনা এত দুঃখ আর সইছে না।

এমনি করে বউ শ্বশুরের রাত পোহায়।

আজ পৌষ সংক্রান্তি। প্রতি বছরের রীতি পাব্বোন পোষ-বরণের দিন আজ। অমর্তের বিয়ের পর এই প্রথম পৌষ! দয়াল নড়ে চড়ে বসে। গলা খেঁকারি দেয়। হামলে উঠলে চলবে না, চলবে না গলার স্বর কাঁপতে দিলে। বউকে ডেকে নির্দেশ দেয়: কই, গেলা কো-হানে? নেপা পোছা কর………

সন্তর্পণে আর একবার গলা খাঁকারি দিয়ে কথা শেষ করে দয়াল ; মা লক্ষ্মীরে আগলাও। বাওড়ে এট্টা ডুব দিয়ে এইস। মানুষ জনা আসবে'নে সকল। পৌষ সংক্রান্তির নিমন্তন্ন !······

কথা শেষ করতে করতে বালিকা-বধূর দিকে চেয়ে কি যেন ঠেলে আসে আবার গলার কাছে। দু'হাতে গলা চেপে ধরে সে। না, টুঁ শব্দটিও নয়।

ঝুমি অবাক হয়ে যায়। নিশ্বাস জমাট হয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। পাব্বোন করবার দিন নাকি এটা ? হায় ভগবান ! ঘরের মানুষ ফেরার, বিপদ মাথায় করে কোন আঘাটায় না জানি আছে পড়ে, সে করবে পাব্বোন ? লজ্জার মাথা খেয়ে অভাগী তার হিদয়ের কথা বলবে কারে ? এই তো সেদিনের বউ। এখনও পড়শীরা দেখতে এলে লাজ-তরিবৎ বজায় রেখে চোখ বুঁজে মুখ দেখাতে হয়। হিদয়ের কথা হিদয় দিয়ে যে বুঝত সে মনিষ্যিটা কোথায় কে জানে !

গোবর মাটীর জল নিয়ে সে উঠোন দাওয়া লেপতে বসে। মা লক্ষ্মীর সেবাই সে করবে পবিত্ত মনে। সোয়ামীর তার মঙ্গল হোক, তাজা শরীলে ফিরে আসুক।

এদিককার কাজকর্ম সেরে, চান করে নতুন চিনির-টুকরো চারাটা থেকে আমের পল্লব নিয়ে বাড়ী ঢোকে ঝুমি। লাউ মাচায় মেলে দেওয়া জলে কাচা পুরনো শাড়ীটা পরে। বংশীর বাড়ী থেকে নিয়ে আসা সিঁদুরের মস্তবড় টিপ পরে একটা কপালে। আর চকিতে চোখ ছাপিয়ে জলের ঢল নামে। হায় গো ! ফেরার হলেও মানুষটা কি পাষাণ ! আজ না পোষ-সংক্রান্তি ?

ঝুমির কপালে অতবড় টিপটা দেখে দয়ালের হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে খুঁড়ে যেতে থাকে। হায়, আবাগী একি সব্বোনাশ করেছে ? ভগবান ! দয়ালকে অন্ধ করে দাও তুমি !

ক্রমে বেলা বাড়ে। মানুষজন আসে দু'চারজন করে। নিমন্ত্রণে আসার মত মনের অবস্থা নয় কারুরই। আর এটাও তারা বোঝে, ফেরার ছেলের শোকে দয়াল বুড়োর মতিভ্রম ঘটেছে।

অমৃতর সমবয়সী তার পেয়ারের দোস্ত উকিলউদ্দিন এসেই হাঁক দেয় : কই গো খুড়ো ! এ্যাই যে, বইসে আছো।

দয়ালের কাছ থেকে একটু দূরে বসে সে। বোকার মত হেসে বলে : দোস্তর আমার ক্যারামতিডা বড় সোন্দর। শালাদের চ'কি ধুলা দিয়া কেমন ফেরার হলি দেইখেছ ?

—তুই চুপ যা দি'নি ! ধমকে ওঠে রফিক শেখ।

—অবস্থাটা বুইজবার লাগে—বোজচো ? হলধরও উকিলকে বলে ওঠে।

নিরতিশয় অমায়িকতায় ঘাড় কাৎ করে উকিল নখ দিয়ে মাটিতে আঁক

কাটতে থাকে। কোথায় একটু অন্যায় হয়ে গেছে বুঝতে পারে সে। এদিক ওদিক দেখে সন্তর্পণে চায় হাঁটুতে মুখ গোঁজা দয়ালের দিকে। লেপা উঠোনে কাঁচা রোদ তার সোনালি অঙ্গ পেতে দিয়েছে। সকলেই একটু রোদ ঘেঁষে বসে। পৌষ যায়; মাঘ আসে, জার বড় বেশি। হাঁড়ে কাঁপুনি দেয়। ছোট ছোট কালো পোকা ওড়ে, কয়লার গুঁড়োর মত লেপটে যায় গায়ে। চোখের মধ্যে গিয়ে কটু কটু করে।

কিন্তু আবহাওয়াটা যেন অস্বস্তিকর, বড় থম্‌থমে।

—তবে ইডা বইলবার নাগে, মিত্যু হয় নাই কারু! —উকিলউদ্দিন আবার বলে ওঠে।

—সদর থে' আমি খবর নিয়ে আলাম। তবে বললে না পেত্যয় যাবা তোমরা, সব কীর্তির কীর্তিমান কিন্তুন্‌ ওই নষ্ট তৈলোক সরকার। খুব খেলাড়ী দেখাল। কিন্তুন্‌ হলি কি হবে, দোস্ত আমার ঠিক চ'কি ধূলা দেছে—হাঁ!—

হেসে ওঠে উকিলউদ্দিন।

—আ-হাঃ! একেবারে ছাও-পানের মতন সুরু করলা দেখি? প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে হলধর।

আচমকা ধমকে চম্‌কে উঠে সারা মুখে লজ্জার হাসি নিয়ে খানিকটা অপরাধীর মত মাথা নিচু করে উকিল।

দয়াল তার কোটরাগত চক্ষু তুলে ধরে। উঠোন ভরে গেছে লোকে। ঢেঁকিঘরের দরজায় জলজলে সিঁদুর কপালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুমি।

একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ উঠল তার গলায়। আর বাধা মানতে চাইছে না মন। তাকে বলতে হবে অমর্তের কথা। ওই জ্বল্‌জ্বলে সিঁদুর-টিপটার পানে চেয়ে বলতে হবে। বলতে হবে তার লড়ায়ে ব্যাটার কথা।

—কিন্তু কচি লাউ ডগার মত নরম বউটা কেমন করে পরাণ ধরে রাখবে! কে হাত দিয়ে মুছিয়ে দেবে বোঁচা মেয়েটার ইহকালের সর্বস্ব ওই সিঁদুরের টিপ!

লজ্জা সরম ভুলে সুমি উঠোন ভরা মানুষগুলোর দিকে চেয়ে আছে। এত মানুষ, নেই শুধু সেই ফেরার মানুষটা। দশজনারে নিয়ে যে ওঠবোস করে, সব্বোজনের মধ্যে যারে চোখে পড়ে প্রথম, লড়ায়ে নামার ডাক দেয় যে সকলের আগে—সে নেই! শত দিনের সহস্র স্মৃতিতে উথালি পাথালি করে বুকটা। কপালের টিপ থেকে ঝরে পড়া সিঁদুরের লালচে নাকের ডগাটা কেঁপে ওঠে তির্‌ তির্‌ করে।

উঠোন ভরতি লোক উসখুসু করে। সকলের মনে বড় অস্বস্তি জমাট হয়ে ওঠে। কি বলতে চায় দয়াল?

উকিলউদ্দিন একটা দমকা নিশ্বাস ফেলে বেমক্কা বলে ওঠে: এট্টুখানি তামুক পা'লি হত।

—আরে এ ছোঁড়া তো মহা পাজি। রহিম শেখ ভ্রু কুঁচকে গালি দিয়ে ওঠে।

উকিলউদ্দিন ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কথাটা তার বলা ঠিক হয়নি। খুব গম্ভীর হয়ে ওঠে সে।

তিন দিন তিন রাত্রি পরে দয়াল উঠে দাঁড়ায়। দাওয়ার ধারে এসে সকলের দিকে একবার তাকায়। সকলের সামনেই তার দন্তহীন চোপসানো ঠোঁট থর থর করে কেঁপে ওঠে।

—আমার অমর্তরে···তোমা'গো অমর্তরে আমি দেই নাই! বোধহয় ফুঁপিয়ে উঠল দয়াল।

উঠোনের মানুষগুলো মুহূর্তে যন্ত্রের মত নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেল। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল সকলের চোখগুলো। কি বলতে চায় বুড়ো?

লাঠি ভর দিয়ে ঘরে ঢোকে দয়াল। একটু পরেই লাঠি ভর করে টলতে টলতে বেরিয়ে আসে। কাঁধে তার কালো রক্তে ভরা অমৃতর জোয়ান দেহটা।

— ও হো হো!··· একটা শব্দ ওঠে বহুকণ্ঠের আর্তনাদের।

সকলের সামনে অমর্তর দেহ রেখে দয়াল ফিরে তাকাল সুমির দিকে।

ঘোমটা খসা পাথরের মূর্তি! কাঁপল না, ফোঁপাল না। নিষ্পলক এক জোড়া চোখ কালো রক্তে ছাওয়া লোহার মত প্রকাণ্ড দেহটার দিকে চেয়ে রইল।

—আমার অমর্ত!···দয়াল ভাঙা গলায় সুরু করে: বুকে ধরে বইসেছিলাম। ডাকাতগুলানরে দেই নাই ছিঁড়তে খুঁড়তে, কাক-পক্ষীর অগোচরে আগুলি রাখছি। আর পাইরলাম না। লড়ায়ে প্রাণ দেছে আমার অমর্ত···

গলাটা বুঁজে এল দয়ালের।—শত্তুরেরা খুন করছে আচমকা পেছন থে'। পালা পাব্বোনের দিন আজ—আমার অমর্তরে আজ তোমাগো হাতে তুইলে দিলাম।

সমস্ত মানুষগুলো পাথরের মত খাড়া হয়ে রইল।

দয়াল কপালে হাত দিয়ে ভ্রু কুঁচকে তাকাল বাওড়ের দিকে। হাত তুলে ডাকল সবাইকে: শোন! সকলে দয়ালের দিকে ফিরে তাকাল।

—হুই ত্থাখো।—বাওড়ের দিকে আঙুল দেখাল সে।

সবাই ফিরে তাকাল। গোল সাজির মত পেতলের টুপিগুলো জল্ জল্ করছে। চক্ চক্ করছে সুদীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ বেয়নেটের ডগাগুলো। টুপিগুলো সারি সারি বাওড়ের ধার দিয়ে মাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে সুশৃংখল ধীর গতিতে।

—ওরা আমার মরা অমর্তরে নিতে আসতিছে, খুন করতি আসতিছে সগ্‌গল অমর্তরে। চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল দয়াল।

পরমুহূর্তেই ধানের গোলা দেখিয়ে হেঁকে উঠল সে : লড়াইয়ের ধান, আমার অমর্তের প্রাণ ওই ধান ওরা কাড়ি নিতি আসতিছে। আদি-চাষী-বাসী সগ্‌গলে কও, ধান মান দেবা, না প্রাণ দেবা ?

প্রতিজ্ঞায় স্থির মুখগুলো কঠিন হয়ে উঠল। গনগনে জলন্ত অঙ্গারের মত জলে উঠল চোখগুলো।

আগুন ঝরছে সুমির চোখ থেকে। কখন চোখে দু'ফোঁটা জল আসতে আসতে শুকিয়ে দাগ ধরে গেছে।

দয়ালের ডাকে এগিয়ে এল সে। দয়াল তার হাতে তুলে দিল লাঠিটা। মরা অমৃতের রক্তাক্ত কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে এক ফালি বেঁধে দিল লাঠির ডগায়।

তারপর বসে পড়ে দয়াল। অমর্তের গাল আর মুখটা কাঁপন-ধরা হাতে একবার আলতো ভাবে বুলিয়ে নেয়।

ধান-কাটা রিক্ত মাঠের বুকের উপর দিয়ে তখন টুপি-পরা বন্দুক হাতে ছায়াগুলো এগিয়ে আসছে সুশৃংখল ধীর গতিতে।...

সমরেশ বসু

"সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য"

আইয়ুব সাহেব সাহিত্যের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে গিয়ে সাম্যবাদের মূল ভিত্তিতেই ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য প্রবন্ধের মুখবন্ধে তিনি, আজকের দিনের সাহিত্যিকের পক্ষে যে গজমোতিমিনারে মানস-বিলাস আর সম্ভব নয়, তাকে যে আজ এসে পড়তেই হবে সাধারণ মানুষের জীবনক্ষেত্রে, 'এই সত্যকে মামুলি অভিবাদন জানিয়েছেন। যদি এই সত্যে তাঁর বিশ্বাস থাকত তাহলে প্রবন্ধে এই সত্যের বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ তাঁকে করতে হত না। আর তিনি শুধু সন্দেহই প্রকাশ করেন নি, সাম্যবাদের সাহিত্য-ব্যাখ্যার রীতি যে ভুল এই সিদ্ধান্তেই একেবারে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর মূল আপত্তিগুলি আলোচনা করবার আগে, আজকের দিনের শিল্পীর গণমানসে আবশ্যিক অধিষ্ঠানের যে উদাহরণ তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, সেই উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে যে আইয়ুব সাহেব গণসাহিত্য বলতে বোঝেন বুর্জোয়া সাহিত্যিকের গণ-সমস্যা নিয়ে নিষ্কাম, উদার রোমন্থন—তার বেশি কিছু নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঐ সমস্যা সম্বন্ধে শেষপ্রায় জীবনে ঐটুকু সচেতন হওয়াটাই কীর্তি বলে গণ্য হতে পারে কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ বাংলার কৃষক জীবনের ভাঙনের ও মধ্যবিত্ত জীবনে সেই ভাঙনের সূত্রপাত, যা সেই যুগেই হয়েছে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন কোনো দিনই হলেন না—জীবনের সমস্ত অভাব এবং দৈন্যের, সমস্ত অপূর্ণতার আধ্যাত্মিক সমাধানে এমনিই তাঁর বিশ্বাস। তবে তিনি যে 'আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী' থেকে 'ওরা কাজ করে'তে চলে এসেছেন সেইটাই যথেষ্ট। কবিতাটি আমি আংশিক উদ্ধৃত করছি :

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি

শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে

* * * * *

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
ওরা কাজ করে।

* * * * *

জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-জোড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

কিন্তু এই পংক্তি ক'টির মধ্যে আসল কথা হল 'জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,' অতএব মাভৈঃ—ইংরেজ চলে যাবে, কোনো ভয় নেই। জনগণের বিপ্লব যে সেই জিনিস ঘটাবে, জন-জাগরণই যে 'ওদের' মুক্ত করবে এ কথা ঐ কবিতার কোথাও নেই। যারা দাঁড় টানে আর ধান বোনে তারা ঐ অবস্থাতেই আরও দীর্ঘকাল ধরে দাঁড় টানতে আর ধান বুনতে থাকবে; ইতিমধ্যে রাজছত্র ইত্যাদি বিলীন হবে কালস্রোতে। সেইটুকু যে কি সান্ত্বনা তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। শুধু পরিবর্তনহীন দীর্ঘতর স্থায়িত্ব কোন্ কল্যাণটা সাধন করবে? 'জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র' চিহ্ন না রাখলেও বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ (যা এখনও ভারত ছাড়েনি) ভারতবর্ষকে যে মৃত জ্যোতিষ্ক করে দিয়ে যাবে তার কি? যারা কাজ করে তারা কাজ করতেই থাকবে, এতো গতানুগতিকতার পরাকাষ্ঠা। যারা কাজ করে তারাই বাঁচবে এ বাণী তো কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হল না।

কোনো মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন হলে সেটা যে মানুষকে নিজের বিপ্লবী কর্মের সাহায্যেই আনতে হবে এ কথা কবি বলেন নি কবিতার মধ্যে; তিনি যেন বলছেন, কোনো চিন্তা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে; ওরা আর ক'দিন? এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে মৌলিক পরিবর্তনের বিরোধী তাদেরই কবি সাহায্য করে গেলেন। আর মৌলিক পরিবর্তন যে বিপ্লব ছাড়া হয় না এ কথা জানা থাকলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কবির ঐ নিরপেক্ষ, নিষ্ক্রিয় দৃষ্টি কাদের স্বার্থ সিদ্ধি করবে। তাই জনমানসে শ্রদ্ধাশীল, গণজীবনে অংশগ্রহণকারী কবির বাণী বলে ঐ কবিতাকে গ্রহণ করতে বাধা আছে। আজকের দিনের সাহিত্যিক হলেই যে উচ্চ মিনারচূড়া থেকে একেবারে পথে নেমে আসবে—আইয়ুব সাহেবের এই কথা তাই মানা চলে না। চূড়া থেকে পথ অনেকখানি দূর। মাঝখানে অনেক বিশ্রামের স্থান আছে নানান ধরনের শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে। কবি যে শ্রেণীর মুখপাত্র তিনি সেই শ্রেণীর ভাবধারাই রূপায়িত করবেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও

তাই সম্ভব হল না বোঝা যে আজকের দিনের ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে বাঁচাতে হলে যা করা দরকার তা হল পুঁজিবাদের লোপসাধন আর সে লোপসাধন করবে তারাই যারা এই পুঁজিবাদের পুঁজির-চাপে কুব্জপৃষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে সেই কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্তেরা। সেই কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্তের ভাঙনের মধ্যে থেকে জাগরণের, বিপ্লবের বাণী যে শোনাতে পারবে সেই হল বর্তমানের সার্থক কবি। কারণ অন্য কোনো শ্রেণী আজ আর প্রগতিশীল নয়; তারা সকলেই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে কোনো না কোনো উপায়ে জীইয়ে রাখতে চায়। তাদের মুখপাত্র যে কবি সেও তাই জনগণের কবি নয়, প্রগতির পথ সে বেছে নেয়নি বা নিতে পারেনি: 'মুক্তি ও উন্নত জীবনযাত্রার জন্য জনগণের সংগ্রামে যার চরিত্র শাণিত হয়েছে, শুধু তারই সঙ্গে আজকের যুগের সামঞ্জস্য আছে।' (কমিউনিজম্, তত্ত্ব ও শিল্প—লোর্ কাসানভা)। যে কবি এইভাবে শাণিত নয় সে প্রগতির কবি হতে পারবে না আজকে। সাম্য চাই, মৈত্রী চাই, জীবেম: শরদ: শতং, পশ্যেম: শরদ: শতং বলে চেঁচালেই কাজ হবে না। সে মানুষ বহুকাল থেকে চেঁচিয়ে আসছে। কাজে নামতে হবে। বুর্জোয়া কবি এই বাস্তব কর্মকেই (Practical action) ভয় করেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল।' এই জানি বলে সর্বজ্ঞ হয়ে বসে থাকলেই প্রতিক্রিয়ার হাতের পুতুল হতে হবে। মিনারচূড়া থেকে মনে মনে শুধু নেমে এলে কোনো কাজ হবে না, শুধু সম্ভব হবে জনগণের দুঃখদৈন্য নিয়ে মানস-বিলাস। বিলাস যারা করে না তাদের কবিতার উদাহরণ দিচ্ছি:

হে সূর্য,
　　তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
　　তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকে এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
　　পরিণত হবে,
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
　　তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
　　আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।
　　　　　　　　　　(সুকান্ত ভট্টাচার্য)

আইয়ুব সাহেব মুখে 'সমাজ-জীবনের ভাঙা-গড়ার মাঝখান' দিয়ে কবিকে নিয়ে যেতে চাইলেও তাঁর উদাহরণটি গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ কবির বাণী নয়। তিনি নবজাতকের সঙ্গে নরঘাতকের দ্বন্দ্বকে দূর থেকে সেলাম করেছেন, বলেছেন, 'জানি

তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল।' আজকের দিনে জন্মালেই যে আজকের দিনের কবি হওয়া যায় না এ কথা সতর্কতার সঙ্গে মনে রাখা দরকার।

প্রবহমান, পরিবর্তমান, সৃষ্টিমুখর সমাজ-জীবনে সমষ্টির বিপ্লবী কর্মধারার মূল্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা থাকার জন্যেই তিনি ডিমিট্রিয়ফের কথার রসবাদীসুলভ ব্যাখ্যা করে ফেলেছেন, ভুলেছেন যে সাহিত্যের সাধন (Instrumental or means) এবং চরম মূল্য বলে পৃথক কিছু নেই—তার মূল্য সব সময়েই নির্ধারিত হয় তার সমাজ-জীবনে কার্যকারিতা দিয়ে। সমাজে যখন মোটামুটি স্থিতি আছে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত নয় তখন সমাজ-জীবনে কর্মের চেয়ে মননের (pure contemplation) তাগিদ থাকে বেশি—মনে হয় মনন বা Contemplationই বুঝি জীবনের চরম কথা। তাই কর্ম থেকে মুক্তিই, পরিপূর্ণ স্থায়ী কর্ম-বিচ্যুত মননই সবচেয়ে কাম্য হয়ে দাঁড়ায়: 'সমাজের অবস্থা যখন মোটামুটি স্থিতিশীল, তখন যাঁরা মনীষী, যাঁরা শিল্পী, তাঁরা নিজেদের বোঝাতে পারেন যে, সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার প্রধান উপায় হল উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ গবেষণা, রসসৃষ্টি ব্যাপারে স্বকীয় পরীক্ষা এবং নব নব আঙ্গিকের আবিষ্কার। কিন্তু জনতার অভিযান যখন চলে, সমাজে যখন আলোড়ন, তখন আর ঐ ভুল করা যায় না।' (কমিউনিজম্, তত্ত্ব ও শিল্প—লোর কাসানভা)। সামাজিক ভারসাম্যের নড়চড় হলে প্রথমেই ধাক্কা লাগে বঞ্চিত জনগণের ওপর। উপরতলায় যারা থাকে তাদের সচেতন হতে দেরী লাগে কিংবা তারা সচেতন হয়ই না। নীচের তলায় ধাক্কা লাগলে উপরতলার লোকেরা যত দোল খায় ততই চায় নীচে প্যালা লাগাতে—কোন রকমে সেই ব্যবস্থাকেই টিঁকিয়ে রাখতে। আজ জনগণ যখন বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে তখনও বুর্জোয়ারা চিরন্তনত্ব, কল্যাণ, শিব ইত্যাদি গতিহীন, অর্থহীন ধারণার (concept) মোহবিস্তার করতে থাকে নিজেদের এবং জনগণের ওপর, চেষ্টা করে নিজেদের এবং তাদের বিপ্লবী কর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। তারা চায় না পরিবর্তন। তাই বিপ্লবী কর্মপন্থাকে এবং যে-কোনো কর্ম-পরিকল্পনাকে তারা জীবনের নিম্নতর দিক বলে নাক সিঁটকোয়; উচ্চতম স্থান দেয় খাঁটি মননকে। তারি থেকে জন্মায় নানা আধ্যাত্মিক মতবাদ, কর্মকে বন্ধন বলে প্রচারের বাসনা এবং শেষ পর্যন্ত কর্মকে এড়াবার চরম অস্ত্র অদৃষ্টবাদ—'জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল।'

একটা বিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় যে শ্রেণী সুখের অধিকারী হয়, সে কেবলি চায় সেই ব্যবস্থাকেই অটুট রাখতে—সে ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থাই হোক আর পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থাই হোক। আর সেই সুখী শ্রেণীই সাধারণত হয় কৃষ্টির ধারক, বাহক কারণ তাদেরি থাকে সৃষ্টির অবকাশ। ধীরে ধীরে তারা জীবনের মূল কর্মপ্রচেষ্টা থেকে যত সরে আসে তত তারা হারায় সৃষ্টি-প্রেরণা। শেষে তাদের দর্শনে,

সাহিত্যে জীবনের গতিশীলতার পরিবর্তে চলে সনাতন আর চিরন্তনের ছড়াছড়ি, পরিবর্তনের অসম্ভাব্যতার নানান যুক্তি, কর্মকে অস্বীকার। যারা কাজ করে তারা হয় হেয়-শ্রেণীভুক্ত : 'Plato, for example, in seeking to uphold the moral and political values of his class, and thus to preserve the status quo, sought to find them rooted in the eternal structure of the universe. This automatically took them away from the scrutiny and criticism of the ordinary citizen (not to mention the slave) and left them the province solely of the thinker, the gentleman of leisure who could spend his life in the contemplation of these eternal truths. Thus, at one and the same time, he made reality consist in these changeless principles, only dimly manifested by our mundane material world, and set up the ideal of the aristocratic philosopher who, contemplating these truths, was alone capable of ruling society.' (What is Philosophy—Howard Selsam). প্লেটোর মতে দার্শনিকেরাই হবেন 'রাষ্ট্রের অভিভাবক।' ম্যাসিডনীর সাম্রাজ্যের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে অ্যারিস্টটল-এর দর্শন আর একটু বাস্তব-ঘেঁষা হলেও অবকাশ-বিলাসীদের সেই সনাতন, চিরন্তনের ভিত্তিতে কোনো ফাটল তিনি ধরাননি : 'But he could only conceive society on a slave basis and this consideration seems to have influenced much of Aristotle's thought concerning human beings. In his Ethics, he develops his ideal of human life. It is an ethics for the rich man, denying in fact that the poor man can ever be virtuous, and of course not considering slaves at all. Again, as with Plato, the purpose of all human society is that a few might live lives of leisure and wealth, supposedly then to engage in the highest of all activities —the pure knowing of the first principles of the Universe (What is Philosophy—Howard Selsam). কৃষ্টির ধারক, সমাজের অবকাশ বিলাসীরা জীবনের মূল কর্মপ্রচেষ্টা (economic activity) থেকে যত সরে সরে যাবে ততই তারা এই কর্মহীন খাঁটি জ্ঞানকেই চরম মূল্য দিতে থাকবে—সে জ্ঞানের বাস্তব মূল্য কিছু থাক বা না থাক। এমন কি বাস্তব মূল্য যত কম হবে তত বাড়বে তার আধ্যাত্মিক মূল্য—সামাজিক আর আধ্যাত্মিক জীবনে আসবে মৌলিক বিরোধ। তার একমাত্র ফল হবে—বৈরাগ্য-সাধনেই মুক্তি।

কিন্তু সেই পলায়নে কোনো লাভ নেই। জীবনের সমস্যার কোনো সমাধানই সেই পলাতক জীবন-দর্শন দেয় না। তাঁরা যখন অবকাশ-রঞ্জন করতে থাকেন তখন সমাজের অত্যাচারিতদের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে বিপ্লব। এই কর্মহীন বিলাসীরা

সেই বিপ্লব যে ঠেকাতে পারেন না তার প্রমাণ ইতিহাসে বারে বারে মিলবে। তার কারণও খুব স্পষ্ট। যে শ্রেণী সমাজের মূল অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সেই জানে মানুষের শক্তির উৎস কোথায়, কেমন করে মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির ওপর জয়লাভ করে নিজের সভ্যতার এবং ক্ষমতার পরিধি বাড়াচ্ছে—সত্যকারের বাস্তব জ্ঞান অর্জন করছে সে কর্মের মধ্যে দিয়ে : 'The process of knowledge, which is a process of reflecting the ever deeper connections of the material world, can arise only when the conditions are ripe for the development of real social history ; when socially controlled production becomes possible, when organic life is no longer subject to the merely unconscious operations of cause and effect, but comes under conscious and deliberate social control'. (Text Book of Marxist Philosophy ; page 69). তার কারণ 'the struggle of Man and Nature is a material movement which in the field of thought takes the form of the subject-object relation, the oldest problem of philosophy. It becomes an insoluble problem only because the division of society into classes, by separating the class which generates ideology from society's active struggle with Nature, reflects this cleavage into ideology as a separation of subject from object whereby they become mutually exclusive opposites'. (Illusion and Reality —P. 137). তাই knowledge-এর চরম রূপ বুর্জোয়া সমাজে হয়ে দাঁড়ায় কর্মহীন মানস-বিলাসের প্রলাপ। যারা এই বিলাসে গা ভাসাতে পারে না, সমাজ-ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে চলে কর্ম-প্রচেষ্টার নীচের তলা থেকে, সেই বঞ্চিত জনগণ প্রকৃতিকে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানব-সমাজকে পরিবর্তিত, উন্নততর করে চলে। তারা ব্যক্তিমানস ও বহির্বিশ্বকে কর্মহীন মননলোকে আলাদা করে দেখে, শুধু ব্যক্তিমানসের বস্তুহীন (contentless) ভ্রান্তিবিলাসে মগ্ন হয় না। তারা বোঝে বহির্বিশ্বকে পরিবর্তন করার চেষ্টাতেই যেমন বিশ্ব পরিবর্তিত হয় তেমনি ব্যক্তিও হয় পরিবর্তিত, উন্নততর। চিরন্তনের দোহাই দিয়ে বসে থাকলে খুব জোর অরণ্যে রোদন করার অধিকার জন্মাতে পারে, তার বেশি কিছু নয়: 'Man learns about reality in changing it......Science is the sum of changes in perceptual worlds produced by men in their history, preserved, organised, made handy, compendious and penetrating' (Illusion and Reality—P. 140).

এই পরিবর্তনের তাগিদ যখন সমাজে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে, যেমন এখন হয়েছে তখন যারা সমাজে এগিয়ে চলে সেই কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্তেরা কর্মমুখর

হয়ে ওঠে—আগের যুগের ভারসাম্য ভেঙে গিয়ে কর্মচাঞ্চল্য যায় বেড়ে। বিপ্লব ঘটিয়ে পঙ্কিল এই সমাজ-ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে দিয়ে মুষ্টিমেয়ের প্রতিষ্ঠার জায়গায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই তখন হয়ে ওঠে একমাত্র শ্রেয় কর্ম। এবং সাহিত্যিক যেহেতু অগ্রগামী জনগণের মুখপাত্র তাঁর সাহিত্যেও তাই থাকতে হবে ঐ বিপ্লবের, ঐ মৌলিক গঠন কর্মের প্রবর্তনা। তা যদি না থাকে তাহলে তিনি ঐ যুগে জন্মেও ঐ যুগের সার্থক সাহিত্যিক বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার পাবেন না এবং তাঁর সাহিত্যও তাই হবে স্বধর্মচ্যুত, প্রতিক্রিয়াশীল। ডিমিট্রিয়েফের ঐ কথার উদ্দেশ্য হল সাহিত্যিককে তাঁর সামাজিক এবং একমাত্র দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া; তাঁর স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করাও নয়, তাঁর স্বাধীনতা হরণ করাও নয়। সাহিত্যের সামাজিক বৃত্তিই (function) যে একমাত্র বৃত্তি, এই সত্য ডিমিট্রিয়ফ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান। সাহিত্যের এই দায়িত্ব যে আইয়ুব সাহেব অস্বীকার করেন তা নয়। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর প্রবন্ধে, 'তাঁরা (সাহিত্যিকেরা) হাজারো লোকের মতন হাজারো লোকের মাঝখানে কাজ করতে পারেন। কিন্তু তার চেয়েও যেটা বড় কথা, তাঁরা হাজারো লোককে দিয়ে কাজ করাতে পারেন তাদের অনুভূতির গভীরতম স্তবকে মায়াকাঠি বুলিয়ে।' এই যে কাজ করানোর প্রবর্তনা, সে যত সূক্ষ্ম যত পরোক্ষই হোক না কেন, এই হল সকল সাহিত্যের মূলীভূত দায়িত্ব। শেলী পর্যন্ত বলেছিলেন: 'Poets are not only the authors of language and of music, of the dance and architecture, and statuary and painting; they are the institutors of laws, and the founders of civil society and the inventors of the arts of life' (A Defence of Poetry). তারপর 'The connexion of poetry and social good is more observable in the drama than in whatever other form (A Defence of Poetry). এই social good কেমন করে সাহিত্য ঘটায় তার সম্বন্ধে শেলীর মন্তব্য অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়: '...I have what a Scotch philosopher characteristically terms "a passion for reforming the world." But it is a mistake to suppose that I dedicate my poetical compositions solely to the direct enforcement of reform (অর্থাৎ সাহিত্য প্রচার নয়), or that I consider them in any degree as containing a reasoned system on the theory of human life.....But poetry acts in another and diviner manner. It awakens and enlarges the mind itself by rendering it the receptacle of a thousand unapprehended combinations of thought........The great instrument of moral good is imagination; and poetry administers to the effect by acting upon the cause' (Preface to 'Prometheus Unbound' and A Defence of

Poetry) এমন কি চরম কলাকৈবল্যবাদী ক্রোচেও স্বীকার করেছেন যে শিল্পীর 'lyrical vision' amoral হলেও externalisation এর ব্যাপারে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব অনস্বীকার্য। আর কর্মই যেহেতু জ্ঞানের এবং জীবনের মূল, সেই হেতু জীবনের থেকে উদ্গত সাহিত্যের মায়াজগতের একমাত্র বৃত্তি হল কর্মের প্রবর্তনা দেওয়া ; বিশুদ্ধ রস উদ্রেক করা নয়—সে আমাদের বিশ্বনাথ, জগন্নাথ এবং আধুনিক আলংকারিক অতুল গুপ্ত যতই বলুন না কেন। আরিস্টটল পর্যন্ত তাঁর Poetics গ্রন্থে ট্র্যাজিডির বৃত্তি (function) Katharsis ঘটানো বলেই উল্লেখ করেছেন, বিশুদ্ধ রসোদ্রেক করা নয় (Poetics : ch 6.) জীবনের মূল কর্মপ্রচেষ্টা থেকে সরে যাওয়ার ফলে এবং গণসংগ্রামে পেছিয়ে থাকার ফলে একশ্রেণীর রসবাদীদের ঐ প্রকার দৃষ্টিভ্রংশ হয়েছে। ওঁরা তাই সাহিত্যের চরম মূল্য নিয়ে এত অকারণে ব্যস্ত—ওঁরা তাই সাহিত্যকে সাধারণের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাই রজার ফ্রাই তাঁর বলেন : 'The artist of the new movement is moving into a sphere more and more remote from that of the ordinary man. In proportion as art becomes purer the number of people to whom it appeals gets less. It cuts out all the romantic ovetones of life which are the usual bait by which men are induced to accept a work of art. It appeals only to the aesthetic sensibility and that in most men is comparatively weak.' (Vision and Design). গণমানসে ভিত্তি নেই বলে সাহিত্য যে মরে যাচ্ছে এ বোধ নেই তাঁর। খাঁটি হতে হতে সে যে উবে যাবে, তার চেতনা এঁদের জাগে না। তার সামাজিক বৃত্তি লুপ্তপ্রায় বলেই তার প্রয়োজনীয়তা গিয়েছে কমে। তাই সাহিত্য মুষ্টিমেয়ের অবকাশ বিনোদনের, এমন কি দুরূহ, দুষ্প্রকাশ্য আবেগের বাহন হতে গিয়ে অসামাজিকতার, রূপায়ণের অসম্ভাব্যতার চোরাবালিতে নিজের অপমৃত্যু ঘটায়। 'In a class society the workers do their tasks blindly as they are told by supervisors. They build pyramids but each contributes a stone ; only the rulers know a pyramid is being built. The scale of the undertakings makes possible a greater consciousness of reality. but this consciousness all gathers at the pole of the ruling class. The ruled obey blindly and are unfree.

The rulers are free in the measure of their consciousness. Therefore the exercise of art becomes more and more their exclusive prerogative, reflecting their aspirations and desires.

......As the ruling class becomes more and more parasitic and delegates increasingly its work of supervision, it itself becomes less free, It repeats formally the old consciousness of yesterday. Yet

the reality it expressed has changed. The class is no longer truly conscious of reality, because it no longer holds the reins whose pressure on its hands guided it. The exercise of art, like the exercise of supervision, becomes a mechanical repetition by stewards and servants of forms, functions and operations of the past. Art perishes in a Byzantine formality or an academic conventionality little better than religious dogma. Science becomes mere pedantry—little better than magic. The ruling class has become blind and therefore unfree. Poetry grows in no such soil' (Illusion and Reality Pp. 42-43). রুজার ফ্রাই যে এই সমস্যা সম্বন্ধে একেবারে অচেতন তা নয়: 'শিল্পের ইতিহাস থেকে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মহত্তম শিল্প সব সময়েই গোষ্ঠী-মানসের আদর্শ-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ—অবশ্য শিল্পীর ব্যক্তিগত রূপায়নের মাধ্যমে' (Vision and Design)। রসবাদীরাও কুনীতিপূর্ণ সাহিত্য পড়তে মানা করেন। কিন্তু বুর্জোয়া হিসেবে শ্রেণীধর্ম (class role) তাঁরা পালন করবেনই। তাই কর্ম-প্রবর্তনার বদলে মানস-বিলাসের রসদ জোগানোই সাহিত্যের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাঁরা বলেন রসো বৈ সঃ, রসবোধ ব্রহ্মাস্বাদসহোদর, রসবোধেই সাহিত্যের শেষ। এই বিপথগামী, ক্ষয়িষ্ণু রসিকদের ডিমিট্রিয়ফ যখন স্মরণ করিয়ে দেন সাহিত্যের সামাজিক এবং একমাত্র বৃত্তির কথা, তখন তাঁরা মনে করেন সাহিত্যকে বুঝি টেনে নামিয়ে পথের ধুলো মাখানো হচ্ছে, শ্রমিকের মত তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার চেষ্টা হচ্ছে। ঐটাই যে সাহিত্যের একমাত্র মূল্য, অন্য কিছু নয়, এ কথা কলা-কৈবল্যবাদীদের ভাবতে মন দ্বিধায় ভরে যায়।

আইয়ুব সাহেব তবু বলেছেন, 'কডওয়েল দেখিয়েছেন যে বর্বর জাতিগুলির নৃত্যও প্রধানত ব্যবহারিক, চাষবাস শিকার প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কর্মের সঙ্গে সর্বদা জড়িত। সভ্যতার গোড়াতে শিল্পকলার মূল্য ছিল নিতান্ত প্রয়োগসিদ্ধ। সভ্যতার শেষ পর্যায়ে আবার তার উপকরণ মূল্যকে সর্বেসর্বা ঘোষণা করে কি আমরা ইতিহাসের চক্রগতির প্রমাণ দিতে চাই?'

সভ্যতার গোড়াতে সাহিত্যের যে ঐ বৃত্তি ছিল এবং তারপরে সে বৃত্তি বদলে সে 'নিজেই নিজের শেষ' পর্যায়ে পৌঁছেছে—এ কথা কডওয়েলের প্রামাণ্য নয়; তাঁর প্রামাণ্য হল সাহিত্যের সামাজিক অর্থাৎ যাকে আইয়ুব সাহেব নিতান্ত ব্যবহারিক মূল্য বলেছেন সেই মূল্যই সাহিত্যের একমাত্র মূল্য। তিনি বলেছেন Illusion এর স্তরে ঐ যে আবেগ সৃষ্টি হল সেটা বর্বর মানুষটিকে সমষ্টিগত আনন্দ দিল তেমনি সেই আনন্দের ফলে জেগে উঠল কর্মোন্মাদনা; তার প্রকাশ হল বাস্তবজীবনে। Illusion আর realityর, সাহিত্যের আর জীবনের এই হল

পারস্পরিক সম্বন্ধ। আইয়ুব সাহেব ঐ আবেগটুকুকেই চরম করে দেখতে চান কিন্তু আবেগেই আবেগের শেষ যে হতে পারে না, সেটা যে অতিবড় মনস্তাত্ত্বিক প্রমাদ এ কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। শিল্প ও জীবনের সম্বন্ধ সম্পর্কে কডওয়েল বলছেন: 'কবিতা স্বভাবতই গীতিধর্মী বলে জন-সমষ্টি একসঙ্গে সেই গান করতে পারে; সেই কবিতা হয় সমষ্টির একীভূত আবেগের প্রকাশ।......

'কিন্তু সমষ্টির একীভূত আবেগের প্রয়োজন কেন? একটা বাঘ, কি কোন মানুষ শত্রু, কি বৃষ্টি, কি ভূমিকম্প এলে সমষ্টি জৈব-প্রবৃত্তি বশেই (instinctively) সেই উদ্দীপকে সাড়া দেয় (respond)। এই সব উদ্দীপকের (stimulus) বাস্তব উপস্থিতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাড়া জাগানোর জন্যে কোনো অতিরিক্ত মাধ্যমের (instruments) প্রয়োজন হয় না; ভয়ত্রস্ত একপাল হরিণের মতই বর্বর জন-সমাজ একসঙ্গে সাড়া দিয়ে ওঠে।

'কিন্তু যখন কোনো দৃশ্যমান উদ্দীপক সামনে নেই অথচ ঐ রকম উদ্দীপকের উপস্থিতির সম্ভাবনা আছে তখন সাড়া দেবার জন্যে তৈরি হতে হলে সমষ্টির পক্ষে অতিরিক্ত মাধ্যম প্রয়োজন। এই মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা থেকেই গোষ্ঠীর অর্থ-নৈতিক জীবনে কবিতার উৎপত্তি—এমনি করেই বাস্তব জগত থেকে সৃষ্টি হয় মায়াজগতের।

'পশুর জীবনে না হলেও মানুষের গোষ্ঠীজীবনে এমন কতকগুলি কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে যেগুলি প্রবৃত্তিজাত (instinctive) নয় কিন্তু যেগুলির প্রয়োজন হয় অজৈবিক (non-biological) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে—যেমন কৃষিকর্ম।' সামাজিক কর্মের মাধ্যমে তাই প্রবৃত্তিগুলিকে ঐ কৃষিকর্মে প্রয়োজিত করতে হয়। এই সামাজিক কর্মের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হল গোষ্ঠী-উৎসব—কবিতার জন্মক্ষেত্র। কবিতাই তাদের আবেগের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে সেই সব আবেগকে গোষ্ঠী-কর্মের খাতে প্রবাহিত করে। বাস্তব স্পষ্ট উদ্দেশ্য যে শস্য উৎপাদন সেটা উৎসবের উৎসাহে কল্পনায় রূপায়িত হয়। বাস্তব শস্য সামনে থাকে না বটে। কিন্তু কাল্পনিক শস্য সামনে রয়েছে কল্পলোকে। নৃত্যের বেগে, স্বরের তীক্ষ্ণতায় আর ছন্দের গভীর মোহে বর্তমান পারিপার্শ্বিক থেকে গোষ্ঠী-মানস যেমন সরে এসে আত্মস্থ হয় অমনি বর্তমানের শস্যবিহীনতা থেকে সে নীত হয় কল্পলোকের কল্পনার শস্যের মাঝখানে। সেই কল্প-শস্য তখন হয়ে ওঠে সত্যতর। গান শেষ হয়ে গেলেও অনুপ্ত কল্পলোকের শস্য সেই গোষ্ঠীর পক্ষে আরও বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে, সেই শস্য বাস্তবে ফলানোর জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রম স্বীকার করতে তাদের প্রণোদিত করে।

'এমনি করে কবিতা, ধর্মানুষ্ঠান, গান প্রবৃত্তির সঞ্চিত শক্তির উদ্দীপনে গোষ্ঠীকে সাহায্য করে সমষ্টিগত কর্মের খাতে সেই শক্তিকে বইয়ে দেয়। সেই

সব কর্মের প্রত্যক্ষ কারণ অথবা উদ্দেশ্য এখনও দৃশ্যমান ত নয়ই; প্রবৃত্তিরও সেই সব কর্মের দিকে স্বাভাবিক এষণা নেই।' (Illusion & Reality—P. 26-27).

'এই সমষ্টিগত আবেগ কর্মে প্রেরণাই শুধু জোগায় না, কর্মের সময় পর্যন্ত সেই আবেগের রেশ তাদের কণ্ঠে গান হয়ে বাজে, কর্মে দেয় আনন্দ। এখনও মুটে-মজুর মজুরনীরা গানের ধুয়ার সঙ্গে কাজ করে।' (Illusion & Reality, P 28).

কবিতার বা সাহিত্যের এই বৃত্তিই হল একমাত্র বৃত্তি—বিভিন্ন যুগে সে-বিভিন্ন রূপ নেয় এই পর্যন্ত। সাহিত্যের এই বৃত্তি সম্বন্ধে সচেতনতার বদলে তার কল্পিত পরম মূল্যের এই অন্বেষারও কারণ দেখিয়েছেন কডওয়েল: The increasing division of labour, which includes also its increasing organisation, seems to produce a movement of poetry away from concrete living, so that art appears to be in opposition to work, a creation of leisure. The poet is typically now the solitory individual, his expression, the lyric. The division of labour has led to a class society, in which consciousness has gathered at the pole of the ruling class, whose rule eventually produces the conditions of idleness. Hence art ultimately is completely separated from work, with disastrous results to both, which can only be healed by the ending of classes. (Illusion & Reality—P 28). কবিতাকে, সাহিত্যকে পুনর্জীবিত করতে হলে, তাকে স্ববৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই শ্রেণী-বৈষম্য ভেঙে নবতর সমাজ গড়তে হবে বিপ্লবের মাধ্যমে। আজকের সাহিত্যিকও তাই বলবে জনতার জাগরণের কথা। সেটা সাহিত্যের বৃত্তির অধোগতি নয়, বর্বর সমাজের আদিমতার পুনরাবৃত্তিও নয়, কেন না সমাজ চলে কম্বুগতিতে ওপরের দিকে, চক্রগতিতে একই খাতে নয়। তাই আপাত দৃষ্টিতে পুনরাবৃত্তি মনে হলেও সেটা প্রগতি: 'It will be seen that the final movement of society has this parallel to primitive communism, that once again man turns outward from the ego to reality, and looks the world steadily in the face.' (Illusion & Reality P 296). আজকে তাই প্রগতিশীল সাহিত্যের উপাদান এবং লক্ষ্য স্থির হবে গণ-জাগরণের বিভিন্ন রূপ দিয়ে; সেই জাগরণেই উদ্ভব হবে সব কিছু মূল্যের কেন না সেই জাগরণই আজ একমাত্র সামাজিক সত্য। কর্মহীন মননের চরম বিলাসের জোগান দেওয়া যে সাহিত্যের কাজ নয় এ কথা আজ আর বুঝতে ভুল হলে চলবে না। উপকরণ-মূল্য বলে সাহিত্যের মূল বৃত্তিকে আজ পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আর নেই: 'জনসাধারণের ক্ষিপ্র অগ্রগতির যুগে সংস্কৃতি ব্যাপারে সৃষ্টি-উপাদানের উৎসের সঙ্গে যে-লক্ষ্য-সিদ্ধির শক্তি সেই উপাদান সমূহকে বিকশিত

করে, তার অঙ্গাঙ্গিত্ব জন-আন্দোলনও তখনি উপলব্ধি করে'। (লোর কাগানভা—কমিউনিজম, তত্ত্ব ও শিল্প)। তখনই সাহিত্য হয় পুনর্নবায়িত।

আর তার ওপর উপকরণ এবং উদ্দেশ্য, সাধন ও সাধ্যকে যেরকম একান্তভাবে (absolutely) আলাদা করে আইয়ুব সাহেব দেখছেন তা কি দেখা সম্ভব? সাধন ও সাধ্য ছুটিই আপেক্ষিক শব্দ—এক সূত্রে কোনো জিনিস সাধন আবার অন্যসূত্রে সেই সাধ্য। চরম সাধ্য বা চরম মূল্য বলে যে কিছু নেই এই দার্শনিক সত্যে সন্দেহের অবকাশ সাম্যবাদীর নেই। কারণ জীবন চলমান; সে কোথাও গিয়ে থিতিয়ে পড়ে না—ঐ চলতে চলতেই মানুষ উন্নত থেকে উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থায় নীত হয়: This dialectical philosphy dissolves all conceptions of final, absolute truth, and of a final absolute state of humanity corresponding to it. For it nothing is final, absolute, sacred. It reveals the transitory character of everything and in everything; nothing can endure before it except the uninterrupted process of *becoming* and of passing away, of endless ascendancy from the lower to the higher. (Ludwig Feuerbach, P. 22—Engels). কোনো অবস্থাকেই চরম বলে স্বীকার করতে হলে জীবনের গতি যায় থেমে এবং প্রয়োজন হয় জীবনের সমস্ত সমস্যা এবং সম্ভাবনার সম্বন্ধে পরিপূর্ণতম জ্ঞানের। তা না হলে সেই পরম মূল্যবান অবস্থার ধারণা করবে কি করে মানুষ? সে সর্বজ্ঞতা কোনো সময়েই সম্ভব নয়। তবু মানুষ সবটুকু জানতে পারে না বলে কিছুই জানতে পারে না, এও হল রাগের এবং কাজ করতে না চাইবার অজুহাত: 'However conditional and imperfect our knowledge at any stage may be, it reflects objective meterial reality, appproximating to absolute truth. The fact that we can and do know the truth and are really in touch with objective meterial nature is proved to us by our practice, which turns our knowledge into actual existing objects of production and remakes and changes material actuality.' (Text Book of Marxist Philosophy—Pp. 23-24). 'মানুষের জ্ঞান বেড়েই চলেছে, প্রকৃতির ওপর তার অধিকার বিস্তৃততর হয়েই চলেছে, কিন্তু কোনো সময়েই সে সব জ্ঞানের শেষে পৌছোচ্ছে না। মানুষের জ্ঞানের যে কোনো বিভাগের ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রমাণ করবে।' (Text book of Marxist Philosophy Pp. 113-114)।

সব সময়েই মানুষের জ্ঞান আংশিক মাত্র, সম্পূর্ণ নয়; তাই তার অগ্রগতিও কখনও থামবে না। আর এই জ্ঞান যেহেতু ব্যক্তিমানস ও বহির্বিশ্বের দ্বন্দ্বের

প্রতিফলন সেইজন্যে স্বতস্ফূর্ত জ্ঞানের (*a priori* knowledge) কোনো সম্ভাবনাই থাকছে না : সত্য, শিব ও সুন্দরের কোনো অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ধারণা ব্যক্তিমানসে নিহিত থাকবার কোন্ যুক্তি আইয়ুব সাহেব দেবেন ? সাহিত্যের পরম মূল্য হিসেবে যে স্বতস্ফূর্ত বোধের উদ্বোধন তিনি কল্পনায় করেছেন সেই পরম মূল্যের কোন অস্তিত্বই স্বীকার করা সম্ভব নয়, ঐ সত্য, শিব ও সুন্দরের কল্পবিলাসকে সত্য বলে গায়ের জোরে মেনে না নিলে। তিনি বলেছেন ঐ তিনটি মূল্যের বোধ সকলেরই কম বেশি আছে এবং তার হেরফের-ও খুব বেশি নয়। এই মূল্যজ্ঞানকে সাধারণ সত্যাসত্য বিচারের যে সাধারণ বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড আমাদের আছে তা দিয়ে বিচার করা যায় না। কিন্তু কেন যায় না, কেন এই ত্রয়ীকে পরম বলে স্বীকার করে নেব তার কোন যুক্তি আইয়ুব সাহেব দিতে পারেন নি। অথচ প্রমাণের দায়িত্ব তাঁরই কারণ তিনিই ওদের অস্তিত্ব সকলকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চান। কোনো বিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় সেই সমাজের ব্যক্তিবিশেষদের মনোমণ্ডলস্থিত জ্ঞান-বিশ্বাসের মূল নির্ধারণ করতে হলে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে সেই সমাজের যুগযুগান্তরের মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের ধারা। তা না হলে আপাতদৃষ্টিতে যা কিছু দুর্বোধ্য মনে হবে তাকেই একটা পরম মূল্য বলে স্বীকার করে নেবার ঝোঁক দেখা যাবে। আইয়ুব সাহেব সত্য, শিব, সুন্দরের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি কি এ কথা অস্বীকার করতে পারেন যে যুগে যুগে একই জনগোষ্ঠীর চরম সত্য, কল্যাণ এবং সুন্দরের বোধ বদলে বদলে এসেছে। ভগবান ত চরম সব-কিছু। কিন্তু এ কথা ত জানতে বাকি নেই যে theriomorphism থেকে আরম্ভ করে আজ আমরা solipsism এ এসে পৌছেছি সেই ভগবানের বোধের বিবর্তনের ধারায়। প্রাচীন গ্রীক সমাজে-ক্রীতদাস থাকাই সমাজের পক্ষে পরম কল্যাণকর বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল আজ কিন্তু তা আর হয় না। আর সুন্দরের কথা তো না বলাই ভাল। সক্রেটিস এ কথাও না কি বলেছিলেন 'The useful are the beautiful' (Xenophon's Memorabilia) ; আর প্লেটো ত সৌন্দর্য-সৃষ্টিকারী সাহিত্যিককে তাঁর রিপাবলিক থেকে একেবারে বের করে দিয়েছিলেন ; তিনি তো স্বীকারই করতেন না যে সাহিত্যিক সত্যের সন্ধান দিতে পারে, (III & X books of The Republic)। Neo-classic যুগে সুন্দরের যে বোধ ছিল রোম্যান্টিক যুগে কি তাই ছিল ? ক্লাইভ বেল-এর অনুসরণে significant form-এ আশ্রয় নিলেও এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের হাত থেকে নিস্তার নেই। কোনো বোধকেই পরম বলে স্বীকার করে নিলে সত্য-ভাষণের বদলে সত্যের অপলাপই সেই জন্যে করা হবে। সত্য, শিব ও সুন্দরের নির্বিশেষ (abstract) অর্থহীনতা থেকে বিশিষ্ট সত্য, কি বিশিষ্ট কল্যাণ কি বিশিষ্ট সুন্দরে এলেই আইয়ুব সাহেবের কথার প্রমাদ সহজেই ধরা পড়বে।

তাই সাধারণ থেকে বিশিষ্ট রূপে আসতে এঁদের এত আপত্তি। এঁরা কথায় কথায় কল্যাণের দোহাই পাড়েন অথচ সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণকর যে কোনো কাজই এঁরা সেই কল্যাণবোধের প্রভাবে করে উঠতে পারেন না। মহাপুরুষদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা এঁদের। কিন্তু মহাপুরুষদের বাণী, গুরুবচন, এঁরা যে কি ভক্তির সঙ্গে মানেন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার আছে কি? 'দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সবাই জানেন জনগণকে খাওয়ানোর ভার শ্রেষ্ঠীও নেয় নি, রাজাও নেয়নি, নিয়েছিল 'ভিক্ষুনীর অধম সুপ্রিয়া'। স্বয়ং বুদ্ধও তাদের কল্যাণবোধ জোগাতে পারেন নি। মানুষ যখন না খেতে পেয়ে মরে এঁরা তখন জনকল্যাণের খাতিরে জগতের অপরিবর্তনীয়তা এবং ধর্মের বিচিত্র গতির দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। ১৯২৯ সালের ঐতিহাসিক অর্থ-নৈতিক সংকটের পর থেকে চার্চের কর্তারা হাজার হাজার বাণী উদ্গীরণ করেছেন এই প্রমাণ করে যে এই দুঃখ ভগবানের দেওয়া এবং তা ভালোর জন্যেই। এতে আর কারও কল্যাণ না হোক, কল্যাণ হয়েছে ফোর্ড-রকফেলারদের। এই প্রচার মানুষকে বিদ্রোহের পথ থেকে সরিয়ে রেখেছে। এই মানুষ যদি একবার বিদ্রোহের পথে অন্যায়ের প্রতিকারের আস্বাদন পায় তাহলে আর তাদের সত্য, শিবের দোহাই দিয়ে শান্ত করে রাখা যাবে না। জগতের, অর্থাৎ কিনা পুঁজিবাদী জগতের, অপরিবর্তনীয়তা রক্ষা করা যাবে তখন কি দিয়ে? তাই Concrete কথাবার্তা ছেড়ে abstract generalisation-এর স্তরে বিচরণ করেন বলে বুর্জোয়া বুদ্ধি-জীবীরা সব সময়েই বিশিষ্ট তথ্যকে এড়িয়ে চলেন, সুন্দরের বিশিষ্ট ধারণার ক্রম-বিবর্তনের কথা না বলে নির্বিশেষ সুন্দরের কথা বলেন। সুন্দরের সার্বজনীন ধারণার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একদা এক অধ্যাপক বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন, রোমবিহীনতা সৌন্দর্যের একটা অবিসংবাদিত লক্ষণ। জীব যত উচ্চস্তরে অভিব্যক্ত হচ্ছে ততই তার দেহে রোম কমে আসছে। তখন কেউ একজন উত্তর দিয়েছিল ঘিয়ে-ভাজা কুকুর তাহলে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। বিশিষ্ট তথ্যে এলেই এঁদের এই বিপদ হয়। তখন আর ঐতিহাসিক ক্রম-বিবর্তনকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না।

'It is characterisitc of most metaphysicians that they should fail to comprehend that the reflection of truth is an historic process. But admitting the absolute immutability of all that exists (including also truth itself), they hold that our ideas straightway grasp the object just as it is. The categories, which they use in this metaphysical fashion, are in their opinion eternal. Thus for instance the English economists, the fore-runners of Marx (Adam Smith,

Ricardo) considered the category "capital" as an absolute reflection of the relationship between people in the whole course of human history begining with primitive times and ending with bourgeois society. The researches of Marx (from the standpoint of the new social class) disclosed the complete futility of this metaphysical understanding of capitalism.' (Text Book of Marxist Philosophy, P. 112) অন্য উদাহরণ দিচ্ছি ফরাসী বিদ্রোহের আগে ফরাসী mechanical materialistদের সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সেই সব প্রতিষ্ঠানকে পরিবর্তিত বা দূরীভূত করবার অক্ষমতা থেকে: 'But it (the unhistorical approach to human institution and ideology) goes deeper, extending to their conceptions of institutions like the monarchy, the union of church and state, feudal economic relations, as well as to the nature of the institutions and relations they would substitute for these. They thought, for example, that by bringing the doctrines of the christian church to the light of reason they would destroy these doctrines and the organised church. This followed from their naive conception that religion was just something foisted upon gullible men by scheming deceivers. Had they actually studied the church and its teachings historically, they would have understood it better and learned that religion was an expression of human needs and aspirations could not be satisfied in any more real and genuine way in actual life.' (What is Philosophy ?—Howard Selsam)

এই যুক্তির পাশ কাটাতে গিয়ে আইয়ুব সাহেব বলেছেন অন্য সব মূল্যবোধ সম্বন্ধে যাই হোক ঐ পরম ত্রয়ী বিবর্তনহীন, শাশ্বত, নিত্য কেন না ওদের মেনে না নিলে সমাজের প্রগতির কোন স্থায়ী বিনির্ণায়ক তো পাওয়া যাবেই না, সাহিত্যেরও উৎকর্ষাপকর্ষের বিচারের কোন মানদণ্ড পাওয়া যাবে না। সাম্যবাদী জীবনবেদ না কি গুণগত পার্থক্য মানে না এবং প্রগতির কোন মানদণ্ডই না কি সাম্যবাদে নেই। সাম্যবাদের ঐ ত্রুটি সংশোধনের এক মাত্র উপায় হচ্ছে ঐ ত্রয়ীকে মেনে নেওয়া।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদের Nagation of negation এবং transformation of quantity into quality (and vice versa)—এই দুটি মৌলিক তত্ত্বের অপরূপ অপব্যখ্যা করেছেন আইয়ুব সাহেব। তিনি বলেছেন থিসিস ও এ্যান্টিথিসিসের মধ্যে যা দুষ্ট, সিনথিসিস সেই দুষ্ট গুণগুলির সমন্বয়ও তো

হতে পারে, আর পরিমাণে বাড়লেই অর্থাৎ জটিলতর হলেই যে সিন্‌থিসিস থিসিসের ও এ্যান্টিথিসিসের চেয়ে উৎকৃষ্টতর হবে তার কি মানে আছে? এই অপহ্নবের অপহ্নব (Negation of negation) সম্বন্ধে মার্কস্‌ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাচ্ছি যে ঐরকমের একপেশে (সু-টুকুকে বাদ দিয়ে কু-টুকু) মিশ্রণ সম্ভব নয় সিন্‌থিসিসে এবং ওটা মিশ্রণই নয়—সিন্‌থিসিস হল থিসিস ও এ্যান্টিথিসিসের পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়, কিন্তু কোন সমন্বয়ই আবার চরম নয়: 'But once it has placed itself in thesis, this thought, opposed to itself, doubles itself into two contradictory thoughts, the positive and the negative, the "yes" and the "no". The struggle of these two antagonistic elements, comprised in the antithesis, constitutes the dialectic movement. The *yes* becoming *no*, the *no* becoming *yes*, the *yes* becoming at once *yes* and *no*, the *no* becoming at once *no* and *yes*, the contraries balance themselves, neutralize themselves, paralyse themselves. The fusion of these two contradictory thoughts constitutes a new thought which is the synthesis of the two' (Text Book of Marxist Philosophy, P 59). তারপর মিশ্রণ সম্বন্ধে: 'The negation of the negation—the synthesis, the new—does not emerge by way of a simple uniting concord, reconciliation or external combination of opposites. Such a mechanistic interpretation of synthesis is mere eclecticism.' (Text Book of Marxist Philosophy. P. 359). তাহলে এই সমন্বয়ের স্বরূপ কি? 'Every object or phenomemon has many opposite aspects and alternative ways of being described, However, in a concrete situation it is important to find that "new thing' which emerges as the progressive step in the mutual action of these aspects, it is important to disclose the new as the law of the movement of the whole. The eclectic cannot disclose this new progressive beginning.' (Text Book of Marxist Philosophy. P. 359)

এই উন্নততর নূতনের উদ্ভবের মালা গেঁথে চলে ইতিহাসের কম্বুগতি (spiral movement)। এই নূতন উন্নততর, কেন না পারিমাণিক চাপ বৃদ্ধির ফলে থিসিস গ্রস্ত হয়েছে এ্যান্টিথিসিসের দ্বারা, কিন্তু সম্পূর্ণ সমন্বয় সাধন তখনই হবে যখন থিসিস-এ্যান্টিথিসিসের দ্বন্দ্বের সমাধান হবে বৃহত্তর কোন সত্তার মধ্যে—যে সত্তার মধ্যে থিসিস, এ্যান্টিথিসিস বিরোধে ব্যস্ত নয়; তাদের প্রকৃতির পরিপূর্ণতর প্রকাশের ক্ষেত্র সেখানে পাওয়ার ফলে তারা নবতররূপে নিজেদের নিস্পিষ্ট সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে ব্যস্ত। এই নূতনতর, বৃহত্তর সত্তা হল সিন্‌-

থিসিস। তাই পারিমাণিক পরিবর্তনই গুণগত পরিবর্তনের মূল কথা। এই পারিমাণিক পরিবর্তনের হেতু হল বস্তুর প্রকৃতিগত দ্বন্দ্বমূলক প্রগতি। পারিমাণিক পরিবর্তন যথেষ্ট হলেই বস্তুর গুণগত পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী—নূতনের উদ্ভব। এই প্রগতি কখনও থামে না, নূতনের উদ্ভবেরও তাই বিরাম নেই : 'It is indeed never at rest, but carried along the stream of progress ever onward. But it is here as in the case of the birth of a child ; after a long period of nutrition in silence, the continuity of the gradual growth in size of quantitative change is suddenly cut short by the first breath drawn—there is a break in the process, *qualitative* change—and the child is born.' (Phenomenology of Spirit—Hegel) সেই শিশুর মধ্যে তার জন্মকারণের সব গুণটুকু তো থাকেই পরিবর্তিত রূপে, তার ওপর থাকে তার নিজের অভিনবত্ব : 'The whole mass of its (synthesis) previous content is raised, and through its dialectical course forwards so far from losing anything, from leaving anything behind, it brings with itself all it has acquired and enriches and expounds its own being.' (Science of Logic, Part II).

অতএব দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করা হয় না এবং পরিমাণ আর গুণে পার্থক্য করা হয় না—এ কথা অশ্রদ্ধেয়। আর এই পরিমাণগত পার্থক্যের ফলে গণসাহিত্য (Literature in a classless society) গুণগতভাবেও বুর্জোয়া সাহিত্যের থেকে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল কোন্ সাহিত্য মানুষকে প্রকৃতির ওপর জয়লাভে কতখানি প্রেরণা জাগিয়ে তাকে স্বরাট্ (freedom from necessity) প্রতিষ্ঠায় কতখানি সাহায্য করেছে—বহিঃ এবং আন্তর প্রকৃতিকে (internal and external necessity) নিজের বশে এনে স্বাধীনতা অর্জনে কতখানি তাকে এগিয়ে দিচ্ছে। স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়াই হল প্রগতি। এই এগিয়ে যাওয়ার সচেতন তাগিদ মনুষ্যেতর জীবের স্তরে নেই। কিন্তু মানুষ হল জীবকুলে শ্রেষ্ঠ। মানুষের জীবনে এই স্বাধীনতা অর্জনের এষণাই হল তার প্রগতির প্রেরণা। মনুষ্যেতর স্তরে এই সচেতন এষণা সাম্যবাদী স্বীকার করে না বলে আইয়ুব সাহেব বলে ফেলেছেন কোনো এষণাই সাম্যবাদীদের জড়বাদে স্বীকৃত নয় : An organism is a teleologically constructed whole. There is none of this teleology in the particular-physico-chemical processes that go on inside the organism, therefore—the upholders of " wholeness " conclude—the teleology of vital processes is a manifestation of a special begining, of a special force, which exists outside the particular parts, which subordinates them to itself and joins them into a single whole. এই ভুলের কোনো সম্ভাবনাই থাকে

না দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদে : ' A living organism is something that arose out of inorganic matter. In it there is no "vital force." If we subject it to a purely external analysis into its elements we shall find nothing except physico-chemical processes. But this by no means denotes that life amounts to a simple aggregate of these physico-chemical elements. The particular physico-chemical processes are connected in the organism by a *new form of movement*, and it is in this that the quality of the living thing lies. The new in a living organism, not being attributable to physics or chemistry, arises as a result of the new *synthesis*, of the new connection of physical and chemical movements. The synthetic process whereby out of the old we proceed to the emergence of the new is understood neither by the Mechanists nor by the Vitalists.' (Text Book of Marxist Philosophy. Page 319).

এই নূতনতম জীব মানুষের স্বরাটের এষণা যুগে যুগে তার কর্ম এবং জ্ঞানের আধারে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে আর শিল্পী, সাহিত্যিকেরা তাঁদের প্রতিভার জোরে সেই স্বরাট-সাধনার বিভিন্ন রূপ এবং সাধনার প্রেরণা জুগিয়েছেন যুগে যুগে : তাই আমরা ইসকাইলাসকেও উপভোগ করি, শেকসপিয়রকেও করি, ভারতচন্দ্রকেও করি, রবীন্দ্রনাথকেও করি এবং এঁদের মধ্যে আবার শ্রেয়, শ্রেয়ানের পার্থক্যও করি। শেকসপিয়র তাঁর যুগের গণ-মানসের সবচেয়ে বড় মুখপাত্র ; তাই তিনি বেন জনসনের চেয়ে অনেক বড় এবং এও খুব সম্ভব যে পরবর্তী যুগে (যেমন বর্তমান যুগে) মানুষের জ্ঞান ও কর্মের পরিধি পারিমাণিকভাবে বাড়লেও তাঁর মত প্রতিভার জন্ম হয়নি বলে আজকের দিনের গণ-মানসে যে স্বরাটের বৃহত্তর রূপের আভাস জাগছে তাকে কোন নাটকের মধ্যে কোন নাট্যকার রূপায়িত করতে পারছেন না। তাই শেকসপিয়রের নাটক এখনও অপরাজেয়। কিন্তু মহত্তর নাটকের সম্ভাবনা আজকে হয়েছে। শেকসপিয়রের মধ্যে আমরা সে যুগের মানুষের স্বরাটের যে রূপ দেখি, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বের যে রূপ প্রত্যক্ষ করি তা ইসকাইলাসএর নাটকের চেয়ে ব্যাপকতর এবং উন্নততর। তাই বলবার সাহস না থাকলেও মনে মনে স্বীকার করি শেকসপিয়রের শ্রেষ্ঠত্ব। সাহিত্যের মূল্য তাই সম্পূর্ণরূপে সামাজিক এবং তার মূল্যও বিচার করব ঐ মানদণ্ডে—মানুষের স্বরাট-সাধনায় কি প্রবর্তনা সে জোগাচ্ছে তাই দিয়ে। সেইজন্যে আমাদের স্থির করতে কষ্ট হয় না কেন আমরা একই যুগের সাহিত্যিক টমাস হার্ডি ও টলস্টয়ের মধ্যে টলস্টয়কে শ্রেষ্ঠতর আসন দিই। তাঁর জীবনদর্শন আরও ব্যাপক, সেইজন্যে উন্নততর। আজকের দিনে মানুষের প্রকৃতির ওপর অধিকার অকল্পনীয়

দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে তার উৎপাদনী শক্তি আর সেই অনুপাতে পাচ্ছে বৃহত্তর স্বরাটের পূর্বাভাস—যে স্বরাটের (freedom) কল্পনা সে আগের কোনো যুগেই করতে পারেনি। আজকের জনগণ সেই freedomএর পথে এগিয়ে চলেছে — বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির প্রাণপণ, নিষ্ঠুর বাধা দেওয়ার ফলে। তাই আজকের সার্থক সাহিত্যিক সেই বিপ্লবের বাণী শোনাবে, জোগাবে সেই স্বরাট-লাভের প্রেরণা—সত্য, শিব, সুন্দরের কল্পিত বোধ জাগানো তার কাজ আজ নয়, কোন যুগে ছিলও না। আর প্রগতির এই বিনির্ণায়ক আছে বলে সত্য, শিব, সুন্দরকে পরম মূল্য বলে স্বীকার করবার কোন প্রয়োজনই সাম্যবাদীর নেই। ডিমিট্রিয়ফ সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আর শুধু সাহিত্যই নয়—মানুষের জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, শিল্প, সব কিছুর মূল্যই হল তাকে ঐ স্বরাট-সাধনায় এগিয়ে দেওয়ায়। সাম্যবাদী এই আদর্শই মানে বলে সে কখনও বলবে না যে, যে-কোনো বস্তুর সমবণ্টনই কাম্য। সিফিলিসের বীজাণুর সমবণ্টন মানুষকে freedomএর পথ থেকে বিচ্যুত করে রোগের unfreedomএর মধ্যে নিয়ে আসবে; তাই সে জিনিসের বণ্টন কাম্য নয়। অন্যপক্ষে পকেটমার কি চোরের ঐ সব কাজ করবার প্রবর্তনাই থাকবে না সাম্যবাদী সমাজে, কারণ অর্থের সমবণ্টন প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন সমাজে। সে অবস্থায় তাদের ধনাপহরণের দক্ষতা থাকা মানে তাদের জীবনে অসামাজিক অভ্যাসের কালাতিক্রমণ। তাদের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় তখন ঐ দক্ষতা। কিন্তু শ্রেণীবিষম সমাজে ঐ দক্ষতা তাদের বাঁচবার উপায়। ঐ দক্ষতা না থাকলে আইয়ুব সাহেবের সত্য, শিব, সুন্দর তাদের বাঁচাতে পারবে না। শ্রেণীহীন সমাজে মানুষের উন্নতির সম্ভাবনাই যে অপরিসীম তাই নয়, সে যে অভূতপূর্ব চারিত্রিক উন্নতি লাভ করছে তার প্রমাণ পেলেও আইয়ুব সাহেব অবশ্য ঐ পরম ত্রয়ীর অদৃশ্য প্রভাবে আস্থা রেখে যাবেন, কারণ পরিবর্তন আনতে হলে যে কর্মের প্রয়োজন সেই কর্মকেই তাঁদের একান্ত ভয় এবং ঘৃণা। আজকের ভৃত্যেরা কালকের প্রভু হলে তাঁদের শিবের প্রভুত্ব যে ঘুচে যায়। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্র থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় এই সত্য-শিব-সুন্দর শাসিত অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত সমাজব্যবস্থার চেয়ে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি কত এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সমাজও। এই শিক্ষার ব্যাপারই ধরা যাক্ না কেন। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় বয়স্ক-শিক্ষা এবং শ্রমিক-শিক্ষা বিশুদ্ধ কল্পলোকেই থেকে যায়, বাস্তবে রূপায়িত হয় না: এখানে ওখানে একটু পলেস্তারা লাগিয়ে নিয়মতান্ত্রিক সমালোচকদের মুখ-বন্ধ করে দেওয়া হয়। বয়স্ক-শিক্ষা দেওয়ায় পুঁজিপতিদের কোনো লাভ নেই আর শ্রমিককে শিক্ষা দেওয়ায় আছে বিপদ।

অথচ সোভিয়েটের দিকে তাকিয়ে দেখি এ সমস্যার সমাধান সেখানে হয়ে গিয়েছে —কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্তের রাষ্ট্র কৃষক, মজুর মধ্যবিত্তকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করেছে। বয়সের কোনো স্তরেই অশিক্ষার অবকাশ আজ সোভিয়েটে নেই। কিন্তু আদর্শ গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকায় এখনও লক্ষ লক্ষ লোক অশিক্ষিত —সেখানে এখন শিক্ষিতের সংখ্যা কমানোর চেষ্টা হচ্ছে। সোভিয়েট যখন মধ্য এশিয়ার বহু রাষ্ট্রে বর্ণমালা পর্যন্ত সৃষ্টি করে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে আমাদের ভারতবর্ষে আমরা তখন ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় শিক্ষা দেব কি সার্জেন্ট পরিকল্পনায় দেব তাই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছি—ভুলে গিয়েছি যে শিক্ষা দিতে সুরু করলে জনগণ আপনিই বুঝে নেবে এবং কর্তাদের বুঝিয়ে দেবে কোন্ শিক্ষা তাদের সবচেয়ে উপযোগী। টাকার অভাবে দেশকে আমরা অশিক্ষায় ডুবিয়ে রাখছি, অন্যদিকে শোষকদের শোষণের ব্যবস্থা সুষ্ঠুতর করে দিচ্ছি কর কমিয়ে, ভারতের পাওনা টাকা ছেড়ে দিয়ে আর মজুরের মজুরি কমিয়ে। খেতে না পাওয়ার জন্যে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রভাবান্বিত দেশে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে ধর্মঘট চলেছে; কই সোভিয়েটে তো নেই। আমেরিকার মত গণতন্ত্রের দেশে নিগ্রোরা এখনও কেন বাঁচবার অধিকার পায় না? ইঙ্গ-আমেরিকা শান্তি আর কল্যাণের জিগির তুলে সারা দুনিয়াকে ফের যুদ্ধের চরম অকল্যাণের মধ্যে নামাতে চাইছে। আর যারা ঐ ত্রয়ীকে মানে না তারা যুদ্ধের ব্যয়-সংকোচ করে জাতি গঠনে মনোনিবেশ করেছে। ঐ পরম ত্রয়ী তাহলে সমাজে কি প্রভাব 'বিকিরণ' করছে, কোন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে এই এত হাজার বছর ধরে মানুষের মনে জেঁকে বসে? এ চরম মূল্যত্রয়কে স্বীকার করে মানুষের স্বরাট-সাধনায় কোন সুবিধেটা হচ্ছে? মানুষ বরং ঐ অপরিবর্তনীয় পরম মূল্যের অস্পষ্ট ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে সংগ্রামের পথ খুঁজে পেতে বিলম্বিত হচ্ছে। ঐটুকুই হল আধুনিক বুর্জোয়াদের লাভ। তাই শান্তির নামে, গণতন্ত্রের নামে, কল্যাণের নামে, সত্য এবং ভগবানের নামে তাদের এত প্রচার আর কাজে সেই সব মূল্যের এত অপলাপ।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং কোনো ক্ষেত্রেই তাই উপকরণ এবং পরম মূল্যে সাম্যবাদীর পক্ষে পার্থক্য না থাকায় আইয়ুব সাহেব এবং রসবাদীদের উদ্ভট আবিষ্কার 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য সাম্যবাদীর বিচারে কর্ম-বিমুখ, প্রতিক্রিয়াশীলদের গণ-জাগরণকে পর্যুদস্ত করবার, চিরন্তনের দোহাই পেড়ে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের পথে অনর্থক বাধা সৃষ্টির চেষ্টা বলেই মনে হবে। সেইজন্যে ওটা 'মহৎ বেহায়াপানা' নয়, অচেতনের অপচেষ্টা মাত্র। তবে তাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্য-রসের ধোঁয়ায় সত্যের, শিবের, সুন্দরের মূর্তি দেখতে থাকলেও জনতা তার নিজের তাগিদেই সাহিত্যের সত্যিকারের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হবেই।

সীতাংশু মৈত্র

জীয়ন্ত

পূর্বানুবৃত্তি

থমথমে মুখে জলজলে চাউনি, তাতে আবার ঘনঘন নিশ্বাস। দেখেই ধনদাসের টের পেতে বাকী রইল না ছেলেটার বেজায় জ্বর এসে গেছে—ম্যালেরি। জ্ঞানদাস আন্দাজ করল, জ্বরজারি সাধারণ ব্যাপার নয়, কিছু একটা ঘটেছে, ঘা খেয়ে জখম হয়েছে পাঁচু। দেহ মন দু'য়েই জখম হয়েছে, নয়তো এমন হতো না। দাঁতে দাঁতে ঠুকে যায় জ্ঞানদাসের, দু'চোখ জ্বলে ওঠে। রও রও, তোমার সাথে বোঝা পড়া হবে জ্ঞানদাসের, যে তুমি এমন করেছ তাদের পাঁচুর। তা হও গে' যে তুমি দারোগা জমিদার লাটসায়েব! আগে একবার শুনতে দাও ব্যাপারটা।

কিন্তু না, এক থাবলা গুড় আর ঠাণ্ডা জল না খাইয়ে পাঁচুকে সে মুখ খুলতে দেয় না। তেতেপুড়ে ক্ষিদেতেষ্টায় এমনিই কাতর ছেলেটা, মনের জ্বালা মুখে প্রকাশ করতে গিয়ে আরও তো তাতবে।

বলিস কেনে জিরিয়ে নিয়ে? মিঠে আর জলটুকু খেয়ে নে আগে। দুকুর গড়িয়ে গেছে বেলা, গরম কত!

ঠাণ্ডা হয়ে বাড়িয়ে ফেনিয়ে রোমাঞ্চকর বিবরণ দেয় পাঁচু, কথা আর অঙ্গভঙ্গি মিলে কি যে জমজমাট প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তার বর্ণনা! তার প্রাণ থেকে যে তীব্র ঝাঁঝ উগ্র ক্ষোভ উথলে উথলে বেরিয়ে আসতে থাকে সোজা স্পষ্ট গেঁয়ো ভাষায় শুনলে নলিনী দারোগারও চমক লেগে যেত। পাকার কথা ধরাই চলে না, কানাই-এর তুলনাতেও তার পাঁচ ঘণ্টার নির্যাতন একরকম কিছুই নয় বলা চলে। কিন্তু ওদের চেয়ে তার যেন শতগুণ বেশি রাগ! চাষার ছেলে ভীরু নরম হয়, পাঁচুর রকম দেখে এ ধারণা আর টিঁকিয়ে রাখা যায় না। পাঁচঘণ্টা সে কেন তবে মুখ বুঁজে সব সয়ে গিয়েছিল, একবারও ফোঁস করে ওঠে নি? ওটাও রীতি চাষার ছেলের, অত তার ভাবোচ্ছ্বাস থাকে না, আলগা থাকে না হৃদয় মনের ছিপি যে মিছামিছি বেহিসেবি ফুঁসে উঠবে। মাটি তাকে ধৈর্য শেখায়।

ঘরের দাওয়ায় এখানে বিপদ নেই বলে যে প্রাণ খুলে ছাঁকা মিথ্যে আওড়াচ্ছে তাও সত্যি নয়। যতটা সে বলতে পারছে তার চেয়ে অনেক বেশিই বরং তার অন্তরের বিক্ষোভ, খাঁটি জ্বালা। কারণ, এতো শুধু তার নির্যাতনের কথা নয়। একরাত্রির অত্যাচারে মরতে মরতে বেঁচে উঠে পাকা নয় একা সে অত্যাচারকে নিজের বুকে পুষে সামলে উঠতে দেশভ্রমণে গেছে, সে ভদ্র ঘরের ছেলে, তার দরাজ বুক। এর আগে সরকারী দাপটের টোকাটিও পাঁচুর গায়ে কখনো সরাসরি

লাগে নি, তার জীবনে থানায় গিয়ে নলিনী ও তার সাঙ্গপাঙ্গের কানমলা চড়-চাপড় গালাগালি গায়ে মাখা এই প্রথম। তাই বলে দেশজুড়ে অন্যায়ের জগদ্দল. চাপ কি জন্ম থেকে তার বুকে চাপ দেয় নি। গাঁয়ে তার আপন কাকা জ্ঞানদাস আর শহরে তার আপন বন্ধু পাকা ও কানাই কি শুধু তাকে জ্বালা জুগিয়েছে, জ্ঞান হয়ে থেকে ক্ষুব্ধ হবার কারণ দেখে আসছে শুনে আসছে। নিত্য, কম আর বেশি। লেখাপড়া শেখায় পড়েও আসছে বাজেয়াপ্ত বইয়ে—এই বইগুলিই তাকে জানান দিয়েছে পড়াও মনকে সত্যি নাড়া দিতে পারে। রাগ তাই পাঁচু কম সঞ্চয় করে নি এই বয়সে। স্কুলে পড়লেও মনের চাষাড়ে ভোঁতা গুণটা রয়ে গেছে বলে, যা নিছক সহনশীলতা—সয়ে সয়ে সব কিছু সয়ে যাবার বংশগত অভ্যাস, নিজে ঘা খাওয়ার আগে রাগটা ফেটে পড়ে নি।

ও শালাকে তুমি ঘায়েল কর কাকা, এস মোরা মারি ওটাকে!

পাঁচু কাঁদে যেন ফোঁস ফোঁস করে তপ্ত বাষ্প ছাড়ছে, থর থর করে কাঁপে যেন আঘাত হানার উদ্যম বাড়তি হয়ে দেহটা নাড়ছে। বাঁশের ঠেক্কা লাগান শালের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেছিল, কখন যে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার উগ্রমূর্তি দেখলে ভয় করে।

ভয় করে এইজন্য যে এ তো বাপখুড়োর সামনে ঢং করা নয় যে ঘরের দাওয়ায় রাগ ঝেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ফোঁসফোঁসিয়ে জ্বালা উপে যায় না তাদের, বুকেই থাকে,—ভাষার সঙ্গে সারা দেহটা লাগিয়ে প্রকাশ করার এমনি ব্যাকুল চেষ্টায় না কমে বেড়েই যায়।

সুভদ্রা ডুকরে কেঁদে ওঠে: ও কথা বলিস নে বাপ্। মোদের পাঁচুকে তোমরা সামলাও না গো, ঠাণ্ডা কর।

পাঁচু চোখ পাকিয়ে ধমকায়: চুপ মার পিসী, চুপ মেরে যা। মেয়েলোক তুই কথা কইতে আসিস নে মোদের কথায়।

না সোনা, এ সব্বোনেশে কথা মুয়ে আনিস নে তুই!

রা কাড়িস নে পিসী, মেরে মুখ থেঁতলে দেব।

মারের ভয় কি পিসী মানে, পাঁচু তার মারমূর্তি হয়ে দারোগাকে মারতে চলেছে—চলেই বুঝি গেল!

কি যন্তনা, কথার কথা কইছে বই তো না? বুড়িয়ে গেলি তোর জ্ঞানগম্মি হল না সুভদ্রা মোটে। সুভদ্রাকে থামিয়ে ধনদাস ছেলেকে শান্ত করার একমাত্র অস্ত্র খাটায়, জ্ঞানদাসের বেলাতেও সে এ অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকে, টিটকারি দিয়ে বলে, বীরপুরুষ! কেরদানি দেখাচ্ছে! সে রইল সে সদর থানায়, দাওয়ার এর লম্ফঝম্প! একদম মেরে টেরে কম্মো সেরে এলেই হত? 'হাটে চাটে সেপাইর জুতো, ঘরে মারে মাগকে গুঁতো'। বীরপুরুষ!

তুমি তো কেঁচো, কি জানবে? বাবুরা অমন কত দারোগা ম্যাজিষ্ট্রেট মারছে! ক্রুদ্ধ অপমানিত পাঁচু কটমটিয়ে চেয়ে থাকে, বাপ না হলে মেরে বসত ধনদাসকে। ছ'চোখ ভরা স্নেহ আর শ্রদ্ধামর্যাদা ধনদাস ছেলের সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিতে থাকে, মুখে তেমনি টিটকারির সুরেই বলে, অ্যাং * যায়, ব্যাং যায়, খল্সে বলে মুইও চলি! বাবুরা বোমা পিস্তল দে' সায়েব মারে, তুই দা' নিয়ে ছোট্, দারোগা মেরে আয়।

এতো শুধু টিটকারি, বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধির কথা। যে লাঞ্ছনা করেছে তার পাঁচুকে তাকে যদি উচিত শিক্ষা দেওয়া যায় ধনদাস খুশিই হবে, কিন্তু শিক্ষা দেওয়া যায় কিনা সেটা তো দেখতে হবে! একজন অকারণে ছ্যাঁচা দিয়েছে বলেই তো রাগের মাথায় দিগবিদিগ জ্ঞান হারিয়ে পাথরে মাথা ঠুকে মরা যায় না, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া যায় না। সাধ হলেই তো প্রতিশোধ নেওয়া যায় না সদর থানার প্রবল প্রতাপ দারোগার ওপর। শুধু তাই নয়, আরও হিসাব আছে। অসম্ভব সাধকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে পাগল হওয়া, প্রতিকারহীন জ্বালায় নিজে জ্বলে পুড়ে খাক হওয়া, স্রেফ বোকামি। এমন যে করছে পাঁচু, গায়ে কি আঁচড়টি লাগছে নলিনী দারোগার, কোনদিন লাগবার সম্ভাবনা আছে? এসব কথা মুখ ফুটে বলতে হয় না ধনদাসকে, পাঁচুরও ভাল করেই সব জানা আছে, ধনদাসের টিটকারি শুধু মনে পড়িয়ে দেওয়া বৈ তো নয়। পাঁচুর উগ্র প্রচণ্ড রূপ ঝিমিয়ে আসে, সে গুম খেয়ে থাকে, কিন্তু ক্ষোভ তার কমে না, তার উতলা ভাব যায় না। সে শান্ত হবে, তার রাগ জুড়িয়ে যাবে, এ আশা অবশ্য ধনদাসও করে নি।

মোর যা হবার হবে। নয় মরব। মরলে কি হয়?

কি হয়? জ্ঞানদাস ভারি গলায় নিবিড় সহানুভূতির সঙ্গে বলে, মরা কিছু লয় বাপ! মরণকে সবাই ডরায়, আঁধারকে ডরায় না? দরকার পড়লে ঘোর আঁধারে বনবাদাড়ে যায় মানুষ, মরণকেও বরণ করে। ফল যদি হয় তো মর না কেনে তুই, কে বারণ করছে? না হক উয়ার গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে তো মরবি, না কি? বোকার মত মরাই সার হবে, সেটা কাজের কথা লয়।

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়েছে ধনদাস, গভীর দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে এসেছে। কে জানে বাবুদের বিদ্যা সংসারের সহজ সরল হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে কিনা পাঁচুর। জ্ঞানদাসকেও চিন্তিত দেখায়। ভাই তার যাই ভাবুক, ফাঁকা নিষ্ফল গোয়ার্তুমির পক্ষপাতী সেও নয়, নিছক ঝোঁকের বশে আত্মনাশের মানে সেও বোঝে না। কড়ায় গণ্ডায় মরণের মূল্য আদায় না করে ভাবের বশে প্রাণ দিতে তার সায় নেই। তার ছেলেমানুষ পাঁচু শহরের স্কুলে পড়ে হয় তো অন্য হিসাব শিখেছে। নলিনী দারোগাকে শুধু তেড়ে মারতে গিয়ে বিপদে পড়াটা হয় তো সে যথেষ্ট প্রতিশোধ,

* অ্যাং—লেটা মাছের মত লাফানে মাছ।

উচিত কাজ ভেবে নেবে? অনেক বিষয়ে অনেক কথা পাঁচু বলে যার উদ্দেশ্য এমনি শূন্য, মানে এমনি ফাঁকা।

চাষী সমাজ বর্ষার পথ চেয়ে আছে, বৃষ্টি সুরু না হওয়ায় ইতিমধ্যে উদ্বেগ বোধ করছে। প্রতিদিন তা শংকায় পরিণত হবার দিকে বেড়ে চলে। অবস্থা এমন যে মারাত্মক অনাবৃষ্টির কথা ভাবাই যায় না, প্রকৃতির সাধারণ সামান্য অনিয়ম ব্যতিক্রমের ফলে খুব কম অনিষ্ট হলে তাই মারাত্মক হয়ে ওঠে অনেকের পক্ষে। একটা বছর আংশিক অজন্মার ধাক্কা সামলানো পর্যন্ত অসাধ্য হয়ে গেছে। বনের জন্য স্থানীয়ভাবে আগে একটা বিশেষ বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হত, বনের সঙ্গে সে বর্ষণও কমে গেছে। বর্ষা নামতে দেরী হলে বিপদ অনিবার্য: হয় খরা নয় বন্যা। সময়ের নিয়ম একবার লঙ্ঘন করা হয়ে গেলে এই দুই চরম ছাড়া আকাশ আর সামঞ্জস্য জানে না। কিছুদিন মাঠে হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে, জল নামার অপেক্ষায় থাকা ছাড়া এখন আর কাজ নেই, সাময়িক আলস্যে পাঁচুর ক্ষোভ আর অসন্তোষ তাকে অস্থির করে রাখে। ধনদাস ও জ্ঞানদাস দুজনেই সেটা লক্ষ্য করে, মেয়েদের কিছু না জানিয়ে শুধু তারা দু'ভাই পাঁচুর বিয়ের কথাটা নিজেদের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। কালটির বৃন্দাবনের মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, ঘরের দিক থেকেও অসমান নয়, শুধু পাঁচুর হিসাবে বয়সটা বেমানান, এগার হবে। আটের বেশী বয়সের মেয়ে, পাঁচুর সাথে মানায় না, বড় মেয়ে আনলে পাঁচু যখন হবে বাইশ চব্বিশ বছরের হাল্কা যোয়ান পরিবার তার হয়ে দাঁড়াবে রস ঘন হয়ে আসা থমথমে সোমথ ভারিক্কি যুবতী। সে বড় মারাত্মক যোগসাজস, ভাগ্যক্রমে উৎরে যদি যায় তো ভাল, নয়তো সব বিগড়ে যায়। তবে যেজন্য তারা তাড়াতাড়ি পাঁচুর বিয়ে দেবার কথা ভাবছে তাতে বাড়ন্ত তৈরি মেয়ে হলেই ভাল।

পাঁচুর বিয়ে দেওয়া সম্পর্কেই জ্ঞানদাসের একটা খটকা আছে, সে খেদের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, এতে মন জুড়ায় না গো, সে আশা মিছে। তবে হাঁ, বাঁধন- পড়ে একটা, নিরুপায় করে দেয় খানিকটা। মনের জ্বালা মনেই পুষে রাখতে হয়, হঠাৎ যে ঝাঁপ দেবে-তার যো রয় না। ফের ইদিকে কিন্তু—

এসব কথার মর্ম ভাসা ভাসা বোঝে ধনদাস, পাঁচুর অনেক কথার মত বস্তুহীন হাওয়া নিয়ে কারবারের মত ঠেকে। বৌ এনে যদি ঠেকানোই যায় পাঁচুর হঠাৎ সাংঘাতিক কোন কাণ্ড করে বসার বিপদ, গরম যদি নরম হয় পাঁচুর, তবে তো সার্থক হয়েই গেল এখন বিয়েটা দিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য। এর মধ্যে আবার মনের হিসাব আসে কিসে? এটা ছাড়া জ্ঞানদাসের আরও খটকা আছে শুনে ধনদাসের আরও অসহায় মনে হয় নিজেকে।

—ক্ষের ইদিকে কিন্তু তোমার আমার মত নয় পাঁচু, ওর ধারা ভিন্ন। আটক বাঁধন মানবে কিনা কে জানে বল ?

তবে ? তাই যদি না মানে পাঁচু তবে আর তার বিয়ের কথা ভেবে লাভটা কিসের ? মাঝে মাঝে যেকথা অনেকবার অনেক কারণে মনে হয়েছে ধনদাসের, আজ আরও জোরের সঙ্গে সেই কথা মনে হয়,—ছেলেকে শহরে পড়তে দেওয়া বুঝি ঝকমারি হয়েছে। জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরা ছোঁয়া যায় না, তার ঘরে নইলে কি এমন সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রায় এমনি অবস্থায় সে জ্ঞানদাসের বিয়ে দিয়েছিল, পাঁচুর মতই তার ছটফটানি এসেছিল। স্বভাব যায় নি জ্ঞানদাসের, গোঁয়ারই সে রয়ে গেছে। তা থাক না। তার স্বভাব তো আর বদলাতে চায় নি ধনদাস বিয়ে দিয়ে, বিয়ে করে নাকি কারো স্বভাব পাল্টায়। সাময়িক যে উন্মত্ততা এসেছিল, পুরুষ মানুষ কেন তার শান্তশিষ্ট গাইটা পর্যন্ত যে স্বাভাবিক অবস্থায় দড়ি ছিঁড়ে চারপা তুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটোছুটি করে, সেটা তো কেটেছিল জ্ঞানদাসের। যাই বলুক আর যাই করুক ভাল থেকে সুখে দুঃখে ঘরকন্না সে করছে না ? সাত বছরের মেয়ে সে এনেছিল জ্ঞানদাসের বেলা। পাঁচুর বেলা বৃন্দাবনের ওই বাড়ন্ত মেয়েটা এনেও ফল হবে না ? এ কোন দেশী রীতিনীতি হিসাব নিকাশ কে জানে, মাথায় ঢোকে না ধনদাসের।

মাঝে হঠাৎ পাঁচু একবার সদরে গিয়েছিল, শ্যামলের একটা দরকারী ওষুধ আনতে। সদরে যাওয়া কি আর এমন ব্যাপার, মাসে দশবার খুশি হলে ঘুরে আসা যায় অনায়াসে। এবার দারুণ একটা বিরাগ জন্মেছে, সদরে নলিনী দারোগা থাকে! সদরে যে তার জানাচেনা বন্ধুও শত শত থাকে, কানাই আর নোলকপরা ফোকলা রাধি থাকে, এক নলিনী দারোগার সদরে বাস সবারটা ছাপিয়ে উঠেছে। ঘৃণার কি আগুনটাই জ্বলেছে পাঁচুর মনে! নলিনী ইতিমধ্যে আবার এ আগুনে নতুন ইন্ধন যোগাবার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। কালীনাথের ওপর আরেক চোট নির্যাতন বর্ষণ হয়ে গেছে, সরকারী হুকুমে সে এখন ঘরবন্দী। কালীনাথের মত চাঁইদের এত চেষ্টাতেও ধরতে না পেরে ইংরেজ সরকার ক্ষেপে গেছে, কার্লটনকে মারার একটা চেষ্টা প্রায় শেষ মুহূর্তে ঠেকানো গেছে বটে কিন্তু নিছক ষড়যন্ত্রটা ছাড়া ষড়যন্ত্রকারীদের একজনকেও ধরা যায় নি। সাগর পারের শিখর-থেকে গাঁয়ের থানার শেকড় পর্যন্ত সরকারী দপ্তরে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে নিস্ফল আক্রোশের, এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা এমন বিরাট আয়োজন সব কিছুকে তুড়ি দিয়ে যদি স্বদেশী ছোকরারা এ ভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে পারে কদিন টিঁকবে ইংরেজ রাজত্ব ? যে ভাবে পার ধ্বংস কর বিদ্রোহ।

কানাই-এর যোগাযোগ আছে এটা পুলিসের জানা ছিল কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও বার করা যায় নি যোগসূত্রটা কি। কোনমতেই কানাই-এর চব্বিশ ঘণ্টার

গতিবিধির হদিস রাখা যায় নি, এক্সপার্ট নজরও হার মেনেছে। তিনদিন হয় তো সে সাইকেল দোকানে ঠুকঠুক মেরামতি কাজ করে চলেছে, কেরোসিনে পার্টস সাফ করছে, স্ক্রু খুলছে লাগাচ্ছে, বড়জোর বাজারে গিয়ে মাছতরকারী দোকানে গিয়ে সওদা আনছে, আর কোথাও যায় না কিছুই করে না। পরদিনও তেমনি বাজারে গিয়ে সে হারিয়ে গেল, ঘণ্টা চারেক পাত্তা নেই। এমনি জেরা করা যায় না, টের পাবে কড়া নজর আছে, সাবধান হয়ে যাবে, হয় তো যোগাযোগ ঘুচিয়েই দেবে ভয় পেয়ে। চেনা লোককে, মাধব ধীরে ধীরে তার সঙ্গে পরিচয় গড়ে তুলেছে, পিছনের চাকায় ভালভ্ লাগিয়ে দিতে বলে মাধবকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করতে হয়, কোথা গিয়েছিলে কানাই ?

বেলতলায় কীর্তন শুনে এলাম। আঃ, ফাইন কীর্তন দিয়েছে !

শয়তান ছেলে ! যেখানে ভিড়, যেখানে যাচাই করা যাবে না সে সত্যিই গিয়েছিল কিনা, এমনি সব যায়গা ছাড়া সে কোথাও যায় না। একবার সুনিশ্চিত জানা গেল ছ'টি পিস্তল কানাই-এর হাতে পৌচেছে, হানা দিলে মেরামতি দোকানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এ সুসংবাদ, পিস্তল কানাই যথাস্থানে পৌছে দেবে। তাড়াতাড়ি দেবে, তাকে সন্দেহ করা হয় জানে, নিজের কাছে রাখতে সাহস পাবে না। অবিলম্বে আঁটঘাট বাঁধা হয়ে গেল, সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হল কানাই আর তাদের দোকানবাড়ীর ওপর, এবার আর ফসকালে চলবে না। সামনে সাইকেল মেরামতের দোকান, পিছনে কানাইদের বসবাস। বাড়ীটার পিছনে একটা পুকুর, ওপারে কুমোরপাড়া—পিছনেও কড়া নজর রইল।

যথাসময়ে কানাই দোকান বন্ধ করল, ভেতরে গিয়ে নাওয়া খাওয়া সারল। তারপর গরমের দুপুরে বাড়ীর লোকের একটু তন্দ্রার ভাব এলে অন্দরের যে জানালাটা পাশের বাড়ীর অন্দরে খোলে এবং যে জানালা মারফতে দুই অন্দরের মেয়েরা কোন্ বাড়ীতে কি রান্না হয়েছে থেকে জগৎ সংসারের সব বিষয় নিয়ে আলাপ করে, সেই জানালাটি খুলে শিস দিয়ে ধরে দিল বেসুরো গানের সুর।

ঠিক যেন গল্প উপন্যাসের নাটকীয় ঘটনা, খানিক পরে সত্যি সত্যি এলোচুলে একটি কিশোরী মেয়ে এসে দাঁড়াল জানালার ওপারে ! কানাই তাকে জন্মাতে না দেখলেও আঁতুর ঘরে ট্যাঁ ট্যাঁ করতে দেখেছে, কানাই-এর নিজের বয়সও অবশ্য তখন ছিল বছর চারেক।

ভাগ্যিস তুই ঘুমোস নি ঘেঁটু !

আহা, আমি যেন দুকুরে কত ঘুমোই !

নিষিদ্ধ দ্রব্যের প্যাকেটটি কানাই তার হাতে দেয়। পাংশু মুখে কড়া চোখে তাকায় ঘেঁটু।

ফের তুমি এসব করছ ? এত তোমার পয়সার খাঁকতি !

নে নে হয়েছে। নিজের ভাগটি তো ঠিক বুঝে নাও!

আচ্ছা, সত্যি এতে কি আছে কানাইদা? চুপি চুপি একদিন খুলে দেখতে হবে। ঘেঁটু ফিক করে হাসে।

কানাই উদাসভাবে বলে, দেখিস্! একটি সুতোর গিঁট দু'বার লাগানো হলে ওরা টের পেয়ে যায়। লুকিয়ে এসব ব্যবসা যারা করে এমনি তারা ভালমানুষ, পিছনে লাগতে গেলে মজা টের পাইয়ে দেবে। এখান থেকে জিনিসটা একটু ওখানে পৌঁছে দেবার জন্যে এমনি অতগুলি টাকা দেয়?

আপিম-টাপিম হবে বোধ হয়, এঁ্যা? তুমি নিশ্চয় আমায় ঠকাও কানাইদা, কম টাকা দাও!

যা পাই তার আদ্দেক দি'। আমি দশ টাকা পেলে তোকে পাঁচ টাকা দি'। যা এখন, লুকিয়ে ফেলবি যা।

ভোরে স্কুলে যাবার পথে ঘেঁটুর কাছ থেকে প্রতিমা জিনিসটা নেয়।

আপনি কত পান?

তোমায় বলব কেন?

যথাসময়ে তন্নতন্ন করে সার্চ করা হয় কানাই-এর দোকান আর ঘর-বাড়ী। তারপরেই ঘরবন্দীর হুকুম জারি হয়। তবে কানাই-এর সঙ্গে যে কেউ দেখা করতে আসতে পারে, তাতে কোন নিষেধ নেই। কানাই বাইরে যাদের সঙ্গে যোগ রাখত, তারা কেউ যদি কানাই-এর সাথে যোগ রাখতে আসে কখনো, এই আশা।

একবারে বুঝি শিক্ষা হয় নি? —কানাই বলে পাঁচুকে, বন্ধুকে পেয়ে সে খুশি হয়েছে বোঝা যায়। ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে থাকতে দম আটকে আসছিল। কেউ বড় একটা আসে না এ বাড়ীতে, আত্মীয় স্বজনও একরকম বর্জন করেছে। দোকানে কাজ কর্ম নেই, ভয়ে কেউ সাইকেল সারাতে আসেনা, রসিক একলাটি চুপচাপ দোকানে বসে থাকে। পাঁচুর সঙ্গে এবার কানাই আশ্চর্যরকম খোলাখুলি ভাবে কথা বলে। ঘেঁটুর মারফৎ পিস্তল দুটি সরানোর গল্পও সেই নিজে থেকে পাঁচুকে শোনায়। গতবার তাকে যে থানা হয়ে গাঁয়ে ফিরতে হয়েছিল এ খবর কানাইকে কে দিল পাঁচু প্রথমে ভেবে পায় নি, দেখা যায় শ্যামলের কাছে তার ঘনঘন যাতায়াতের খবরও কানাই জানে। বন্ধুর প্রতি তার ভালবাসার সঙ্গে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর শ্রদ্ধাভক্তির ভাব এসে মেশে। বিপ্লবীদের মধ্যে বন্ধুর যে তার এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে তাতে পাঁচুর গর্ব হয়। কানাই-এর আত্মবিশ্বাস, সাহস, শক্তি আর শান্তভাব তাকে মুগ্ধ অভিভূত করে রাখে।

কানাই ভণিতা করে না, সোজাসুজিই বলে, শ্যামলদা তোর খুব প্রশংসা করেছে। তুই যদি ইচ্ছা করিস পাঁচু, আমাদের সঙ্গে ভিড়তে পারিস।

কদিন ভেবে দেখে বলব।

নিশ্চয়, এতো ছেলেখেলা নয়। সব সুখের আশা ছেড়ে জেল ফাঁসি সব কিছুর জন্যে তৈরী হয়ে আসতে হবে। বরং না আসা ভাল, এসে ভড়কে গেলে চলবে না।

এ বয়সে মনের এমন ভারিক্কি গড়ন কানাই কোথায় পেল কে জানে। কাজের মধ্যে নিজের যে পরিচয় সে দিয়েছে কথাগুলি তারই প্রতিরূপ বলে বেমানান শোনায় না, মনে হয় বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষের মত কথা বলার অধিকার আছে।

বোধ হয় এখানে থাকব না ভাই।

কেন?

মিছামিছি বাড়ীর সবাই জুলুম সইছে। দোকানের রোজগার একদম বন্ধ। এমনি আটকে থেকেও লাভ নেই।

পালাবি?

তাই ভাবছি।

পাঁচুও ভাবে। কানাই আরেক পথের সন্ধান দিয়েছে। মরিয়া হয়ে শুধু নলিনীকে ঘা মারার চেয়েও চরম পথ, ইংরেজ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়া। পাঁচু জোরালো আকর্ষণ অনুভব করে, এমন বিরাট যাদের সৈন্য পুলিস কামান বন্দুক তাদের বিরুদ্ধে মরণ পণ লড়ায়ে নেমে কানাই-এর মত বিপজ্জনক জীবন গড়ে তোলা, দাসত্বের মধ্যে মুক্তির স্বাদ পাওয়া। কিন্তু মনের মধ্যে কিসে যেন বাধা দেয়। নলিনীকে খুন করে ফাঁসি যাবার মানে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওই বিদ্বেষ আর ওই আঘাতটা সৈন্য পুলিস জজ ম্যাজিস্ট্রেট লাট বড়লাটের প্রকাশ্য গবর্নমেণ্ট-এর বিরুদ্ধে প্রযোগ করার কল্পনা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, ব্যাপারটা মনের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারে না। কত তফাৎ শক্তির—একদিকে কতবড় গবর্নমেণ্ট অন্য-দিকে কতটুকু কানাইয়ের দল। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মাইনে করা লাখ লাখ সৈন্যরাও তো যুদ্ধে প্রাণ দেয়, এদিকে কত চেষ্টায় কত খুঁজে পেতে কত বাছ-বিচার বাছাই করে কানাইদের এক একটি ছেলে জোগাড় করতে হয়। কানাই-এর মত গুণ না থাকলে কাজে লাগে না।

কি করে কি হবে? সে যে বুঝতে পারে না সেটা নিশ্চয় তার দোষ। নলিনীর কথা ভাবলে পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত তার জ্বলে যায়। ওটাকে সাবাড় করে এখুনি সে হাসিমুখে ফাঁসি যেতে পারে, কিন্তু সারা গবর্নমেণ্টের কথা ভাবলে তো এরকম নাড়া লাগে না। একটা গভীর অতল অসন্তোষ মনটা ভারি করে দেয়, ক্ষোভের জ্বালা ধিকি ধিকি জ্বলে।

ইংরেজ গবর্নমেণ্টের চেয়ে বরং বসন্তবাবুদের উচ্ছেদ করে মেরে দেশছাড়া করার কল্পনায় বেশি উৎসাহ জাগে।

কেউ যদি পাঁচুকে বলে দিত।

শ্যামল বলে, বলে দেবার লোকের অভাব নেই ভাই। আমিও এককালে সবাইকে বলতাম, আমার কথা শোন, মঙ্গল হবে। আজ আমি বলি, যেটুকু বুঝেছ সেইটুকু নিয়ে কাজে নামো। কাজ করো আর সেই সঙ্গে আরও বোঝবার চেষ্টা কর। তুমি যা বুঝবে কারো বাবার সাধ্য নেই মুখের কথায় তোমাকে তার চেয়ে বেশি বুঝিয়ে দেয়। কার্ল মার্কসের যে দর্শন নিয়ে রুশিয়ায় বিপ্লব হয়েছে, তাতে বলে কর্মশক্তি থেকে চিৎশক্তি আসে। গোড়ায় অন্ধভাবে কর্ম করতে করতে মানুষের চেতনা এসেছিল, সেই চেতনা দিয়ে সে কর্মের সংস্কার করেছিল, এমনিভাবে—

পাঁচু বোকার মত হাসে।

শ্যামলও হাসে, বলে, না দাদা, আমিও ভাল বুঝিনা ব্যাপারটা। তবে কিনা কথাটা মনে লাগে। গীতার কর্মযোগ নিয়ে সারা জীবন মারামারি করেছি—গীতা পড়েছ তো? সারা জীবনের কর্মফল যোগ করে আজ ভাবছি, অত মারামারি নাইবা করতাম! ভাব ভাবনার কথা নিয়ে মারামারি করতে হয়, নইলে মন ঠিক হয় না, ঠিকমত কাজ করা যায় না। কিন্তু শুধু ভাবনা নিয়ে মেতে থাকলে চলে? ভাবনার তাতে পুষ্টি হয়? চিন্তারও তো খোরাক চাই, কাজ হল সেই খোরাক। যখন সমস্যা আসে কি করব, এটা করব না ওটা করব, তখন দু'দিন চারদিন দু'মাস চারমাস ভাবা উচিত। কিন্তু এ্যাদ্দিন তুমি কি করেছ সেটা স্রেফ বাদ দিলে কি চলে ভাবনা থেকে? আজ কি করব এই যে চিন্তা সেটা আসলে এসেছে এ্যাদ্দিন কি করেছি তাই থেকে—

পাঁচু বোকার মত হাসে, বলে, শরীরটা আজ ভাল আছে, না শ্যামলদা? বাইরে রোয়াকে পাটি পেতে বসি আসুন। আসুন না? শুয়ে শুয়ে শুধু বই পড়বেন, মাথা ঘামাবেন, তাতে কি শরীর টেঁকে?

শ্যামল ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। গ্রাম প্রান্তের কুঁড়ে ঘরে রোগশয্যায় জীবনকে শুধু ধরে রাখার সংগ্রাম চালাতে চালাতে সে আর সকলের জীবনে কিছু অনুপ্রেরণা আনার চেষ্টা করছে, তাকে এমন রূঢ়ভাবে বাইরের রোয়াকে বসে সূর্যের আলো খোলা হাওয়া সবুজ শোভা থেকে বাঁচার প্রেরণা সংগ্রহ করতে বলা!

পরের জন্যই শ্যামল বহুকাল বেঁচেছে, আন্দামানেও সে পরের জন্য ভাবত, ভারতবর্ষের কোটি কোটি পর, তাদের জন্য ভেবে মরেছে, উনিশ শ' চার সালে বাংলা দেশটা ভাগ হওয়ার মত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সারা ভারতের পরকে যে সে আপন করেছিল তার জের টেনে টেনে। (ক্রমশ)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্র রচনাবলী—ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ খণ্ড। বিশ্বভারতী। ছ' টাকা, আট টাকা, ন' টাকা ও এগারো টাকা।

অল্প দিন আগে প্রকাশিত এই দুটি খণ্ডে আছে : প্রথম খণ্ডে প্রহাসিনী ও আকাশ প্রদীপ (কবিতা), চণ্ডালিকা ও তাসের দেশ (নাটক ও প্রহসন), গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যের পথে (প্রবন্ধ)। দ্বিতীয় খণ্ডে : নবজাতক ও সানাই (কবিতা), বাঁশরি (নাটক), গল্পগুচ্ছ, কালান্তর (প্রবন্ধ)।

এই দুই খণ্ডেরই কবিতা ও নাটকের চেয়ে গল্প ও প্রবন্ধ, বিশেষত প্রবন্ধ অনেক বেশি মূল্যবান। ত্রয়োবিংশ খণ্ডের গল্পগুচ্ছের প্রথম সাতটি গল্প (হালদার গোষ্ঠী ইত্যাদি) লেখা হয়েছিল সবুজ পত্রের প্রথম সাতটি সংখ্যার জন্য পর পর সাত মাসে। সবুজ পত্রের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি নিয়ে তখন বেশ একটু আন্দোলন হয়েছিল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এই গল্পটিকে ব্যঙ্গ করে 'মৃণালের পত্র' নামে একটি গল্প লেখেন, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত নারায়ণ পত্রিকায় তা ছাপা হয়।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'সাহিত্যের পথে'র পরিশিষ্টে প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনের ও সাহিত্য সভায় পঠিত বা কথিত বক্তৃতা। 'সাহিত্য ধর্ম' প্রসঙ্গে কুড়ি বৎসর আগে বাংলা সাহিত্যে কী রকম হৈ চৈ হয়েছিল 'সাহিত্য রূপ' ও 'সাহিত্য সমালোচনা' প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। শনিবারের চিঠির লেখক মণ্ডলী বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতি 'অতি আধুনিক' লেখকদের উপর প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করায় দুই পক্ষে ঘোর বিতণ্ডা জমে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দুই দলের লেখকদেরই ডেকে তাদের বক্তব্য শোনেন ও নিজের বক্তব্য তাদের শোনান। উক্ত দুটি প্রবন্ধে এই ঘটনার ইতিহাস পাওয়া যাবে। সাময়িক পত্রের সমাধি থেকে এই আলোচনার রিপোর্ট উদ্ধার করে রবীন্দ্র রচনাবলীর সংকলয়িতারা আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

'কালান্তর ও তার 'সংযোজন' অংশে সংকলিত প্রবন্ধগুলি সবগুলিই পলিটি-ক্যাল প্রবন্ধ। এর মধ্যে অনেকগুলিই কোনো না কোনো জনসভায় পঠিত হয়েছিল। এইগুলির মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য 'সত্যের আহ্বান'। ইংরাজি

১৯২১ সালে ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিট্যুট হলে পঠিত এই প্রবন্ধে গান্ধিজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রকাশ তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে দেশের লোককে সাবধান করেন। এই সতর্কবাণী গান্ধিজী কী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে Young India পত্রে প্রকাশিত তাঁর The Great Sentinel প্রবন্ধ পড়লে।

রচনাবলীর অন্যান্য খণ্ডের মতন এই দুই খণ্ডেরও গ্রন্থপরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আশা করি এই পরিচয় পরবর্তী সংস্করণে আরো তথ্যসমৃদ্ধ হবে।

সর্বশেষে, 'সাহিত্যের পথে'র পরিশিষ্ট থেকে একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্ধৃতি তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না :

"সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দেবার প্রস্তাব। বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠেসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি? চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত কেহ এমন অদ্ভুত কথা বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে। বস্তুতই খর্বতা ঘটে যদি জবরদস্তির দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি মুসলমানের মাতৃভাষা হয় তবে সে ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে মুসলমানেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষাতেই তাঁহারা মুসলমানি মাল-মশলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরও জোরাল করিয়া তুলিতে পারিবেন।.........

"....বাংলা দেশের সাধনা একটি সত্যবস্তু পাইয়াছে; সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসংগত। কোনো অস্বাভাবিক কারণে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের সহজ বুদ্ধি কখনই ইঁহাদের আক্রমণে পরাভূত হইবে না।"

১৩৩২ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের শিউড়ি অধিবেশনে পঠিত হবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ রচনা করেন উপরের উদ্ধৃতি তারই উপসংহার।

হিরণকুমার সান্যাল

শূন্যের অঙ্ক—বাণী রায়। "জিজ্ঞাসা"। আড়াই টাকা।

সগরল—সত্যভূষণ চৌধুরী। মডার্ণ বুক ডিপো। আড়াই টাকা।

অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমতী বাণী রায় গল্পলেখিকা বলে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। 'শূন্যের অঙ্ক' তাঁর দ্বিতীয় গল্পের বই। লেখিকার অন্যতম প্রথম গল্প 'মিডিয়া' যখন 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়েছিল তখনই তাঁর গল্পের অভিনবত্ব ও তাঁর রচনার তীব্র সংবেদন আমাদের সচকিত করেছিল: গ্রীক পুরাণের মিডিয়া বাঙালি মেয়ের রূপ গ্রহণ করে বাংলা সাহিত্যের আসরে স্বয়ং উপস্থিত। অসামান্য চমক লেগেছিল লেখিকার দুর্জ্জয় সাহসে। কলেজের পাঠ্য পৌরাণিক কাহিনী পাঠ করে নারিকা গ্রীক নায়িকাদের মত তীব্র প্রতিহিংসা গ্রহণ করলেন। মনে একটু বিস্ময় লেগেছিল বাঙালী মেয়েদের মনেও কি এ শ্রেণীর হিংস্রবৃত্তি জাগরিত হয়েছে? দেখা গেল তাঁর পরের গল্পগুলি থেকে যে এই শ্রেণীর তীব্র মনোবৃত্তির চিত্রাঙ্কণে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'শূন্যের অঙ্কের' গল্পগুলিতে এই মানসের আর একদিক প্রতিফলিত হয়েছে, সে হল অশেষ দুরপনীয় হতাশা। লেখিকার গল্প লেখার ধারা থেকে একটা সূত্র আমরা ধরতে পারি,—তা এই যে, বাংলা সমাজের নারীরা বড়ই বঞ্চিতা; ইচ্ছামত প্রিয়মিলন লাভ, দাম্পত্য জীবন লাভ, স্বাধীনতা ও সুখলাভ এ-সব হতে বঞ্চিতা। এই বঞ্চনার উপলব্ধি, ও প্রতিক্রিয়া শ্রীমতী বাণী রায়ের গল্পের প্রধান উপজীব্য। বাণী রায়ের ভাষা ও রচনার চমৎকারিত্ব অবিসংবাদিত; তাঁর গল্পের আঙ্গিক সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব। কিন্তু তাঁর লেখনীর গুণক্রমহয় অনেক হলেও আমার মত পাঠকের মনে কিছু অপ্রসন্নতা রয়ে যায়। লেখিকার গল্পগুলি যেন উচ্চৈস্বরে বলতে চায়—তোমরা জান না কী তীব্র দহন নারীহৃদয় ধারণ করে। তাঁর গল্পগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এই কথা,—নারীর বেলায় 'শূন্যের অঙ্ক'। মানতে পারব না যে পুরুষ লেখকের কাছে নারীর যে গূহ্য কামনা বেদনা ছিল নারী লেখিকার কাছে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং নালিশটি প্রাচীন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে নারীর বেলা—অন্তত আমাদের সমাজে—অঙ্ক সংখ্যা প্রায় শূন্যই বটে। কিন্তু সে শূন্যাঙ্কের কথা ত তিনি লেখেন নি। অত,স্ত সংকীর্ণ গণ্ডীর এক নারী সমাজের চিত্র তিনি রঙিয়ে তুলেছেন যা সমাপ্ত-পাঠ-কলেজ-শিক্ষার্থিনীদের ধনসম্পদে লালিত পালিত উদ্ভ্রান্ত এক বিশিষ্ট অংশের মধ্যে আবদ্ধ। এমন কি এটুকু অংশও সমূহ কাল্পনিক। অবশ্য কল্পনার আশ্রয়ে রচয়িতার সম্পূর্ণ অধিকার;—সমালোচকের অধিকার শুধু সামঞ্জস্য মাত্রে। আমার আপত্তি এই যে অতি সুলেখনী-নিঃসৃত হলেও এ চিত্র বিদেশী সাহিত্য থেকে ধারে আনীত। এ ভাবে বিদেশী কবিতা বা গল্প থেকে লেখিকা 'শূন্যের অঙ্কে' দুটি ফুল আমদানী করে সরাসরি বালিগঞ্জের গৃহোদ্যানে রোপন করেছেন সে

হল লাইলাক এবং লিলি অফ দি ভ্যালি। ও দুটি বিখ্যাত ফুল সাগরপারে বিদেশ ভ্রমণেই দেখা যায়; অন্তত অনেক তৎপর হয়েও এদেশে ও দুটি ফুলের সাক্ষাৎলাভ আমার আজও হয়নি।

সুখের বিষয় গুচ্ছের অঙ্কের সব গল্পগুলিই উপরোক্ত ছাঁচে ঢালা নয়। বইটির মধ্যেই ওই শ্রেণীর নারীদের চিত্রাঙ্কনের ধারা থেকে মোড় ফিরিয়ে লেখিকা তাঁর অপূর্ব গল্পলেখার কুশলতা কয়েকটি চিরপরিচিত নারীর ও পল্লীবাসিনীর ওপর প্রয়োগ করেছেন। ফলে এ গল্পগুলির সাফল্য জাজ্বল্যমান হয়েছে। এই অবসরে লেখিকার এই দুই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তার উল্লেখ করব। প্রথম শ্রেণীর গল্পগুলি, যাদের আমি বিদেশী-ভাবাপন্ন বলেছি সেগুলি শুধু ঘটনাপরম্পরার সমাবেশ বা আধুনিক ও সুলভ মনবিশ্লেষণ মাত্র নয়। মনের তদবস্থ ভাবকে (mood) বন্দী করে লেখিকা উপস্থিত করেছেন পাঠকের কাছে,—কৃতিত্বের সঙ্গে। প্রত্যেকটির পিছনে আছে একটি মর্মন্তুদ কাহিনী। শেষের চারটি গল্পের টেকনিক আর এক শ্রেণীর। সেগুলির ঘটনাংশই মুখ্য,—ট্রাজেডি ঘটনাসমাবেশেই প্রকট। এই গল্পগুলি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ও অকৃত্রিম হয়েছে। অতি উল্লেখযোগ্য গল্প "শুদ্ধি"; দুর্বৃত্তেরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল এক পুত্রবতী আয়ুষ্মতীকে। তাকে ফিরে পেয়ে শুদ্ধি ও স্বামীকর্তৃক পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা। এর শ্বশুরকুলের প্রচ্ছন্ন অস্পৃশ্যনীয়তার ও অস্বাচ্ছন্দের আবহাওয়া আর স্বামীর দ্বিধা এক দুলে বাগদীর অকপট সহজ আত্মীয়তার পাশাপাশি স্থান পেয়ে গল্পটিকে অপরূপ মহানতা দান করেছে। মনে পড়ে না বাংলায় এমন আর একটি গল্প পড়েছি। "মৃণালিনী" "নির্বাপিত" ও "শাড়ী" এ তিনটি গল্পও উল্লেখযোগ্য। আমার মনে হয় এ গল্পগুলি শ্রেষ্ঠতর দেশী বিদেশী গল্পের আত্মীয়স্থানীয় বলে গণ্য হতে পারে।

শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরীর 'সগরল'-এর তিনটি ছাড়া সব গল্পগুলিই কোম্পানীর রাজত্বের শেষ বা পরবর্তী এক অনির্দিষ্ট যুগের কিংবদন্তীজাত দুর্ধর্ষ জমিদার, বাগদী লেঠেল ও নিষ্ঠাবতার অথচ খড়্গধারী ব্রাহ্মণ প্রভৃতির প্রতিহিংসামূলক রোমাঞ্চকর খুনখারাপির গল্প। এ শ্রেণীর গল্পে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রকৃত শৌর্যবীর্যের সার্থক রূপদান বা প্রথম চৌধুরীর নিপুণতা লাভ নিশ্চয় খুব শক্ত। তবু গল্পগুলি নিশ্চয় অনেকের ভাল লাগবে। যে তিনটি গল্প অন্য শ্রেণীর তা বন্য জন্তুদের নিয়ে দুটি শিকার-সম্পৃক্ত। একটি হাঁস শিকারের অপরটি বাঘ শিকারের। এতে একটি নূতন টেকনিক অবলম্বিত হয়েছে; অর্থাৎ এতে শিকারের হাঁস ও বাঘই গল্পের কথক। কর্নেল গ্লাসফোর্ড, বেস্ট, সিলভার হ্যাক্‌ল্, কিপলিং প্রভৃতি বিখ্যাত ভারত প্রবাসীরা এই টেকনিকে শিকারের গল্প লিখে শিকারের গল্প লেখায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বাঘ ভাল্লুক হরিণ প্রভৃতির বাল্যাবধি বন্য জীবন যাপনের অনেক তথ্য ও যাযাবরী

হাঁসের সাইবিরিয়া থেকে ভারতে গমনাগমন প্রভৃতি বিষয় এই সব গল্পে সুন্দর ভাবে বয়ন করা হয়। বাংলায় এ ভাবে লেখা গল্প পড়ে বড় আনন্দ হল; এই বোধ হয় বাংলায় প্রথম এ শ্রেণীর গল্প লেখা হল। সংস্কৃত সাহিত্যে শিকারের না হোক পশুপক্ষীর মুখনিঃসৃত অনেক বিখ্যাত গল্পই আছে। রাজসভায় শুকের আত্মকাহিনী বা চিত্রগ্রীব কপোতের গল্প অনেকেরই মনে পড়বে। লেখকের হাঁস শিকারের গল্পট বড়ই উপভোগ্য। বিশেষ করে মনে হয় এটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব; অপর লেখক থেকে অনুকরণ করা নয়। বুনো মহিষ "মাণিক"-এর গল্পটিও অনুরূপ উপভোগ্য ও মনে হয় লেখকের নিজস্ব। লেখক যদি এ শ্রেণীর শিকারের আবহাওয়ায় রচিত আরও কয়েকটি গল্প লিখে পৃথক একখানি বই ছাপান তবে তা খুবই আদরণীয় হবে। কেবল এইটুকু দৃষ্টি রাখতে হবে যে বন্য জন্তুদের জীবন যাপনের তথ্য, পাখীর যাযাবরী বৃত্তি ও শিকারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে এমন কথা যেন স্থান না পায় যা শুধু মনগড়া ও বহু দর্শন বা অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিশোধিত নয়।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

KINGSBLOOD ROYAL—Sinclair Lewis. Jonathan Cape. 7s. 6d

FREEDOM ROAD—Howard Fast. Eagle Publishers. Rs.5/-

মার্কিন মুল্লুকের মালিকেরা সম্প্রতি যেভাবে 'অমার্কিনি' চিন্তা ও কার্যকলাপ বন্ধ করতে কোমর বেঁধেছেন তাতে সারা দুনিয়া আজ সন্ত্রস্ত। মার্শালি 'দাক্ষিণ্য' আর ট্রুম্যানি তর্জনের সাহায্যে অবশ্য সব দেশেই ভাড়াটে 'পণ্ডিত'দের লাগানো হয়েছে নানা কায়দায় 'ডলারের' মাহাত্ম্যকীর্তনে—নতুন বিভ্রান্তি সৃষ্টির কাজে। তবু চারিদিকের এই অন্তঃসারশূন্য গলাবাজীর মধ্যেও তীক্ষ্ণ শাণিত সত্য থেকে থেকে ঘোষিত হচ্ছে। আমেরিকার দুই লেখকের সাম্প্রতিক উপন্যাসে আমরা তারই সাহিত্যিক প্রকাশ প্রত্যক্ষ করলাম।

যে মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই দুই উপন্যাসের রচনা, সে হল কালা-ধলার সমস্যা। মার্কিন দেশের এ হল এক দুষ্টগ্রহ। 'টমকাকার কুটির' থেকে যে লড়াই সুরু আজও তার নিষ্পত্তি হয়নি, শুধু রূপান্তর হয়েছে। কালা বিদ্বেষের সঙ্গে আজ মিশেছে শ্রমিক-বিদ্বেষ, গণতন্ত্র-বিদ্বেষ আর সাম্যবাদ-বিদ্বেষ।

আমরাও এ সমস্যার সঙ্গে হাড়ে হাড়ে পরিচিত—এর হালের মাউণ্টব্যাটেনি রকমফের সত্ত্বেও। আবার এ দেশের সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিও যে কতখানি এই বর্ণবিদ্বেষের সামিল বারবার তা' মনে হয়েছে এ বই দু'টি পড়তে পড়তে।

সিনক্লেয়ার লুইসের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দুনিয়াজোড়া ও বেশ কিছুদিনের। 'ব্যাবিট'এর যুগ থেকে যে সব অনুরাগী পাঠক তাঁর সাহিত্যিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন তাঁরা গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছিলেন যে সিনক্লেয়ার লুইসের সুতীক্ষ্ণ কলম বুঝি এবার ভোঁতা হয়ে আসছে। ঠিক এমনই সময়ে সাহিত্যের আসরে তাঁর এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন 'কিংসব্লাড রয়াল' মারফৎ।

যুদ্ধফেরতা নীল কিংসব্লাডের পরিবারই এ উপন্যাসের কেন্দ্র। সাধারণ ধলা মার্কিন-সুলভ সংকীর্ণ অথচ প্রকট শালীনতা বোধ, মহাযুদ্ধ যে গণতন্ত্র ও চার-দফা স্বাধীনতা বাঁচাবার লড়াই—এ সম্পর্কে একটা প্রায় নিস্পৃহ নিশ্চিতি,আর দশটা পরিবারের মত এঁদেরও ছিল। তাদের থেকে হয়ত বেশিই ছিল দাম্পত্য জীবনের নিস্তরঙ্গ সুখ ও শান্তি। কিন্তু ব্যাঙ্কের সুদক্ষ কর্মচারী হিসাবে ধাপে বাঁধা উন্নতি যখন তাঁর করায়ত্ত, পত্নী ভেস্টাল যখন ভাবী জীবনের সচ্ছলতার স্বপ্নে মশগুল হঠাৎ তখন ঘটনা বিপর্যয়ে নীল জানতে পারলেন যে তাঁর মায়ের পূর্বপুরুষ ছিলেন নিগ্রো। এই প্রবল নিষ্ঠুর সত্যকে মেনে নেওয়ার পথে প্রচণ্ড বাধা সারা জীবনের নিগ্রোদ্বেষী সংস্কার। তা ছাড়া পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে ভেস্টাল ও কন্যার প্রতি মমতা ও দায়িত্বের কথা ভোলা চলে না। সবশেষে আছে শান্ত সচ্ছল জীবনের প্রতি অতি স্বাভাবিক গভীর আকর্ষণ।

অথচ এ সত্য এত প্রচণ্ড যে গোপন রাখাও অসম্ভব—দুর্নিবার যে এর আকর্ষণ। অতএব জীবনে এই প্রথম সুরু হল নিগ্রোদের সত্য করে জানবার, বুঝবার প্রয়াস—আত্মসমীকরণের চেষ্টা। যে বিদ্বেষবুদ্ধি এতদিন নীলের মনকে আচ্ছন্ন রেখেছিল আজ চোখে পড়ল তার একান্ত ভ্রান্তি, অবৈজ্ঞানিকতা। অথচ মানুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—কোনক্রমেই 'হিরো' বা 'Martyr' পর্যায়ের নন। তাই ভেস্টালের কাছেও গোপন রইল এ অন্তর্দ্বন্দ্ব—জীবনের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার তাগিদে। এই দুই বিরোধী শক্তির অবিশ্রাম সংগ্রাম ও তার নাটকীয় পরিণতিই হল 'কিংসব্লাড রয়াল'এর মূল কথা।

এই ঘাতপ্রতিঘাত সব থেকে প্রবলভাবে এল নীল ও ভেস্টালের জীবনে। হয়ত মা ছাড়া পরিবারের আর সকলের জীবনেও এল—কিন্তু বাইরের দিক থেকে। এতদিনের পারিবারিক আনুগত্য তাই নিমেষে লোপ পেয়ে দেখা দিল স্থূল স্বার্থের সংঘাত। অবশ্য প্যাট্রিসিয়া নামে নীলের দূরসম্পর্কিত বোনটি ছিল একগুঁয়ে রকম বর্ণবিদ্বেষ-দ্বেষী। এই ধাক্কায় তার একরোখামি বিপজ্জনক ভাবে বেড়ে উঠল। কিন্তু এ চরিত্রে স্ববিরোধ নেই, ঔপন্যাসিকও খুব গুরুত্ব দেননি এর ওপর। তাই তুলনায় এটি অনুজ্জ্বল রয়ে গেল পাঠকের চোখে।

কিন্তু ভঙ্গুর পারিবারিক জীবনের একান্ত বিপর্যয়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ভেস্টাল। চরিত্র হিসাবে ভেস্টাল হয়ত নীলের চেয়েও পাঠকের সহানুভূতি

আকর্ষণ করেন। ধনী, পাকা ধলা মার্কিন পিতার কন্যা হিসাবে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়ত নীলের চেয়েও তীব্র, যদিও অতটা বিচারের পর্যায়ের নয়। নয় বলেই হয়ত ভেস্টাল তাঁর সমস্ত সংশয় দুর্বলতা সংস্কার নিয়ে আমাদের মনকে টানেন। সিনক্লেয়ার লুইসও তাঁরই মুখে বসিয়েছেন উপন্যাসের শেষ কথা—We are moving.

সাহিত্যের বিষয় প্রগতিশীল হলেই সেটা প্রচার সাহিত্য অতএব অপাঠ্য হবে—এমন কথা যাঁরা বলেন তাঁদের এ উপন্যাস পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি।

হাওয়ার্ড ফাস্ট তরুণ মার্কিন লেখক। গত যুদ্ধের কয়েক বছরেই কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 'ফ্রিডম রোড' যে তাঁর গোড়ার দিকের রচনা তা বোঝবার জো নেই। এতখানি পরিণত শক্তি নিয়ে খুব কম লেখকই সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর প্রতিভারও অবশ্য যথাযোগ্য সমাদর ঘটেছে সাধারণ পাঠকের অকৃপণ অভিনন্দনে আর রাষ্ট্রের তরফ থেকে নিষেধাজ্ঞা ও কারাদণ্ডের হুকুমজারিতে।

'ফ্রিডম রোড'এর বিষয় মূলত ঐতিহাসিক। মার্কিন গৃহযুদ্ধের অবসানে সদ্য-'মুক্ত' কালো ক্রীতদাসেরা মনুষ্যত্ব অর্জনের চেষ্টায় যখন সবেমাত্র পথ হাতড়াতে সুরু করেছে সেই সময়কার ঘটনা নিয়ে এ উপন্যাস লেখা। এ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের মানবনীতির ছোঁয়াচে তখন দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে নবজীবনের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। দাসত্বের প্রত্যক্ষ শৃংখল দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালো মানুষেরা মাতল নতুন সমাজ গড়ার কাজে। কয়েক বছরের মধ্যে আশ্চর্য সাফল্যও দেখা গেল, কিন্তু দক্ষিণের সাবেকী দাসপ্রভু ও সারা মার্কিন দেশের কায়েমী স্বার্থের সইল না কালাদের এই ঔদ্ধত্য। রাষ্ট্রযন্ত্রও ততদিনে লিঙ্কনের মানবনীতিভ্রষ্ট হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের হস্তগত। কু ক্লুকস্ ক্লানের গোপন বর্বরতা তাই ক্রমে রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে একদিন আইনসম্মত হয়ে উঠল। চূর্ণ হল—অন্তত সাময়িক ভাবেও—কালো মানুষের আত্মোপলব্ধির প্রয়াস।

কিন্তু এ তো হল ইতিহাসের কথা। এরই পৃষ্ঠপটে হাওয়ার্ড ফাস্ট গেঁথেছেন 'ফ্রিডম রোড'এর আখ্যানভাগ। নায়ক গিডিয়ন জ্যাকসন চরিত্রে ফ্রেডরিক ডগলাস প্রভৃতি নিগ্রো নেতাদের জীবনের আভাস এলেও সেটি আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল। নিরক্ষর এই দাস দাসত্ব ঘোচাবার লড়াই থেকে জিতে তার দক্ষিণ রাষ্ট্রের গ্রামে ফিরে আসছে—এই দৃশ্যেই উপন্যাসের সূত্রপাত। কিন্তু মুক্তির আনন্দের সঙ্গে তার দায়িত্বের কথা ভেবে তখন সে রীতিমত সন্ত্রস্ত। এ দায় বিশেষ করে তাকে পীড়িত করছিল কারণ গ্রামের প্রধান হিসাবে তারই ওপরে যে বিশেষ ভার মুক্তিরচনার। তাই দায়িত্বের মুখোমুখি সে দাঁড়াল বেশ খানিকটা ভয়ে ভয়েই। কিন্তু তার মনে ছিল না কোন পেশাদার রাজনীতিকের কূট কৌশল বা ন্যস্ত স্বার্থের জটিলতা। সহজ বুদ্ধির একটা প্রাথমিক চেতনা দিয়ে সে গ্রহণ করেছিল জেফারসন, হুইটম্যান,

লিঙ্কনের মানবতা ও গণতন্ত্রের বাণী। আন্তরিকতা ও চরিত্রের অনমনীয় বলিষ্ঠতার জোরেই ক্রমে প্রাথমিক সংশয় দুর্বলতা অতিক্রান্ত হল। এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কিনি মাপকাঠিতেও বেশ খানিকটা সাফল্য এল জীবনে। বড ছেলে জেফ গেল নিউইয়র্কে ও পরে বিলাতে ডাক্তারী পড়তে। তবু গিডিয়নের সঙ্গে তার দেশের মাটীর যোগ ছিন্ন হল না। বার বার এইখানে ফিরে ফিরে এসে সে সঞ্চয় করত নতুন লড়াইএর শক্তি। অবশ্য মনের দিক থেকে পরিবর্তন যে ঘটেনি তা নয়, স্ত্রী র‍্যাচেলের সঙ্গে যোগাযোগ আর সেই লোকগাথার প্রেমের পর্যায়ে থাকা সম্ভব হল না। কিন্তু স্বামীর কর্মক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান পরিসর স্ত্রীর মনে প্রথমে খানিকটা দূরত্ববোধ আনলেও সঙ্গে সঙ্গে আনল শ্রদ্ধা ও পরে বিরাট অথচ সহজ মানুষটির প্রতি গভীরতর প্রেম।

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট গ্র্যাণ্টের ক্লৈব্য ও হেশের চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতায় যখন বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠল তখন গিডিয়ন শেষবারকার মত ফিরল তার গ্রামে। ওয়াশিংটনে বসে কালো মানুষদের অভাব অভিযোগ নিয়ে তদ্বির তদারক করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান্ করে সে চলে এল এই কথা বলে : I dont propose to fight to die ; I want to fight to live. I want to fight so that this whole country will see what is happenig here.

রাষ্ট্রপুষ্ট কু ক্লুকসের বর্বর অভিযানের মুখে গিডিয়ন ও তার সহকর্মীদের দুর্জয় প্রতিরোধ ও আত্মদানেই উপন্যাসের শেষ। কিন্তু এই শেষ অধ্যায়ের জন্য লেখক এমন ভাবে পাঠকের মনকে প্রস্তুত করে তোলেন যে এতে নৈরাশ্য আসে না, আত্ম-দানের ট্র্যাজেডি ছাপিয়ে ওঠে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জয়যাত্রা।

গিডিয়নই এ উপন্যাসের মহানায়ক। তার মধ্যে ঐতিহাসিক শক্তির বলিষ্ঠতা ও অপরিণতি দুইই প্রস্ফুট। কিন্তু আশেপাশের চরিত্রগুলিও চমৎকার। র‍্যাচেল, প্রবীণ ব্রাদার পিটার, দুই পুত্র জেফ ও মার্কাস, এমন কি 'গরীব ধলা' এবনার লেট প্রত্যেককেই মনে রাখার মত।

আর একটি চরিত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার বলে মনে করি, কারণ এদেশেও এর দোসরেরাই ক্রমে আসর জমাচ্ছে। এর নাম স্টেফান হোম্‌স্। 'কিংসব্লাড রয়াল'এও এর একটি আধুনিক সংস্করণ পাওয়া যায়। তার নাম মেজর অ্যালডুইক রডনী। এরা অত্যন্ত ভদ্র ও "অমার্কিন কার্যকলাপ সমিতি"র মাপকাঠিতেও একান্ত মার্কিন। এরা ভুলেও নিগ্রোদের 'নীগার' বলে অপমান করে না—হাত নোংরা হওয়ার ভয়ে নিজ হাতে লিঞ্চিং করে না—করলে, সেই পাশব মুহূর্তেও এরা ভাষার সংযম হারাতো না। এরা বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে অম্লান বদনে অবৈজ্ঞানিকতম কথা বলতে সংকুচিত হয় না—কালাদের সুখ সুবিধার জন্যই পৃথক বসবাস সমর্থন করে আর ভেবে চিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় নিগ্রোদের প্রত্যেকটি জীবিকার পথ বন্ধ করার নিরলস সাধনা চালায়। লিঞ্চিং-এর গুণ্ডারা নৃশংসতায় এদের কাছে শিশু—এরাই হল সে বর্বরতার প্রচ্ছন্ন নায়ক।

চিন্মোহন সেহানবীশ

সংস্কৃতি সংবাদ

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলন

১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল। অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসুর সভাপতিত্বে বহরমপুরে নিখিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলনের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন সুরু হল বিপুল উত্তেজনার মধ্যে। ১২ই এপ্রিল থেকেই প্রতিনিধিদের ভিড় জমতে থাকে বহরমপুরে। শেষ পর্যন্ত দেড়শো জনেরও বেশি প্রতিনিধি এসে উপস্থিত হলেন সম্মেলন প্রাঙ্গণে। বেশির ভাগ প্রতিনিধি এলেন কলকাতা থেকে। কলকাতা থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে আমিও একজন। বহরমপুর-যাত্রী ট্রেনের কামরাতেই সম্মেলনের অনাগত সম্ভাবনা সম্বন্ধে বেশ জোরালো আলোচনা সুরু হল। শিক্ষক সম্মেলন উপলক্ষে এত আলোচনা, এত উত্তেজনা এই প্রথম। প্রতিনিধিদের সংখ্যার দিক দিয়েও এই সম্মেলন পূর্বের সব সম্মেলনের রেকর্ড অতিক্রম করে গেল। গত দু'তিন বছর ধরেই কিছু কিছু আলোড়ন সুরু হয়েছে শিক্ষক সম্মেলনে। তবে এবারের সম্মেলন অনেক দিক থেকে অভূতপূর্ব। মাত্র কয়েক বছর আগেও বছরে একবার করে শিক্ষকসমাজ সম্মেলনে সমবেত হতেন, চা পান করতেন, মজলিস হত, কিছু কিছু নির্দোষ প্রস্তাব পাস হত। সভাপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহু তোষামোদ ও ভূরিভোজের আয়োজন চলত। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষক সম্মেলনের এই ছিল রেওয়াজ।

বছর দু'তিন থেকে সম্মেলনের মোড় ঘুরতে আরম্ভ করেছে। যুদ্ধের মধ্যে ও যুদ্ধোত্তর কালে জীবনযাত্রার মান যত নামতে বসেছে, ভাত, কাপড় তেল, কয়লা যত দুষ্পাপ্য হয়ে উঠেছে শিক্ষক সমাজের ভুয়ো সম্মানবোধে ততই চিড় ধরতে আরম্ভ করেছে। বাস্তব জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য হয়ে শিক্ষক-সমাজ ক্রমশ সমাজ-সচেতন ও রাজনীতি-মুখী হয়ে উঠেছে। এই সম্মেলনে শিক্ষকসমাজের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা নানা প্রস্তাব ও নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরিয়েছে।

তবে সম্মেলন আমাদের এই শিক্ষাও দিয়েছে যে, এই সচেতনতা ও সংগ্রামী মনোভাব আজও শিক্ষকসমাজের একাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে সংখ্যার দিক থেকে এই অংশ আজও লঘিষ্ঠ হলেও সম্ভাবনায় ও সজীবতায় এক অনাগত শুভ-দিনের প্রতি ইংগিত জানায়।

মূল সভাপতির ভাষণ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, বিভিন্ন প্রস্তাব ও আলোচনার মধ্য দিয়ে এটাই বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষক সমাজের সামনে আজ এমন সব বাস্তব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে যা আর ধামাচাপা দেওয়া চলে না। শিক্ষকসমাজ শিক্ষা-ব্যবস্থার অখণ্ড সমস্যাকে নিয়ে নিশ্চিত সমাধানের দিকে পৌছাতে আজ বদ্ধপরিকর। তবে শিক্ষকসমাজের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অংশ বিভিন্ন রকমের স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে এই সমাধানের মুহূর্তকে যথাসম্ভব পেছিয়ে দিতে চান। যাঁরা পরিবর্তনের বিরোধী তাঁদের পেছনে সমর্থন আছে বর্তমান কংগ্রেসী সরকারের, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ও বিভিন্ন কলেজের কর্তৃপক্ষের। গতানুগতিকতায় বিশ্বাসী, সংগ্রাম-ভীরু বহু শিক্ষকও নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এই প্রতিক্রিয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করছেন—একথাও অনস্বীকার্য। শিক্ষক সমিতির কর্মপরিষদের মধ্যে উপরোক্ত কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা বিশ্বস্তভাবে কাজ করে চলেছেন, তাঁরা বর্তমান সম্মেলনেও সমিতির শাসন-যন্ত্রটিকে গণতান্ত্রিক আলোচনা স্তব্ধ করার কাজে ব্যবহার করতে মোটেই পিছপা হননি।

সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার আগে থেকেই সমিতির কর্তৃপক্ষের একাংশের সংকীর্ণ উপদলীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যেতে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা ছিল অভ্যর্থনা সমিতির নিমন্ত্রণে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতি এই পরিবর্তনের ঘোর বিরোধিতা করেন। প্রতিনিধিদের এই পরিবর্তনের কারণ সঠিকভাবে জানাবার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ অনুভব করেননি। কর্তৃপক্ষের এই স্বৈরতান্ত্রিক আচারে প্রতিনিধিমণ্ডলী বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। কর্তৃপক্ষ সাধারণকে তাঁদের বক্তব্য জানাবেন কি? শোনা গিয়েছে যে, কংগ্রেসের ভিতরকার উপদলীয় কলহ ও ডাঃ মজুমদারের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নির্ভীক সমালোচনার সম্ভাবনাই নাকি কর্তৃপক্ষের কয়েকজন প্রধানকে এই বিষয়ে অগ্রণী হতে উৎসাহ দিয়েছে।

সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার পর এই কায়েমী-স্বার্থ ভীতি ও উপদলীয় সংকীর্ণতা নগ্নভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। ভোটগণনায় সন্দেহজনক অসাধুতা থেকে গণ-তান্ত্রিক আলোচনায় বাধা প্রদান পর্যন্ত সব রকমের প্রতিক্রিয়াশীল ট্যাকটিক্স গ্রহণ করা হয়। তবে এই সব প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সাধারণ শিক্ষক-সমাজ এই সম্মেলনে অনেক ক্ষেত্রে জয়ের মাল্য নিয়ে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হন। আদর্শ যেখানে মহান, উদ্দেশ্য সেখানে সৎ, সেখানে সাধারণ শিক্ষক ও সাধারণ দর্শক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রগতিশীল শিক্ষকদের প্রতিটি প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হল —সম্মেলনের মূল প্রস্তাব। কর্ম-পরিষদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন

অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়। এই প্রস্তাবে সরকারের শিক্ষা-নীতির সমালোচনা করে বলা হয় যে, সরকার প্রাথমিক শিক্ষা, স্কুলের শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে পৃথক পৃথকভাবে সংস্কারের কথা চিন্তা করছেন। এর ফলে তিন স্তরের শিক্ষকের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হয়েছে। এবং সংশ্লিষ্ট কায়েমী স্বার্থেরা এই সংঘাতকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। কাজেই তিনি এই তিনটি স্তরকে একসঙ্গে বিচার করে এক অখণ্ড শিক্ষা-নীতি গ্রহণ করতে সরকারকে অনুরোধ করেন। তাছাড়া তিনি কংগ্রেসের বহুবিঘোষিত নীতি—৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ও মাতৃভাষার শিক্ষাদান করার নীতি অবিলম্বে চালু করার জন্ম দাবী জানান। অন্য একটি বিশিষ্ট প্রস্তাবে ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা-নীতির নিন্দা করা হয়। এই প্রস্তাবে অভিযোগ আনা হয় যে, ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচলনের নীতি আপাতত সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্বন্ধে ব্যাপক ছাঁটাই-নীতি গ্রহণ করতে পশ্চিম বঙ্গ সরকার মনস্থ করেছেন। তৃতীয়ত, সরকারী বাজেটে শিক্ষকদের আর্থিক সমস্যার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করা হয়নি। চতুর্থত, স্কুল, কলেজ ও হোস্টেলে ছাত্র ও ছাত্রীদের স্থানাভাব দূর করতে সরকার এতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন।

শিক্ষকদের দাবীদাওয়া আদায়ের পন্থা কী হবে এ নিয়েও বিশেষ বিতর্ক সুরু হয়। কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিরা ও শিক্ষকসমাজের অনগ্রসর অংশ আবেদন-নিবেদনের থালা ব'য়ে বেড়াতে চান আজও। কিন্তু শিক্ষক-সমাজের কর্মপ্রবণ অংশ এই আবেদন-নিবেদনের থালা বয়ে বেড়াতে লজ্জা বোধ করেন। একজন শিক্ষক আলোচনার মুখে বললেন—আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি, এখন আর আবেদন-নিবেদনের পথে চলা আমাদের মানায় না। বিতর্ক আরও জমে উঠল যখন একজন প্রতিনিধি প্রস্তাব আনলেন যে, শিক্ষক সমিতিকে ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট অনুযায়ী নতুন ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকদের একটি বৃহৎ অংশ এই প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব নিয়ে মতান্তর শেষ পর্যন্ত মনান্তরে পরিণত হতে পারে ও সমিতির ঐক্যে ভাঙন আসতে পারে এই আশংকায় এই প্রস্তাব এক বছরের জন্ম প্রত্যাহার করার জন্ম প্রস্তাবক এক সংশোধন গ্রহণ করেন। প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে বিভেদ আনার চেষ্টা করেছিলেন, এই সংশোধনী প্রস্তাবে তা বানচাল হয়ে যায়। শিক্ষকদের প্রগতিশীল অংশ এই দূরদর্শিতা দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে, সমিতির ঐক্যের প্রতি তাঁদের দরদ কত বেশি, কত আন্তরিক।

তবে সম্মেলনের সবচেয়ে লজ্জাকর অধ্যায়ের কথা এখনও বলা হয়নি।

অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী বর্তমান কংগ্রেসী সরকারের অগণতান্ত্রিক উপায়ে বিরুদ্ধ দলের কণ্ঠরোধ, মৌলিক নাগরিক অধিকারের কণ্ঠরোধ প্রভৃতিতে আশংকা প্রকাশ করে এক প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়নি। অবশ্য এই প্রস্তাবের পক্ষে অর্ধেকের কিছু কম লোকে ভোট দেন (৬০-৭৩)। যারা দেন না তাঁরা এর আগে প্রত্যেকটি শিক্ষা সমস্যার প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক সমাধানের বিরোধী ছিলেন। এই কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসী বড়কর্তাদের অনুকরণ করে 'লালাতংকে'র (ত্রিপুরারিবাবুর ভাষায়) জিগির তোলেন। 'লাল জুজু'র নামে তাঁরা মৌলিক নাগরিক অধিকারেরও বিরোধিতা করেন—এটাই হল এই সম্মেলনের সব চেয়ে দুরপনেয় কলঙ্ক। অবশ্য, লালাতংকের নামে শিক্ষকদের এই আত্মপ্রবঞ্চনা শিক্ষক সমাজের অনগ্রসর অংশের মধ্যেও আত্মসমালোচনার সৃষ্টি করে। কেউ কেউ বলতে থাকেন—শেষ পর্যন্ত এই কথাই কি দেশ জানবে যে, শিক্ষক সমাজ মৌলিক নাগরিক অধিকারও চায় না! এই লাল আতংক সৃষ্টি করেই প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কায়েমী স্বার্থের এজেণ্টরা। কিন্তু কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর 'উদাত্ত' আহ্বান সত্ত্বেও কয়েকজন আন্তরিক কংগ্রেসসেবী তাঁর প্রতিক্রিয়ার পৌরোহিত্যকে পছন্দ করতে পারেন নি একজন পক্বকেশ কংগ্রেস কর্মী বললেন, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট এটা আমাদের সামনে প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল—শিক্ষকের জীবিকার জন্য, সম্মানের জন্য, সুশিক্ষার জন্য সংগ্রাম, আর বড় বড় বুলির আড়ালে এই সব সমস্যাকে পাস কাটিয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়াশীল চেষ্টা। এই সংঘাতে আমরা চিরদিন সংগ্রামী অংশের সঙ্গেই ছিলাম, আজও থাকবে।

সত্যিই, আজকের শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম, ভদ্রজনোচিত জীবিকার জন্য সংগ্রাম, দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের জন্য সংগ্রাম দেশের অখণ্ড ও বিরাট গণতান্ত্রিক জীবনবোধের সংগ্রামের এক বিশিষ্ট অংশ। শিক্ষকসমাজ দেশের সংগ্রামী মানুষের সহানুভূতি পাবেন, সমর্থন পাবেন, সাহচর্য পাবেন যত তাঁরা এগিয়ে আসবেন তাঁদের নিজের সংগ্রামে। তাঁদের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁরা যত বেশি জয়ী হবেন, দেশের অখণ্ড গণতান্ত্রিক সংগ্রাম তত সাফল্যের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

শেষে এই কথা না বলে পারি না যে, অভ্যর্থনা সমিতি ভূরিভোজে প্রতিনিধিদের আপ্যায়িত করতে এতটুক কসুর করেন নি। তাঁদের নির্ভীকতা ও সাহচর্য আমাদের বহরমপুরের তিন দিনের জীবনকে বিশেষভাবে স্মরণীয় ক'রে রাখবে।

ভরদ্বাজ ভদ্র

বিয়োগপঞ্জী : অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

যাঁরা আজীবন দেশকালের বহির্দেশে মানসলোকে বাস করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অন্যতম। তাঁকে বাঙালী বলাও চলে না, বিংশ শতাব্দীর মানুষ বলা চলে না। যাঁরা প্রকৃত সাহিত্যলোকে বিচরণ করেন এবং কোনও পার্থিব রাজ্যের প্রজা হন না—এই রকম ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

কুড়ি বছর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগারে, সাদাসিধা কোট ও ধুতি পরিহিত নাতিদীর্ঘ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের স্থূলদেহের অন্তরবাসী ষোড়শ শতাব্দীর একজন ইংরেজের কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম। বাঙালীর গলায় এমন স্বর কোনো দিনও শুনব আশা করিনি।

সাহিত্যের একটা দিক আছে যেখানে পাণ্ডিত্য আর নাট্যকলার মিলন হয়। যে পণ্ডিত এবং যে অ্যাকটর তারা যে অভিন্ন হতে পারে একথা আমাদের অনেকের ধারণার অতীত ছিল। অ্যাকটরের যে রঙ্গমঞ্চ ও সাজ-পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয় না, ড্রপসীন লাগে না, আলোবাতি লাগে না, একথা ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজরা আবিষ্কার করেছিলেন। আমরাও দেখলাম ও সব ত' লাগেই না, উপরন্তু রূপলাবণ্যও লাগে না। চোখের সামনে আধাবয়সী স্থূলদেহী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মৃত্যুবাসরবাসিনী ডেস্‌ডেমোনা হয়ে গেলেন, যে ছিল সৌরভশোভিনী ললিত-লতার মত, যার জন্য কামনা বেদনাকাতর হয়ে পড়ত।

যাঁদের প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সেক্সপীয়র পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে, কেবলমাত্র তাঁরাই এ কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল তাঁর সম্পদ। একবারে আগাগোড়া একখানা সেক্সপীয়রের নাটক পাঠ করে যেতেন, এবং শ্রোতারা মুগ্ধ নৈঃশব্দে শ্রবণ করত। একটা মানুষের গলা থেকে এত সুর, এর স্বর, এর ভাব, আবেগ, উদ্বেগ যে নিঃসৃত হতে পারে যে না শুনেছে সে কল্পনা করতে পারে না।

একটুখানি হাত পর্যন্ত সঞ্চালন করতেন না, তাঁর ধ্বনিপ্রকাশ ছিল এমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাঠ করবার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ধারণ করতেন।

আর কী অপূর্ব ইংরেজি উচ্চারণ! আজীবন বাংলা দেশে কাটিয়ে কেমন করে এমন উচ্চারণ আয়ত্ত করলেন কে বা জানে।

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। কতকগুলি স্মৃতি ছাড়া কী রেখে গিয়েছেন? দেশের জন্য কোন্ সম্পদ রক্ষা করে গিয়েছেন? কী দিয়ে উত্তর কালে প্রমাণ করা যাবে যে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন? যাঁদের পাণ্ডিত্য বইয়ের পাতায় আবদ্ধ হয়নি, যাঁদের বৈদগ্ধ্য তাঁদের চিত্তে নিহিত ছিল, দেশের জন্য তাঁরা কী রেখে যান? জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা, গাইয়ে-বাজিয়েরা, যাঁরা ব্যক্তিগত গুণে জনসাধারণকে মুগ্ধ করতেন, কতটুকুই বা তাঁরা উত্তরাধিকারস্বরূপ

দান করে যেতে পারেন। স্বরলিপি দিয়ে যেমন সঙ্গীত বিচার করা যায় না, তেমনি তাঁর হাতের কোনও রচনা দিয়ে প্রফুল্ল ঘোষকে বিচার করা যায় না।

রস দুই শ্রেণীর হয়, নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিগত। মোলিয়ের, সেক্সপীয়র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলালের রস সম্ভারের কোনও পরিচিতির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যাঁরা যুগে যুগে, দেশে দেশে জনসাধারণকে ঐ রস পরিবেশন করেছেন, অরূপকে রূপ দিয়েছেন, তাঁদের গুণপনা একান্ত ব্যক্তিগত, এবং ব্যক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কতটুকু তার বাকী থাকে!

হেলেনের রূপের চিহ্নমাত্রও নেই, কেবলমাত্র খ্যাতিটুকুই রয়েছে। প্রফুল্ল-চন্দ্র ঘোষের অসাধারণত্বর স্মৃতিটুকুই আমাদের চিত্তে রয়েছে। অসাধারণত্বটাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, প্রফুল্ল ঘোষ কেবলমাত্র সেক্সপীয়রের অধ্যাপক ছিলেন। অগাধ ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত তাঁর কাব্যানুরাগ। কাব্যের প্রতিটি শব্দের যে মূল্য আছে একথা তাঁর কাছে শুনেছিলাম।

মানুষের আজকাল নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিসের আদর করবার সময় নেই, কিন্তু কোন্‌টা বা দরকারী আর কোন্‌টা অদরকারী সে কথা বিচার করবার কোনও নিয়মকানুন নেই। যদি শুধু খাওয়া-পরা, দেহের আরাম, রোগের ঔষধ ও বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান জীবনের পক্ষে দরকারী হয়ে থাকে তবে প্রফুল্লচন্দ্র পর্যায়ের কাব্যা-নুরাগীদের জগতে আর স্থান নেই। এইটুকু ভরসা যে, যতদিন মানুষের কণ্ঠ ও শ্রবণ থাকবে, প্রয়োজনীয় অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজনের আদর বেশি হবে।

লীলা মজুমদার

পত্রিকাপ্রসঙ্গ

ফরাসী সংস্কৃতির বিপ্লবী অভিযান: লা পঁসে

প্রগতিবাদী সাহিত্যের কাজ হল সামাজিক এবং ঐতিহাসিক অগ্রগতিকে সাহায্য করা। সেই অগ্রগতির পতাকাবাহক শোষিত জনগণের সংগ্রামের সমস্তাগুলিকে ফুটিয়ে তুলে সম্মুখের পথ নির্দেশ করতে পারাতেই তার সার্থকতা। বাস্তব জীবনের সমস্তাগুলির সমাধান ছাড়াও চিন্তার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিফলন এবং প্রকাশভঙ্গী প্রগতি-সাহিত্যিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বাধ্য।

অগ্রগতির প্রত্যেক ধাপে সাহিত্যিকদের সামনে বহু প্রশ্ন নতুন ও জটিলতর রূপে দেখা দেবে। কারণ প্রগতিবিরোধী শক্তি নতুনকে সহজে পথ ছেড়ে দেয় না, আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। বাস্তব জীবন থেকে চিন্তাজগত পর্যন্ত জুড়ে চালায় ব্যাপক প্রতি-আক্রমণ। তাই শুধু মাত্র জনগণের অভাব অভিযোগ আর সংগ্রামকে সাহিত্যে রূপায়িত করে তুলেই প্রগতি-লেখকদের কর্তব্য শেষ হয় না; চিন্তা এবং আদর্শের ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সমস্ত কৌশল এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে এগিয়ে আসতে হবে।

আজ দুনিয়ায় ধনতন্ত্রের সংকট চরমে উঠেছে। মুমূর্ষু সমাজের শক্তিগুলি আজ আত্মরক্ষার মরীয়া প্রচেষ্টায় হিংস্র। সমস্ত দেশে তার আক্রমণ কেবলমাত্র জনসাধারণের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ নয়। চিন্তা আর মত-বাদের ক্ষেত্রে তা সুচতুর, বহুমুখী ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। তারা চায় জনগণের দৃষ্টি সত্যের দিক থেকে ফিরিয়ে নিতে। মুক্তিকামী মানুষের মনে হতাশা এবং ভ্রান্তি সৃষ্টি করে প্রতিরোধের সংকল্পকে দুর্বল করতে তাদের আয়োজনের অন্ত নাই। সোভিয়েট ইউনিয়নের মত দেশ, যেখানে প্রতিবিপ্লবের পঞ্চমবাহিনী হবার মত কোন শক্তি অবশিষ্ট নাই, সেখানেও তারা অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে, বুদ্ধিজীবীদের কোন কোন অংশের মনে পুরাতন দিনের যে সব সংস্কার এখনও অবশিষ্ট রয়ে গেছে তারই সুযোগ নিয়ে। তাই সোভিয়েট লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তানায়কেরা এ বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রেখেছেন।

প্রগতিশীল ফরাসী পত্রিকা 'লা পঁসে' (চিন্তা) পড়ে বোঝা যায় যে, ফ্রান্সের চিন্তানায়কেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তাঁদের বলিষ্ঠ অভিযান থেকে আমাদের বহু শিক্ষণীয় আছে।

'লা পঁসে', নিজের ভাষায়, আধুনিক বুক্তিবাদের মুখপত্র। পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ লেখক পল লাঁজভ্যাঁ, সম্পাদক রেনে মরা, পরিচালক মণ্ডলীতে আছেন জোলিও-কুরি, জর্জ কনিঞো, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার প্রভৃতি অনেকে যাঁরা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি দিক দিয়ে বিশ্ববিশ্রুত হয়েছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ফরাসী জাতির চিন্তাজীবনে বিভিন্ন রূপে যে বিষ ছড়াতে সুরু করেছে, 'লা পঁসে'র গত আগস্ট সংখ্যায় জর্জ কনিঞো সে দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দেশী অনুচরদের কার্যকলাপ আরও সাংঘাতিক। নানা ছদ্মবেশের আড়ালে আত্মগোপন করে তারা অগ্রসর হয়। সংগ্রামশীল জনগণের শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়গান করে। নৈরাশ্যবাদ, হতাশা এবং পরাজিতের মনোভাবের আবরণে জনসাধারণকে সংগ্রামবিমুখ করে তুলতে চায়। গল্প, উপন্যাস, মতবাদ ইত্যাদির মারফত বোঝাতে চায় যে, প্রগতি সম্ভব নয়, লড়াই করে কিছু হবে না; তাতে শুধু বৃথা শক্তিক্ষয়। বাস্তববিমুখ রহস্যবাদের ধূম্রজাল রচনা, মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করেই ক্ষান্ত নয় তারা; মানুষের নীচতম প্রবৃত্তিগুলিকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে বসায়—স্বার্থান্ধ পশু প্রবৃত্তি, যৌন বিকার, ভীরুতা, বহুকামিতা। এক কথায় মানুষের ইতিহাসের সমস্ত গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার। 'এক্‌সিস্টেনসিয়ালিস্ট'রা হল এই সংস্কৃতি-বিরোধী শিবিরের অন্যতম নেতা।

কিছুদিন আগে কয়েকখানি প্রগতিশীল বাংলা পত্রিকায় 'এক্‌সিস্টেনসিয়ালিজম' সম্বন্ধে আলোচনা বেরিয়েছিল। যতদূর মনে আছে সবগুলি লেখাই তাকে পরাজিতের মনোভাব-প্রসূত পলায়নপন্থী মতবাদের বেশি আর কিছু সংজ্ঞা দেয়নি। কিন্তু 'লা পঁসে' তার আসল রূপটিকে নগ্ন করে তুলে ধরেছে। 'লা পঁসে'র মতে এক্‌সিস্টেনসিয়ালিজম হল পলায়নের ভাণে প্রতিক্রিয়ার সুকৌশলী প্রতি-আক্রমণ।

এক্‌সিস্টেনসিয়ালিস্টরা 'মানবতা'র বুলি আওড়ায়। তাদের প্রধান কাজ মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধ অপপ্রচার। মানুষের 'স্বাধীন ইচ্ছা', 'সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা' ইত্যাদি মুখরোচক কথার সাহায্যে বস্তুবাদের প্রতি শ্রমকারী জনগণের বিশ্বাস নষ্ট করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য।

'লা পঁসে'র সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যার 'মার্ক্সের চিন্তাধারায় বস্তুবাদ ও মানবপ্রেম' নামে প্রবন্ধে আঁরি দেনি এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

এক্‌সিস্টেনসিয়ালিজমের প্রধান প্রচারক সার্তর্‌ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে সে স্থানে মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে চান এক অতি-প্রাকৃত সত্তা রূপে। তাঁর কথায় "অতিপ্রাকৃত (transcendent) লক্ষ্য অনুসরণ করেই কেবল মানুষের

পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব।” অর্থাৎ মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পথ দেখানোর অজুহাতে তারা বাস্তব ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্ককে অস্বীকার করে। মানব ইতিহাসে পথপ্রদর্শক হিসাবে যুক্তি এবং বিজ্ঞানের ভূমিকাকে উড়িয়ে দিতে চায়।

সার্ত্‌র্‌-এর কথা মতো “মানুষ পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট চিহ্নের অবলম্বন লাভ করুক, এর বেশি আর কিছু এক্‌সিস্টেনসিয়ালিজম চায় না। কারণ মানুষ নিজের খুশিমত চিহ্নের ব্যাখ্যা করে নিতে পারবে।”

তাঁর মতবাদের পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, প্রত্যেকে নিজের খেয়াল খুশিমত তুনিয়াকে ব্যাখ্যা করার যথেচ্ছ অধিকার পাবে, যুক্তিবিচারের মুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার থাকবে না। মানবপ্রেমের ভণ্ডামির দ্বারা মানবতার এর চাইতে বড় শত্রুতা আর কি হতে পারে? সার্ত্‌র্‌-এর নির্দেশমত চললে মানুষে মানুষে সহযোগিতা, সমবেত চেষ্টায় বিশ্ব ও সমাজকে রূপান্তরিত করার সংকল্পকে বিসর্জন দিতে হবে। যুক্তি ও বিজ্ঞানকে নির্বাসনে পাঠিয়ে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে অতিপ্রাকৃত মানুষের উপাসনা। সমসাময়িক ফ্রান্সের পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এক্‌সিস্টেন্‌সিয়ালিজমের মুখোস খুলে পড়ে। প্রতিবিপ্লবের নেতা দ্য গল ও তার অনুচরেরা আজ ঠিক এই জিনিসটা রাজনীতিক্ষেত্রে নগ্নভাবে প্রচার করছে—একজন দৈবপ্রেরিত শক্তিমান পুরুষের হাতে নির্বিচারে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেবার ফ্যাসিস্ট মতবাদ।

আঁরি দেনি দেখিয়েছেন যে, মার্ক্‌স্‌বাদই মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতার পথ নির্দেশ করে। পৃথিবীকে রূপান্তরিত করতে যুক্তিই হল তার হাতে সব চেয়ে বড় হাতিয়ার। প্রকৃতি এবং ইতিহাসের অগ্রগতির মূল নিয়মগুলিকে জেনে ও সচেতনভাবে কাজে লাগিয়েই মানুষ নিজের অদৃষ্টনিয়ন্তা হতে পারে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে সমবেত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় জীর্ণ শ্রেণীসমাজকে চূর্ণ করে শ্রেণীহীন সমাজ রচনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে মানবতার অপরাজেয় অভিযান। সমস্ত রকমের শোষণবন্ধনমুক্ত হয়ে সে দুরন্ত বেগে অগ্রসর হবে নব নব বিজয়ের পথে। সেই শিক্ষাই যথার্থ মানবপ্রেমের উৎস, প্রেরণা, সব কিছু।

‘লা পঁসে’ হল সমালোচনা-পত্রিকা। প্রগতিবাদের সামনেকার সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ ও তার সাহায্যে নবসৃষ্টির পথ পরিষ্কার করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রগতি-লেখকদের দিশা নির্ণয়ে সে মস্তবড় সহায়ক; চিন্তাজগতে ধ্রুবতারার মতই অবিচলভাবে তার কাজ করে চলেছে। সেজন্য দূরদূরান্ত থেকে পেয়েছে অভিনন্দন। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ‘বলশেভিক’ পত্রিকার আগস্ট সংখ্যায় ‘লা পঁসে’র অবদান সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে।

আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। “নাৎসী কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পগুলির

সম্বন্ধে" নামে পিয়ের দে-র লেখা। প্রবন্ধটি কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পগুলির জীবন নিয়ে রচিত দুটি বইয়ের সমালোচনা।

দুটি বইতে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব ফুটে উঠেছে। একটির লেখক দাভিদ রুসে,—সংগ্রামবিমুখ, মুমূর্ষু সমাজের, প্রাণহীন অতীতের ব্যাধিগ্রস্ত মনোবৃত্তির পরিপোষক। তাঁর বইয়ের নাম হল "আমাদের মৃত্যুর দিনগুলি"(Les Jours de Notre Mort)।

রুসে নিজে বন্দী ছিলেন। নাৎসী বন্দীশিবিরের বর্বর অত্যাচারের অনেক সজীব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। শিবিরের সিপাই-সান্ত্রীর কাজ করার জন্ত নাৎসীরা ইউরোপের নানাদেশের গুণ্ডা-বদমাইসদের একত্র করে। সমস্ত দেশের ফ্যাসিস্ট দস্যুরা, পেশাদার খুনী, লুম্পেন একসঙ্গে মিলে বন্দী ফ্যাসিবিরোধীদের ওপর চালিয়েছে চরম অমানুষিক অত্যাচার। সে কাহিনী রুসের লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু ঐ শৃংখলিত অসহায় অবস্থার মধ্যেও ফ্যাসিবিরোধীদের যে অমর প্রতিরোধ সমস্ত নির্যাতন তুচ্ছ করে অটুট থেকেছে তার বিশেষ কোন আভাস পাওয়া যায় না। কারণ, প্রথমত, রুসে নিজে সে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন নি। নাৎসী কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের কঠোর ব্যবস্থার মধ্যেও প্রতিরোধ চালানোর উদ্দেশ্তে গড়ে উঠেছিল ফ্যাসিবিরোধীদের গোপন সংগঠন। বুকেন্‌ভাল্‌ডের মত কুখ্যাত কারাগারেও তার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। সেই গুপ্ত সংগঠন 'এস এস' রক্ষীদের হত্যা পরিকল্পনাকে অনেক পরিমাণে ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েছিল। বহু ফ্যাসিবিরোধী যোদ্ধার প্রাণরক্ষা হয়েছে তার নানা দুঃসাহসিক কৌশলের ফলে। কিন্তু রুসের লিখিত বইতে সে অপূর্ব কাহিনী অতি সামান্তই স্থান পেয়েছে। কারণ, তিনি প্রতিরোধ সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন, নিষ্ক্রিয় বশ্যতার মনোভাবের দ্বারা অভিভূত। কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের দুনিয়াকে তিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন "বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, চারিদিকে রুদ্ধ এক রহস্তময় জগৎ"। সে পরিবেশে যা কিছু ঘটছে তাঁর পক্ষে তাই স্বাভাবিক।

আসলে কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পগুলি ছিল ফ্যাসিস্ট শাসনের চরম কেন্দ্রীভূত প্রকাশ। হিটলারী পৈশাচিকতা সেখানে মুখোসহীন, পুরোপুরি অনাবৃত। সেখানকার সুপরিকল্পিত নির্য্যাতন ব্যবস্থা ফ্যাসিজমেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। একজন জার্মান কমিউনিস্ট বুস বলেছেন, "ক্যাম্পগুলিকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে তাদের মৌলিক বিশেষত্বগুলি সম্যকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। আসলে সেগুলি হল ধ্বংসোন্মুখ পুঁজিবাদী সমাজের ভীষণতম অভিব্যক্তি।"

দাভিদ রুসে সেই মূল প্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটন করার বদলে রহস্তময় ধূম্রজালের সাহায্যে তাকে ঢাকারই প্রয়াস পেয়েছেন। সেটা তাঁর পক্ষে আকস্মিক বা

অনবধানতা জনিত নয়। তাঁর গোটা বইটা হল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কৌশলী অপপ্রচার, সত্যের অপলাপ।

বন্দী শিবিরের ভিতরকার প্রতিরোধ আন্দোলনে কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা তিনি একেবারে অস্বীকার করতে সমর্থ হন নি। কিন্তু সেই আন্দোলনের প্রধান সমস্যাগুলির উল্লেখ সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে যে ছবি এঁকেছেন তা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণতার সুযোগ নিয়ে তিনি সত্যকে বিকৃত ও পাঠকদের মনে বিভ্রান্তি জন্মাতে চেয়েছেন।

যাঁরা ভিতরে প্রতিরোধ চালিয়েছিলেন তাঁরা সেটাকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সামগ্রিক লড়াইয়ের অংশ হিসাবে দেখেছিলেন। তাই তাঁদের সংগ্রামে শৈথিল্য বা অবসাদ আসেনি।

আলোচ্য অপর বইটির নাম 'যারা বেঁচে আছে' (Ceux qui Vivent)। এখানে অস্পষ্টতার ধূম্রজাল নাই। সোজা সরল ভাষায় ভিতরে ও বাইরে ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের সৈনিকদের অদম্য দৃঢ়তার গাথা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বইখানির লেখক জঁা লাফিৎ।

মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াইতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, কমিউনিস্ট বা অ-কমিউনিস্ট, তাঁদের প্রকৃত পরিবেশে যথার্থ চিত্রাঙ্কন করেছেন জঁা লাফিৎ।

সমালোচকের কথায় দাভিদ রুসের দৃষ্টি মৃত্যুর দিকে নিবদ্ধ। ফ্যাসিজমের পরাজয়ের পর ইতিহাস লিখতে বসে তিনি ফরাসী জনগণের মধ্যে সংগ্রাম-ভীরুতার বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আর জঁা লাফিৎ-এর লেখায় প্রাণবন্ত হয়েছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভের নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত অজেয় মানুষদের বীর গাথা—যাদের দৃষ্টি অতীতে নয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত।

'লা পঁসে'র আলোচ্য সংখ্যায় আরও বহু মূল্যবান জিনিস আছে। গ্রীসের প্রতিরোধ সাহিত্যের রূপরেখা, বিখ্যাত ফরাসী লেখক জঁা রিশার ব্লশের জীবনী ও চিঠিপত্র, রুশ ঐতিহাসিক হারজেনের বৈপ্লবিক অবদান, ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাময়িকপত্র ও সিনেমা এবং নতুন প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনা।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সবগুলির বিস্তৃত উল্লেখ করা গেল না। ছোট বড় সমস্ত লেখাগুলিই নিজ কর্তব্য এবং ভূমিকা সম্বন্ধে সর্বদা-সজাগ বলিষ্ঠ প্রগতি-বাদের পরিচায়ক। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইতে তার পদক্ষেপ অনাবশ্যক সংকোচের দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত নয়।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

আলোচনা

চীনা কাব্য-পরিক্রমা

ভাষার ক্ষেত্রে যেমন, আঙ্গিক ও কাব্য-প্রকাশের ক্ষেত্রেও তেমনি চীনা কাব্য-সাহিত্য যুগে যুগে জনগণের কাছ থেকে কেবলই দূরে সরে গেছে, আবার তার অন্তর্নিহিত অদম্য প্রাণশক্তি তাকে বারেবারে গণমানসের কাছে টেনে এনেছে। চীনা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটিভাবে এই রূপান্তরেরই ইতিহাস। সম্প্রতি হঙ্-কঙ্ থেকে প্রকাশিত China Digest পত্রিকার একটি সংখ্যায় সাম্প্রতিক চীনা-কাব্যের ভূমিকা হিসেবে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সেই কাব্যের বিবর্তনেরও একটা সংক্ষিপ্ত অথচ উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া গেল।

সকল দেশের কাব্য-সাহিত্যের মতো চীনা কাব্যও প্রেম-নিবেদনের বহিঃপ্রকাশ, শ্রম-বিনোদন, ঘুমপাড়ানি গান, ছেলেভুলানো ছড়া, ধর্মানুচরণের মন্ত্র ও প্রবাদবাক্য প্রমুখ বহুমুখী প্রেরণা থেকে জন্মলাভ করেছিল। আসল কথা আদিম যুগে গণসমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন থেকেই এর উৎপত্তি আর শ্রুতি হিসেবে মুখে মুখে ছিল এর প্রচার। সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে একদা লিপির আবিষ্কার হল আর লেখ্যভাষার কবিতাই হলো প্রথম অবদান। উত্তরকালে সাহিত্য যতোই সম্পদশালী হতে লাগলো ততোই গণসমাজের অন্তর থেকে এর বিচ্ছেদ ঘনিয়ে এলো আর রাজদরবারে অথবা আত্মকেন্দ্রিক বিদগ্ধ-মহলে এর সৃষ্টি ও উপলব্ধির পরিধি ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো।

আদিম সমাজের গণ উৎসবকে কেন্দ্র করে নৃত্যগীতমুখরিত উৎসব-প্রাঙ্গণে সমবেত নরনারী হৃদয়ের রসের ভাণ্ডার উজাড় করে দিত, আনন্দের চরম মুহূর্তে কদাচিৎ স্বতঃই উৎসারিত হতো কয়েকটি কাব্য-পংক্তি যা সবারই মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হত। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এককণ্ঠ থেকে সহস্রকণ্ঠে। উত্তরকালে যখন লিপি আবিষ্কৃত হল তখন এই সব কণ্ঠলগ্ন সঙ্গীতরাশি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল কিনা জানার উপায় নেই, তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে 'প্রাচীন চীনা কাব্য-সংকলন'-এ যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে সেগুলো নিশ্চয়ই এরা নয়। উপরোক্ত সংকলনের কবিতাগুলোর প্রায় সবগুলোই চার-মাত্রা পংক্তির কবিতা। আর এই কারণেই এখনো শিক্ষা-প্রসূত সাধনার অভিব্যক্তি। সাধারণ মানুষের কথ্যভাষায় স্বতোচ্চারিত কাব্য কখনও চেষ্টা-প্রসূত চার-মাত্রার বাহনে প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং আদি চীনা-কাব্যের উৎস-সন্ধানের অভিযানে আমাদের সংকলন-গ্রন্থের যুগকে ফেলে রেখে আরও দূরে এগিয়ে যেতে হবে।

অনেকের মতে চারমাত্রা-ছন্দের পূর্বতনকালে চীনদেশে কবিতা জন্মলাভ করেনি। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে প্রাক্-সাহিত্য-ইতিহাস যুগেও আজকের দিনের মতো লোকসঙ্গীত গাওয়া হত, আর তৎকালীন কথ্য-ভাষাতেই সেগুলো রচিত। দ্বিতীয়ত, উপরোক্ত সংকলন-গ্রন্থের কবিতাগুলোর সমসাময়িক আরও একখানি কাব্য-গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই। তার নাম 'চু-ৎস্থ', —কথ্যভাবায় লেখা। আর চীনা প্রেম-সঙ্গীতের আদি কাব্য নিদর্শন (যেগুলো উদ্ধার করা গেছে তাদের মধ্যে) কোআং-তুএর পাহাড়ী গান,—এর ভাষাও কথ্যভাষা।

কিন্তু এই 'চু-ৎস্থ'র কবিতাগুলোকেও আদি-কাব্য বলা যেতে পারে না, তার কারণ এগুলো কনফুসীয় পণ্ডিত চু-উআন্-কৃত পরিমার্জিত সংস্করণ। এর ভেতরও রাজসভার বিদগ্ধ-হস্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিচে কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করে দেওয়া হল :

সূর্য আর চন্দ্র হায়, তারা তো থামে না
বসন্ত-শরৎ ঋতু ত্বরা অপহৃত
তৃণ আর গাছ হায়, তারা তো শুকায়
কাঁপে শুধু,—সৌন্দর্যের গোধূলি যে গত

মানুষের যন্ত্রণায় আমার করুণা
দীর্ঘশ্বাস ঝরে কতো অশ্রুরা গোপন
ব্যর্থ আমি দিতে নারি মাল্যের সম্মান
উষায় বিকাশে আর রজনীতে ম্লান

যোগ্য সেই নিজ গন্ধে মাল্য করে জয়
ঘৃণিত লুণ্ঠিত যারা শুধু ব্যথা বয়
সৌরভ তো কোনো দিন ফুরাবেনা, আহা
বিগত দিনের মতো আজো সে অক্ষয়।

এই বৈদগ্ধ্য-লাঞ্ছিত কাব্য-কাননেও দু-একটি জীবন্ত কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছন্দের পাষাণ-বেদীতে সে-ফুল স্ব-ইচ্ছায় বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি :

১

পূবে সূর্য আমরা খাটি
পশ্চিম গেলে পাই যে-ছুটি
কুঁয়া খুড়ি পানি পিণা
জমি চষি মিলবে দানা
রাজার দাপট আমরা সবাই থোড়াই কেয়ার করি।

২

উজ্জ্বল শাদা মেঘের গুচ্ছ, আহা
আপনাকে মেলে কেবলি অন্তহীন
সূর্যের আর চন্দ্রের জ্যোতি, আহা
প্রতিদিন নভে বিকশিত অমলিন।

৩

নরম গমের মঞ্জরী বাড়ে মন্থনী
তারি সাথে ক্ষেতে রাই আর যব বাড়ে
আহা মরি, ওই তন্বী অদূরবর্তিনী
ভালো তো বাসে না হায়, অভাগ্য আমারে।

৪

দক্ষিণ-সমীরের
উষ্ণতা,
আহা,
আনবে সে রোগ থেকে
মুক্তি রে,
আহা,
মৌশুমী দক্ষিণ
ঝড়ের হাওয়ায়, আহা,
সোনার দুয়ারখানি
খুলে যায় রে!

ছন্দ ও মাত্রার কঠোর শাসনকে ফাঁকি দিয়ে কয়েকটি কবিতা তার স্বাভাবিক প্রাণশক্তি নিয়ে পাঠকদের কাছে ধরা দিয়েছে। তারই দুটো উদাহরণ নিচে যথাসম্ভব মৌলিক ছড়ায় ছন্দে অনুবাদ করে দেওয়া গেল :

১

উজ্জ্বল পিচ-গাছে
উচ্ছল ফুল
বধূ ঘরে এলো রে
দাওয়া মশগুল

উজ্জ্বল পিচ্-গাছ
বিকশিত ফল
বধূ ঘরে এলো রে
গৃহ চঞ্চল

উজ্জ্বল পিচ্-গাছ
পাতা শ্যাম ঘন
বধূ আজ এলো রে
ঘর-মাতানো।

কু-আন্-চুরা গান গায়
দ্বীপের ওপর
ও সুজন-কন্যা গো
তোমার খোঁজে ঘর

ছন্দে নাচে শ্যাওলা-ঝাড়
নাচায় সোঁতের জল
ওরে সুজন-কন্যা রে
স্বপন-অচঞ্চল

চিরকালের ধ্যান স্বপ্নে
বৃথাই রে ভাবনা
প্রহরের পর প্রহর শুধু
করে আনাগোনা

ঝর্ণা-সোঁতে দোলে রে
দোলে ঘাসের বন
ও সুজন-কন্যা রে
কাব্যের স্বপন

সোঁতের মাণিক গায়ে নিয়া
দোলে ঘাসের বন
ও সুজন-কন্যা গো
সুরের স্বপন।

চীনা কাব্য ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় রাজসভা ও জনগণের পরস্পর প্রতিযোগিতার কাহিনী। এক কথায় একে বলা যেতে পারে বিদগ্ধ ও প্রাকৃতের, অঙ্কিত ও স্বভাবজের বিরোধ। প্রথমোক্ত দল অধিকতর শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও গণসমাজ তার কাব্যধারা ও সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। আর্যাবর্তের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য করা যায় ছন্দস্ ও সংস্কৃত আর পরবর্তীকালে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে। চীন রাজসভা ও সুধীমহল যখনই কোনও প্রাকৃত আঙ্গিক ও ভাবধারা পরিমার্জিত করে আপনার অধিকারভুক্ত করে নিয়েছে, সাধারণ চীন-জনসমাজ তখনই এক নবতর আঙ্গিক ও ভাবধারার আশ্রয় নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ চারমাত্রা ছন্দ যখন রাজকীয় আনুকূল্য লাভ করেছে তখন জনসাধারণ মুক্তছন্দের আশ্রয় নিয়েছে। তার প্রমাণ আমরা চু-ৎস্যুতে পাই। পক্ষান্তরে চু-ৎস্যু যখনই রাজদরবারে প্রবেশ লাভ করলো তখন চীনা-কিসান পাঁচ-মাত্রা ছন্দের প্রচলন সুরু করলো। উত্তরকালে হান্ ও উই-ই রাজারা যখন পাঁচ-মাত্রার সমাদর করতে লাগল তখন অভ্যুদয় হলো সাত-মাত্রা পংক্তি। এমনিভাবে অশিক্ষিত জনসাধারণ সৃষ্টি করলো ত্যাং, ৎস্যু ও চু ছন্দের। চীনা গণতন্ত্র গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সহজ-ভাষা আন্দোলন' কাব্যের ক্ষেত্রেও তার সীমা বিস্তৃত করতে সুরু করল। ফল যা হল তা ইওরোপীয় কাব্য-সাহিত্যের প্রথম মহাযুদ্ধকালীন কাব্যের অনুরূপ। প্রচলিত অনুশীল ছন্দের সকল বন্ধন থেকে কাব্য মুক্তি-ঘোষণা করে সাধারণ কথ্যভাষাকেই কাব্যের বাহন হিসেবে নির্বাচিত করল। ফলে এই কাব্য হয়ে উঠল বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাধারণ পাঠকের উপলব্ধির বাইরে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কিন্তু চীনা কাব্য ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায় সৃষ্টি করল কবি ও কাব্য নাগরিক গণ্ডী অতিক্রম করে প্রবেশ করল গ্রামে ও মফঃস্বলে, এককথায় দেশের প্রাণকেন্দ্রে। সেখানে চীনা কবিদের অনেকেই নব পরিবেশে নতুন প্রেরণালাভ করল। বলিষ্ঠ চেতনার উদ্বুদ্ধ এই নবতর কাব্যসৃষ্টি এক নবীন যাত্রাপথের সন্ধান জানালো। সে পথ কাব্য প্রগতির পথ। তাই চীনা কাব্যআসরে আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে কৃষককবির যার কবিতায় পাওয়া যায় আন্তরিক দরদ আর দৃঢ় বিশ্বাস। ভাষা তার স্থানীয় কথ্যভাষা, ছন্দ অমিত্র, সুরে গ্রাম্য ভাটিয়ালির রেশ। এই কবিতার ভেতর থেকে নায়ক য়াং কু-আই আর নায়িকা লি সিআং-সিআংএর প্রেম নিবেদনের অংশটুকুর অনুবাদ নিচে দেওয়া হল :

বুনো লাল লিলিফুল প্রতিদিন বাড়ে তার শোভা
সিআং সে দেহে বাড়ে বিরল সুন্দরী মনোলোভা।
একজোড়া টানা চোখ যেন অশ্রু টলমল করে
ঘাসের গায়ের পরে একবিন্দু জল যেন নড়ে।

দুইবার সেদ্ধচাল তিনবার উদুখলে পেশা
সি-আং-এর জন্মাবধি শ্রমিক পুরুষে ছিল নেশা।

নদীতীরে উইলো গাছ, পাতা তার অতি ঘন-নীল
তেমনি য়াং কু-আই খ্যাত ছিল কিশোর সুনীল।

সুমধুর শস্য আধা ফুটিবার আগে
সিআংএর রূপে য়াং মরে অনুরাগে।
দোঁহারে যদিও দোঁহা মাগয়ে পীরিতি
লাজে তবু কেহই তো নাহি মানে নতি।

এবে একদিন য়াং উৎরাইয়ে ভেড়া নিয়া যায়
আড় চোখে দেখে সিআং—খাদে নুয়ে গাছড়া কুড়ায়।
চরাতে চরাতে ভেড়া য়াং আনমনে গান ধরে
সহসা একটি গান সুরে সুরে কণ্ঠ হতে ঝরে :

"আমি রে অভাগ্যজন নিদ্রাহীন কাটে মোর রাতি,
উন্মীলিত চোখে তারে অনুক্ষণ স্মরি তার নাহিক বিরতি।"
"গভীর গভীর খাদে বুনো-লাল লিলি ফুল ফোটে,
সলজ্জ ভাবনা সেথা ধীরে ধীরে গুটি মেরে জোটে।"
"সুগন্ধি ফুলেরা সারি সারি দেয় পথপ্রান্ত ছেয়ে,
কেহ-না সুন্দরতর মোর এই অহঙ্কার চেয়ে।"
"অশ্ব-নির্বাচনে ঋজুতমকেই বাহন তো করবেনা জানি,
সকল মানব-মাঝে তোমাকেই শ্রেষ্ঠ আমি জানি।"
"সুন্দর তরমুজ তুমি, অন্তরে সিঁদুর আর বাইরে হরিৎ,
তোমার প্রেমের বাণী ভুলবোনা কখনও ক্বচিৎ।"
"অন্তরের কথা মোর পাকানো সুতার মতো কেবলি জড়ায়,
বলো কোন্ শুভক্ষণে অন্তরে অন্তর দিয়ে কথা কওয়া যায়।"
"যখন আকাশ কালো, স্তব্ধ রাত সুষুপ্ত ধরণী,
আসবো তোমার কাছে বলিতে গো হৃদয়-উজাড়-করা বাণী।"
"তারাজ্বলা রজনীতে এসো তুমি, জ্যোৎস্নার বান ডেকে যায়,
পথচারী সারমেয়ে ভুলে না মাড়িও তুমি পায়।"

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে দু-একটি প্রচেষ্টা সুরু হলেও জাতিগতভাবে চীনা-কবিতার কাব্যগণ্ডীর পরিবর্তন আজও সুস্পষ্ট নয়। তবে আশা করা যায়, কাব্য কৃষক-সাধারণের হাতের নাগালে এসে পড়াতে এর বিরাট সম্ভাবনা বর্তমান। এর চরমতম বিকাশ কিভাবে সম্পন্ন হবে আজকের দিনে সে-কথা বলা অসম্ভব। তবে এই পথেই যে চীনা কাব্যের রুদ্ধ বন্যা উৎসারিত হবে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

নরেন সেনগুপ্ত

পাঠকগোষ্ঠী

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু,

পৌষের পরিচয়ে প্রকাশিত বিষ্ণু দে মহাশয়ের পত্রখানির অকারণ তিক্ততা ও অসংযম সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মার্কসীয় সাহিত্য-বিচার সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণার মত এই তির্যক অবিনয়ও প্রতিবাদযোগ্য। শারদীয়া সংখ্যা পত্রিকাগুলির কয়েকটি ছোট গল্প সম্পর্কে নীহার দাশগুপ্তের যে নিবন্ধের বিরুদ্ধে তাঁর পত্রাঘাত, বিষ্ণুবাবুকে এতখানি বিচলিত করার মত কিছুই তাতে খুঁজে পেলাম না। নীহারবাবু কেবল একস্থানে লিখেছেন : "অচিন্ত্যকুমারের তীক্ষ্ণধার ভাষা ও গল্প বলার কায়দার জোরে গল্পগুলি সুখপাঠ্য হয়ে উঠলেও কোন এক কবি-সমালোচকের মতো তাঁকে হেমিংওয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারবো না। বলতে পারবো না, 'তাঁর গল্পের জীবন জীবনেরই মত বিচিত্র, তিক্ত, মধুর, বিস্ময়কর মিশ্রাবেগ'।"

বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে মতের পার্থক্য ঘোষণা করা ছাড়া এর মধ্যে আর কি আছে বিষ্ণুবাবুর কাছে যা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে গঞ্জিত করার মত আপত্তিকর হতে পারে?

নীহারবাবুর নিবন্ধটি ঠিক সমালোচনাও নয়, আলোচনা মাত্র। শারদীয়া সংখ্যার কতগুলি গল্প পড়ে তিনি সংক্ষেপে তাঁর সাহিত্যিক মতামত ও পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতেই গল্পগুলির মোটামুটি বিচার পরিচয় দশজনের সামনে ধরেছেন—দশজনেও যাতে আলোচনা করেন। এটা সাহিত্যিক সৎ প্রচেষ্টা।

বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট দৃষ্টি বিকৃত না হলে নীহারবাবুর প্রবন্ধের মূল ত্রুটি তাঁর চোখে উল্টো প্রতিভাত হত না, সমালোচনাটির দক্ষিণ ঘেঁষা দুর্বলতাকে ট্রটস্কি-মার্কা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে ভুল করতেন না। আমাদের সকল প্রগতিপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি ও সমালোচনা প্রচেষ্টার মধ্যে এই বামপন্থী বিধর্মের পরিচয়, নিজ শ্রেণী-মূল-গত মোহ ও ভ্রান্তির নাগপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার অক্ষমতার প্রমাণ, কমবেশি আছে—কিন্তু সেটা কোনমতেই উগ্র বামত্বের ট্রটস্কিমার্কা প্রতিক্রিয়াশীলতা হয়ে উঠতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার প্রসঙ্গে নীহারবাবু শিককাবাব ও সন্দেশে গুলিয়ে ফেলেন নি, তিনি যে মূল কথাটা ধরতে পারেন নি তা হল এই যে মানিক বা অচিন্ত্য একজনও ভাল শিককাবাব বা ভাল সন্দেশ বানাচ্ছেন না। নীহারবাবুর মার্কসিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি কাঁচা বলেই 'গায়েন' ও 'মুচিবায়েন'-এর তুলনামূলক পার্থক্যটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে, আজকের দিনের জীবনের গতির সঙ্গে বাস্তব ও সত্যধর্মী সামঞ্জস্য রাখার যে প্রগতিশীল 'সৎ প্রচেষ্টা'টুকু 'গায়েন' গল্পে তাঁর চোখে পড়েছে তাতেই তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। সেই পুরাতন ফাঁকি রসসৃষ্টির খাতিরে 'মুচিবায়েন'-এ আজকের দিনের চাষাভুষো সবার জীবনের প্রথম ও প্রধান সত্য আড়ালে রয়ে গেছে বলে তাঁর কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'গায়েন'-এর আপেক্ষিক সাহিত্যিক সার্থকতা। এবং এ হিসাবে কথাটা সত্যই। প্রগতির প্রচেষ্টাতেই খুশি হওয়া বরং ভাল, প্রচেষ্টার অভাবকে বরণ করার প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মচ্যুতির চেয়ে। চাষাভুষো নিয়ে গল্প লিখব

বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য যারা দেহরক্ষার ব্যাপার অনেকটা সহজ করে মন নিয়ে কারবার করার অবসর পায় এবং ওই অবসর-সোহাগী মনের খাতিরে একেবারে চেপে যাব চাষাভূষো পুরুষটা ও নারীটার অবসরহীন অকথ্য কঠোর দেহরক্ষার সংগ্রাম, অথচ রসসৃষ্টি করব একমাত্র ওই দুটি ভূখা দেহের যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে —সাহিত্য সৃষ্টির এ ফাঁকি আজ অচল না হয়ে গেলেও ধরা পড়ে গেছে। চাষী-মজুর-দের দেহ নিয়ে সাহিত্যের হাটে এ ব্যবসা চালানোর সহজ সরল মানেই হল পশু পাখীর প্রেমলীলা দর্শনে যে মনের বিকার তৃপ্ত হয়, সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে সেই মনের সেই বিকারকেই তৃপ্তি দান। 'মুচিবায়েন' সত্যই তাই অশ্লীল। সত্যই অবাস্তর। অনাথপিণ্ডদসুতার একমাত্র বস্ত্রদানের ফলে যে অশ্লীলতা গুরুদাসবাবু কল্পনা করেছিলেন সেটা গুরুদাসবাবুরই শ্লীলতা অশ্লীলতার সম্পর্কে চেতনার প্রশ্ন— চাষী মজুর মেয়ে বৌয়ের গা থেকে একমাত্র ছেঁড়া কাপড়খানা কেড়ে নেওয়ার অশ্লীলতার সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ। দেহ তো আর অশ্লীল নয়, দেহের চেতনাও নয়—ওই চেতনার বিকৃতিই শুধু অশ্লীলতা। গোর্কি বেঁচে থাকলে আচমকা আসরে টেনে নামানোর চমক সামলে সবিনয়ে বিষ্ণুবাবুকে এই দৃষ্টিতে আরেকবার শোলোকভের উপন্যাসটি পড়বার অনুরোধ জানাতেন নিশ্চয়। 'কম্যুনিস্ট ও কসাকদের দুর্বলতা বা যৌন আত্মদানেই শেষ'—কিন্তু এই শেষটাই আসল বা বইখানার শেষ কথা নয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার যৌন সম্পর্কের বিপর্যয় সম্পর্কে 'হিউম্যানিটি অপরুটেড' বইখানার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা পড়ে দেখলেও বিষ্ণুবাবুর সাহায্য হতে পারে খেয়াল হতে পারে যে যৌন বিপর্যয়েরও একটা বিপ্লবাত্মক সত্য থাকে—বিপ্লবটা বাদ দিলে যা অর্থহীন। কমুনিস্ট ও কসাকদের যৌন আত্মদানই শোলোকভের উপন্যাসটির প্রধান কথা বা মর্মকথা নয়—যদিও বিষ্ণুবাবু তাই ধরে নিয়েছেন। এবং ধরে নেওয়ার ফলে তিনিই গোর্কিকে প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছেন—নীহারবাবু নন। তাই কি দাঁড়ায় না কথাটা?—শোলোকভের উপন্যাসে কম্যুনিস্ট ও কসাকদের দুর্বলতা বা যৌন আত্মদান ছাড়া আর কিছুই ছিল না—তবু শুধু আর্টের খাতিরে গোর্কি বইখানা ছাপিয়েছিলেন। এই যদি 'আর্ট' এবং একেই যদি এতটা খাতির গোর্কি করে থাকেন, তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতেই হবে। 'একটা মানুষ জন্মাল' গল্পে অশ্লীলতার দ্বারপথে পুঁয রক্তের সঙ্গে মানুষের জন্মলাভের বর্ণনাটাই "মনে হয়" বিষ্ণুবাবুর মতে "যেন" গোর্কির গল্পটির একমাত্র সার্থকতা—আর্টত্ব।

বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কতদূর অপরিচ্ছন্ন তার আরেক প্রমাণ লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যে পাই। "অচিন্ত্যকুমার হাকিম কিনা তা জানবার প্রয়োজন গল্প-সমালোচনায় নেই, তিনি কৃষক সভার রিপোর্ট থেকে গল্প লেখেন কিনা তাও জানবার প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ শুধু লেখার বিচার কর, লেখককে বাদ দিয়ে। লেখা যেন আকাশ থেকে পড়ে—লেখক সম্পর্কে কিছুই না জেনে যেন লেখার সমালোচনা সম্ভব। শোলোকভ বা গোর্কির জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায় না বাংলা দেশে তা যেন না জানলেও চলে সমালোচকের। অচিন্ত্যকুমারের কলম কেন অনেকদিন থেমে ছিল. কেন আবার পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীদের নিয়ে বিশেষ ধরনের গল্পের ফসলের আশ্চর্য ফলন শুরু হল, কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে দু'তিনখানা গল্পের বই দান করলেন, বাংলা সাহিত্যে যা সম্পূর্ণ নতুন প্রচেষ্টা, কোন্ সূত্রে এই নতুন উপাদানের সন্ধান তিনি

পেলেন, আইন আদালত তাঁর সাম্প্রতিক গল্পে কেন এতটা প্রাধান্য পেল, এসব না জেনেই যেন তাঁর গল্পের সঠিক সমালোচনা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, বিষ্ণুবাবু এখানে 'আর্টের জন্যই আর্ট' এর পক্ষেই একটু ঘুরিয়ে ওকালতী করেছেন। মার্কসবাদের মূলকথা উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, লেখকের শ্রেণীগত চেতনার হিসাব না ধরেও লেখার বিচার চলে, লেখক কোন শ্রেণীর দৃষ্টিতে চাষী শ্রেণীর জীবনকে দেখছেন গল্পের সমালোচনায় তার খোঁজ করা গোয়েন্দাগিরির সামিল!

কিন্তু প্রগতিশীল-সমালোচনা গালাগালি বা দুর্নামের ভয়ে লেখককে ছেড়ে কথা কইতে রাজী নয়, সংগ্রামী বাঙালীর সংস্কৃতির লাল রাস্তা কে তৈরি করেছে আর কিসে তৈরি করেছে সে বিষয়ে উদাসীন থেকে তরল দীপ্তির চটুল আগুনে সমাজ চেতনার ফুলঝুরির মোহে সাহিত্যিক স্পেশাল পাওয়ার্সের খেলা চলতে দিতে রাজী নয়। কৃষকসভার রিপোর্ট থেকে যিনি গল্প লেখেন তাঁকেও নয়, কলকাতায় বসে যিনি 'গায়েন' লেখেন, হাকিমের আসনে বসে যিনি 'মুচি বায়েন' লেখেন, মার্কসবাদ নিয়ে যিনি ঘরে বসে কাব্য করেন তাঁদেরও নয়!

সংগ্রামী বাঙালীর সংস্কৃতির লাল রাস্তা তৈরি করতে হলে সংগ্রামী সমালোচনা ছাড়া চলবে কেন? পুরানো সংস্কৃতির ধাঁধাকে সাদরে বজায় রেখে নতুন সংস্কৃতি গড়া যায় না।

হেমিংওয়ের বিশেষ পরিণতির সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের বিশেষ পরিণতির তুলনাকে হেমিংওয়ের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের তুলনা বলে ভুল করে নীহারবাবু গজেন্দ্রগামিনী মহিলাকে হাতি মনে করার মত 'বাস্তিকর সমালোচকে' পরিণত হয়েছেন। নীহারবাবুর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে বোঝা অসম্ভব 'পার্থক্য'টা তাঁর খেয়াল ছিল কি না। তিনিই সেটা জানেন। তবে তাঁর মন্তব্য থেকে ধরে নিলে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। হেমিংওয়ের সঙ্গেই তিনি অচিন্ত্যকুমারের তুলনা করার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এতই কি ভুল একটা কথা তিনি বলে ফেলেছেন? বিশেষ পরিণতি কি এমনই একটা ছাঁকা জিনিস যা বিচ্ছিন্ন করে এনে তুলনা করা যায়? হেমিংওয়ের এবং অচিন্ত্য-কুমারের মধ্যে আর সমস্ত তুলনা বাদ দিয়ে শুধু তুলনা করা যায় তাঁদের বিশেষ পরিণতির? কিসের ভিত্তিতে সে তুলনা হবে? নির্গুণ নিরপেক্ষ তুলনা, 'abstract'-এর অঙ্গীকার যে মার্কসীয় ধারণা প্রণালীতে অর্থহীন, বিষ্ণুবাবু নিজেই তার পরিচয় দিয়েছেন হেমিংওয়ের বিশেষ পরিণতির সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের বিশেষ পরিণতির তুলনা করতে গিয়েই। 'ভয়াবহ মিতভাষিত্বের' প্রচণ্ড সার্থকত্ব লাভ, স্পেনের ফ্যাসিস্ট যুদ্ধ, দুর্গত সমাজ-ভাঙা অত্যাচারে অনাচারে জর্জর বাংলা, দেশজ শব্দের তীক্ষ্ণ মর্যাদা লাভ, সস্তা কারুণ্য থেকে মুক্তি, বিষয়ানুগ মানবিকতা ইত্যাদি ফর্ম ও কন্টেন্টগত সর্বাঙ্গীনতার মধ্যেই তাঁকে পরিণতির ভিত্তি খুঁজতে হয়েছে। দু'জনের পরিণতির তুলনার অর্থই তাই দু'জনের রচনাবলীর তুলনা এবং চেতনা ও দৃষ্টির পরিবর্তনের তুলনাও।

শেষ কথাটা মনে রাখেন না বলেই সাহিত্যিকের বিশেষ পরিণতি সম্পর্কে বিষ্ণুবাবুর ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, অচিন্ত্যকুমারের চাকুরিয়া বা মধ্যবিত্তকে নিয়ে লেখা গল্প ও চাষীজীবনের গল্পের স্টাইলের পার্থক্যের ভুল ব্যাখ্যা দিতে হয়, এবং এই পার্থক্যের মধ্যেই বিশেষ পরিণতি আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হন। মধ্যবিত্ত বা চাকুরিয়াদের নিয়ে লেখা গল্পের "প্রখর ব্যঙ্গ ও প্রায় নেতিবাচক অবজ্ঞা" ওই শ্রেণীরই আত্মবিরোধের প্রকাশ, অচিন্ত্যবাবু নিজেও যে আত্মবিরোধের অংশীদার। চাষী জীবনের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ নেই, চাষীজীবন তাঁর কাছে শুধু দর্শনীয় ও

বুদ্ধি-মননীয় ব্যাপার, সুতরাং চাষী জীবনের গল্পে ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞার সেই তীব্র করুণ প্রকাশ ঘটবে কি করে? এ ক্ষেত্রে ব্যঙ্গের চেহারা চাষী জীবনকে বিকৃত করায়, অবজ্ঞার স্ফূর্তি চাষী জীবনের দীনতাকে হীন করায়। তেভাগা আন্দোলনটা নাই বা এল গল্পে, একজন বাজনদারের বৌ দিলই বা তার দেহটা আর এক বাজনদারকে ঘুষ। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে সমগ্র চাষী জীবনের যে সত্যটা প্রকাশ পেল, যে মুখ বুঁজে অত্যাচার সয়ে না গিয়ে চাষী মেয়ে পুরুষ আজ সচেতন ভাবে সংগ্রাম করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই সত্যকে গল্পের মধ্যে কোন আর্টের ধামায় চাপা দেওয়া চলবে? এ তো শুধু তেভাগার প্রশ্ন নয়, এটাই চাষী জীবন, এটাই তার চেতনা—এবং জীবনে তার সহস্র আত্মপ্রকাশ! গল্পে বাজনদারের বৌ শতবার দেহ ঘুষ দিক—বাংলার চাষাভুষোর শত শত বৌ বাস্তবে তা দিয়েছে এবং দিচ্ছে, কিন্তু গল্প কি হবে ওইটুকুই? এ কি মধ্যবিত্তের ঘরের বৌয়ের দেহ ঘুষ দেওয়া যে শুধু নীতিবোধের ধর্ষণেই করুণ রস সৃষ্টি হবে? চাষী বৌ নিজের দেহকে পণ্য করলে চাষীর জীবনের বাস্তবতাতেই খুঁজতে হবে তার মর্ম, তাতেই ফুটবে তার করুণ রূপ। নতুবা হবে অশ্লীলতা, ন্যাচারালিজম।

আমরা ভদ্রলোকেরা বলি: আহা, গরীবের বৌ অভাবের তাড়নায় দেহ বিক্রী করল। আমাদের ভাবখানা এই, যেন আমাদের আহা বলাবার জন্যই সে এ কাজটা করেছে, অন্যথা কোনই প্রয়োজন ছিল না।

এই জন্যই লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিষ্ণুবাবু যদি এই অমার্কসীয় দৃষ্টি বর্জন করতেন, তা হলে দেখতে পেতেন, অচিন্ত্যকুমারের যে বিশেষ পরিণতির কথা বলছেন তার বিশেষত্ব নতুন দৃষ্টি, নতুন চেতনা, নতুন জীবনবোধ বা মানস জগতের সমাজমানসগত মৌলিক কোন পরিবর্তন নয়—পরিণতি শুধু এই যে তিনি নতুন বিষয়কে উপাদান করে আরও পাকা হাতে লিখছেন। তাঁর আগের স্টাইল আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে, তাঁর আগের দৃষ্টি আরও ব্যাপক, জীবন ক্ষেত্রকে আরও পরিষ্কার ভাবে দেখছে, অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক রূপায়ন আরও ঘন ও শৃংখলাবদ্ধ হয়েছে। তাঁর চিন্তাজগতে বিপ্লবাত্মক কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। মধ্যবিত্তের জীবন একদিন ছিল তাঁর সাহিত্যের অবলম্বন। তারপর চাকরীর জীবনে চাষীর জীবন, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীর জীবন, একভাবে তাঁর সামনে এল, একদিকের উলঙ্গ বাস্তব রূপে। ত্রিশংকু শ্রেণীর স্বপ্ন ও বাস্তবে একাকার অর্থহীনতা, ভ্রান্তি, বিরোধ ও ব্যর্থতা, এক কথায় সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের আত্মবিচারগত বাস্তবতা যেভাবে তাঁর সাহিত্যে এসেছিল, তেমনি ভাবেই এল চাষীর জীবনের বাস্তবতা। তফাৎ শুধু হল এই যে চাষীর রিক্ততা তাঁর চোখে মূল্য পেল মধ্যবিত্তের ব্যর্থতার, জমির ট্র্যাজেডি, অনাচার অত্যাচারের মর্ম রূপান্তরিত হতে লাগল মানসিক দ্বন্দ্বে। তাদের সঙ্গে স্বভাবতই দেশজ শব্দ, এল—এবং লাভ করল অচিন্ত্যকুমারেরই নিজস্ব তীক্ষ্ণতা।

হেমিংওয়ের পরিণতির সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির তুলনা করতে হলে আগে তাই দরকার হয় এই দৃষ্টিতে হেমিংওয়ের পরিণতি এবং অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির বিচার। অচিন্ত্যকুমার ভাল গল্প লিখতেন, আজ আরও ভাল গল্প লিখছেন, তাঁর পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে। বিকাশ পরিবর্তন নয়। ধারা পরিপুষ্ট হওয়া ধারাবাহিকতাই। সমাজ ভাঙা জর্জর বাংলার চাষী জীবনের আসল বাস্তবতা কোথায় তাঁর সাহিত্যে? কোথায় বাঁচার সংগ্রাম, যা তাদের হাসিকান্না আনন্দবেদনা প্রেম বিরহ নীতি দুর্নীতি কলহ বিবাদ একতা প্রতিরোধ—জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করেছে?

প্রগতিশীল সমালোচনা, কাঁচা সমালোচনা পর্যন্ত, আজ তাই প্রথমেই খোঁজ করে সৃষ্ট-সাহিত্য জীবনের এই সর্বাধিক সত্য, বাস্তবতার এই প্রধান শর্ত, সংগ্রামকে স্বীকার করেছে কিনা। তার মানে এই নয় যে সমালোচক সৃষ্ট সাহিত্যের সার্থকতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি বেঁধে দিয়েছেন রণভূমির সম্মুখ যুদ্ধের প্রাথমিক অঙ্গীকার, চাষী লাঠি নিয়ে জমির জন্য লড়ছে মরছে—শুধু এই হবে চাষী জীবনের গল্পের উপজীব্য এরকম হুকুম জারি করেছেন। প্রগতিবাদী এটুকু জানে যে তাতে সংগ্রামকেই মিথ্যা ঘোষণা করা হয়। চাষীর জীবনে, জনসাধারণের জীবনে, অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে সামনাসামনি সংঘর্ষ ছাড়া সংগ্রামের আর কোন রূপ নেই, অভিব্যক্তি নেই—এতো সংগ্রামকেই অস্বীকার করা, সাময়িক একটা বিচ্ছিন্ন বিশেষ ঘটনায় পরিণত করা। জীবনে ও চেতনায় ওতোপ্রোত-ভাবে মিশে আছে বলেই সংগ্রাম সত্য। চাষী শুধু তেভাগা করে না আজ, সে নিজেই ভাবে আর বলে, আগের মত বৌকে মারধোর করা আর চলবে না। মন্দির মসজিদ পুরুত মোল্লার কাছে আজও সে মাথা নোয়ায়, তেমন আর অভিভূত হয় না। কবিয়ালের মুখে রামায়ণের যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের গানের বদলে আজকের মানুষের মুক্তিলড়ায়ের গানে তার রোমাঞ্চ হয় বেশি। তার প্রেম, বাৎসল্য, ঘৃণা লজ্জা ভয় ক্রোধ আজ মাটির নরম সহিষ্ণুতায় গড়া নয়, তাতে কাস্তের কাঠিন্য ও ধার এসেছে।

বাংলার চাষী গরীবদের জীবন সাহিত্যভাত করার দায়িত্ব সোজা নয়। বিষ্ণু-বাবু যদি তাঁর "প্রগতিবিলাসী বন্ধুদের" সঙ্গে এ দায়িত্ব পালনের সৎ প্রচেষ্টায় যোগ দিতেন তা হলে তাঁর কাছে ধরা পড়ত এ বিলাস কি কঠিন, কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাহিত্যপাঠের সহক্ষমতা শুধু নয়, মিলেমিশে নিজেদের চেতনা পুনর্গঠনের, আত্মকেন্দ্রিকতা, ভ্রান্তি, সংস্কার, সংকীর্ণতা অপনোদনের এবং আরও অনেক কিছুর জন্য কী বিরামহীন অনলস সংঘবদ্ধ সাধনা চলছে। "শ্রদ্ধা বিনয় আর সততা এবং অনলস অধ্যয়নের দ্বারা আমরা সবাই যেন সাহিত্যের প্রগতি প্রসারেই সাহায্য করতে পারি, দলগত মনোভাবের নয়"—বিষ্ণুবাবু এ আশা করতে পারেন বলে আমাদের কম মুস্কিল নয়। কারণ তিনি আমাদের বন্ধুমানুষ। মুস্কিল একটা নয়। কী ও কাকে শ্রদ্ধা করব? জনসাধারণকে, না জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত জনসাধারণের সংজ্ঞা-মূল্য নির্ধারণকারীকে ও তাঁর সংজ্ঞা-মূল্যকে? কোন বিনয় অভ্যাস করব? মানবতা-বিচ্যুত আধ্যাত্মিক বিনয় অথবা জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও উচ্চতা যা ঘুচিয়ে দেয় সেই বিনয়? কোন সততাকে মর্যাদা দেব? জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতীক আমার শ্রেণীর প্রতি সততা, অথবা আমাদের চেয়ে জন-সাধারণ বড়—এই সততা? অনলস অধ্যয়ন চালাব কিসের এবং কি উদ্দেশ্যে? বই পড়ে পড়ে বিদ্যার জাহাজ হতে, না বই পড়তে পড়তে জনসাধারণের জীবনে নেমে গিয়ে জীবনকে জানতে?

সাধে কি আমরা শ্রদ্ধা, বিনয় আর সততা এবং অনলস অধ্যয়নের ছুটো ছুটো মানের মধ্যে ব্যক্তিগত মানে বাদ দিয়ে ব্যাপক জীবনের ব্যাপক মানে গ্রহণ করেছি! নইলে শুধু মানের ধাঁধাঁয় ঘুরপাক খেয়ে প্রাণ যায়।

এই আমাদের দলগত মনোভাব। এই আমাদের স্বজাতিপ্রীতি। ছুটো দল হয়ে গেছে, উপায় কি। ব্যক্তিগতদের ব্যক্তি-প্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতি-প্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

বিচার ও বিধান

পরিচয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতির চর্চায় ও প্রচারেই নিযুক্ত ছিলেন। অবশ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন একক ও "বিশুদ্ধ" সংস্কৃতিতে তাঁর যে আস্থা ছিল না, তা সুবিদিত। কিন্তু এই অনাস্থা যে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল এ কথা কল্পনা করাও কষ্টকর। তাই বিনা বিচারে তাঁকে আটক করে রাখায় আমরা যে-রকম বিস্মিত সে-রকম ব্যথিত হয়েছি। তরুণ কবি ও পরিচয়-গোষ্ঠীর অন্যতম সভ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও গোপালবাবুর সঙ্গে বন্দী হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে সাহিত্যিকদের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়েছে ও এই দৃষ্টিকে ঠিক শুভদৃষ্টি বলা চলে না। যদি কোনো সাহিত্যিক কোনো অপরাধ করেন ও প্রচলিত আইন অনুসারে সেই অপরাধের জন্যে বিশেষ কোনো দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে তাহলে সাহিত্যিকরা শুধু সাহিত্যিক বলেই রেহাই পাবেন এমন অসংগত দাবি আমরা করছি না। কিন্তু অপরাধটা কি জানাই গেল না অথচ বিনা বিচারে কারাব্যবস্থা হল—আপত্তি এইখানে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয় :

> "একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোনো অপরাধীকে দণ্ড দেবার পূর্বে আইনে-বাঁধা অত্যন্ত সতর্ক বিচারের প্রণালী আছে। এই সভ্যনীতি আমরা পেয়েছি ইংরেজের কাছ থেকে। এই নীতির পরে আমাদের দাবি অভ্যস্ত হয়ে গেছে।···অপরাধের নিঃসংশয় প্রমাণের জন্য প্রমাণতত্ত্বের অনুশাসনের ভিতর দিয়ে বৈধ সাক্ষ্যের সন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্য অভিজ্ঞ বিচারক ও বিশেষজ্ঞ আইনজারীর প্রয়োজন আছে। এই বিশ্বাসের পরে যদি আস্থা না রাখি তাহলে আইন-আদালতকে প্রকাণ্ড অপব্যয়ের খেলা বলতে হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে নির্বিশেষে সকল মানুষের পরে যে সম্মান আছে এতদিন ধরে সেই নীতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি।"

মাত্র একটি বা দুটি সাহিত্যিককেও যদি এই সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে দেশের সমগ্র সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যে আজ এই উপলব্ধি প্রবলভাবে সঞ্চারিত হবার সময় এসেছে যে

"অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

পরিচয় প্রকাশে বিলম্ব

পরিচয়ের এই সংখ্যা পাঠকদের হাতে পৌঁছাতে এত দেরি হল তার জন্যে আমরা দুঃখিত হলেও নিরুপায়। কেন না পরিচয় ছাপা হত গণশক্তি প্রেসে; পুলিশ ঐ প্রেস বন্ধ করায় পরিচয়ের কিছু মালমশলাও আটক পড়ে এবং তার জন্যে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। যাই হোক, অন্য প্রেস থেকে পরিচয় ছাপানর ব্যবস্থা হয়েছে ও অতঃপর নিয়মিত প্রকাশে কোন বিঘ্ন ঘটবে না আমাদের এই আশা আছে। পাঠকগণ যে বর্তমান সংখ্যার জন্য এতদিন অপেক্ষা করেছেন সেজন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

সপ্তদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৫৪

বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন

[ইংরেজী ভাষায় যে দার্শনিক মতবাদের নাম Idealism তাকেই আমাদের দেশের দার্শনিকরা বলতেন বিজ্ঞানবাদ। নিছক ঐতিহ্যের খাতিরে এই নামই বজায় রেখেছি, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা অনুসারে হয়ত "ভাব-বাদ" নাম শ্রের হত। "বিজ্ঞান" শব্দটি চলতি বাংলায় ইংরেজরা যাকে বলে Science তাই বোঝায় এবং চলতি ভাষায় এই অর্থের দাবি এত নিঃসন্দেহ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের অনুসরণ করে যদি এই শব্দে Idea বুঝতে চাই তাহলে অর্থ নিয়ে অনর্থ বাধবেই। তাই, "বিজ্ঞান" শব্দের অর্থ Scienceই রইলো—"বৈজ্ঞানিক দর্শন" হল Scientific Philosophy, "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি" হল Scientific method।

"বিজ্ঞানবাদ" দর্শনের ইতিহাসে প্রধানতম সমস্যা এবং মার্কসীয় দর্শনের, লেনিন যে রকম দেখিয়েছেন, এ যুগে প্রধানতম দায় হল বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনই। প্রসঙ্গত, একমাত্র মার্কসীয় দর্শনই "বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনে"র প্রকৃত পথ দেখাতে পারে কেননা একমাত্র এই দর্শনই বিজ্ঞানবাদের জন্ম ও স্থিতির রহস্য জানে, তাই জানে এর মৃত্যুর রহস্যও।]

বিজ্ঞানবাদ অনুসারে মানুষের মাথা নেই, তবু বুদ্ধি আছে। কথাটা লেনিনের। আজগুবি শোনালেও উপায় নেই, কেননা সহজবুদ্ধির কাছে যা আজগুবি তাই নিয়েই বিজ্ঞানবাদের কারবার। এই মতবাদ অনুসারে বুদ্ধির অতিরিক্ত বাস্তব বস্তু কোথাও কিছু থাকতে পারে না, তাই মানুষের মাথাও নিশ্চয়ই নয়। শুধু বুদ্ধি

বা অভিজ্ঞতা বা চিন্তা—যে নাম দিয়েই ব্যাপারটার শোভা বর্ধন করা যাক না কেন—সবচেয়ে চরম সত্য। তাই মাথা নেই, তবু বুদ্ধি আছে।

অথচ, দর্শনের ইতিহাসের এমনই মজা যে মাথা বলে কোনো পদার্থ এই মতবাদ অনুসারে বাস্তব না হলেও একে দেখতে লাগে শুম্ভ-নিশুম্ভের সেই পৌরাণিক সেনাপতির মতো—যার মাথা কেটে ফেললেই মরণ হয় না, কাটা মাথা থেকে ছিটকে পড়া প্রত্যেক রক্তবিন্দু জন্ম দেয় এক একটি সমতুল্য দৈত্যের।

বিজ্ঞানবাদের এই অদ্ভুত লীলা-খেলাকে বর্ণনা করতে বসলে দেশ-বিদেশের নানান পৌরাণিক উপাখ্যান মনে ভিড় করতে চায়: মনে হয়, বিজ্ঞানবাদ বুঝি মিশরের সেই পাখি যুগে যুগে নিজের ভস্মাবশেষ থেকে যে লাভ করে নবজন্ম; মনে হয় মৃত দেবতার পুনরুজ্জীবন কাহিনীতেও অবাক হবার কিছু নেই, কেননা দর্শনের পূত মন্দিরে আপাত তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে যার উপাসনা প্রায় তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন তারও মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, নবজীবনের সংকেত।

কেননা, বিজ্ঞানবাদকে বহুবার বহুভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। তবুও মরণ হয়নি তার। বরং যাঁরা চণ্ডবিক্রমে একে খণ্ডন করতে এগিয়েছিলেন তাঁরাই শেষ পর্যন্ত এর মহিমায় পঞ্চমুখ। শুনতে আজগুবি লাগে, কিন্তু আগেই বলেছি আজগুবিকে ভয় করলে আর যাই হোক বিজ্ঞানবাদকে বোঝবার জো থাকবে না। বিজ্ঞানবাদের যেটা মোদ্দা কথা সহজ বুদ্ধির সঙ্গে সত্যি তার মুখ দেখাদেখি নেই, আর নেই বলেই বার্কলির মতো বিজ্ঞানবাদীকে মাথা খুঁড়ে মরতে হয় বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে সহজবুদ্ধির সংগতি প্রাণপণে প্রমাণ করতে। সহজবুদ্ধির সাধারণ মানুষ মনে করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে তার সংসার। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী বলবেন, সংসার কোথায়? আছে তো শুধু সংসারের ধারণা। এদিকে, ধারণার দৌলতে সত্যিই সংসার চলে না: পকেট-বোঝাই ধারণাকে উজোড় করে দিলেও মেছুনী এক-টিকলি মাছ দেবে না,. কিম্বা ফাঁকা দু'নম্বর বাসের ধারণায় চেপে সাড়ে পাঁচটার সময় আফিস-ভাঙা ভিড় এড়িয়ে আরামে বাড়ি ফেরা হায় অসম্ভব! উত্তরে বিজ্ঞানবাদী বিরক্ত হয়ে বলবেন—আসলে মাছটাও যে মাছ নয়, বাড়িটাও বাড়ি নয়, মাছের আর বাড়ির ধারণা মাত্র। কিন্তু সহজ মানুষ একেবারে যেন নাচার—মাছের ধারণা খেয়ে তার পেট নাকি কিছুতেই ভরে না! বিজ্ঞানবাদী মাথা না মানলেও এমনতরো বেয়াদপির কথা শুনে নিশ্চয়ই মাথা গরম করে বলবেন—আসলে পেট বলে জিনিসটেও যে সত্যি নয় আর পেট-ভরানো বলে ব্যাপারটাও যে ছোটলোকদের ছোটলোকমি মাত্র, যাকে ধ্রুব সত্য বলা যায় তা শুধু পেটের ধারণা আর পেট-ভরানোর ধারণা! এহেন চরম জ্ঞানের কথা শুনেও যদি মানুষের মাথা শ্রদ্ধায় নুয়ে না পড়ে তাহলে সন্দেহ করতে হবে

যে বিজ্ঞানবাদীর রকম-সকম দেখে মাথা বলে জিনিসটা সম্বন্ধেই মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়েছে।

তাই বলে সমস্ত যুগের সমস্ত দার্শনিকই যে বিজ্ঞানবাদীর এই অকাট ও অকাট্য যুক্তিকে মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন তাও মোটেই সত্যি কথা নয়। দর্শনের ইতিহাসে বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে উৎসাহ যতখানি বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করবার উৎসাহ বুঝি তার চেয়ে কম নয়। অনেকবার অনেক দার্শনিক কোমর বেঁধে লেগেছেন বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করতে। কিন্তু, যেটা সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরাই বিজ্ঞানবাদের দীক্ষা নিলেন এবং বিধর্মে দীক্ষিত হবার পর যেন হয়ে দাঁড়ালেন এক একটি মূর্তিমান কালাপাহাড়, বিজ্ঞানবাদেরই চরম নৃশংস প্রচারক। বিজ্ঞানবাদ তাই মরেও মরে না, যমালয় থেকে ফিরে আসে নতুন বর নিয়ে, নচিকেতার মতো।

একদিকে বিজ্ঞানবাদকে তীব্র, তীক্ষ্ণ আক্রমণ। অপরদিকে সেই বিজ্ঞানবাদের কাছেই করুণ আত্মসমর্পণ। এ কথা যে সব দার্শনিকদের সম্বন্ধে সত্য তাঁদের "দুর্বলচেতা" বলে উড়িয়ে দিতে যাওয়া নেহাতই আত্মপ্রবঞ্চনা হবে। কেননা, দর্শনের ইতিহাসে তাঁরাই হলেন দিকপাল-বিশেষ। স্বদেশে শঙ্কর, প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিস, আধুনিক য়ুরোপে কাণ্ট এবং সাম্প্রতিক যুগে অভিজ্ঞতা-বিচারবাদী-দের (Empirio-critics) থেকে সুরু করে প্রয়োগবাদী (Pragmatists) বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী (Realist) পর্যন্ত যুগে যুগে এঁরাই তো যুগান্তকারী দার্শনিক বলে স্বীকৃত। অথচ, এঁরা সকলেই প্রবল উৎসাহে বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করার পর প্রবলতর উৎসাহেই বিজ্ঞানবাদের মাহাত্ম্যে মেতে উঠেছেন!

আচার্য শঙ্করের "বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন" সংস্কৃত দর্শনের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করতে বসে শঙ্কর আর যাই হোক তথাকথিত বৈদান্তিক-সুলভ নিস্পৃহ সংযমের পরিচয় দেন নি, এমন কি তাঁর ভাষার সহজ প্রসাদ-গুণকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রত্যক্ষ বিতৃষ্ণা।—বিজ্ঞানবাদীর দল যে এমনতরো আজগুবি কথা বলতে সাহস পায়, শঙ্কর বলছেন, তার আসল কারণ তাদের মুখের মতো অঙ্কুশ নেই! অর্থাৎ, অঙ্কুশের ভয় থাকলে অমন নির্লজ্জ মিথ্যে কথা বলতে তারা সাহস পেতো না। শঙ্কর বলছেন, বহির্জগৎকে উড়িয়ে দেবে কেমন করে? তার অনুভূতি যে অবিসংবাদিত! দিব্বি একপেট খেয়ে এবং রীতিমতো পরিতৃপ্ত হয়ে যদি কেউ বলে "কিছুই তো খাই নি, কই পরিতৃপ্তও তো হই নি,"—তার কথা যে-রকম মিথ্যে হবে সেই রকমই মিথ্যে বিজ্ঞানবাদীর কথা। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্বস্তুর সন্নিকর্ষ হবার পর এবং স্বয়ং অব্যবধানে বহির্বস্তুকে অনুভব করার পর বিজ্ঞানবাদীও বলে "বহির্বস্তু যে কী কই তা তো জানি নে, কখনো দেখি নি, মনের বাইরে সত্যি কিছু নেই।" বিজ্ঞানবাদীর

দল নিজেদের কথাটা হয়তো আর একটু শুধরে নিয়ে বলবে, বিষয়ের অনুভূতিকে আমরা অস্বীকার করতে যাব কেন, আমরা শুধু অস্বীকার করি তার বাহ্যস্বরূপ। বিজ্ঞেয় পদার্থরাশি অন্তর্বর্তী ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। উত্তরে শঙ্কর বলছেন, এ হোল গায়ের জোরের কথা। অনুভূতির সময় আমবা তো এই বলেই অনুভব করি—এটা হোল স্তম্ভ, ওটা হোল কুড্য। কই, এমন তো কখনো অনুভব করি নে যে এটা হোল স্তম্ভের মানসরূপ, ওটা হোল কুড্যের মানস-রূপ। তাছাড়া, বহির্বস্তু বলে কোনো জিনিস যদি কোথাও কোনো-কালে না থাকে তাহলে অন্তর্বর্তী ধারণাকেই বা কেমন করে "বহির্বৎ" হিসেবে অনুভব করা সম্ভব? আসলে, "বহির্বৎ" বলে ব্যাপারটা এলো কোথা থেকে? এমন কথা তো মুখ-ফুটে কেউ বলতে পারে না যে বিষ্ণুমিত্রের চেহারাটা ঠিক বন্ধ্যা-পুত্রের মতো!

এই তো শঙ্করের বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন। কিন্তু তারপর? তাঁর নিজের মতবাদ? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব কেবলম্। এর চেয়ে চরম বিজ্ঞানবাদ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো দেখা দেয় নি। যে বহির্বস্তুর অবিসংবাদিত সত্তা নিয়ে এতো তর্ক তার হল কি? সমগ্র জগৎ—যে জগতে বিজ্ঞানবাদীর মুখের মতো চাবুক নেই বলে শঙ্করের এতো অনুশোচনা—রজ্জুতে সর্প-প্রতিভাসের মতো মিথ্যা হয়ে গেল। (মিথ্যা হিসেবে রজ্জু-সর্প আরও এক কাঠি সরেস, কিন্তু তাই বলে ব্যবহারিক পৃথিবী তার চেয়ে এক চুলও বেশি সত্য নয়। তাঁর মতে মিথ্যার তারতম্যকে সত্যের তারতম্য বলে ভুল করলে চলবে না।) সহজবুদ্ধির সঙ্গে সামান্যতম আপোসটুকুও নেই; বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন পরিণতি পেল চূড়ান্ত বিজ্ঞানবাদে।

দর্শনের এই আজব-ধাঁধায় ঘোরা—বিজ্ঞানবাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে বিজ্ঞানবাদের জালেই জড়িয়ে পড়া—একে শুধু দিশি দার্শনিকের খামখেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। প্রাচীন গ্রীসে মহৎ দার্শনিকের মধ্যেও একই ঘটনার পুনরুক্তি। সক্রেটিসের কথা ধরা যাক। তাঁর দর্শন, এমন কি তাঁর জীবনকেও বোঝবার একমাত্র সূত্র হল সফিস্টদের বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করবার উৎসাহ। সফিস্টরা তর্কে ধুরন্ধর; তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন যে ব্যক্তিগত মানুষের মনের ওপরেই পরমসত্তার একান্ত নির্ভর। মানুষের ভালো-লাগা-না-লাগাই সত্যবিচারের অভ্রান্ত কোষ্ঠিপাথর। বিজ্ঞানবাদের এই মূল দাবিকে নিছক জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে সফিস্টদের সন্তোষ নেই, নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনেও তাঁরা এর জের টানতে চান—সুনীতি আর দুর্নীতির মধ্যে আসলে কোনো তফাৎ নেই, আপনার যা রোচে সেটাই আপনার কাছে চরম সুনীতি; প্রেয় আর শ্রেয় একেবারে নিছক এক। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের

বেলাতেও ওই একই কথা—এ সব আইন-কানুন মানতে যদি মন্দ না লাগে তাহলে মন্দ কি ? কিন্তু মানতে যে হবেই এমন কোনো কথা নেই।

সক্রেটিস দেখলেন, বিজ্ঞানবাদের এই দাবি সমাজজীবনের পক্ষে একেবারে দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করবার জন্তে তিনি প্রায় মরিয়া হয়ে উঠলেন। তাঁর খণ্ডন-পদ্ধতি আপাত-বিনয়ের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু তার পেছনে যে তীব্র বিদ্রূপ আর তীক্ষ্ণ বিদ্বেষ লুকোনো, সে কথা তাঁর ভক্তদের লেখা ভালো করে পড়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। হাটবাজার থেকে সুরু করে বড়লোকের খানাপিনার আসর পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর দুর্ধর্ষ দ্বন্দ্ব-আহ্বান, অমনটাই ছিল তখনকার দিনের রেওয়াজ।

কিন্তু তারপর ? তাঁর নিজের মতবাদ ? তিনি নিজে অবশ্য কোনো দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর দর্শনের যেটুকু খবর পাওয়া যায় তা শুধু তাঁর ভক্তবৃন্দের—প্রধানত প্লেটোর—গ্রন্থাবলী থেকে। এবং টীকাকারদের মধ্যে এ নিয়ে অনেক তর্ক আছে যে প্লেটো নিজের গ্রন্থে সক্রেটিসের মুখে যে দার্শনিক মতবাদ চাপিয়েছেন তা তাঁর গুরুদেবেরই মতবাদ, না নিজের মতবাদ ভক্তিভরে গুরুদেবের ঠোঁটে বসানো মাত্র! কিন্তু এ কথা নিয়ে তর্ক যতই থাকুক না কেন, এবং গুরুশিষ্যের মধ্যে মতের প্রভেদ ঠিক কী এবং কতটুকু, এ বিষয়ে টীকাকাররা নিঃসন্দেহ হতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত এক বিষয়ে মতভেদের কোনো প্রশ্নই ওঠে না: প্লেটোর দর্শনে সক্রেটিক বিশ্বালোচনের পূর্ণ বিকাশ। এবং গ্রীক যুগে প্লেটোর পৌরহিত্যেই বিজ্ঞানবাদের সবচেয়ে জমকালো অভিষেক। বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন বিজ্ঞানবাদেই পরিণতি পেল।

দর্শনের সেই পুরোনো গোলক-ধাঁধাই! তবু নেহাৎ একে প্রাচীনদের সেকেলে ভ্রান্তিবিলাস ভেবে নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়াও সম্ভব নয়। য়ুরোপে বিজ্ঞানের দিগ্বিজয় সুরু হবার পরও যে দিগ্বিজয়ী দার্শনিকের জন্ম হল, এবং যাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তি অতি-বড় শত্রুও অস্বীকার করতে পারেন না, তিনিই বা এই আজব আবর্তকে এড়াতে পারলেন কই ? ইম্যানুয়েল কাণ্ট—কোএনিস্‌বের্গের সেই ঋষি ইম্যানুয়েল কাণ্ট, যাঁর কথা বলতে গিয়ে কোলরিজের কবিকণ্ঠও আবেগে গদগদ হয়ে পড়ে। পাছে তাঁর দার্শনিক মতবাদকে পাঁচ ভূতে মিলে বিজ্ঞানবাদ বলেই চালিয়ে দেয় এই ভয়ে কাণ্ট তাঁর মূল গ্রন্থ "শুদ্ধবুদ্ধির বিচার"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করবার সময় তাতে একটি নতুন অংশ জুড়ে দিলেন, আর সেই অংশের নাম দিলেন "বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন"। তাঁর মতো পরিপাট-প্রিয় দার্শনিক বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করার সময় যে এলোমেলো ভাবে অগ্রসর হবেন এমন কথা নিশ্চয়ই ভাবা যায় না ; কাণ্ট এলোমেলো ভাবে এগোন নি। প্রথমে তিনি প্রচলিত বিজ্ঞানবাদের শ্রেণীবিভাগ করে গিয়েছেন :

একদিকে বার্কলির গোঁড়া বিজ্ঞানবাদ এবং অপরদিকে দেকার্থ-এর সংশয়াত্মক বিজ্ঞানবাদ বার্কলি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সামান্তই—দেশ এবং কালের বাহ্যসত্তা অপ্রমাণ করে, এ দুটিকে মানব অনুভূতির মূল কাঠামো বলে প্রমাণ করে কাণ্ট নাকি আগেই গোঁড়া বিজ্ঞানবাদের মুণ্ডচ্ছেদ করেছেন! (কী ভাবে যে তা সম্ভব হয় তা নিয়ে অবশ্য টীকাকারদের মধ্যে অনেক বিতর্ক আছে), আপাতত তাই কাণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য হল দেকার্থ-এর সংশয়াত্মক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করা। দেকার্থ-মতে একমাত্র আত্মার সত্তাই অবিসংবাদিত সত্য, তাকে সংশয় করতে গেলেও স্বীকার করতে হয়। অপরপক্ষে, বহির্বস্তুর সত্তা ভগবানের দোহাই না দিয়ে মানবার জো নেই। এ কথা খণ্ডন করতে গিয়ে কাণ্ট দেখালেন যে তথাকথিত অবিসংবাদিত আত্মাকে মানতে গেলে বহির্বস্তুর সত্তা না মেনে উপায় নেই। কেননা, আত্মা সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু উপলব্ধি তা নিছক চেতনা-প্রবাহের উপলব্ধি, এবং প্রবাহকে প্রবাহ হিসেবে বুঝতে গেলে স্থির ও নিত্যর দ্বারস্থ হতেই হবে। কিন্তু স্থির ও নিত্যর কোন হদিস মানস-জগতে মেলে না। তাই বহির্জগতে তার সত্তা না মেনে উপায়ই নেই। আর এই কথা প্রমাণ করার পর কাণ্ট প্রায় উল্লাস করে উঠলেন: বিজ্ঞানবাদীর মারণ-মন্ত্র বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধেই চেলে দেওয়া গেল; কেননা, বিজ্ঞানবাদ অনুসারে একমাত্র অন্তর্বস্তুর যাথার্থ্যই অবিসংবাদিত,অথচ প্রমাণ করে দেওয়া গেল যে অন্তর্বস্তুর অনুভূতি একান্তভাবে বহির্বস্তুর মুখাপেক্ষী!

বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করলেন কাণ্ট। কিন্তু তারপর? তাঁর নিজের মতবাদ? তা নিয়ে অবশ্য টীকাকারদের মধ্যে অজস্র মতভেদ আছে। এবং মতভেদ এতই বেশি যে তাঁদের মধ্যেই একজন, একজন শ্রদ্ধেয় টীকাকার, শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন যে কাণ্ট তাঁর সমসাময়িক দর্শনের যে দুর্গতির বর্ণনা দিয়েছেন কান্টীয় টীকার দুর্গতি তার চেয়ে কম নয়। সমসাময়িক দর্শনের দুর্গতি বর্ণনা করতে গিয়ে কাণ্ট বলেছিলেন—এ যেন এক আজব মল্লক্ষেত্র, ভুয়ো মারপিটে হাত পাকাবার দেদার সুযোগ এখানে।

কান্টীয় টীকা নিয়ে যে এত সোরগোল তার আসল কারণ অবশ্য কাণ্ট নিজেই এক অদ্ভুত দোটানায় পড়েছিলেন। একদিকে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করা সত্ত্বেও বিজ্ঞানবাদের কাছেই করুণ আত্মনিবেদন, অপরদিকে বৈজ্ঞানিক বিবেকের দংশনে অন্তত খিড়কি দোর দিয়ে জড়বাদের মূল কথাকে সসংকোচে আমন্ত্রণ। এক বিশেষ যুগের, এক বিশেষ সমাজের জীব হিসেবে কাণ্ট যে কেন এমন দোটানায় পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সে কথা অবশ্য ভবিষ্যতে আলোচনা করতে হবে; কিন্তু এ কথায় কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে তাঁর দর্শনের সচেতন দিকটুকু স্পষ্টই বিজ্ঞানবাদী। তাঁর মতে এই মূর্ত ও দৃশ্য জগৎ বুদ্ধিনির্মাণ।

কান্টীয় দর্শনের ঐতিহাসিক পরিণতির দিকে চেয়ে দেখলেও বোঝা যায়

বিজ্ঞানবাদের দিকে এ দর্শনের ঝোঁক কী দুর্নিবার, কত নিঃসন্দেহ! উত্তর-কান্টীয় দার্শনিকেরা কান্ট-এর দর্শনকে প্রতিজ্ঞা হিসেবে ব্যবহার করে একটানা এগিয়ে চললেন সোজা বিজ্ঞানবাদের পথে। জ্যাকবী, ফিক্‌টে, হার্বার্ট, সেলিঙ, এবং শেষ পর্যন্ত হেগেল। হেগেলের সর্বগ্রাসী পরব্রহ্ম—সে যেন এক চিন্ময়, ভয়ঙ্কর আদিম দেবতা, তার ক্ষুধা কিছুতে মিটতে চায় না, সমগ্র মানব-ইতিহাসকে গিলে খাবার পরও না।

শুধু ঐতিহাসিক পরিণতির দিক থেকেই বা কেন, কান্ট থেকে হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদে পৌঁছোবার সড়ক যে সোজা, তার নৈয়ায়িক তাৎপর্যটুকুও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। সাম্প্রতিক পরব্রহ্মবাদীরা তাই কান্ট থেকেই সুরু করেন এবং শেষ করেন হেগেলে। গ্রীন, কেয়ার্ড, এমন কি এ যুগের অতবড় ধুরন্ধর বিজ্ঞানবাদী ব্রাড্‌লী পর্যন্ত এ কথার ব্যতিক্রম নন।

শেষ পর্যন্ত য়ুরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে যেন এক অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হল। হেগেলের সর্বগ্রাসী বিজ্ঞানবাদ দার্শনিক মহলে যেন সহজবুদ্ধি হয়ে দাঁড়ালো—তাকে প্রমাণ করবার দরকার বুঝি নেই, তাকে খণ্ডন করবার অস্ত্র বুঝি পাওয়া অসম্ভব। অথচ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে সুরু করে দার্শনিকেরা অনুভব করতে লাগলেন যে বিজ্ঞানবাদের আবহাওয়ায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছে। তাই আবার সোরগোল পড়ে গেল—বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করতে হবে, যেমন করে হোক। দেখা গেল একের পর এক দার্শনিকের দল মেতে উঠছে বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করবার উৎসাহে, খোলা হচ্ছে একের পর এক আক্রমণ-কেন্দ্র। অভিজ্ঞতা-বিচারবাদ, (Emperio-Criticism), প্রয়োগবাদ (Pragmatism), নব্য-বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Neo-Realism), বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Critical Realism),—এই সব হরেক রকম খাঁটি আধুনিক মতবাদ। প্রত্যেকটিরই একান্ত উৎসাহ বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন; অথচ তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এই সব অতি-আধুনিক দার্শনিকরা বিজ্ঞানবাদকে নানান রকম গালমন্দ করার পর শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানবাদের মূল কথা নিয়ে চোরা কারবার চালিয়েছেন!

অভিজ্ঞতা-বিচারবাদের প্রধান পাণ্ডা হলেন ম্যাক্। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে, নানান রকম দুরূহ পরিভাষার কসরৎ দেখিয়ে, সাড়ম্বরে তিনি দর্শন সুরু করলেন। এতদিন ধরে চিৎ ও অচিতের মধ্যে যে দুর্লংঘ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে তাকে ভূমিসাৎ করতে পারলেই নাকি দর্শনের অবাধ মুক্তি। প্রথম কাজ তাই মনোবিজ্ঞান আর পদার্থবিজ্ঞানের মিলন ঘটিয়ে এক বর্ণশঙ্করের জন্ম দেওয়া, সেই বর্ণশঙ্করেরই নাম হবে দর্শন এবং এই দর্শন অনুসারে জড়পদার্থও পরমসত্তা নয়, মানস-পদার্থও পরমসত্তা নয়, এক তৃতীয় অপক্ষপাতী সত্তাই পরম সত্তা। ম্যাক্ তার নাম দিয়েছেন

element; অথচ,এই দার্শনিক আজব-চিড়িয়া, এই তথাকথিত তৃতীয় অপক্ষপাতী সত্তা, বিজ্ঞানবাদীর পুরাতন মানস-অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ম্যাক্‌-প্রমুখের এই সাড়ম্বর অতি-আধুনিক দর্শন স্রেফ্‌ বার্কলির মতবাদের ওপর চটকদার আর চড়া নতুন রঙ চাপিয়ে তাকে অভিনব দর্শন বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টাই। ব্যাপারটা লেনিন এমন ভাবে ফাঁস করেছেন যে তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তারপর ধরা যাক প্রয়োগবাদীদের কথা। তাঁদের দর্শনের মূল উৎসাহ যে হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি খোঁজা, এ কথা তাঁরাই জোর গলায় জাহির করেছেন। বিজ্ঞানবাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দর্শন গড়ে তুলতে হলে প্রথম দরকার দর্শনের মূল ভিত্তিটারই বদল করা। দর্শনকে আর শুদ্ধবুদ্ধির গজদন্তমিনারে কুমারী ব্রতচারিণী করে রাখলে চলবে না, তাকে নামিয়ে আনতে হবে ধুলোর পৃথিবীতে, যেখানে কাজের মানুষের কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি, যেখানে প্রয়োগের নগদ মূল্য চুকিয়ে তবেই কিছু কেনা-বেচা। তাই কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদ বা ধারণা, নিছক নিজের জোরে যথার্থও নয়, অযথার্থও নয়, যাথার্থ্য দাবির একটি আবেদন মাত্র। ব্যবহারিক জীবনে তার গণিকা-বৃত্তির ওপর যাথার্থ্য বা অযাথার্থ্য নির্ভর করে: উক্ত ধারণা বা মতবাদ যদি জীবনে সুখানুভূতির সন্ধান দেয় তবেই তাকে যথার্থ বলে মানা যাবে, যদি না-দেয় তাহলে বলতে হবে সেটি ভ্রান্ত। হাজার বাক্‌-বিতণ্ডায় যে তর্কের মীমাংসা নেই প্রয়োগের যাদুস্পর্শে নিমেষে তার মীমাংসা হয়ে যাবে। এই সহজ ব্যাপারটুকু এর আগে দার্শনিকেরা ধরতে পারেন নি, বা ধরতে পারলেও তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি, তার কারণ এতদিনকার একটানা বুদ্ধিবাদের মোহে তাঁদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল।

সহজ কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু নতুন কথা কোথায় হল? প্রয়োগের দোহাই দেওয়াটুকু অবশ্যই নতুন, তবু এতো সুস্থ প্রয়োগের ওপর নির্ভর করা নয়, প্রয়োগের দোহাই-পাড়া মাত্র। কেননা, প্রয়োগবাদীদের মতে এই তথাকথিত প্রয়োগ ব্যাপারটার তাৎপর্য শেষ পর্যন্ত কতটুকু? সুখানুভূতি—শেষ পর্যন্ত অনুভূতিই, মানস-অভিজ্ঞতাই! যথার্থ বা সত্যের একান্ত নির্ভর রুচি-মাফিক অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাই। মানুষের মধ্যে যেটা সবচেয়ে খামখেয়ালি, সবচেয়ে ব্যক্তিগত দিক—তার ভালো-লাগা-না-লাগা—প্রয়োগবাদীর মতে তার উপরই পরমসত্তার চরম নির্ভর। সহজ কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কিছু নতুন কথা নয়। গ্রীক দর্শনে সফিস্টদের মুখেও এই কথাই শুনতে পাওয়া গিয়েছিল, শোনা গিয়েছিল সমস্ত সত্যের চরম কোষ্টিপাথর হল ব্যক্তিগত মানুষের ভালো-লাগা-না লাগা; কেবল তাঁরা প্রয়োগের দোহাই নিয়ে এমন আধুনিক গলাবাজি করতে জানতেন না। বিজ্ঞান-বাদের পুরোনো কথাটুকুই, কেবল ওপরে একপোঁচ চটকদার নতুন রঙ।

বিজ্ঞানবাদীর ভাষা যেন গঁদের সঙ্গে করাতগুঁড়ো মিশিয়ে একটু ঘন করা হয়েছে, বললেন সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। অন্তত সাত-সাতটা সরল অনুপপত্তির ওপর বিজ্ঞানবাদের ভিৎ, বললেন নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর দল। মনে হয়, মেজাজটা এবার রীতিমতো কড়া; আশা হয় এবার আর কোনো রকম আপোসের কথাই উঠবে না। ঠিক হল বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করতে হবে রীতিমতো দল পাকিয়ে, সভা ডেকে। সভা ডাকলেন নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর দল; সভা ডাকলেন বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর দল—বড় বড় নামজাদাদের সভা। ঠিক হল, এমন কি ন্যায়-শাস্ত্রকেও সমূলে সংস্কার করতে হবে—পুরোনো ন্যায়শাস্ত্রের আবর্জনায় বিজ্ঞান-বাদের আগাছা জন্মেছিলো, তাই সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক নব্যন্যায় চাই। প্রবর্তিত হল গাণিতিক নব্যন্যায়। অনুষ্ঠানের এতটুকুও ত্রুটি নেই। এতদিন পরে বিজ্ঞানবাদের পরমায়ু সত্যিই বুঝি সমাপ্ত-প্রায়।

বিজ্ঞানবাদ তবুও যেন মিশরের সেই পৌরাণিক পাখীই, নিজের ভস্মাবশেষের মধ্যে তার নবজন্মের নিঃসন্দেহ অংকুর। সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের এত তোড়জোড়, এত সোরগোল, শেষ পর্যন্ত তারও পরিসমাপ্তি বিজ্ঞানবাদেই! জানি, এ কথা প্রমাণ করা পরিসর-সাপেক্ষ, বিশেষত এই কারণে যে সাম্প্রতিক বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা জানেন নিজেদের দার্শনিক দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে জটিল তর্ক আর দুরূহ পরিভাষার ঠাসবুনোনি দিয়ে কী অপূর্ব উর্ণাজাল বুনতে হয়। সহজ কথাকে কঠিন করে প্রকাশ করবার দুর্লভ মেধা তাঁদের। সুখের বিষয় মরিস কর্ণফোর্থ তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানবাদ"-এ এই লোকঠকানে উর্ণাজালকে ছিন্নভিন্ন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অত দুরূহ জটিলতার পেছনে মোদ্দা কথাটুকু বার্কলিরই কথা। এই প্রসঙ্গে কর্ণফোর্থ-এর পুস্তক অবশ্য-পাঠ্য। সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের তথাকথিত গাণিতিক নব্যন্যায়কে অমন ভাবে আর কেউ ফাঁস করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। আসলে, সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এই নব্যন্যায়-এর চারপাশে এমন দুর্বোধ্যতার আর জটিলতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে দূর থেকে সেলাম জানানোই সম্ভব হয়, কাছ-ঘেঁষবার সাহস বড় কারুর হয় না। কর্ণফোর্থ-এর গ্রন্থ পড়ার পর বুঝতে পারা যায় এ হল এক অতি আধুনিক দিল্লির লাড়ু—শুধু যে না-খেলেই পস্তাতে হয় তাই নয়, খেতে গেলেও পস্তাতে হয়, কেননা খেতে গেলে শুধু দাঁতই ভাঙে কিন্তু বিজ্ঞানবাদের চর্বিতচর্বন ছাড়া নতুন কোনো আস্বাদ জোটে না।

কর্ণফোর্থ-এর গ্রন্থ ছাড়াও এখানে শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের গুরুদেব হলেন ইংরেজ দার্শনিক মুর। "বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন" নামক তাঁর ছোট্ট প্রবন্ধ য়ুরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে নাকি যুগান্তর এনেছে।

উত্তর-বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সকলেই তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঋণী। বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করবার সময় মূর-এর কণ্ঠ সতেজ, যুক্তি যেন দুর্ধর্ষ। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতার মনের ওপর নির্ভর করে এ কথা বলা, মূর-এর মতে, নেহাতই বালিসভাষণ। কিন্তু এ সমস্তই তো নেতিবাচক কথা। প্রশ্ন ওঠে, জ্ঞানের বিষয় তাহলে ঠিক কী রকম? উত্তরে মূর ইন্দ্রিয়োপাত্ত (Sense-datum) নামের এক জাতীয় সত্তার আমদানি করলেন। এই ইন্দ্রিয়োপাত্ত হল দর্শনের জগতে অভিনব-তম আজব-চিড়িয়া, অভিজ্ঞতা-বিচারবাদীর Element-এর সাক্ষাৎ বংশধর। লেনিন দেখিয়েছিলেন Element জিনিসটা বার্কলির Percipii ছাড়া আর কিছুই নয়। মূর-এর ইন্দ্রিয়োপাত্তর বেলাতেও হুবহু একই ব্যাপার। এই ইন্দ্রিয়োপাত্তর স্বরূপ নির্ণয় করা নিয়ে যতই তিনি মাথা ঘামিয়েছেন ততই তাঁকে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ছেড়ে পেছু হটতে হয়েছে বার্কলি-হিউমের বিজ্ঞানবাদের দিকেই। মূর-এর এই দার্শনিক ডিগ্‌বাজিকে নিছক তাঁর ব্যক্তিগত মহিমা বলা চলে না; সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা প্রায় প্রত্যেকেই এই দিক থেকেও গুরুদেব মূর-এর চরণচিহ্ন অনুধাবন করেন। জ্ঞানবিজ্ঞান (Epistemology) নিয়ে তাঁদের অন্ত অজস্র বিতর্কের পেছনে তাই বিজ্ঞানবাদের বিচ্ছুরিত হাসি। (এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র আলোচনা করবার অবসর রইলো।)

প্রাচীন মিশরে দেবতা আসিরিসের জীবন-মরণ কাহিনী নিয়ে প্রতি বছর মরমী নাট্যের অভিনয় হত: দেবতার পীড়ন, দেবতার মৃত্যু, তারপর আবার দেবতার পুনরুজ্জীবন। পুনরুজ্জীবনের পর দেবতা দেখা দিতেন হয় তাঁর নিজের মূর্তিতেই, আর না হয় পুত্র হোরাস্-এর মূর্তিতে। কিন্তু মূর্তি যারই হোক, মূলে সেই দেবতাই, সেই আসিরিস। দর্শনের ইতিহাসেও যেন একই নাটকের অভিনয়। এবং কীর্তিকলাপের দিক থেকে বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে পৌরাণিক দেবতার এতখানি মিল দেখে যদি কেউ সন্দেহ করেন মূল সত্তার দিক থেকেও এদের দুয়ের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা সম্ভব, তাহলে তাঁর নামে অপবাদ দেওয়া উচিত হবে না। ভবিষ্যতে সে কথার আলোচনা করা যাবে। আপাতত সাদৃশ্যের মধ্যে একটা কথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়: পৌরাণিক দেবতার মতোই মৃত্যুর পর বিজ্ঞানবাদের যে পুনরুজ্জীবন কখনো তা স্বমূর্তিতেই, কখনো বা তা বংশধরের আপাত-ভিন্ন মূর্তিতে। কিন্তু মূর্তি যারই হোক, মূলে সেই বিজ্ঞানবাদই।

তাই পূর্বপক্ষ এ কথা বলতে পারবেন না যে একজাতীয় বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করে শঙ্কর-প্রমুখ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতের বিজ্ঞানবাদ প্রবর্তন করেন; অতএব এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা নেহাতই দার্শনিক অপগণ্ডতার লক্ষণ। আসলে, বিভিন্ন বিজ্ঞানবাদের মধ্যে আপাত বর্ণভেদটুকু যতই গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা নেহাতই অচল ও অন্তঃসারশূন্য। এ কথা মূর এবং পেরীর মতো দার্শনিকদের দৃষ্টিও এড়ায় নি, যদিও তাঁরা যে যুক্তি দিয়ে কথাটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন, সে যুক্তি শেষ পর্যন্ত বিচারসহ নয়। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত প্রতিজ্ঞা থেকে তাঁরা যথার্থ নিগমন নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানবাদের সামাজিক উৎস নিয়ে আলোচনা করবার সময় ভবিষ্যতে এঁ বিষয়ে দীর্ঘতর মন্তব্যের অবকাশ রইলো।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

ক্ষুধা

ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনী করেছ
ক্ষুধিতদের আখ্যা দিয়েছ বিপজ্জনক
উদ্বাস্তু নরনারীর অবাঞ্ছিত শোভাযাত্রা
তোমাদের নিশ্চিন্ত শাসনের ব্যাঘাত করে
দুর্ভাগা লক্ষ্মীছাড়াদের চিৎকারে তোমরা বিব্রত বোধ করো
হে পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত মহানায়কেরা
আহা তোমাদের কী জ্বালা
আহা তোমাদের কী কষ্ট!

ওরা ক্ষুধিত ওরা লাঞ্ছিত ওদের মাথার ঠিক নেই
তাই ওরা তোমাদের মত অকপট দেশভক্তদেরও বলে:
সাম্রাজ্যবাদীর তল্পিদার
বলে ধনৈশ্বর্যবিলাসী জনশত্রু
সমাজতন্ত্রের মুখোস-আঁটা চোগাচাপকানওয়ালা বেনিয়া
ওরা ক্ষুধিত ওরা উন্মাদ ওরা লক্ষ্মীছাড়া
অধঃপতিতদের হৃদয়বিদারক প্রলাপে কান দিওনা
ওরা বোঝেনা তোমাদের সাত্বিক শাসনের মহিমা
বোঝেনা তোমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্য!

বিগত পঁচিশ বছর তোমরা ওদের আশ্বাস দিয়ে এসেছ
কিষাণ-মজদুর-রাজ কায়েম হবে
অসত্যের অন্ধকারে মিশে গেছে তোমাদের সেই অগ্নিগর্ভ ঘোষণা
এক সিংহকে ভারত-ছাড়া করার ছলনায়
প্রতিষ্ঠা করেছ তিন সিংহ
ধর্মাশোকস্তম্ভের পৌরাণিক গাম্ভীর্যে
তোমাদের রাজকীয় আড়ম্বরের কূটনৈতিক কুচকাওয়াজে
আসমুদ্র হিমাচল থরহরিকম্প!

ওরা মিথ্যা চ্যাচায় দাবী জানায় আওয়াজ তোলে
ওরা ভুল করে ওরা ক্ষুধিত ওদের মাথার ঠিক নেই
ওদের কথায় কান দিওনা।

দয়া করে তোমরা বিনারক্তপাতে দেশ স্বাধীন করেছ
শত্রুমিত্রের পারস্পরিক দাক্ষিণ্যে
ওরা বোঝেনা তোমাদের রাজনীতি-
বোঝেনা হিন্দুস্থান পাকিস্তানের নারকীয় মানচিত্র
ওরা বলে কায়েমী স্বার্থের সাম্প্রদায়িকতা তোমাদেই সৃষ্টি
নিরুপদ্রব বাঁটোয়ারার যূপকাষ্ঠে,
ওরা ক্ষুধিত ওদের জাতধর্ম নেই ওরা হতভাগা
ওদের ছোট কথায় কান দিওনা!

তোমরা সময় চেয়েছ
শিশুরাষ্ট্রকে হাঁটতে শেখানোর সময়
তবু ওরা বলে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ?
যে শিশুর জন্মই হলনা তার আবার হাঁটতে শেখা!
ওরা ক্ষুধিত ওরা অজ্ঞ ওদের কথায় কান দিওনা।
আহা তোমরা কত সুন্দর কত ভাল কী বড়লোক
কী চমৎকার তোমাদের বক্তৃতার ভাষা
মার্জিত-সংযমের রোমাঞ্চকর আভিজাত্যে!
কত সহজে পেয়ে গেছ তোমরা আমলাতান্ত্রিক স্বাধীনতা
নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের হুমকীতে
অহিংসায় অনশনে
আধ্যাত্মিক অসহযোগে
নিরুপদ্রব কারাবরণে
কত কষ্টে
আহা কত কষ্টে তোমরা লাভ করেছ
ইংরেজের এত সাধের বাণিজ্যতীর্থে প্রবেশাধিকার
যে তীর্থে তোমরা ছিলে চণ্ডালের মত অস্পৃশ্য
যে তীর্থের অণুপরমাণু ক্ষুধার বিস্ফোরণে দিয়ে গড়া।
ওরা ক্ষুধিত ওদের মাথার ঠিক নেই
অধঃপতিতদের ছোট কথায় কান দিওনা!

ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনী করেছ
ক্ষুধিতদের আখ্যা দিয়েছ বিপজ্জনক
হে দেশভক্ত মহানায়কেরা
তোমরা ভুল বুঝোনা এই কবিতাকে
যদি ব্যঙ্গ মনে হয় তবে সমস্ত ক্ষুধার জগতকে
ঝোলাও ফাঁসি-কাঠে
টেনে উপড়ে ফেল ক্ষুধিতদের রসনা
গেঁথে ফেল সমস্ত ক্ষুধার কঙ্কাল
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কবরে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

বাতিলতা

রাত্রি হল জল্পনায় শেষ—।
শ্রেণীহীন কল্পনার স্বপ্ন অবশেষে
ষড়যন্ত্রী দিন
সভ্যতাবিরোধী পথে উদ্যত-সঙ্গীন।

সকালের ঘুম ভাঙে রূঢ় করাঘাতে
উঠে দেখি বেআইনী আমি,
বেআইনী হয়ে গেছ তুমি।
বেআইনী আমাদের পথ।
হুংকৃত এ প্রত্যাঘাতে
ছোটে শাসনের জয়রথ।
কারণ, তুমি ও আমি
চেয়েছি আলোক, গান
বাধাহীন জীবনের স্বাদ
সমাজ-সমিতি,
আর শ্রেণীহীন জীবনের গতি।

এই আমাদের বিদ্রোহ।
তাই বুঝি জমে ওঠে আক্রোশের রুদ্র সমারোহ।
মুষ্টিমেয় ধনী-স্বার্থ গড়েছে শিবির
পৃথিবীর মোড়ে মোড়ে, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে।
শস্ত্রপাণি বণিকের সৈন্য-সমাগমে
জমেছে শকুনি-সভা।
অন্ধ অসভ্য কালো রাত্রির গায়ে
চুণকামে কিছুই হবে না।
রাত্রির এ নিশাচর রাক্ষসেরা পাবে
শেষ পুরস্কার—
আমাদেরই হাতে।
আমাদের সম্মিলিত বিদ্রোহের পথ
জ্বলে ওঠে নবতম সূর্যের প্রাতে
তীক্ষ্ণ তরবারি।
রাত্রিঘেরা শাসনের চেয়ে তাহা ভারী।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

পাব্‌লো নেরুদার কবিতা

চিলির চল্লিশোত্তর প্রখ্যাত স্প্যানিসভাষী কবি পাব্‌লো নেরুদা। চিলি-সরকারের কূটনৈতিক দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ চাকরি উপলক্ষে পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে ঘুরে স্পেনের গৃহযুদ্ধের কালে হাজির ছিলেন ইনি মাদ্রিদে। ফরাসী সুররিয়ালিস্‌ম, এলিয়টের সিম্বলিস্‌ম থেকে সুরু ক'রে কাফকার রিয়ালিস্‌ম পর্যন্ত বহুমুখী আন্তর্জাতিকতা একদিকে যেমন এঁর সার্থক কাব্যআঙ্গিক ও কাব্যদৃষ্টির অঙ্গ, তেমনই অন্যদিকে নিতান্ত অন্তরঙ্গ দেশপ্রেম থেকে প্রবল ফ্যাসিস্টবিদ্বেষ ও স্টালিনগ্রাডের জয়ঘোষণা পর্যন্ত সবকিছুই এঁর কাব্যবস্তুর তালিকাগত।

নিচে অনূদিত নেরুদার 'ধর্ষিত দেশ' বর্গী-বিধ্বস্ত স্পেনের বুকচাপা স্মৃতি—'প্রত্যাবর্তন' স্বদেশের ঘনিষ্ঠ হাওয়ায় তাঁর মুক্তির নিঃশ্বাস, আশার প্রশ্বাস।

ধর্ষিত দেশ

অবগুণ্ঠিত অঞ্চল
অসংখ্য শহীদের আত্মত্যাগে, সীমাহীন স্তব্ধতায়,
মৌমাছি আর চূর্ণ চূর্ণ পাহাড়ের হৃদ্‌স্পন্দনে।
গম আর সবুজ শস্পের আশা জাগায় না এই দেশ,
এখানে ওখানে ছড়িয়ে রাখে শুধু চাপ চাপ রক্ত আর শয়তানির নমুনা :
ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ গালিসিয়া,
বৃষ্টিধারার মত পরিশুদ্ধ,
চিরকালের জন্যে কান্নায় বিষাক্ত হ'য়ে গেল :
বুলেটের গর্তের মত কালো ঝল্‌সানো এক্সট্রেমাদুরা,
প্রতারিত আর জখ্‌মি আর বিধ্বস্ত এক্সট্রেমাদুরা,
যার আকাশ আর ঝকঝকে এনামেলের মহামহিম তটভূমিতে
আজ শুয়ে আছে বাদায়োৎস্, স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায়,
মৃত সন্তানদের বুকে নিয়ে তাকিয়ে আছে সে আকাশে—
যে আকাশ মনে করে রাখে মালাগাকে :
সেই মৃত্যুর আবাদ মালাগা,
সেই সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মে পশ্চাদ্ধাবিত মালাগা
পশ্চাদ্ধাবিত—যতক্ষণ না কিংকর্তব্যবিমূঢ় মায়েরা
উন্মত্ত, আছড়িয়ে মেরে ফেলেছিলো তাদের নবজাত সন্তানদের।
শুধু আক্রোশ আর শোকের অনবকাশ
শুধু মৃত্যু আর ক্রোধ—
যতক্ষণ না অশ্রু আর বুকফাটা দুঃখের পুনর্মিলন ঘটেছে,
যতক্ষণ না কথা আর হতাশা আর ক্রোধ
রাস্তার ওপর কঙ্কালের স্তূপ হ'য়ে জ'মে উঠেছে
কিংবা কবরের ওপর ধুলোয় ঢাকা স্মৃতিফলক হ'য়ে।

এত অগুন্‌তি কবর, এত শহীদের আত্মত্যাগ, হায়রে
ধ্রুবতারার দেশে এতগুলো জানোয়ারের উন্মত্ত দাপাদাপি !
হায়রে !
এই ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত ক্ষত কিছুতে শুকোবার নয়,
জয়লাভেও না :
কিছুতে না, সমুদ্র-সিঞ্চনে না—
সময়ের সিকতাসৈকত অতিক্রম ক'রে এলেও না,
কবরের মাটিতে মাটিতে জলন্ত জেরানিয়ম্ ফুটলেও না।

প্রত্যাবর্তন

পিতৃভূমি, হে আমার স্বদেশ, এবার তোমার দিকেই মুখ ফেরাই।
তবু কী মন-কেমন করে তোমার জন্তে, মায়ের জন্তে যেমন শিশুর মন কেমন করা
কান্নায় ভরা।
কোলে তুলে নাও এই অন্ধ সেতার
আর এই অনাথ মাথাটি।

আমি বেরিয়ে পড়েছিলুম সংসারে তোমাকে সন্তান উপহার এনে দিতে,
আমি নেমে গিয়েছিলুম পতিতকে পথ দেখাতে তোমার তুষারিত নামের মহিমায়,
আমি গিয়েছিলুম ঘর বাঁধতে তোমার শক্ত গাছের গুঁড়িতে,
আমি গিয়েছিলুম আহত বীরদের জন্তে তোমার দেওয়া সম্মান বহন ক'রে আনতে।

আর এখন আমি বুকে তোমার ঘুমোতে চাই।
দাও আমাকে তোমার মর্মভেদী ঝঙ্কারমুখর স্বচ্ছ রাত্রি
তোমার পালতোলা নৌকোর রাত্রি, তোমার তারায় তারা বিশালতা।

হে আমার স্বদেশ : আমি আমার পুরোনো দিন বদল ক'রে নিতে চাই।
হে আমার স্বদেশ : দাও আমাকে নতুন কামনার গোলাপ।
তোমার ক্ষীণাঙ্গ কটিতট আমাকে হাত দিয়ে জড়াতে দাও
সমুদ্রউচ্ছ্বাসে চূর্ণ তোমার উপল উপকূলে বসতে দাও আমাকে
যেন মুঠো মুঠো বাজরা কুড়িয়ে ছড়িয়ে মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারি তার।
এই আমি চললুম সার-স্বপুষ্ট স্বকুমার ফুলগুলো বেছে বেছে তুলতে

চলন্সুম তুলো থেকে তুষার-শাদা স্থতো কাটতে
আর এই মহিমান্বিত নির্জন ফেনার মুখোমুখি
তোমার সৌন্দর্যের গলায় পরানোর জন্তে গাঁথবো এক সমুদ্রোপকূলের মালা।

পিতৃভূমি, হে আমার স্বদেশ,
প্রতিরোধের পারাবারে, তুষারের বাধার দেয়ালে
আদিগন্ত ঘেরা,
চোখে তোমার প্রহরী ঈগলের দৃষ্টি, বুকে তোমার গন্ধকের বিস্ফোরণ,
পবিত্র পশম আর পান্নায় মোড়া তোমার দক্ষিণ মেরুদেশের হাতে
একফোঁটা অনির্বাণ মানবিকতার আলো
টলমল টলমল করে, শত্রুদেশের আকাশে আগুন লাগায়।

সেই আলোকে বাঁচিয়ে রাখো, পিতৃভূমি, তুলে ধরো আকাশে
অন্ধ, আশঙ্কাআতুর এই বাতাসে
তুলে ধরো তোমার মৃত্যুহীন ফসলিয়া আশা।
আর তোমার দুর দুর প্রান্তরে পড়ুক এই সুদুর্লভ আলোর রেখা,
মানুষের এই ভবিষ্যত,
ঘুমন্ত আমেরিকার বিস্তীর্ণ বিপুলতায়
এইভাবে আগলিয়ে রাখো তুমি একক প্রাণের রহস্যময় পুষ্পকে।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আপ্যায়ন

ওঠাতে পারা যায় নি বলেই এঁরা এখানে এখনো বসবাস করছেন। এত বড় রাস্তার ওপর আজো নামমাত্র ভাড়ায় টিঁকে থাকার দরুন অনেকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক, এঁরা পরম ভাগ্যবান। দক্ষিণ-খোলা রকওয়ালা বড় বড় দুখানি ঘর, সামনে ফুটপাথের ওপর লোহার খাঁচায় পোরা বকুল গাছ—মাঝে মাঝে কোনো একটা বিশেষ সময়ে বকুল ফুলের গন্ধ এসে এঁদের ঘরে পৌঁছয়। পাকা বকুল ফলের লোভে পাড়ার কয়েকটি অর্বাচীনের অত্যাচারে গাছটার মাথার ওপর কাকের বাসাটা পরিত্যক্ত। তলা থেকে ইঁট-পাটকেল আর ওপরতলাবাসীদের হুম্-হুম্ হাততালির চোটে প্রসব-বেদনা-কাতর বায়সী অন্যত্র উড়ে পালিয়েছে। তোতাপুলি আমের মত বকুল ফলগুলো কিন্তু সময়মত পেকে টশ্-টশ্ করে। মুরারিবাবুরা অনেক হাঁকডাক করেও ছোঁড়াদের নিরস্ত করতে পারেন নি।

বকুলতলার এই ঘর দুখানিতে মুরারিবাবুরা জাপানী বোমার ভয়ের আমল থেকে বাস করছেন একরকম নির্ভয়ে বলতে গেলে। যুদ্ধের চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে কত বাড়ি খালি হল, কত বাড়ি ভরতি হল, কত বাড়ির ভাড়া বাড়ল, লোকজন গাঁ থেকে শহরে উপচে পড়ল। সবই মুরারিবাবুদের চোখের ওপর এই সেদিনের ঘটনার মত। মুরারিবাবু গোল্ডমেডালিস্ট এইচ. এম. বি—রংচটা কালো কাষ্ঠফলকে নাম এবং পরিচয়ের শাদা আগ্রাক্ষরগুলো গা-ফাটা, নিশ্চিহ্নপ্রায়। সবুজ রঙের চিঠির বাক্সের ডালাটা উৎপাটিত—ইতিপূর্বে অনবরত স্থানপরিবর্তনের জন্যে পেরেকের মুখে আশেপাশের পলেস্তারা খসে গেছে ইতস্তত। তবুও মুরারিবাবুকে অনেকেই চেনে—ডাক্তার বলেই তাঁর চেনা-শোনার পরিধি বিস্তৃত কিনা আজ বলা শক্ত।

রাস্তার ওপর ঘরখানা সব সময় খোলাই থাকে, নির্লজ্জ বেআব্রু। ঘরের ভেতর উদয়-অস্ত একটি শিশু উপুড় হয়ে কাঁদে, আরো দু-একটি শিশু মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে গান গেয়ে চীৎকার করে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করে। ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় কাঁথাকানির ছড়াছড়িতে রাস্তার ধুলোয় ঘরের মেঝেটা একাকার হয়ে থাকে। অবসর সময়ে ঘরে ঢুকে মুরারিবাবুর স্ত্রী ক্রন্দনরত শিশুটাকে কোলে তুলে নেয়—ক্রীড়ারত ছেলেগুলোকে তাড়না করে বলে, ঘরটাকে একহাঁটু করে রেখেছে—হতভাগা পাজি ছেলে সব!

হঠাৎ ঘরটা বড় নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ছেলে কোলে করে মলিনা কি মনে করে একবার ঘরটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নেয়; পরনের কাপড়ের মত

নোংরা হয়েছে ঘরটা! কবে কোন যুগে যে কলি ফেরানো হয়েছিল কে জানে! কড়ি-বরগায় জমে-ওঠা ঝুল আজ হঠাৎ মলিনার চোখকে পীড়া দেয়—সব কাজ ফেলে ঘরটাকে ঝাড়মোছ করবার চিন্তা হয়তো মনে জাগে।

আঁচলের আড়ালে শিশুর মুখটা গুনে বন্ধ করে মলিনা জানালায় এসে দাঁড়ায়। ক্ষত-বিক্ষত রাস্তাটা রোদ্দুরে ঘেয়ো কুকুরের মত ঝিম হয়ে পড়ে আছে; ওপারে রাজজ্যোতিষী ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর ছ'ফুট-লম্বা সাইন বোর্ডটার ওপর একটা কাক বসে বকুল গাছটার দিকে মুখ করে তারস্বরে চীৎকার করছে—মাঝে মাঝে অসুস্থ নিরানন্দ জানোয়ারের বিলাপের মত গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ উঠছে। মলিনার জানালার নিচে ফুটপাথের ওপর কয়েকটি কিশোরী বুকের ওপর বই-খাতা চেপে ধরে বেণী ঝুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে বোধ হয়—হঠাৎ ভারি নয়নাভিরাম লাগে বিদ্যার্থিনীদের। পোপো-বাসুর স্কুলে যাবার কি সময় হয় নি এখনো? কোথায় খেলে বেড়াচ্ছে? হঠাৎ এক সময় ভোজবাজির মত দেখা দিয়ে ছেঁড়া-ময়লা বইগুলো কুক্ষিগত করে তপ্ত খোলায় খইএর মত ঘরে থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবে—ওদের মুখে অন্ন দিয়ে স্কুলে পাঠাতে রোজই মলিনার কাঁসার পাত্রে আছড়ে পড়ার মত মনে হয়, নিদারুণ অস্বস্তিকর একঘেয়ে। বাপ-মা-মরা ছেলের মত অনাদরে অবহেলায় পোপো-বাসু শিক্ষার দাতব্য কুড়িয়ে আনে। বইগুলো বুকে চেপে ঐ মেয়েগুলো কেমন পড়তে যাচ্ছে—কানের দুলে, তৈলাক্ত চুলের বিনুনিতে সকালের রোদ্দুর ফিরে ফিরে কেমন চিকমিক করছে, মলিনার মনে পড়ে তারা কোনো দিন অমন করে স্কুলে যায়নি—ফ্রকে ভুষোর কালি মেখেই তাদের লেখাপড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে। পোপো-বাসুকে আরো সাজিয়ে গুজিয়ে আরো ভালো স্কুলে পাঠাতে পারে না তারা? মেয়েগুলোর গায়ে-মুখে সব সময় খড়ি ফুটে থাকে।

মাই টানতে টানতে ছেলেটা কামড়ে দিয়েছে। আচমকা আঘাতে মলিনার মাথাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। ছেলেটাকে কোল থেকে ফেলে দিতে কি মনে করে বুকের মধ্যে সাপটে ধরে পিঠে গোটা দুই চড় কসিয়ে দিলে—দড়ির মত পাকানো ছেলেটা দম ফেটে যাবার মত ককিয়ে উঠে মায়ের বুকটা আরো জোরে আঁকড়ে রইল। ব্যথাটা ক্ষণিকের; মলিনা এক সময় ছেলের মাথাটা টেনে তুলে মাই বদল করে দিলে—ছেলেটা ঘাড় কাত করে খানিকক্ষণ মায়ের মুখের দিকে ছল্ ছল্ চোখে চেয়ে রইল! অকারণে মলিনার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল! সুধাভাণ্ড খালি হয়ে গেছে, বঞ্চিত কচি ছেলেটার দোষ কি! নিষ্ফলা মাতৃস্নেহ মথিত হয়ে গোটা দুই চুমা রুগ্ন শিশুটার গণ্ডদেশে ললাটে অঙ্কিত হয় অকপটে। গাভীর স্তনদুগ্ধবঞ্চিত বাছুরের গা-চাটার মত মলিনা চুমোয় চুমোয় সন্তানের দেহ

লেহন করতে চায়—জানালার বাইরে থেকে ঘরের ভেতর চোখ ফেরাতে কেমন ঝাপসা ঝাপসা মনে হয়।

ক্রমশ উত্তপ্ত রাস্তায় অবোধ্য কোলাহল ওঠে—বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে বাড়তে থাকে, ওপরতলা থেকে অনেকগুলি সাড়ি-ধুতি ঝুলে পড়ে শুকোবার জন্যে—মুরারিবাবুদের ঘরে আব্রুর ছায়া নেমে আসে। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর সাইন বোর্ডের ওপর থেকে উড়ে এসে কাকটা বকুল গাছের ওপর বসল।

পোপো-বান্টু বোধ হয় না খেয়েই আজ স্কুলে চলে গেছে, কিংবা স্কুলের কথা আজ তাদের মনে পড়ে নি এখনো। স্কুলের ওদের বাপ-মা নেই। কোলের ছেলেটাকে নামিয়ে ছেঁড়া কাগজ-পত্তর দিয়ে ঘরের মেঝেয় বসিয়ে দিয়ে মলিনা রান্নার জোগাড় দেখতে গেল—ডাল-ভাত হয়ে গেছে, এখনো বাজার এসে পৌছল না, শুধু শুধু আঁচ খালি যাচ্ছে। রুগী দেখে ফেরবার পথে মুরারিবাবু বাজার করে আনেন রোজই এই সময়ে—মলিনা সবে জানলায় এসে দাঁড়ায় কি দাঁড়ায় না, এক হাতে বাজারের থলি আর এক হাতে খবরের কাগজ চোঙ করে পাকানো মুরারিবাবু এসে হাজির হন। বাজারটা কোনরকমে ফেলে দিয়ে ক্রন্দনরত শিশুটাকে কোলে তুলে নেন, কোঁচার খুঁট দিয়ে নাক-মুখ মুছিয়ে দেন, তিন শো পঁয়ষট্টি দিন বেলা সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। অত কাঁদুনে ছেলেটাকে এত প্রফুল্লময় দেখায় তখন!

চৌকাঠ পেরিয়ে অন্য ঘরে পা দিতে মলিনার মাথটা হঠাৎ ঘুরে যাবার মত কেমন করে ওঠে—দুরাগত শব্দের মত প্রাত্যহিক দুঃখবোধের একটা বাঙ্ময় অনুভূতি স্পষ্ট হয় যেন: এই ছেলে-পুলে স্বামী নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়ে ঘরসংসার, ভবিষ্যৎ সুখের মুখ দেখার বাসনা, কোনোই মানে হয় না! নিজেকে বাদ দিয়ে মলিনা আজ এই সংসারের সুখদুঃখের অকিঞ্চিৎকরতার কথা ভাবতে পারে—জীবনদর্শনের একটা অস্পষ্ট ধারণা মাথার মধ্যে ভেসে ওঠে! আশ্চর্য দার্শনিকতাবোধ! ছেলেটার কান্নার শব্দে মলিনাকে ফিরে আসতে হয়। একটানা কেঁদে যাচ্ছে ছেলেটা চোখ বুঁজে। কোলে না তুলে থমকে দাঁড়িয়ে থেকে মলিনার মনে হয়—দেখা যাক ছেলেটা কত কাঁদতে পারে, কিছুতেই কোলে তুলব না। না, না, এত কিসের!

মলিনাকে কিন্তু হার এক সময়ে মানতেই হয়। গলা চিরে রক্ত বার হবার মত স্বরগ্রাম উঠে ফেটে পড়তে চায়—অবোধ শিশুর প্রতিবাদ নিদারুণ অস্বস্তিকর লাগে। ছেলে কোলে তুলে নিজের ওপর কেমন ঘেন্না ধরে যায় মলিনার—কি সাংঘাতিক প্রজনন-ক্ষমতা তার! পোপো, বান্টু, গোপা, চিন্টু, হুতো আর এই ছেলেটা, ছ'টি ছেলে-মেয়ের মা হয়েছে সে এরি মধ্যে! আত্মঘাতী হবার কথা এখন ভাবতেও যেন মলিনা লজ্জা পায়। ছেঁড়া কাঁথায়, মালিন্যে, অপ্রাচুর্যে অনভিলষিতের আবির্ভাব

নিদারুণ পরিহাসের মত মনে হয়। কে জানে কত বয়েস হয়েছে তার, আর কত ছেলেই বা বিয়োবে সে এখনো। আবার ছেলে হবার সন্দেহ মনে জাগতেই মলিনার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ভয়ে ভাবনার আতংকে কাঁটা দিয়ে উঠল। সারা দেহ কুঁকড়ে গেল।

মনে হল জানালার ওপারে বকুলতলায় আধখানা আকাশ নিঃশব্দে নেমে এসেছে। মলিনা মুখ বাড়িয়ে দেখল মস্ত একটা মটর তাদের জানালার সামনে এসে থামল। রবিকরোজ্জ্বল ঘননীল আকাশের মত গাড়িটার রং ক্ষণিকের জন্যে মলিনার চোখে মাদকতা আনে হয়তো—দূর সমুদ্রের ময়ূরপঙ্খী হঠাৎ কোনো দিন কারো ঘাটে ভিড়ে যাওয়ার মত: বিস্ময়-পুলক-বেদনা-বিহ্বলতা এক সঙ্গে অনুভূত হয়! এমন সুন্দর রথে কে জানে কারা এল? কোথায় এল? আর যদি তাদের বাড়িতেই আসে শেষ পর্যন্ত?

মলিনা আরো বিস্মিত হয় দেখে, গাড়ি থেকে যাঁরা নামলেন তাঁরা তাদেরই দরজা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছেন। মলিনা জানালার একপাশে সরে গিয়ে ঘাড় কাৎ করে দেখে: না, সুবেশা স্ত্রীলোকটি পুরুষটির পিছু পিছু সাবলীল গতিতে এগিয়ে আসছে—ঐ ওঁরা দরজার নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন, চা খড়ি দিয়ে লেখা বাড়ির নম্বরটা পরম কৌতুকের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছেন। কি লজ্জা, এখনি ডাকবে বোধহয় নাম ধরে। হারামজাদিদের একজনেরও কি ধারে-কাছে থাকতে নেই এ সময়ে? দরজাটা খোলা আছে, এখনি যদি ওঁরা ঢুকে পড়েন!

এটা কি মুরারিবাবুর বাড়ি?—পুরুষটির কণ্ঠস্বর শোনা যায়। মলিনা এগিয়ে এসে উত্তর দিতে পারে না। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কাপড়-চোপড় সামলে নেয়। এত জড়তা যে কেন আসে কে জানে! এমন তো সে কত লোকের সামনে বেরিয়েছে, স্বামীর বাড়ি থাকা-না-থাকার সংবাদ উচ্চকণ্ঠে জানিয়েছে। আজ এ কি হচ্ছে?

মুরারিবাবু বাড়ি আছেন? কণ্ঠস্বরটা এবার একটু বিকৃত হয়েই ওঠে। বোধ হয় ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। পর পর আরো দুবার আওয়াজ দিলেন ভদ্রলোক। জানালার পাশে মলিনা কাঠ হয়ে উঠেছে—ওঁদের সামনে কিছুতেই নিজেকে টেনে আনতে পারছে না: ওঁরা সুন্দর, সুবেশ, শৌখিন বলে, না ওঁরা অপরিচিত অভাবিত আগন্তুক বলে?

সঙ্গের মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল: জানলায় যেন একজন কে দাঁড়িয়ে দেখেছিলুম গাড়ী থেকে নামবার সময়: আশ্চর্য, কেউ সাড়া দিচ্ছে না কেন?

শেষের কথার আঘাতটা ঠিকই মলিনার হৃদয়ঙ্গম হয়। সত্যি তো তারা যদি তাকে দেখেই থাকেন তা হলে এমনি করে চোরের মত নিশ্চুপ থাকার কি মানে হয়! মেয়েটি নিশ্চয়ই অভিযোগ করতে পারেন, একশোবার করতে পারেন। ওঁরা কি ভাবছেন!

ভদ্রলোক আবার হাঁকলেন : মুরারি বাবু বাড়ী আছেন ? সঙ্গের মেয়েটিও যেন দু'এক পা করে চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে।

মলিনা ছেলে কোলে নিয়েই উন্মুক্ত দরজার সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়—অস্ফুটে বলে, তিনি এখনো ফেরেন নি—

হঠাৎ তিনজনেই অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে ওঠে : তিন জোড়া চোখ তিন প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় উদ্ভাসিত হয়।

পুরুষটি প্রশ্ন করেন : কখন ফিরবেন ? ইতিমধ্যে মেয়েটি একেবারে মলিনার পাশে ঘেঁসে দাঁড়ায়।

আশ্চর্য, কখন মলিনার জড়তা কেটে যায় ! অকুতোভয়ে মলিনা এবার জবাব দেয় : এখনি ফিরবেন। আপনারা আসুন, বসুন।

মায়ের চেয়ে কম বিস্মিত হয়নি কোলের কাঁদুনে ছেলেটি। মলিনার খেয়ালই নেই এঁদের দেখে কখন সে কান্না ভুলে গেছে। এদের কারো কাছে আজ কম অপূর্ব আর অভাবনীয় নয় এই নবাগতরা। কাঁদুনে ছেলেটির কি যে খেয়াল হল মায়ের কোল থেকে হাত বাড়িয়ে নবাগতার পরিচ্ছদের বর্ণচ্ছটা মুঠোর মধ্যে ধরতে চাইলে। নবাগতার কাপড়ে মৃদু টান পড়ল।

ছেলেটার স্বাস্থ্যে প্রথম দর্শনেই স্বামী-স্ত্রী মনে মনে বিশেষ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন : এত ক্ষীণকায় মানবশিশুও দেখা যায় ! আবার সেই শিশু হাত পা নেড়ে খেলা করে, শিশুমনের কৌতূহল তাকেও চঞ্চল করে ? ঐ ক্ষীণজীবীর পক্ষে এ কি ক'রে সম্ভব হয় ? ওকি কখনও হাসতে পারে, বিশ্বাস হয় না।

কাঁদুনে ছেলেটি সত্যি সত্যি হাসছে—বারবার নবাগতার কাপড়ের রঙীন পাড়ে হাত দিয়ে হৃদ্যতা আকৃষ্ট করতে চাইছে।

কৌতুকচ্ছলে নবাগতা, হাত দুটো প্রসারিত করে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির সমস্ত কৌতূহল অন্তর্হিত হয়—মলিনার আঁচলে মুখ লুকায়। স্বামী-স্ত্রী হেসে ওঠেন।

অভ্যর্থনা করতে এঁদের একটা আসন নির্দিষ্ট করতে হয় মলিনাকে। ঘরের কোণ থেকে ভাঙা চেয়ারটা এগিয়ে দেয় পুরুষটির দিকে—মেয়েটির জন্যে কি আসন দেবে ভেবে পায় না। এঁরা কারা ? তার স্বামীর সঙ্গে গাড়ী-চড়া লোকের এত ঘনিষ্ঠতা মলিনা এর আগে দেখে নি কোনদিন। তাদের খোঁজ খবর কেউ কোনদিন এমন করে নেয় নি—পরমাত্মীয়রা তো দূরের কথা। এই অসময় এমন করে এঁরা তার স্বামীর খোঁজ করছেন কেন ? রোগী এঁরা নিশ্চয়ই নন! আর সঙ্গের বৌটির কি স্বাস্থ্য ! কত বয়েস হবে ? মলিনারই বয়েসী বোধ হয়, মনেই হয় না।—যেন নবোঢ়া ! দিব্যি ঝাড়া হাত পা ! তার স্বামীর সঙ্গে এঁদের পরিচয়ই বা হল কি করে ? এ নবলব্ধ পরিচয়ের জন্যে মলিনা কি গর্ব বোধ করতে পারে না ? তাদের মত লোকের সঙ্গে হঠাৎ এত বড় লোকের আলাপ, তারা কি কল্পনা করে

না? দীনের কুটিরে ঐশ্বর্যবানের পদার্পণে দীন কি বিহ্বল হয় না? তিন শ' পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে এ এক অপূর্ব ব্যতিক্রম—প্রতিদিনের শ্রমবিনিময়ে পাওয়া পারিশ্রমিকের জীবন্ত রূপের মধ্যে এ একটা অপরূপ রূপ—হাত-ফিরতি ময়লা-ঘসা টাকার মধ্যে একটা নতুন করকরে টাকা।

মলিনা বুঝতে পারে, স্বামীর অবর্তমানে এঁদের ভাল করে আপ্যায়ন হচ্ছে না। মেয়েটিকে এখনো কোন আসন দেওয়া হল না। হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাতেও সংকোচ হচ্ছে। হঠাৎ এমন বেমানান আর বেখাপ্পা লাগছে আগাগোড়া ব্যাপারটা! স্বামীর ওপর মনে মনে মলিনা বিরক্ত হয়ে ওঠে।

নবাগতা প্রশ্ন করে বসেন: আপনার ক'টি ছেলে-মেয়ে ভাই?

মলিনা চট করে উত্তর দিতে পারে না—মনে হয়, সংখ্যার ক্রমিকতা তার গুলিয়ে যাচ্ছে। পোপো-বাচ্চু ছাড়া আর কারো কথা মনে পড়ে না, এমন কি কোলের ছেলেটি কথাও মলিনা ভুলে যায়।

মলিনাকে আর উত্তর দিতে হয় না, একসঙ্গে তিন চারটি ছেলে-মেয়ে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে থেকে—নতুন লোক দেখে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে মায়ের দিকে তাকায়। নবাগতা হৃষ্টকণ্ঠে বলেন, আপনার ছেলে মেয়ে?—শোন খুকীরা!

পুরুষটি জিজ্ঞেস করেন, মুরারিবাবুর ছেলে-মেয়ে? শোন খোকা!

কিছুক্ষণ অনেকগুলি লাজুক জিজ্ঞাসা ঘরময় নিঃশব্দে ছোটাছুটি করে। মলিনার এমনি মনে হয়, অতিথিদের পোষাক পরিচ্ছদের শুভ্রতা বড় বেশি রকম চোখে আঙুল দেওয়া। তার ও'পর এই রকম প্রশ্ন! ছেলে-মেয়েগুলো কি ধূলোটাই না মেখেছে আজ! এমন করে আত্মজদের দীনতা মলিনার আর কখনো চোখে পড়েনি। শুধু লজ্জা নয়, এঁদের সামনে নিজের অবস্থা গোপনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে মলিনার।

ছেলেগুলো নড়ে না, চড়ে না, ঠায় এক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বোধগম্য মায়ের চোখের ইশারা উপেক্ষা করে ওরা নিজের নিজের জায়গা অধিকার করেই থাকে। খোকা-খুকু কেউই নবাগতের কাছে এগোয় না। অশ্বস্তিকর রকমে মলিন বিরূপ হয়ে ওঠে। সম্মানীয় অতিথিব সামনে কি অপ্রস্তুত হতে হচ্ছে! ছেলে-মেয়েগুলোও এসে জুটেছে ঠিক সময়!

মুরারিবাবু এসে পড়লেন। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেও মলিনা সুস্থির হতে পারল না—স্বামীর হাতে নিত্যকার মত আজ বাজারের থলি নেই—মুরারিবাবু খালি হাতে ঘরে ঢুকেছেন। এমনিতেই কতক্ষণ আঁচ পুড়ে গেল, আবার কখন বাজার আসবে কে জানে—জ্বালাতন! ঘরে ঢুকেই মুরারিবাবু বিশেষ বিব্রত বোধ করছিলেন—তিনি কোন দিন কল্পনা করতে পারেন নি যে এ ধরনের অতিথিরা তাঁর গৃহে পায়ের ধুলো দেবেন। এঁদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুরারিবাবু মনে

মনে নানা জল্পনা করতে লাগলেন। তিনি খুশি হয়েছেন কি ভয় পেয়েছেন ঠিক বোঝা গেল না।

মুরারিবাবু অস্ফুটে জিজ্ঞেস করলেন, পঞ্চাননবাবু, আপনারা ?

পঞ্চাননবাবু হেসে বললেন, কেন আসতে নেই ?

পঞ্চাননবাবুর স্ত্রী বললেন, না বললেও আমরা কিন্তু আসতে জানি—দেখলেন তো !

বড় অপ্রস্তুত হন মুরারিবাবু—ভেবে পান না কি উত্তর দেবেন—একবার মনে হল বলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আজ এসেছেন। কিন্তু কিছুতেই কথাটা মুখ দিয়ে বেরুল না।

মলিনাকে জিজ্ঞেস করলেন শুধু, এঁদের চা-টা দিয়েছে ? তোরা আজ ইস্কুলে যাস নি ?

পঞ্চাননবাবু বল্‌লেন, হবে হবে—অত ব্যস্ত হবেন না। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, বসুন।

এবারে একটা মাদুর পেতে দিতে হয়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ আলাপ করা যায়—তা ছাড়া একটিমাত্র ভাঙা চেয়ারে এতগুলি লোকের আসন হতে পারে না। কিন্তু মুরারিবাবুর সঙ্গে পঞ্চাননবাবুর এমন কি 'অনেক কথা' থাকতে পারে! ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় মাত্র দু'একদিনের, তাও এই চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবসায়ে—এমন অনেকের সঙ্গে মুরারিবাবুর আলাপ হয়, কিন্তু এমনি ভাবে পরিচয় হয় না। বেশ অস্বস্তি বোধ করেন মুরারিবাবু—অতিথিদের ঘরে বসিয়ে আলাপ করার চেয়ে যথাশীঘ্র বিদায় করার কথাই তাঁর মনে হয়—যেন গায়ে ছ্যাঁকা লাগার মত এঁদের সান্নিধ্য।

মলিনা চায়ের জোগাড় করতে চলে যায়। ছেলেমেয়েগুলো তখনো আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে—হয়তো অপরিচয়ের রহস্য শিশুমনে গভীর রেখাপাত করে—কৌতূহলের শেষ থাকে না! আজকের প্রাত্যহিকতার ব্যতিক্রমে খাঁচায় পোরা বকুলতলার ঘর দুখানার সহসা যেন বাকরোধ হয়ে যায়। মানুষ এত সুন্দর, এত রহস্যময়ও হয় ?

মুরারিবাবু সুস্থির হয়ে বসে আলাপ করতে পারেন না। মাঝে মাঝে উঠে আসেন—মলিনাকে কি সব নির্দেশ দিয়ে আবার ফিরে যান। ব্যস্ততায় লোকটা ছটফট করেন, হয়তো এঁদের যোগ্য আপ্যায়নের জন্যে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন। পঞ্চাননবাবু দু'একবার প্রতিবাদও করলেন—কিন্তু কে শোনে সে কথা। চায়ের জল আজ সময় মত ফুটে উঠতে বড় দেরি করছে। হঠাৎ নিজের মানসম্ভ্রম সম্বন্ধে মুরারিবাবু বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠেন, যেন আজকের আতিথেয়তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই তাঁরা সমাজের এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত হবেন যার

প্রতিচ্ছবি জীবনসংগ্রামের নির্মমতায় হতাশায় একমাত্র ভরসাস্থল—সুদিন, এমন একটা দিন যা আজ কেবল কল্পনা!

একসময় বড়মেয়ে পোপোকে চুপিচুপি ডেকে মুরারিবাবু খাবার আনতে পাঠান। মেয়েকে বারবার সাবধান করে দেন: দেখিস্ সাবধানে আনিস্—চিলে না ছোঁ মারে। যাবি আর আসবি বুঝলি?

উৎসাহে মেয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ে। অতিথি-সৎকারের এ সুযোগ এগার বছরের মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট। পারা-না-পারা, সাবধান-অসাবধান, এসব প্রশ্ন অবান্তর।

একরকম নাচতে নাচতে পোপো রাস্তায় নামে। উত্তেজনায় হাতের পয়সাটা বার বার হাত পিছলে পড়ে যায়—একবার গড়িয়ে রাস্তার হাইড্রান্টের মুখে যেতে যেতে বেঁচে গেল। পোপো সতর্ক হল, হাতের মুঠোয় আধুলিটা শক্ত করে চেপে ধরল। আবার যদি পড়ে যায়? উরে বাবা, কি গভীর আর অন্ধকার ড্রেনটার মুখ! একবার পড়লে কি আর ওঠানো যাবে! অতি সন্তর্পণে পোপো ফুটপাথের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। চল্‌তে চল্‌তে হাতের মুঠো খুলে খুলে পয়সাটা বারকয়েক দেখে নিলে, কে জানে, পয়সাটা যদি মুঠোর মধ্যে উবে যায়! হাতের চেটোর ঘামে ময়লায় আধুলিটা কি রকম ম্যাড়ম্যাড়ে আর মোটা দেখাচ্ছে—ওটা ভাঙলে কটা পয়সা হয়? কটা ডবল পয়সা? কটা আনি? আট-আনিতে বত্রিশটা ফুটো পয়সা! পোপো এক নিঃশ্বাসে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুণে ফেলে। আচ্ছা, একশোটা পয়সায় কটা আধুলি হতো?—দুটো? তিনটে? চারটে? না, হিসেবটা গণ্ডগোলে, কিছুতে মাথার মধ্যে স্থির হয় না। একশোটা পয়সা কতগুলো? কই, সে তো কোনদিন দেখেনি একসঙ্গে! মায়ের চাবির রিঙে ফুটো পয়সাগুলো বেশ দেখায় কিন্তু! বামুর তবু বই-এর বাক্সে কটা পয়সা আছে, তার একটিও পয়সা নেই—বামুটা বেশ জমাতে পারে, সে কেবল বোকার মত যা পায় পেটে পোরে! আজকে বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে জমাবে, একটা দুটো চারটে পয়সা—একটা আনিই চেয়ে নেবে!

বেড়া-বিনুনীর বেড়া-ভাঙা চুলগুলো পোপোর মুখ ঝাঁপিয়ে পড়েছে—লাল শালুর ফ্রকের চেহারাটা কাদামাটিতে লাল রঙ ধরানোর মত, ধুলোবালিতে ময়লা বিবর্ণ! ফ্রক পরলে পোপোকে আর মানায় না যেন, মাথায় অনেকটা খাড়া হয়ে উঠেছে মেয়েটা। সরু সরু হাত-পা ঢাকবার পক্ষে শাড়িই এখন উপযুক্ত। বাবা-মা সে-কথা বোঝে না। শাড়ি পরতে চাইলে ধমকায় কেবল!

ক্ষতবিক্ষত রাস্তায় দুপুর রোদ্দুর ঝাঁঝাঁ করছে—কাকের গলার স্বর ক্রমশ

চিরে চিরে ফাঁক হয়ে আসছে—বড় রাস্তায় গাড়ির তেল-কালি গড়াচ্ছে। ভেলি গুড়ের ছেঁড়া চটে বজগে-ওঠা রস ধর্মের ষাঁড়ের জিভের আগায় তৃপ্তি আনতে পারছে না। দাঁড়ানো গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে পেছনটা ধোঁয়ায় কালো করে দিচ্ছে—বাজারের পাশে ঝালাই-এর দোকানে কেনেস্ত্রা-পেটা একটানা শব্দ হচ্ছে।

পোপো থমকে দাঁড়াল। ফ্রক চাপা-দেওয়া খাবারের ঠোঙাটা বার করে সামনে উঁচু করে ধরলে—বাঁহাত দিয়ে পিঠটা চুলকে নিলে। হর্ন দিতে দিতে একটা গাড়ি একেবারে গায়ের ওপর উঠে এসেছিল—নির্বোধ দৃষ্টিতে গাড়িচালকের গালাগাল বোঝবার চেষ্টা করলে মেয়েটা। আশপাশের অনেকেই আশ্চর্য হয়ে গেল মেয়েটা চাপা পড়লো না দেখে—আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! পোপো ফুটপাথে উঠে এল—দুপুর রোদ্দুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফুটের নিচে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা ভিখিরী 'এ নারায়ণা' বলে চীৎকার করছে। গাড়িটানা মোষের মুখের গাঁজলায় নিদাঘের শোষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পোপো একটা রসগোল্লায় মুখ দিয়ে প্রাণপণে চুষতে লাগল। পোপোর রসনা বুঝি এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত রস চুষে নিঃশেষ করে দিতে পারে। লোভ নয়, প্রচণ্ড ক্ষুধা পোপোকে ভর করেছে। বড় তাড়াতাড়ি রসগোল্লাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল। তাদের জীবনে এমন সুযোগ হয়তো আর আসবে না, এমন করে রসগোল্লা কিনে চুষে খাবার অবসর! মেয়েটার লুব্ধতা অনেকে হয়তো দেখলে, লোভী মেয়েটাকে দোষারোপও করলে—কিন্তু পোপোদের জীবনে আজকের ব্যতিক্রমের কথা ভাবতে পারলে কী? তাছাড়া আজকের মত সুযোগ পোপোর জীবনে এই প্রথম—ইচ্ছে করলে সে চুষে সারা পৃথিবীর রস শেষ করে ফেলতে পারে।

রসগোল্লাটা স্বস্থানে রেখে পোপো চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে বেঁড়া-বিনুনীর ফাঁকে গুঁজে দিলে। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো চেটে নিলে। সামনে তাকাতে চোখদুটো ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল—হঠাৎ ফ্রকের কোঁচড়ে খাবারের ঠোঙাটা ঠাহর করা যায় না।

তবু রসপিপাসা অতৃপ্তই রয়ে গেছে। না, এ সুযোগ আর দ্বিতীয় বার আসবে না। পোপো আর একটা রসগোল্লা বার করে চুষতে লাগল দম বন্ধ করে। নিঃশেষে সমস্ত রস নিঙড়ে নিলে। মুখ তুলে দম নিতে পোপোর নজর পড়ল; চাপা কলের মুখে জিভের শব্দ করে একটা নেড়ী কুকুর জল খাচ্ছে—লোল জিহ্বার চক্ চক্ শব্দে তৃষ্ণার তীক্ষ্ণতা শানিয়ে উঠছে।

রসগোল্লাটা আবার মুখে তুলে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে পোপো চুষতে লাগল—কণ্ঠতালুতে রসহীন জিভের কাঁটাগুলো ঘসে ঘসে রসসিক্ত করতে লাগল। না, আর রস নেই। যদি সব রসগোল্লাগুলোর রস চুষে নেওয়া যায়…

হঠাৎ একটী প্রচণ্ড চপেটাঘাতে চোখের সামনে দিনদুপুরের আলোটা থর থর করে কেঁপে উঠল। মুরারিবাবু যে কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন পোপোর খেয়াল ছিল না—ভালো জিনিসের রসাস্বাদ মাদক দ্রব্যের মতই আচ্ছন্ন করে।

পোপোর হাত থেকে খাবারের ঠোঙাটা কেড়ে নিয়ে মুরারিবাবু চাপা গলায় ভর্ৎসনা করলেন, হারামজাদা, নচ্ছার মেয়ে—তাই এতো দেরি হচ্ছে! এলোপাথাড়ি কিল-চড় মেয়ের পিঠে-মাথায় পড়ল। এদিক-ওদিক থেকে দু'একজন এগিয়ে এসে মুরারিবাবুকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। নিজের মেয়ের গুরুতর অন্যায়ের জন্যে প্রহার করার দরুন তাঁকেও সাধারণ লোক আজ উপদেশ দিচ্ছে—এর চেয়ে বড় পরিহাস যে কি থাকতে পারে অদৃষ্টের মুরারিবাবু ভেবে পান না। তবুও যে অন্যায়ের জন্যে মেয়েকে তিনি এই মাত্র তাড়না করলেন, তার জন্যে নিজেকেই দোষী করতে হয়। কিন্তু মেয়েটা অমন করে খাবারটা আত্মসাৎ করছিল কেন? রাস্তার লোক-জন দেখে কি ভেবেছে? মুরারি ডাক্তারের মেয়ে? ছি, ছি, ছি! এমন ছেলেমেয়েও লোকের হয়? মানসম্ভ্রমের কথা বড় বেশি করে মনে হয় মুরারিবাবুর—ঐ হাবাতে ছেলেমেয়েগুলোই তাঁকে এমনি করে ডুবিয়ে দেবে। নিজেরহাতে এখনি তিনি ওদের খুন করতে পারেন, এতটুকু মায়াদয়া তাঁর হবে না। পোপোর বাপ হওয়ার দরুন আত্মহত্যাও করতে পারেন তিনি।

নেড়ী কুকুরটা শুকনো রসগোল্লাটা দাঁতে চেপে অবাক হয়ে মুরারিবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। পোপো চোখ রগড়ে রগড়ে কান্না হবার জোগাড় করলে। ওদিকে অতিথিদের দেওয়া গরম চা জুড়িয়ে পান্তা ভাত হয়ে গেল বোধ হয়। এমন বে-ইজ্জত অপ্রস্তুত কখনো লোকে হয়।

অতিথিরা চলে গেছেন—বাজারের কেনা-খাবারের এতোটুকু তাঁরা ভেঙে মুখে দেন নি। ঠাণ্ডা চা'ও তাঁরা হাসি-মুখে মুখে তুলেছেন—তাঁরা কিছুই সন্দেহ করেন নি। পঞ্চাননবাবুর স্ত্রী মুরারিবাবুর স্ত্রীকে বরং একদিন যাবার জন্যে অনুরোধ করে গেছেন। মলিনার পক্ষে আজকের দিনটা সত্যিই মনে রাখবার মতো। ওঁরা কত বড়লোক কে জানে—আবার কখনো যদি আসেন মলিনা দেখিয়ে দেবে কি রকম খাতির করতে হয়। প্রথম প্রথম অমন হবেই তো! ওঁদের আসার কথাটা ভেবে মলিনা মনে মনে হাসে। এত জড়ভরতও লোকে হয়?

পোপো হাত পেতে খাবার নিলে না। মলিনার হঠাৎ খেয়াল হয়, মেয়েটা দোকানে যাবার পর থেকে আর সামনে আসে নি, কি হয়েছিল মেয়েটার? বেশ বোঝা যায়, পোপো এতক্ষণ নিঃশব্দে কেঁদেছে।

মলিনা জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে রে? অমন করে আছিস যে!

পোপো উত্তর দিলে না। কাঁদতেও পারলে না, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল কেমন একরকম করে, মলিনা দেখলে, মেয়ের চোখে অনেক অশ্রু শুকিয়ে গেছে —মুখটা ফুলো ফুলো। অনেক পেড়াপিড়িতে পোপো বললে, বাবা মেরেছে।

কেন ?

এবার পোপো হু হু করে কাঁদতে আরম্ভ করলে—কিছুতেই মেয়েকে থামানো যায় না। মেয়েকে কোলের কাছে টেনে শান্ত করতে করতে মলিনা কঠিন হয়ে উঠল—প্রহার চিহ্ন তার চোখকে এড়াতে পারলে না। কিন্তু কেন ? মেয়ে তার কি করেছে যার জন্তে এমন করে মারতে হবে ? এতবড় মেয়ের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না ? আসুক একবার ! বড়লোকদের দেখে তার স্বামীর মেজাজ বিগড়ে গেছে—অমন বড়লোকদের বাড়িতে ডেকে আনা কেন ! মনে মনে আজকের দিনটাকে শাপান্ত করলে—দরকার নেই তাদের বাড়িতে কারো এসে আদিখ্যেতা করবার। তারা যেমন আছে তেমনি থাক ! বাপ হয়ে ছেলেমেয়েকে এমনি করে কেউ মারে ? ক্ষোভে দুঃখে মলিনার মাথায় আগুন জ্বলতে লাগল—কেন মারলে ? কেন ? কেন ? মেয়ে তার কি করেছে ? বড়লোকদের সামনে কি বেহায়াপনা করেছে সে, যাতে তার মান নষ্ট হয়েছে ? বাইরের লোকের সামনে এত বড় মেয়েকে কেন মারবে ? স্বামী বলে মলিনা আজ কিছুতে ক্ষমা করবে না, ছেড়ে দেবে না।

জানালায় দাঁড়িয়ে মলিনা স্বামীর প্রতীক্ষা করতে লাগল। সামনে রাস্তায় দীর্ঘ ছায়া নেমেছে—রাজজ্যোতিষীর সদর ঘরের দরজা-জানালাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে—বকুলতলার ছায়াটা ঘুরে গেছে। কি দরকার ছিল আজকে পঞ্চাননবাবু আর তাঁর স্ত্রীর তাদের বাড়ী আসবার ? মেয়েটা আজ ওঁদের জন্তেই মার খেলে ! ওঁরা এসে তো আর তাদের বড়লোক করে দিয়ে যান নি ! সব বড়লোকদের ওপর মলিনা চটে উঠল। স্বামীর বুদ্ধিবিবেচনার ওপর মলিনার ঘেন্না ধরে গেল।…

অতিথিদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসতে মুরারিবাবুর দেরি হল। মলিনা কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই মুরারিবাবু বললেন, একি তোমরা এখনো খাওনি ? অনেক বেলা হয়ে গেছে যে !

স্বামীকে জবাবদিহি করবার জন্তে মলিনা মনে মনে প্রস্তুত হল। পোপোটা সামনে থাকলেই ভাল হত এসময়।

পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে মলিনার হাতে দিয়ে মুরারিবাবু বললেন, রাখো। ওরা দিয়ে গেল।

মলিনা জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, কেন ? কি জন্তে ! হঠাৎ দয়ার কথা, মহত্তর করুণার কথা মনে হলো মলিনার। টাকাগুলো ঘামে ভিজে চট্‌চট্ করছে, কেমন স্যাঁতার মত হয়ে গেছে।

মুরারিবাবু বললেন, পঞ্চাননবাবুর স্ত্রীকে চিকিৎসা করেছিলুম কিছু দিন আগে —ভদ্রমহিলা তোমার চেয়েও রোগা ছিল। অম্বল, সূতিকা নানান রোগ। অনেক ডাক্তার বদ্যি খরচ করেছিল; কিছুতেই কিছু হয় নি; শেষে আমার ওষুধেই নাকি সেরেছেন। দেখলে তো, বেশ চেহারা হয়েছে, না? তোমার চেয়ে বয়েসে বড়, বুঝতে পারলে? টাকাগুলো দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ডাক্তারের ঋণ শোধ না করলে রোগ একেবারে সারে না, তাই।—তোমার চেয়ে কম অবাক আমি হই নি। দেখ মজা, আজ একেবারে বাজার করবার টাকা পর্যন্ত ছিল না।

মলিনার মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। পোপোর প্রহারের কথা তার মনে আছে, কিন্তু ঠিক এ সময় স্বামীকে জবাবদিহি করা উচিত হবে কিনা ভেবে পাচ্ছে না। আর আজকে তার সংসারের যা কিছু বিপর্যয় ঘটেছে তার নিমিত্ত কি ঐ বড়লোক অতিথিরা? এই এতোগুলো টাকা কি নেহাৎই দাক্ষিণ্য, না তার স্বামীর যোগ্যতার মূল্য? পাওনা উসুল?

স্বামী স্নান-খাওয়া করে সুস্থির হোক, তখন বুঝে-সুঝে সুযোগ মত পোপোর কথা জিজ্ঞেস করলেই হবে। বিনা অপরাধে কি আর তার স্বামী পোপোকে মেরেছে? লোকজন দেখলে ছেলেমেয়েগুলোর বেহায়াপানা যেন বাড়ে!

প্রভাত দেবসরকার

জীয়ন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

অথচ পাঁচুর কথায় সে ঘা খায়। একটা অদ্ভুত বিরোধ আছে তাদের মধ্যে, থাকে থাকে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়! কিসে কে ঠোক্কর খেল টের পায় না, কিন্তু বেশ একটু লাগে, পথ চলতে হোঁচট খেয়ে আঙুল ছড়ে যাওয়ার মতো, —মনের অমিল, হাওয়ার বিরোধ নয় মোটেই! সম্পর্ক তাদের জমে উঠেছে পরীক্ষা দিয়ে পাঁচু গাঁয়ে আসার পর থেকে, শেষজীবনে শ্যামল যেন শিষ্য পেয়েছে মানস পুত্রের মত প্রিয়, এমন তারা মশগুল হয়ে যায় কথায় যে দেখে মনের সুখেই পিসীর চোখে জল আসে। তফাতে উবু হয়ে বসে সে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে দু'টির মিল।

শিষ্য বটে, অনেক গুরু তপস্যা করে জীবনে একটি পেলে যমের মত ধন্য হয়ে যায়। তা যম এসে শিয়রে বসেছে শ্যামলের কিছুকাল হল, নতুন যুগের বামুন-ঋষি চাষী জাত থেকেই উঠে এসেছে কিশোর নচিকেতা পাঁচু। হাটে বিকানো একখানি যেন টিনে মোড়া আধ-স্বচ্ছ ছোট আয়না, দামী দর্পণের মত প্রতিফলনে স্তবস্তুতির মত সব ফিরিয়ে দেয় না। নিজের মনে যা স্পষ্ট নয় পাঁচুকে তা সাড়ম্বরে শোনাবার সাধ্য শ্যামলের নেই, পাঁচুর মধ্যে অবোধ জিজ্ঞাসু নিজেকে শ্যামল নিজেরই লজ্জার মত দেখতে পায়: ফাঁকি দিচ্ছ?

কারণ, মুখ দিয়ে যখন তার খই ফোটার মতো অনর্গল বার হতে থাকে নিজের জীবনের মূল্যে যাচাই করা স্বচ্ছ স্পষ্ট সত্য, মেরুদণ্ড সিধে হয়ে যায় পাঁচুর, আলগা তারের মত তার ঢিলে শিথিল দৃষ্টি মোচড়-কষা সঙ্গতিতে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে; দুটি প্রাণে যেন বৈদ্যুতিক ছোঁয়াছুঁয়ি চলতে থাকে, অনবরত চমক দিতে থাকে বোঝানো আর বোঝার চেষ্টার মিল, গুরুশিষ্যের আত্মীয়তা!

সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। প্রণয়লীলার মত তা আনন্দঘন।

—মরা কিছু নয় পাঁচু। বেঁচে আছি তাই না মরার দাম? বাঁচাই যখন মরার বাড়া হয়, অন্যের হজম করা ফাঁকা বাতিল জীবনের মত, মানে, মলের মত ঠেকে বাঁচাটা, মরাকে তখন কেয়ার করে কে? আমি আর কটা দেখেছি, অমন কত আছে, কত ছিল, কত হবে। শুধু এদেশে? সারা জগতে এরা গণ্ডা গণ্ডা গজাচ্ছে। একটা আদর্শ সামনে ধরে দাও, কিসের জীবন কিসের কী, চলো মরি, মরে বাঁচি, মরে বাঁচাই! তবে ওটা হওয়া চাই, জীবনের দাম কষাটা। বাঁচার মত বাঁচা কাকে বলে আর সে তুলনায় কি বাঁচাটা বাঁচছি। ওটা ছাড়া হয় না, আগে নালিশ

চাই, বুকফাটা নালিশ। নইলে শুয়োরের মত পাঁকে ময়লায় বেশ্ কেটে যায়, যেমন আছি সেটুকু বাঁচি বাবা বেশি চেয়ে এটুকু খুইয়ে লাভ কি। কর্মযোগ মানে লড়াই, কুরুক্ষেত্রে তাই গীতার জন্ম। আত্মরক্ষা কি মানুষের জীবন? পশু আত্মরক্ষা করে বাঁচে, কৃমিকীট আত্মরক্ষা করে বাঁচে, মানুষ নয়। মানুষ যুদ্ধ করে, বাঁচার জন্যে মরে। বাঁচার দফা নিকেশ করেছে বলেই না তুই আমি সায়েব মেরে ফাঁসি যাই। কেন যাই? আমরা টের পেয়েছি, আমরা ফাঁসি গেলে অন্য সবাই টের পাবে, ওদের ফাঁসি দেবে! এমনি হয়, জানিস্, এই দুনিয়ার রীতি। আগে একটা কবি ওঠে, একটা পাগল ওঠে, দশটাকে পাগল করে, তারা দেশটাকে ক্ষেপিয়ে দেয়। কিসে? আগুন ছড়িয়েই থাকে, ভাগে ভাগে, কম কম, ঠাহর হয় না কি ব্যাপার, জ্বালা কিসের। একজনের বুকে আগুন জ্বলে, দাউ দাউ জ্বলে, সে ঠাহর পাইয়ে দেয় জ্বালা কিসের। না কি বলিস তুই?

বলে, ওদেশের কথা বলছিলাম, রাশিয়ার কথা। ঠিক কি হল ব্যাপারটা ভালমতো জানা যায় নি, খবর আসে কম। যা বলে মোটামুটি বুঝি, ওই বাঁচার কথা। মজুর-গরীবের বাঁচার কিছু নেই, শুধু খাটুনি, সবার চেয়ে মরতে ওদের ভয়ডর কম। ওরা ক্ষেপলে কারো সাধ্য নেই ঠেকায়। এটা সোজা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝি। আমার ঠেকছে কোথায় জানিস? ওদের ক্ষেপাবে কে, কিসে ক্ষেপবে? মুক্তির আদর্শ বোঝার মত শিক্ষাদীক্ষা কই, মনের গড়ন কই? ওদের অবস্থাই যে ওদের মেরে রেখেছে, পশুর মতো খাটে পশুর মতো থাকে ভাবনা চিন্তা বোধ সব ভোঁতা—

বলে, কালীনাথ আমায় পাগল বলে, মাথা নাকি খারাপ হয়েছে তাই এসব বলি। সব কথার জবাব দিতে পারি না এই হয়েছে মুস্কিল। বুঝি যে জবাব আছে। ওদের দেশে যখন এমনি ভাবেই সত্যি সত্যি ঘটেছে ব্যাপারটা, কেন ঘটল কি করে ঘটল জবাব আছে নিশ্চয়।

ওদেশের গরীব-মজুর হয়তো এদেশের মতো নয়।

কালীনাথও তাই বলে।

পিসী মাঝে মাঝে লাগসই সুযোগ পেলে এদের কথার মধ্যে ছড়া কাটে, বলে, ও ছাই বলে। খেতে পায় না গরীবদুখী, তার আবার এদেশ ওদেশ! গতর সবার গতর বাবু, পেটের খিদে খিদে, তার এদেশ ওদেশ কি?

কালীনাথরা কয়েকজন একদিন গোপনে শ্যামলের এখানে জড়ো হয়, সঙ্গে প্রতিমাও আছে। সন্ধ্যার পর আচমকা হাজির হয়ে টের পেয়ে পাঁচু উঠোন থেকে ফিরে আসছিল, প্রতিমাই তাকে ডাকল। সেদিন কানাই-এর খোলাখুলি কথা বলার চেয়েও আজ বিনা ভূমিকায় তার সঙ্গে এদের সহজ কথা ব্যবহার পাঁচুকে আশ্চর্য করে দেয়। বিনা আড়ম্বরে আজ তাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া

হয়। পাঁচু পারবে কি রাত জেগে বড় রাস্তার কাছে পাহারা দিতে, কোন মোটর গাড়ী যদি আসতে দ্যাখে টুক করে সিধু ঘোষের আমবাগানের পেছন দিকে কয়েক আঁটি খড়ে আগুন দিয়ে সরে যেতে? খড়ে কিছু কেরাসিন ঢেলে রাখলে ভাল হয়।

ঘুম পেলে চলবে না কিন্তু।

ঘুম পাবে, ঘুমোব কেন?

পাঁচু তখনি উঠে আসতে যায়, কালীনাথ বলে, বোস, অত তাড়াহুড়ো নেই। খেয়ে দেয়ে গাঁ একটু নিঝুম হলে পাহারা দিতে যেও। পাকার সঙ্গে তোমার ভাব ছিল, না?

এ রোমাঞ্চকর স্বপ্নাতীত ঘটনা পাঁচুর জীবনে। মনের রহস্যলোকের অংশে ভক্তিশ্রদ্ধার আবেগ যে একজন মানুষকে কোন আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে কাছাকাছি এসে আজ এসে ভাল করে টের পায়। এদের তুলনায় কত তুচ্ছ জ্ঞানদাস, তার বিদ্রোহপনা। একটু ব্যথা পায় পাঁচু। সপরিবারে নিজেকে ছোট মনে হয়।

পাকার কথা আরও জিজ্ঞাসা করে কালীনাথ, প্রশ্ন করার সুরে মন্তব্য করে, চরিত্র ভাল ছিল না পাকার, খারাপ পাড়ায় যেত?

পাকার চরিত্র? এদের সান্নিধ্যে অভিভূত হয়েছে পাঁচু মনে মনে, জিভে নয়,—পাকার চরিত্র আপনারা কি বুঝবেন? তেজের চোটে ছটফটিয়ে বেড়ায়, সব জাগায় যায়। কারো হয় তো বিপদ হয়েছিল, উপকার করতে যেত, নয় কোন খেয়ালে যেত। কোন কিছু মানে না, কাউকে কেয়ার করে না, তাই বলে খারাপ হবে কেন?

তাই নাকি।

পাঁচুর মুখ কঠিন হয়ে আসে, আপনারা খেদিয়ে দিলেন, আপনাদের জন্য মরতে বসে নি? বলে দিতে পারত সব কথা। আপনারা অন্যায় করেছেন পাকার ওপরে—

সবাই চুপ করে থাকে, কারো মুখে এতটুকু ভাবান্তর নেই। এ কাঠিন্য খাত ফিরিয়ে আনে পাঁচুর। তাই বটে, এদের কাছে তুচ্ছ মান অভিমানের মানে নেই, এরা ভয়ংকরের সাধক। বাইরে অন্ধকার গাঁয়ের পথে ঘরের দিকে চলতে চলতে পাঁচুর মন কানায় কানায় ভরে থাকে গর্বে আর সার্থকতা বোধে। এদের বিশ্বাসের পাত্র বলে কানাই সম্প্রতি কত বড় হয়ে উঠেছে তার কাছে, সেই বিশ্বাস আজ সেও পেল। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ।

কালীনাথ আর প্রতিমা ছাড়া অন্য তিনজনকে সে চেনে না। শুধু একজনকে সদরে দু'চারবার চোখে দেখেছে। কে জানে ওরা কারা?

পরদিন আরও কথা হয়, গীতার কথা, কর্মযোগের কথা, বিপ্লবী বই পড়ার কথা। কাল বিনা শর্তে পাঁচুকে রাত জেগে গ্রামপ্রান্তে পাহারার দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছিল, আজ গীতা স্পর্শ করিয়ে তাকে প্রতিজ্ঞা করানো হয় যে যে-টুকু সে জেনেছে শুনেছে বা জানবে বা শুনবে দেহে প্রাণ থাকতে কখনো প্রকাশ করবে না। দলে ভর্তি হোক বা না হোক দলের প্রতি পাকার মতো এ বিশ্বাস সে রক্ষা করবে। পাকার নামোল্লেখ পাঁচুর কাছে চমকপ্রদ লাগে।

সে নিজে থেকেই জানায়, পাকার একটি চিঠি পেয়েছে দু'দিন আগে। ঢাকার বাবার কাছে আছে পাকা।. তাকে একবার বেড়াতে যেতে লিখেছে।

প্রতিমা সাগ্রহে বলে, যাও না? কালীনাথ বলে, গেলে একটা কাজও করতে পার। পাকার বাবার দুটো রিভলবার আছে, চুপি চুপি অন্তত একটা পাকা সরাতে পারে। পরামর্শ করে ঠিকঠাক করে আসতে পার, আনাবার ব্যবস্থা করব।

পাঁচু আশ্চর্যই হয়ে যায়। একেবারে মশগুল হয়ে আছে এরা, একমুহূর্তের জন্য অন্য কোন চিন্তা নেই। যোগসাধনা ছাড়া কি এ রকম একাগ্রতা হয়?

পাকা লিখেছে: বুড়ো ঝোঁকের মাথায় একটা বিয়ে করে পস্তাচ্ছেন, বাবার কথা বলছি। কিছু বলেন না কিন্তু বেশ টের পাই। নতুন বৌকে নিয়ে হঠাৎ সেকেন্দ্রাবাদে গিয়ে হাজির, আমি গটগট করে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, নতুন মামী কান ধরে আটকে দিল। বলল কি জানিস, বাপ কি তোর চাকর না তুই তোর বাপের চাকর? তুই চলিস তোর বাপের হুকুমে যে বাপ তোর মন জুগিয়ে চলবে? আমি ভেবে দেখলাম যে সত্যি, আমার কি এসে গেল? দু'দিন কথাটতা বলি নি মোটে, যতই হোক বিচ্ছিরি লাগে না মানুষের? পরদিন সে কি কাণ্ড, সকালে বেড়াতে বেড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে খেয়াল থাকে নি, বাড়ি ফিরতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। ফিরে দেখি বাবার নতুন বৌ হাউমাউ করে কাঁদছে, পাগলীর মত চেহারা, বাবা টেবিলে মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছেন চুপচাপ। নতুন মামী সেদিন যা আমায় একচোট নিলে, যেন ঠিক পাগল হয়ে গেছে, বন্দুক এনে আমায় বললে গুলি করে মারবে। বাবার পায়ে ধরিয়ে আমায় ক্ষমা চাওচাল তবে ছাড়ল। আমার কি দোষ বল দিকি? এসব পাগল মানুষকে বোঝার সাধ্য কারো নেই। পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইছি, বাবা পর্যন্ত কেঁদে ফেললেন। বাবা চিরকাল এমন গম্ভীর মানুষ, আবোল-তাবোল কি যে সব বলতে লাগলেন ছেলেমানুষের মতো। আমার অবস্থাটা বুঝে স্তাখ। নতুন মামী ধবে বেঁধে এখানে এনেছে, একমাস থাকতেই হবে, মরি বাঁচি। আমি যেন কচি খোকা মাঝে মাঝে এমনি আদর যত্ন করতে চায়, নইলে বাবার নতুন বৌ লোক বেশ ভাল—

একবার যাওয়ার জন্য তাগিদটা করুণ, কাঁদে পড়ে পাকা যে কত বিপন্ন

৫

সেটা খুবই স্পষ্ট। চিঠির সঙ্গে গাঁথা দশ টাকার নোট দুটি পাঁচু তাই প্রসন্ন মনে সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। পাকা এমন ব্যাকুলভাবে যাবার জন্য আবেদন জানায়, এমনভাবে চিঠি লেখে, তাকে!

ধনদাস বলে, না গিয়ে বরং চিঠি লেখ একটা জবাব এলে যাস।

ধনদাস বলে, না, তুই যা পাঁচু, আজকালের মস্তি যা। কেনে না, ব্যাপার সুবিধে নয়। বড়ঘরের বন্ধু যেতে এমন পত্তর লেখে কখন্? যখন তার মনের বিষম দায়। না তো জগতে তার কত বন্ধু, কত আপনজন, সবার বদলি খেয়াল হল তোকে? নীচু হবাব কথা না, না গেলে নীচ হবি তুই, বিশ্বাসঘাতক হবি!

সুভদ্রার উৎসাহ দেখে মনে হয়, পাঁচু এই দণ্ডে ঢাকা রওনা হলে সে হরিলুট দেয়। পাঁচু তার দারোগা মারার পণ করেছে, এই বুঝি মারতে গেল, তার চেয়ে ঘুরে আসুক ঢাকা থেকে, ঠাণ্ডা হয়ে আসুক।

সদরে কলকাতার ট্রেন রাত দশটায় ছাড়ে, ভোরে পাঁচু রওনা দেয়। বাড়ির মানুষ, বিশেষ করে সুভদ্রা, টুকিটাকি অনেক জিনিস সঙ্গে দিতে চেয়েছিল, পাঁচু সব বাদ দিয়েছে। বিশেষ একটি বিলাসের কাঁথা সেলাই করছিল সারদা, তিন চার বছরের ছেঁড়া শাড়ির পাড় জমিয়ে, তাতে তার সম্বল একটি বাড়তি সার্ট, পুরনো একটি সুতির কোট আর দু'খানা ধুতি, কিছু চিড়ে আর এক টুক্‌রো পাটালি বেঁধে ছোটখাট পোঁটলাটি বগলে করে সে রওনা দেয়। রাধানগরের হাটের কাছে সাত-টায় সদরের বাস মেলে।

কানাই-এর বাড়িতে দিনটা কাটিয়ে রাত দশটায় ট্রেন ধরবে, এই উদ্দেশ্য। কানাই এবারও খুশি হল। পালিয়ে যাবার সাধ সে দমন করেছে, কালীনাথের বারণ। দু'দিন আগে হঠাৎ ঘরবন্দীব হুকুম তুলে নেওয়া হয়েছে, সকাল-বিকেল থানায় শুধু হাজিরা দিতে হবে। কাজটা নাকি পাকার। নতুন মামীর যোগাযোগে সে অনন্তের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে, তার বন্ধুর ওপর মিছে-মিছি জুলুম হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে খবর নিয়ে অনন্ত কোথায় কি কল টিপেছে সেই জানে, শিথিল হয়ে গেছে বিনা বিচারে মানুষের জন্মগত অধিকার খর্ব করার নির্লজ্জ বাঁধন।

দেখলি তো? পাঁচু খুশি হয়ে বলে; পাকার সত্যি টান আছে।

কানাই কিন্তু খুশি নয়, তাকে স্বাধীনভাবে শহরে চলাফেরা করতে দেখে সাইকেলের দোকানে খদ্দের আসতে আরম্ভ করেছে তবু কানাই এতটুকু কৃতজ্ঞ নয়। বলে, সব ব্যাপারে ন্যাকামি, সেন্‌টিমেণ্টাল ভূত। কে বাবা তোকে মাথা ঘামাতে বলেছে আমার জন্যে?

পাকা আর জাতে উঠল না কানাই-এর কাছে। মুখ বুঁজে থাকার জন্যে মার খেয়ে হাড় গুঁড়ো হয়ে গিয়েও নয়, ওটা যেন কানাই-এর কাছে সাধারণ স্বাভাবিক

কাজ। মুখ খুললে অমানুষ পশু হয়ে যেত পাকা, সে তা হয় নি, শুধু এইটুকু! পাঁচুর কাছে পাকার বিচার অন্য মাপকাঠিতে, কানাই-এর কঠোরতা তাই তাকে আহত করে না, মুস্কিলেও ফেলে না। দুরন্ত অবাধ্য বেপরোয়া পাকার কাছে কঠিন সংযম চাইতে পারে কানাই, পাঁচু চায় না। ভাবপ্রবণ? হৃদয় থাকলেই মানুষ ভাবপ্রবণ হয়। তাকে ন্যাকামি বলে না। পাকার সম্পর্কে কাশীনাথ-কানাইদের বিচার পাঁচু সোজাসুজি অগ্রাহ্য করে, পাকাকে এরা জানে না বোঝে না, বিচার করবে কি। তবে পাকার মত স্বাধীন একগুঁয়ে ছেলে নিয়ে এদের যে কাজ চালানো মুস্কিল, এটা পাঁচু মানে। তাই পাকার দিকে টানলেও তার পক্ষ নিয়ে ঝগড়াও সে করে না।

পাশের বাড়ির সেই ঘেঁটু এসেছিল। পাঁচুর সে একেবারে অজানা নয়, আগেও কয়েকবার সে তাকে এ বাড়িতে আসতে-যেতে দেখেছে। কানাই-এর মা আর দিদির সঙ্গে খানিক আড্ডা দিয়ে ঘেঁটু একখানা বই চাইতে আসে।

একটা বই দেবে কানাইদা?

বই নেই।

ঘেঁটুকে দেখেই কানাই-এর মুখভঙ্গি ক্রুদ্ধ কঠোর হয়েছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে প্রায় ধমকের মত জবাব দেয়। পাঁচু অবাক হয়ে ভাবে, ব্যাপার কি!

বই নেই তো নেই, কদিন ধরে এমন করছ কেন? কথা কইলে খেঁকে ওঠ!

কথা না কইলেই হয়। যে মেয়ে বিশ্বাস রাখে না তার সঙ্গে কথা কওয়া পাপ। প্যাকেট খুলেছিলি জানি না ভাবছিস আমি? আমি সব জানি।

পাঁচুর দিকে চেয়ে ঘেঁটু সভয়ে বলে, আঃ, কানাইদা! মুখ তার সাদাটে হয়ে গেছে।

ন্যাকামি করিস নে ঘেঁটু। যা, পুলিশকে বলবি যা, অনেক টাকা দেবে।

বলেছি পুলিশকে আমি?

বিশ্বাস কি? সামান্য বিশ্বাস যে রাখে না, সে সব পারে!

ছেলেমানুষ মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে। রাগে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে পাঁচু। কানাই হঠাৎ তার চোখে ছোট হয়ে যায়, বুদ্ধিহীন বর্বর হয়ে যায়। ঘেঁটু চলে যাবার পরে সে খানিকক্ষণ বিচলিতভাবে ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলে। ভাল করে সব কথা না জেনে না বুঝেও তার ধারণা জন্মে গেছে কানাই কাণ্ডজ্ঞানহীন, তার মাথা বিগড়ে গেছে অনেকখানি। সেদিন বিপ্লবী দলের বিশ্বাস, তেজ, একাগ্রতা আর আত্মবিশ্বাসের জন্য ক্লাসফ্রেণ্ড কানাইকে মনের মধ্যে মহাপুরুষের আসনে বসিয়েছিল। দু'চার মিনিটে ঘেঁটু আসনটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভাল কি মন্দ জানে না পাঁচু, কানাই-এর মন স্বাভাবিক নেই। পাঁচু যে জগতকে আর জীবনকে জানে, তার গাঁয়ের মানুষ, শহরের মানুষ, দেশের মানুষ—সবাইকার মোটমাট মনটা যেমন, কানাই-এর মন তেমন নয়। একটা উগ্র সুরে বাঁধা হয়েছে

কানাই-এর মন, সে শুধু তার নিজের মনের মত করতে চায় সবাইকে, সে নিজের মস্ত বড় চাওয়ায় নিজেই একা সার্থক হতে চায়।

ওসব বোলচাল না দিয়ে, পাঁচু তীব্র চাপা গলায় বলে, খুলে সব বললেই হত ঘেঁটুকে। নাই বা করতি নাটক। তুই ভাবিস কানাই, তুই একাই শুধু দেশকে ভালবাসিস, আর কেউ ভালবাসে না।

বুঝিসনে কিছু, চুপ করে থাক।—কানাই গম্ভীর কিন্তু অমায়িক মাষ্টার মশায়ের মত বলে, মিছেমিছি রাগ দেখালাম। কাল ফের আসবে, খানিকটা বুঝিয়ে দেব। অ্যাদ্দিন না বুঝে কাজ করছিল, এবার বুঝে করবে।

গোড়া থেকে বুঝিয়ে করালেই হত।

তাই কি সবাই বোঝে ?

পাঁচু আরও রেগে বলে, কেউ কিছু বোঝে না, তুই সব বুঝিস ? বোঝাটা তোর একচেটিয়া, না ? কেউ যদি কিছু না বোঝে তোর কাজ নেই কিছু বুঝে, নিজের চরখায় তেল দে। আমরা সবাই ঘাস কাটব, একা তুই দেশোদ্ধার করবি !

রাগে পাচুর মেটে তেলা রং বাদামী হয়ে গেছে, ঠোঁট কাঁপছে দেখে কানাই যেন আমোদ পায়, তোরও একটু ন্যাকামি আছে, কি বুঝবি। জগতে কত মজা আছে খবর রাখিস ? বড়সরো মেয়ে দেখেই চোখ কপালে উঠেছে। ওর কি রকম টাকার খাঁকতি ছিল জানিস ? এইটুকু বয়েস থেকে ওর মা এবাড়ি ওবাড়ি চার আনা আট আনা ধার চাইতে পাঠাত। এমন স্বভাব বিগড়েছিল, সুযোগ পেলেই চুরি করত। আমায় একটু ইয়ে করে, চুরির স্বভাবটা শুধরেছি, টাকার লোভে যায় নি। নইলে ওরকম গাঁজাখুরি গল্প বানিয়ে টাকা দিয়ে ওর হাতে মাল সরাই ?

পাঁচু জল হয়ে যায়, লজ্জা পায়। বলে, ও বাবা, এমন মেয়ে !

ওই তো, কানাই বলে, ফের উল্টো বুঝলি। এমনি মেয়ে খারাপ নয়, বাড়ির দোষে একটা দোষ পেয়েছে। তাও শুধরে আসছে আস্তে আস্তে।

সারা পথ মনটা তরফাতে থাকে পাঁচুর, রেলে ঘুমিয়ে কাটে স্টিমারে দিনের বেলা নিজের ওপর বিরাগ নিয়ে কাটে। স্কুলে যেমন এখনো তেমন বার বার তার কাছে স্পষ্ট হয় পাকাদের কানাইদের সঙ্গে সে কাপে কাপে খাপ খায় না, সে অযোগ্য। স্টিমার যেমন বিশাল নদীতে ভেসে চলে, অজানা আশ্চর্য নদী, মন তার তেমনি ভেসে চলেছে চিন্তা সাগরে। সাগর কিনা কে জানে, হয় তো পুকুর হবে কিংবা ডোবা, মুখ্যু, চাষার মুখ্যু ছেলে সে। নিজের দীনতায় হীনতায় পাঁচু কাতর হয়ে থাকে। শুধু শ্যামল যেন সেই আঁটুলিগাঁর বনের ধারের মাটির ঘর থেকে মানুষ বোঝাই নদীর জাহাজে তাকে অনুসরণ করে। কাজ বল পড়াশোনা বল, শ্যামলকে তো কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, কালীনাথ

বা কানাই। রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই শ্যামল তাকে বুঝতে শিখিয়েছে, কি আগ্রহে শিখিয়েছে! কেন সে তবে কিছুই বুঝবে না?

আসলে এটা তার পাকার কাছে শেখা, আত্মগত এই প্রক্রিয়াটা, মনগড়া আত্মচিন্তার এই ব্যাকুলতা যে তার ওদের কাছ থেকে ধার করা যাদের কাছে সে তুচ্ছ বলে ভাবছে নিজেকে, তাও পাঁচু জানে না। পাকার এরকম সর্বদাই ঘটছে। পাঁচুর মাঝে মাঝে হয়। কানাই উগ্র বিদ্রোহে কেটে বেরিয়ে গেছে, সে বলে, আমার বয়ে গেল! বলে, যা করব ঠিক করেছি, যা সুরু করেছি, তাই করে যাব—চুলোয় যাক দ্বিধা সংকোচ ভাবনা চিন্তায় দোদুল দোলা!

স্কুল-জীবনের নিত্যকার সমীকরণের মধ্যেও তিন বন্ধু এইরকমই ছিল, তাদের বন্ধুত্বের জমাট করা মোট রূপটা ছিল এই দিয়েই গড়া। স্কুলের বাঁধন আর প্রতিদিনের মেলামেশা শেষ করে নিজের নিজের কেন্দ্রে কিছুটা তফাৎ হওয়া মাত্র তারা পরস্পরের পরিচয় প্রতিফলিত করছে। তাদের যোগসূত্র অবশ্য দেশজোড়া সন্ত্রাসী আন্দোলন, তাদের ঘনিষ্ঠতাও ওই অসহ্য ক্ষোভের চরম প্রকাশেরই আরেকটা রূপ। তা না হলে, কে পাকা, কে কানাই, কে পাঁচু, কিসেই বা তাদের বেঁধে রাখত, কোথায় ছিটকে চলে যেত তারা জীবনের বিভিন্ন গতির টানে। তিনু যেমন গেছে, ধনেশ মুদীর ছেলে তিনু। সেও আছে এই শহরেই, অত তার বন্ধুপ্রেম, তিন বন্ধুকে দোকানের লজেন্স বিস্কুট তামাক খাওয়াতে অত তার ব্যাকুলতা, কিছুই তো তাকে ধরে রাখতে পারল না বন্ধুচক্রে। তিনজনেই ভালবাসত তিনুকে। অথচ পাকাকে এত অপছন্দ করলেও, পাকাকে বর্জন করলেও, পাকার সঙ্গে নিবিড় যোগ কানাই-এর রয়েই গেছে: তিনজনের কারো আজ মনে পড়ে না এই সেদিনও তাদের যে আরেকজন প্রাণের বন্ধু ছিল, সেই তিনু গেল কোথায়?

সাধারণ বন্ধুত্ব সুযোগ সুবিধার ব্যাপার। বিপ্লব বন্ধুত্ব গড়ে অন্তরকম। নতুবা জগতে বিপ্লবী হত কে?

পাকার সৎমার নাম সরমা। সতর বছর বয়স, গরীবের মেয়ে। এখানকারই গরীব স্কুলের গরীব মাষ্টার সারদাচরণ তার বাপ। সৌন্দর্য চলনসই, স্বাস্থ্যটা সুন্দর। স্কুল মাষ্টার বাপ, তার ভাতে এমন শরীর এদেশে গড়ে ওঠে না। বাড়তি খাদ্য সংগ্রহের একটা আশ্চর্য প্রতিভা ছিল সরমার, পেয়ারা পাঁপর ছোলা চানাচুর বাদামভাজা তো বটেই, স্বভাবগুণে কয়েকটা বাড়িকে বশ করে মেয়ের মত হয়ে ভাল খাদ্যও সে পেত। পাড়ার পাতানো মাসী পিসী খুড়ী জেঠি দিদি বৌদিরা

তাকে দেখেই খুশি হত, শান্ত নরম স্বভাব, হাসিমুখে কথা বলে, দুঃখে কষ্টে দরদ দেখায়, সুখে সৌভাগ্যে আনন্দ পায়,—সবচেয়ে বড় কথা বাড়িতে এসে যেটুকু সময় সে থাকে বাড়ির মেয়ের মত না. বলতে সংসারের ঝন্‌ঝাট লাঘবে হাত লাগায়। ছেলেটা ধরা থেকে ভাতের হাঁড়িটা নামানো, ঘরটা ঝাঁট দেওয়া থেকে চট্ করে দুটো বাসন মেজে ফেলা, কোন কাজ করতেই তার অহংকার নেই তাই শুধু নয়, নিজে বুঝে নিজে এগিয়ে নিজে থেকে করে দেয়। মাছ মাংস দই মিষ্টির ভাগ তাকে না দিয়ে খেতে কয়েকটা পরিবারের রীতিমত মন খুঁত খুঁত করত। বিশেষ কিছু রান্না হলে সে হাজির না থাকলেও ছোট ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনা হত, ও সরমা, আমি ডাল রেঁধেছি, ছাখতো খেয়ে হয়েছে কেমন ?

বাড়ির কাজে ফাঁকি পড়ত, বাড়ির মানুষ খাপ্পা হত, কিন্তু কোন শাসন মানত না সরমা। তার দারুণ খিদে, পেট ভরে না, বড় বড় কথা বললে চলবে কেন ! যতটুকু খেতে দেবে ততটুকু খেটে দেব, ঘর পর নেই !

না জেনে না বুঝে ভদ্র সমাজের সব নিয়ম রীতি স্নেহ প্রীতির বাঁধন বজায় রেখে তারই মধ্যে এই নীতি গড়ে তুলে মানিয়ে চলা একটি মেয়ের পক্ষে সহজ প্রতিভার কথা নয়।

অরবিন্দের বয়স নিয়ে দারুণ ক্ষোভ হয়েছিল অবশ্যই। শত গরীবের মেয়ে হোক বুড়োর কাছে বলি দেওয়াটা সব মেয়েই বোঝে, হোক সে বড় সরকারী চাকুরে, মস্ত পয়সাওলা লোক। এ বাড়ীতে মাছ দুধ খাবার দাবারের অঢেল ব্যবস্থায় সরমা গোড়ার দিকে মরমে মরে গিয়েছিল। চিরদিন তার খিদে বেশি, তাই যেন সে প্রচুর খাদ্য পেল বরের বদলে ! কিছুদিন কোন জিনিস তার মুখে রোচে নি, খেতে বসে ঠেলে ঠেলে দিয়েছে সব। তাতে একদিকে ভালই হয়েছে। নতুন বৌয়ের পক্ষে মানানসই ব্যবহার হয়েছে। খিদে ক'দিন বিগড়ে না গেলে প্রথম থেকে সে যদি খিদে মিটিয়ে খেত, অন্যে তো হাসাহাসি করতই, অরবিন্দেরও লজ্জা হত। খিদে চাঙা হয়ে উঠেছে সরমার যথাসময়ে, কিন্তু সে তখন বাড়ির গিন্নী, কি সে খায় কত খায় ক'বার খায় কে তা দেখতে যাচ্ছে ঝি চাকর ছাড়া, বিশেষত যে বাড়িতে খাদ্যের ছড়াছড়ি, এমনিই কত নষ্ট হয়, ফেলনা যায়।

অনায়াসে সুখী হত সরমা, পাকা যদি না ছেলে হিসাবে পাগল হত সবদিক-দিয়ে আর অরবিন্দ যদি না পাগল হত ছেলের সম্পর্কে। এতবড় ছেলে থাকার অসুবিধা সরমা সামলে নিত যে ভাবেই হোক, ও বিদ্যা বাঙালী মেয়ের জানাই থাকে, কিন্তু কেউ তাকে সে সুযোগ দিলে তো ! ছেলেকে সরমা চোখে দেখার আগেই পাকা পাকা করে, কি হবে কি হবে করে, বিয়ে করার জন্য হাহুতাশ পর্যন্ত করে, অরবিন্দই সরমাকে ভয়ে দুশ্চিন্তায় পাগল করতে বসেছিল। তারপর আচমকা তাকে নিয়ে সেকেন্দ্রাবাদ ছোটা, সারাপথ কত উপদেশ কত সাবধান করা, সেকেন্দ্রা-

বাদে ওইসব খাপছাড়া কাণ্ড। এখানে অরবিন্দ একঘরে শোয় না, সহজে কাছে আসেনা কথা বলে না, প্রায় তাকে বর্জন করেছে! পাকার সঙ্গে আপোস না হলে, পাকা অনুমোদন না করলে, সে যেন গায়ের জোরেই বাতিল করে রাখবে বিয়ে করাটা যতদুর তার সাধ্য, বিয়ে করা জলজ্যান্ত বৌটা বাড়িতে বর্তমান থাকলেও!

সরমা অগত্যা পাকার দয়া মায়া বিবেচনাই জীবনের আশাভরসা করে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। অমার্জনীয় অপরাধ করেছি, মারো কাটো যা খুশি তোমার কর!

নতুন মামী সামলে সামলে শুধরে শুধরে চলে, সে একরকম সত্যিই কান ধরে পাকাকে ঢাকায় এনেছে, তার আপোসহীন বিরোধকে সংযত করেছে, অনেকখানি ভেঙেও ফেলেছে।

যতই হোক, মা তো? নতুন মামী বলত।

মা? ওতো বাবার ইয়ে!

আজ আর পাকা এ ধরনের কথা বলে না। তবে মা বলেও ডাকে না সরমাকে। সুধাময়ী ছিল বলে আর অতি সম্প্রতি সে হাড়গোড় ভাঙা মরমর ছেলেটাকে ছা'র মত বুকে রেখে সারিয়ে তুলে একেবারে বশ করে ফেলেছিল বলে, নয় তো এ জীবনে হয়তো অরবিন্দ আর নাগাল পেত না ছেলের। সুধাময়ীর প্রভাব দেখে ঈর্ষায় সরমার বুক জ্বলে যায়, জীবনে সে এই প্রথম জেনেছে চাপা হিংসার জ্বালা কাকে বলে, সে হিংসা আগুনের মত পুড়িয়ে দিয়ে চলে। সম্পর্কে ছেলে, সে অন্যের বশ, এ জন্য তার হিংসা নয়। হঠাৎ পাওয়া এতবড় ধেড়ে ছেলের জন্যে অত তার মাথাব্যথা নেই। তার জ্বালা এই জন্য যে স্বামী বল সংসার বল মানসম্মান সুখশান্তি বল সব ওই ছেলেটার মর্জি দাঁড়িয়েছে বলে।

পাঁচুকে সে আদর যত্ন করে, পাকার সে বন্ধু। শুধু সেইটুকুতেই একটা অঘটন ঘটে যায়। তার বন্ধুকে খাতির করায় পাকা এবার দয়া করে মোটামুটি ক্ষমা করে বসে নতুন মাকে, এতদিনের চেষ্টায় নতুন মামীও যা ঘটাতে পারে নি!

সুধাময়ী সরমাকে দিয়ে পাকার সেবা করিয়ে এসেছে, পাকা চেয়েও দেখে নি। চা খাবার সামনে দিয়ে গেছে, পাকা মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে থেকেছে অন্য দিকে। চা খাবারটা খেয়ে শুধু ধন্য করেছে সরমাকে নতুন মামীর খাতিরে। পাঁচুর ওসব বাধা নেই, প্রথম দিন প্রথমবারেই সে সরমার সঙ্গে সম্মান করে কথা বলেছে, অত খেতে পারব না, কমিয়ে দিন। ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করে সরমা আলাপ গড়ে তুলেছে, জেনে নিয়েছে তার গাঁয়ের খবর, ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজনের বিবরণ। দারিদ্র্য সরমা ভাল করে চেনে, সাধারণ অবস্থায় অরবিন্দের ঘরে এলে দারিদ্র্যকে সে আরো বেশি ঘৃণাই করত, কিন্তু অরবিন্দের প্রশ্রয়ের অভাবে আর পাকার লাঞ্ছনায় অবস্থা তার শোচনীয়। পাঁচুর সেবা যত্নে, তার সঙ্গে ভাব করায়, তার তাই বাধো বাধো

ভাব আসে না, বরং পাকার বন্ধু এবং চাষার ঘরের হলেও ছেলেটি যে ভাল এটা জানা মাত্র তার উৎসাহ যায় বেড়ে।

দুদিন এটা দেখে পাকা একেবারে বদলে যায়। যেচে সে প্রথম কথা বলে সরমার সঙ্গে, সন্ধিঘোষণা করে বলে, নতুন মা, তুমি পিঠে বানাতে পার ?

পারি। কি পিঠে ? গলা কেঁপে যায় সরমার !

পাঁচু পিঠে ভালবাসে। নতুন মা বলে ডেকে সরমাকে পাকা পাঁচুর জন্ত পিঠে করতে বলে, এও নাকি সংসারে অঘটন হয়ে ওঠে বিশেষ অবস্থায় ! পাঁচু সেটা টের পাচ্ছিল। বাড়িতে পারিবারিক জীবনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পাকাকে সে আগে কখনো দেখে নি। কানাই-এর কথা মনে পড়ে। পাকার সত্যি পাগলামি আছে। খাপছাড়া পাগলামি।

সরমা আগে অরবিন্দকে জানায়, পাকা আমায় মা বলে ডেকেছে, হাসিমুখে কথা কয়েছে।

রাজা করেছে। বাড়ি থেকে ওকে দূর করে দেওয়া উচিত ছিল।

হঠাৎ অরবিন্দকেও সেদিন প্রফুল্ল প্রাণবন্ত দেখায়, অনেকদিন পরে অন্দরে তার এদিক ওদিক চলাচল ঘটে, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। বৌ আর ছেলে দু'জনকেই তার চাই, তাই এত অনায়াসে তার এমন বেহায়াপনা, দু'জনের একটু মিল হয়েছে শুনেই ঘোষণা করে যে সে খুশি হয়েছে !

সুধার পছন্দ হয় নি পাঁচুকে। তাকে না জানিয়ে পাকা বন্ধুকে আসতে লিখেছে এতেই প্রাণে আঘাত লেগেছে সুধার। কত ছোট ব্যাপারে কত বড সত্যের ইঙ্গিত পায় একাগ্র উচ্চকিত প্রাণ ! এখনো শরীর ভাল সারে নি পাকার, সুধার মতে মোটেই সারে নি, এরই মধ্যে একান্তভাবে সুধার হয়ে বেঁচে থাকতে তার হাঁপ ধরেছে, সে অন্ত সঙ্গী চায়, বাইরের বেপরোয়াউচ্ছৃংখল জীবন চায় ! এত তাড়াতাড়ি ? চপল দুরন্ত পাগল ছেলে, কারো আঁচল ধরে সে থাকবে না, সে যেই হোক, সুধা তা জানে। একা সে পাকাকে বেঁধে রাখতে চাইবে কেন ? কিন্তু এতো নিয়ম নয়, এখনো তো সময় হয় নি ! সেকি হাসপাতালের নার্স যে এত সস্তায় পাকা তার পাওনা মিটিয়ে দেবে ? রাত নটা বাজতে না বাজতে সুধা পাঁচুকে বলে, ওকে আর রাত জাগিয়ো না। ওর শরীর ভাল নয়। বেশ কড়া সুরেই বলে।

পাকা বলে, আমার ঘুম পায় নি।

শুলেই ঘুম পাবে।

পাকাকে শুইয়ে দিয়ে একদৃষ্টে সুধা তার মুখখানা দেখে। চোয়াল ভেঙে বাঁকা হয়ে গিয়েছিল পাকার মুখ, ডাক্তার যতখানি পারে সোজা করে দিয়েছে। কোমল হাতে ম্যাসেজ করে করে বাকিটুকু যদি সুধা ঠিক করতে পারে নইলে

কোন উপায় নেই। দিনে চারবার সুধা আধঘণ্টা ম্যাসেজ করে। প্রতি রাত্রে পাকাকে শুইয়ে এমনি আগ্রহে চেয়ে দেখে কতটা উপকার হল।

পাকার দু'গাল হাতের তালুতে আস্তে চেপে ধরে সুধা বলে, সামান্য একটু এদিক ওদিক হলে কি হয়? আগের চেয়ে বরং সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার মুখ।

বিশ্রী দেখালে বয়ে গেল।

তোমার তো বয়েই যাবে। নিজের মুখ নিজে তো দেখতে পাও না। একটা চিঠি এসেছে তোকে দেখাই।

অনন্তের চিঠি। সে কড়া ভাষায় সুধাকে যেতে লিখেছে, জানতে চেয়েছে সারা জীবনটা সে কি এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরেই কাটাবে? বোঝা যায় কাজের ফাঁকে তাড়াতাড়িতে লেখা চিঠি, তবু রসালো করে কিছু ভালবাসার কথা লেখার চেষ্টা অনন্ত করেছে, একটা মন্ত্রিত্বের জন্য তার প্রাণপাত চেষ্টার মধ্যে! বিনা দ্বিধায় নির্বিচারে সুধা চিঠিটা আগাগোড়া পাকাকে পড়ায়, অনন্তের প্রেমপত্র যেন তার দাম বাড়াবে।

যাবে নাকি?

যাব না? কতকাল হয়ে গেল আজ কলকাতা ছেড়েছি!

পাকার কাছে আরো দাম বাড়াতে চায় সুধা। বাড়াতে বাড়াতে কোথায় গিয়ে ঠেকাবে তা সে জানে না, কিন্তু অন্য উপায়ও তার নেই। শুধু দাম বাড়ানো, নিজেকে মূল্যবান করা। সুদে আসলে সব উসুল করে নেবার সাধ্য তার আছে, কিন্তু সাধে বোধ হয় কুলিয়ে উঠবে না আর কোনদিন। আজকাল কতবার কত বিহ্বলতা আসে পাকার, কতবার হাত ধরে শাড়ি ধরে টানে, আচমকা গলা জড়িয়ে ধরে। সেটা সুধাকেই পরিণত করতে হয় ছোটছেলের মায়ের হাত ধরে টানায়, মায়ের গলা জড়ানোয়। কি রকম থমথমে মুখে স্নেহার্ত গাঢ় চোখে শান্তভাবে চেয়ে ধীরে ধীরে পাকার কপালে হাত বুলিয়ে দিলে, মাথা তোকিয়ে দিলে, ছোট একটি চুমু খেলে পাকা শিশুর মতই ঝিমিয়ে যায় তার চেয়ে কে ভাল করে জানে?

মাঝে মাঝে তাই অসহ্য জ্বালায় অদম্য আক্রোশে সুধা জ্বলে পুড়ে ফেটে যেতে চায়। কেন শান্ত হয় পাকা? সবদিকে দুরন্ত অবাধ্য ও উচ্ছৃংখল, কোন শাসন কোন বাঁধন মানে না, বয়সের সীমা পার হয়ে অভিজ্ঞতার দূর দুরান্তর রহস্য আবিষ্কার করতে ছটফট করে, একদিনও কি সে অবাধ্য হতে পারে না তার স্নেহের, অমান্য করতে পারে না তাকে?

আমি তবে কাল পরশু চলে যাই?

ইস্!

তেমনি পরিচিত বিহ্বল দৃষ্টি, কামনার অতল স্বপ্ন। সুধার স্পষ্ট মনে হয়, এসময় পাকা যেন একেবারে ভুলে যায় সে কে এবং সুধাই বা কে। দু'হাত

ধরে এত জোরে তাকে টানার মত স্পষ্ট বাস্তব চাওয়াও তার তাই এত অনুগ্র, তার ব্যকুলতা এত নিস্তেজ। এর মানে সুধা জানে না, বোঝে না। তার বুক ফেটে কান্না আসে।

ইস্ যেতে দিলে তো?

কে যাচ্ছে? তোকে ছেড়ে যেতে পারি পাগল? সুধা নত হয়ে তার কপালে গাল রাখে, মাথা তুলে বলে, ঘুমোবি না? কপালে চুমু খেয়ে বলে, এবার ঘুমো?

মশারি ফেলে আলো নিভিয়ে সুধা চলে যায়, পনের মিনিট পরে এসে দেখে পাকা ঘুমিয়েছে। পাঁচুর সঙ্গে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে এই শরীরে, ঘুম তো আসবেই।

সে এখন করে কি, তার তো ঘুম আসবে না অর্ধেক রাত, হয় তো সমস্ত রাত! কাল সে করবে কি, পরশু, তার পরের দিন। আলো জেলে মশারি তুলে পাকার সর্বাঙ্গে চোখ বুলায় সুধা, কপাল থেকে এলোমেলো চুল সরিয়ে দেয়, সন্তর্পণে স্পর্শ করে দেখে বাঁ চোয়ালের যেখানটা আজও একটু ফুলে আছে। উঠছে পড়ছে ঘুমন্ত পাকার বুক। কি হবে তবে, কি করা যাবে? সে বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে, সুধা ভাবে। কিন্তু পাগল যদি হয়েই থাকে, ভুলতে কেন পারে না যে এই তার পাকা, তার এই পাকার সারা জীবনটা সামনে পড়ে আছে। কেন শুধু মনে থাকে যে বিপ্লব করতে গিয়েছিল বলে, পুলিশ থেঁতলে দিয়েছিল বলে পাকাকে বুকের মধ্যে পাওয়া গেছে, নইলে ওকে ধরার সাধ তার স্বপ্ন থেকে যেত। সংসারে কত রকম মেয়েপুরুষের কতরকম ভালবাসা হয়, কে না জানে বয়সের হিসাব সম্পর্কের হিসাব কত শতবার সংসারে ভেসে গেছে, কত শতবার ভেসে যাবে। তারও ভেসে গেছে ওসব তুচ্ছ হিসাব, কি গ্লানি কত অনুতাপ কোন যাতনায় সারাজীবন দগ্ধে দগ্ধে মরবে সে জানতেও চায় না! কত নরকের কীট জন্মেছে সংসারে, সেও নয় আরেকজন হল। সব সে মেনে নিতে রাজী, শত শতবার রাজী। জগৎ সংসার চুলোয় থাক। পাকার বাকী জীবনের হিসাব কেন তবে তাকে এমন ব্যাকুল করে, তার হৃদস্পন্দন থামিয়ে দিতে চায়? এতো নিয়ম নয়, সঙ্গত নয়! তার মত যারা সংসারের অভিশাপ হতে চেয়েই পাগল হয়েছে, কেউ তারা এই বিপরীত হিসাব কষে নি। তার এ কি হল?

এই সেদিনও, পাকা মরণাপন্ন হবার আগে, বুঝি সম্ভব ছিল ভাবা যে কিছু হবে না পাকার, একদিন ভুলে যাবে সব, মনের তলায় চাপা পড়ে যাবে জীবনের একটা পুরনো অধ্যায়, মাঝে মাঝে শুধু নতুনমামীকে মনে পড়ে হয় তো একটু ব্যাকুল, একটু আনমনা হয়ে যাবে।

আজ ওই ভুলে যাওয়া অত সহজ নেই, যাওয়ার ভয়ংকর মানে তার আতংক এনে দেয়। খেলা আর উন্মাদনা দুদিনের বেশি টানা যাবে না, তারা ফুরিয়ে যাবে, তাদের ছাড়াছাড়ি হবে, এসব সবাই জানে, সবাই বাতিল করে উড়িয়ে দেয়। আজ এই তাৎপর্যটাই বড় হয়েছে, ভোলা যায় না, তুচ্ছ করা যায় না। পাকাকে নিয়ে সে যদি দেশ ছেড়ে পৃথিবীর অপর প্রান্তেও পালিয়ে যায়, দুদিন পরে তারা ফুরিয়ে যাবেই। তা যাক। কিন্তু তার পাকার তখন হবে কি!

কি হল তার, কেন এমন ভাবে সব গুলিয়ে যায়, সে তো এমন ছিল না। ছেলেবেলা থেকে মানুষের মন ভুলানো শিখে এসে এসে ছেলেখেলা হয়ে গিয়েছিল জীবন, একটি কিশোর তার মন ভুলিয়েছে জেনে জীবনে প্রথম কি বিস্ময় কি রোমাঞ্চ জেগেছিল, কি পুলকের স্বাদ পেয়েছিল। তারপর থেকে শুধু জয় করেছে, বশ করেছে ওই কিশোরটিকে, জগৎ সংসার সব ভুলে থেকেছে। তার এত রূপ এত মায়া তবু পাকা সাড়া দেয় না বলে তার বেঁচে থাকার রুচি ছিল না, কষ্টে পাগল হতে বসেছিল। আজ সেই পাকা বিহ্বল ব্যাকুল চোখে তাকায়, হাত ধরে আঁচল ধরে টানে, গলা জড়িয়ে ধরে। আর সে তাকে আজ শিশুর মত স্নেহে ভুলিয়ে শান্ত করে ঘুম পাড়ায়।

চলে যাবে? কাল সকালেই বিদায় হবে চিরদিনের মত, আর যাতে পাকার সঙ্গে দেখা না হয়? কিন্তু পাকা যদি মুষড়ে যায়, ওই অভিমানী পাগল ছেলে? স্নেহ মমতা যত্নের অভাবে যদি মরে যায় অন্য এক কাণ্ড করে?

মশারির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সুবা নিঃশব্দে কাঁদে। আলোটাও নেভায় না। তার রূপ তার শাড়ি ঝলমল করে আলোয়। মোটরে সোফায় পালঙ্কে ঘরকন্নায় হাসি গান আনন্দে উজ্জ্বল যে ছিল আর যার জীবনটা মানুষের চোখ আর মনকে ঝলসে দিত।

পাঁচু পিস্তলের কথা বলে। পাকা সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী হয়।

দুটোই নিয়ে যাস্।

পাঁচু বুঝিয়ে বলে যে দুটো নিয়ে কাজ নেই, বিশেষভাবে একটার কথাই যখন বলা হয়েছে, নির্দেশটা মেনে চলাই ভাল। তার নিয়ে যাওয়াও ঠিক হবে না। দুদিনের জন্য বেড়াতে এসে সে চলে গেল আর এদিকে পিস্তল চুরি গেল—

সে আমি সামলে নেব। একমাসের মধ্যে বাবা টের পাবে না।

একটা পিস্তল তোলা থাকে, সেটা পাকা অনায়াসেই দিতে পারবে। সহজে কারও খেয়াল হবে না ওটা চুরি গেছে। নেহাৎ যদি ধরাই পড়ে, পাঁচুর ওপরে যাতে

সন্দেহ না হয় পাকা সে ব্যবস্থা করতে পারবে। এত ভাবছে কেন পাঁচু এই সামান্য ব্যাপারে? কালীদা'দের কত দরকার পিস্তলের, পাকা দিতে চায় তবু পাঁচু নিয়ে যাবে না? কিসের ভয় এত? দিন দশেক পাঁচু এখানে থাকে। এ বাড়ির অনভ্যস্ত জীবন তাকে পীড়ন করছিল। পাকাকে অবলম্বন করে বেশির ভাগ সময় কেটেছে তার, নইলে হু'দিনও সহ্য হত না, যদিও এক নতুন মামী ছাড়া বাড়ির লোকের ব্যবহার হয়েছে নিখুঁত। সুধাও তাকে অবজ্ঞা. অপমান করে নি, শুধু অভাব ঘটেছে তার সদয় ব্যবহারের। তাকে যেটুকু দেখেছে শুনেছে পাঁচু তাতেই তার মনে এক রহস্যময় ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। রাণীর মত এত জমকালো রূপ এমন মহারাণীর মত চলনবলন, পাকার মশারির পাশে একা দাঁড়িয়ে সে কাঁদে!

গল্প করে রাত জাগবে বলে অসুখের অজুহাতে সুধা তাদের হু'বন্ধুকে এক ঘরে শুতে দেয় নি। একটা কথা বলতে গিয়ে পাঁচু সুধাকে ঠায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক বিকৃত মুখভঙ্গি করে কাঁদতে দেখে ভড়কে গিয়ে পাকার ঘরের দরজার কাছ থেকে ফিরে এসেছিল।

পরে সে পাকাকে প্রশ্ন করেছে।

কাঁদছিল? সত্যি? আমি তো জানতে পারি নি! আর কিছু পাকা বলে নি।

হু'জনে ঘুরে বেড়িয়েছে শহরে মফস্বলে নদীতে নৌকায়, আগের মত উদ্দেশ্য-হীনভাবে পাক খেয়ে বেড়ানোর চূড়ান্ত করে কিন্তু নয়। পাকাকে এমন শান্ত, এত নিস্তেজ পাঁচু আর দেখে নি। যে অস্থিরতা আছে আগের তুলনায় তা কিছুই নয়। তবে শরীরটা তার সত্যই সারে নি, দুর্বলতা রয়ে গেছে। মনটাও সামলে উঠতে পারে নি টের পাওয়া যায়। এ যেন সবার সেরা প্রমাণ যে শুধু প্রাণটুকু রেখে কি অমানুষিক নির্যাতনটাই করা হয়েছিল, পাকার মত ছেলে এতদিন পরেও গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারছে না। পাঁচুর ক্রোধ আর বিদ্বেষ নাড়া খেয়ে গুমরে গুমরে ওঠে। এই কারণেও মনটা তার আরও ছটফট করে ফিরে যেতে। নলিনীর কিছু করা হয় নি, দিন এদিকে চলে যাচ্ছে একে একে।

পাঁচু ভাবে, তাদের শহরে ফিরে গেলে হয়তো তাড়াতাড়ি পাকা সেরে উঠত?

পাকা বলে, যেতে দেবে না।

শুনে পাঁচু স্তম্ভিত হয়ে যায়। যেতে দেওয়া হবে না বলে পাকা কোন জায়গায় যাবে না, করতে দেওয়া হবে না বলে পাকা কোন কাজ করবে না, পাকার মুখে এরকম বশ্যতা বাধ্যতার কথা সে এই প্রথম শুনল।

পাঁচু একটি পিস্তল নিয়ে যায়। সঙ্গে নেবার নির্দেশ তাকে দেওয়া হয় নি, পাকার উৎসাহে এটুকু নিয়ম সে ভঙ্গ করে। কিন্তু দুটি নিয়ে যেতে রাজী হয় না, পাকা ভীরু বলে গাল দেওয়া সত্ত্বেও।

বাক্সে তোলা পিস্তলটি নিয়ে পাঁচু চলে যাবার এক সপ্তাহের মধ্যে কালী-নাথের কাছ থেকে আরেকজন আসে পাকার কাছে। পাঁচুর কাছে শোনা গেছে পাকা দুটি পিস্তলই দিতে পারে বিশেষ হাঙ্গামা না করে। তা কি সম্ভব? বিনা দ্বিধায় পাকা অরবিন্দের ড্রয়ার খুলে দ্বিতীয় পিস্তলটি চুরি করে এনে দেয়।

কিছু টাকা এবং খানকয়েক গয়নাও দেয়।

পাকা সরমাকে বলে, নতুন মা, তুমি দেশকে ভালবাসো?

ওমা, দেশকে কে না ভালবাসে!

মুখে তো সবাই ভালবাসে। সত্যিকারের ভালবাসা আছে? ত্যাগ করতে পার দেশের জন্য?

কেন পারব না? বলো কী করতে হবে, করছি।

তোমার কয়েকটা গয়না দাও স্বদেশীদের জন্যে। পারবে দিতে? ওরা প্রাণ দিচ্ছে, তুমি কটা গয়না দিতে পারবে?

সরমার মুখ হাঁ হয়ে যায়, বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ পলক পড়ে না, কয়েকবার সে ঠোঁট চাটাচাটি করে। তারপর বলে, দিচ্ছি।

দু'একখানা গয়না নয়, ট্রাঙ্ক খুলে গয়নার বাক্সটা সরমা পাকাকে এনে দেয়। বলে, নাও, আমার যা ছিল সব দিলাম। তুমি আমার যেমন ভাব, আমি তেমন নই পাকা। আমিও মানুষ। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে সরমার!

পাকা অভিভূত হয়ে বলে, বাক্সো শুদ্ধু যে দিলে, বাবা টের পেলে কি হবে?

সে হবে'খন। গয়না কি কারো চুরি যায় না?

সরমা জলভরা চোখে মুচকে হাসে। পাকার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে যায়।

পরদিন সকালেই অরবিন্দ পিস্তলের অন্তর্ধান টের পায়। ড্রয়ারে ছিল সরকারী রিভলবার, ওটা অরবিন্দের সঙ্গেই থাকে, সেটাই নিয়ম। অন্য ড্রয়ারগুলি খুলে, আলমারি হাতবাক্স খাটের তোষকের তলাটা একবার খুঁজে দেখে খোলা ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়েই গম্ভীর কালো মুখে সে ভাবে। অনেকক্ষণ ভাবে। মাঝখানে শোবার ঘরে গিয়ে বাক্স খুলে দেখে আসে, অন্য পিস্তলটিও সেখানে নেই। ক্রোধে ক্ষোভে ভয় বিরাগে তার গা কাঁপে, দাঁড়াতে না পেরে চেয়ারে বসে সে ভাবে।

সফল সার্থক তার জীবন, কত বড় চাকরী করে, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব, আগের এক স্ত্রী, তার ছেলে, নতুন দ্বিতীয় স্ত্রী, কত কিছু নিয়ে তার জীবন। আজ একদিনে একমুহূর্তে তাসের ঘরের মত সব ভেঙে পড়েছে। পাকা তার ছেলে। একমাত্র ছেলে। ছেলে যার শত্রু হয় সে কেমন করে সামঞ্জস্য বিধান করে জীবনে?

চুপ করে বসে থাকে অরবিন্দ। সারাজীবন সে নিয়ম মেনেছে, আইন

মেনেছে। সরমাকে সে ঘরে এনেছে আত্মীয় বন্ধু সমাজ ধর্মের রীতিনীতি নিয়ম আইনের সমর্থনে। বিরোধ করেছে শুধু পাকা।

নেয়ে খেয়ে নেওয়ার তাগিদ এলে অরবিন্দ বলে, আপিস যাব না। শরীর খারাপ। ড্রাইভার গাড়ী বার করেছিল যথাসময়ে, গ্যারেজে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তক্‌মা আঁটা চাপরাসী এসে সেলাম করে ধমক খেয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় নেমে বলে, শালার মর্জি নাই আপিস যাবার, আগে বললেই হত!

নেয়ে খেয়ে শোয় অরবিন্দ। ছুটির দিনে স্বামীকে দুপুরের সেবা দিতে গিয়ে সরমা ঝাঁঝালো ধমক খায়। সমান ঝাঁঝে জবাব দিয়ে সরমা মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

বেলা চারটে নাগাদ অরবিন্দ পাকাকে ডেকে পাঠায়। গড়গড়ায় নল ধরে সে খাটে বসে ছিল, পাকা ঘরে এলে বলে, চেয়ারটা টেনে এনে বোসো।

পাকা নীরবে আজ্ঞা পালন করে। আজ সে ভাল ছেলে। অরবিন্দ বলে, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। জবাব দিতে না চাও দিও না, কিন্তু মিথ্যে কথা বোলো না।

আমি মিথ্যে বলি না বাবা।

মিথ্যে বলে না! তার মানে, যদি সে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি আমার পিস্তল চুরি করেছ? পাকা বলবে, হ্যাঁ চুরি করেছি!

তারপর কি হবে?

তারপর কি করবে অরবিন্দ?

গড়গড়ার নল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অরবিন্দ বলে, তুমি অপদার্থ হয়ে গেছ, অধঃপাতে গেছ একেবারে। দুদিন পরে তুমি কলেজে ভর্তি হবে, আজও ঠিক করলে না আমায় জানালে না, আর্টস পড়বে না সায়ান্স পড়বে।

কেন? সেদিন যে বললাম আমি সায়ান্স পড়ব?

বলেছিলে নাকি? মনে নেই।

পরদিন অরবিন্দ মফস্বলে যায়। কয়েকদিন পরে ফিরে এসে সে রিপোর্ট দাখিল করে যে সোনার্গাঁর কাছে ডিঙি-নৌকায় নদী পার হবার সময় ডিঙি উল্টে সে নদীতে পড়ে যায়, অতি কষ্টে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু সরকারী রিভলভারটি নদীতে খোয়া গিয়েছে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে। সরকারের সে বিশ্বস্ত কর্মচারী, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে তাকে জানাতে হচ্ছে যে চলাচলের এমন অব্যবস্থার মধ্যে তাকে কাজ করতে হয় যে শুধু স্বাস্থ্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে না, প্রাণ নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি পড়ে।

অরবিন্দ বুঝতেও পারে নি যে চিন্তায় ভাবনায় দিশে হারিয়ে কি কড়া আর ঝাঁঝালো রিপোর্ট সে পেশ করেছে ডিঙি উল্টিয়ে নদীতে পড়ে রিভলভার হারানোর গল্প ফেঁদে। দপ্তরে সাড়া পড়েছে। ওপরওয়ালাকে নাড়া দিয়েছে। একুশ বছরের ব্রিলিয়ান্ট সার্ভিস, একুশ বছরের কর্তব্যপরায়ণ দায়িত্বশীল নিখুঁত চাকর। কত ফাঁকিবাজ রায়বাহাদুর হয়ে গেছে, অরবিন্দ আজ পর্যন্ত কোন পুরস্কার পায় নি। রিপোর্টের জবাবে হঠাৎ একমাসের মধ্যে অরবিন্দ উচ্চতর গ্রেডে উঠে গেল। নববর্ষের লিস্টে সে রায়বাহাদুর হয়ে গেল।

কিসে কি হয়!

(ক্রমশ)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য

আর্ট সম্বন্ধে সাম্যবাদী মহলে দু'রকমের উক্তি প্রচলিত আছে: (১) আর্টকে হতে হবে সমাজবিপ্লবের বা নিম্নশ্রেণীক সমাজ প্রতিষ্ঠার ধারালো অস্ত্র, (২) আর্ট হচ্ছে একটা সংবেদনশীল ইতিহাস-সচেতন চিত্তের উপর সমাজ জীবনের অন্তর্গূঢ় সত্তার যথার্থ প্রতিফলন। প্রথম মতের অধিবক্তাদের মধ্যে লেনিন ও ডিমিট্রফের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি আমার আলোচ্য প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।* দ্বিতীয় মতটি ইদানীং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবাদী বস্তুতন্ত্র (Socialist realism) নামে সুপ্রতিষ্ঠিত। দুইমতের মধ্যে সম্পূর্ণ গরমিল আছে আমি তা বলছি না। কিন্তু তাদের সমীকরণও আংশিক এবং আপতিক (accidental)। সামারভিল অবশ্য বলেছেন, স্বধর্মরক্ষায় যে শিল্পকর্ম যত সার্থক, রাজনৈতিক বিচারেও তা তত উঁচুদরের বলে গণ্য হবে। মানব-ধর্মী কোন শিল্পীর রচনায় সমাজগত ও শিল্পগত মূল্যের সাযুজ্য ঘটতে পারে; যদি ঘটে তবে তেমন রচনা আমাদের কাছে অত্যধিক সমাদরের বস্তু হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাই বলে আমি মানতে প্রস্তুত নই যে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মূল্যবিচার একই জিনিস। সমাজ সম্বন্ধে গভীর ও সহৃদয় অন্তর্দৃষ্টি যে-লেখায় শিল্পসম্মত রূপ গ্রহণ করে নি তার রাজনৈতিক মূল্যও শূন্যে গিয়ে ঠেকবে, একথা জোর করে বলা যায় না। সে লেখা যদি ছন্দে বন্ধে উপমায় উৎপ্রেক্ষায় নাটকীয় ঘটনার সমাবেশে একটি রাজনৈতিক মতের তেজোদ্দীপ্ত প্রকাশ বা একটি রাজনৈতিক পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারে তবে সে লেখার মূল্য আমার কাছে কম নয়। বিশুদ্ধ সাহিত্যরসিক হিসাবে আমি তাতে পীড়িত হব যদি সাহিত্যের বিশিষ্ট মূল্য সে দাবী করে। এই মূল্য তার পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে বলে বুদ্ধদেব বসুর মত যাঁরা সাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক তাঁরা তার কোন মূল্যই স্বীকার করতে রাজী নন; সাহিত্যনামধারী তেমন রচনা সাহিত্যের পক্ষে বর্জনীয় বলে তাকে একেবারে আবর্জনা স্তূপে ফেলে দিতে চান। উক্ত প্রবন্ধে তাঁদের কাছে আমার নিবেদন উহ্য ছিল যে সে-রকম রচনা তাঁদের বিশুদ্ধ সাহিত্যরস-পিপাসা মেটাতে না পারলেও আজকের দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক আদর্শসিদ্ধির সহায় হিসাবে তার মূল্য অনস্বীকার্য। সে-সব রচনা সাহিত্যরূপেই আমাদের কাছে পরিবেশিত হয়— যদিও উদ্দেশ্য তার রসসম্ভোগের নির্ভেজাল আনন্দদান নয়। তাই আমি একটি কম্প্রমাইজ গোছের প্রস্তাব করেছিলাম যে "ফলিত সাহিত্য" নাম দিয়ে (ফলিত

* পৌষের পরিচয়ে আমার "সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য" এবং মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের উত্তর দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে 'উপমেয়) তাদের জন্য সম্মানের আসন ছেড়ে দেওয়া উচিত যদি বিশুদ্ধ সাহিত্যের যে-শাশ্বত আসনটী আমাদের হৃদয়ে পাতা আছে তা নিয়ে সে কাড়াকড়ি না করে। সেই সঙ্গে মার্ক্স-পন্থী সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে আমার আবেদন ছিল যে তাঁরা যেন সাহিত্য মাত্রকে রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারালো হাতিহারে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর না হন এবং যে সাহিত্য তাঁদের কাজে— সে যত বড় কাজেই হোক—না লাগে তাকে বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল প্রভৃতি নাম দিয়ে একেবারে খারিজ না করে দেন। ফলে কোন পক্ষই আমার লেখায় সন্তুষ্ট হন নি। সেটা অপ্রত্যাশিত নয়।

বিশুদ্ধ সাহিত্যের অনুরাগীরা শেষ পর্যন্ত ফলিত সাহিত্যের (উপকরণ) মূল্য স্বীকার করে নেবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তবে হয়ত তাঁরা সাহিত্য নামে তাকে অভিহিত করতে রাজী হবেন না—"ফলিত" বিশেষণ দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ করা সত্ত্বেও। এতে আমার আপত্তির কারণ নেই, অধিকাংশের সম্মতি আছে এমন একটি নাম বাছাই করে নিলেই হবে। মার্ক্সপন্থী সাহিত্যবিচারকদের কাছে আমি দু'টি কথা নিবেদন করতে চাই। প্রথমত, আগেই বলেছি যে সামাজিক সত্ত্বাকে সাহিত্যের রসে অভিষিক্ত করতে চরিতার্থ না হলেও সে সাহিত্য বা সাহিত্যপ্রতিম সে রচনা সঠিক রাজনীতির পথে মানুষের মনকে আলোড়িত করতে পারে, বিপ্লবের প্রেরণা যোগাতে পারে, ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-স্পৃহাকে বেগবান করতে পারে। যুদ্ধকালীন অনেক সোভিয়েট গল্পে এবং আমাদের দেশের অ্যান্টি-ফ্যাশিস্ট ও মন্বন্তরী সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। রসের বিচারে এগুলির মূল্য অল্পই, অথচ তাদের গুণগানে সাম্প্রতিক সাহিত্য সমালোচনা মুখরিত। আমি বলছি না যে তাদের পক্ষে যাঁরা ওকালতি করেছেন তাঁরা অন্যায় করেছেন। ওকালতি করবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে প্রয়োজন সমাজ-কর্মীর, সাহিত্যানুরাগীর নয়—অন্তত অনেক ক্ষেত্রে নয়। তা'ছাড়া এই ধরনের সাহিত্যের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে অন্যবিধ সমস্ত সাহিত্যের উপর খড়্গ-হস্ত হওয়ার দরকার ছিল না। সেটা সমাজসেবীর পক্ষেও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়, কারণ সমাজে সাহিত্যের স্থান কেবল উপকরণ হিসাবে নয়। সামাজিক উন্নতির চরম আদর্শের মধ্যেও সাহিত্যের বিশুদ্ধ আনন্দ-সম্ভোগ অন্যতম বলে স্বীকৃত হবেই। সুতরাং সাহিত্যের আদর্শকে আমরা সামাজিক সংকটের আশু প্রয়োজনের খাতিরেও চিরকালের মতন খাটো করতে পারি না। খাটো যে করা হয়েছে অমরেন্দ্রবাবুও তাঁর প্রতিবাদের শেষ অনুচ্ছেদে সে কথা স্বীকার করেছেন।

অথবা ব্যাপারটিকে অন্য ভাবেও দেখা যেতে পারে। সব যুগেই সাহিত্য-যশপ্রার্থীরা "সস্তায় কিস্তিমাত করতে চান।" কিন্তু সমঝদার পাঠকের কাছে তাঁদের সস্তা চাল ধরা পড়ে, বাজি তাঁরা নিয়ে যেতে পারেন না। আজকের দিনে

তাঁরা পারছেন কেন? কারণ সাহিত্যের বিচারে রচনাটি শস্তা হলেও তার অন্য একটি মূল্য সকলের চোখে ধরা দেয়। সভ্যতার সংকটকালে সে মূল্যটি স্বভাবতই আর সব মূল্য ছাপিয়ে ওঠে, রাজনীতির দাবীর কাছে সাহিত্যের দাবী হার মানে, অথবা দুয়ের পার্থক্য ঝাপসা হয়ে আসে।

মার্কস্‌পন্থী সাহিত্যবিচারকদের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় মতভেদ হচ্ছে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের অন্য সংজ্ঞাটি নিয়ে। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সামাজিক সত্তাকে আর্টের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা—এ কথা ঠিক। কিন্তু এটুকু বল্‌লে সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হয় না। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে সাহিত্যে এবং শিল্পকলা মাত্রে আমরা পাই বাস্তব সত্তার রূপায়নিক অভিব্যঞ্জনা। সমাজই একমাত্র বাস্তব সত্তা নয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের রহস্যঘন প্রকৃতি, চেখভ কিংবা হেন্‌রী জেম্‌সের কথা-সাহিত্যে ব্যক্তিচেতনার যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা অভিব্যক্ত—রসের বিচারে এদের বাস্তবতাও অগ্রাহ্য নয়। হতে পারে যে-আঙ্গিকে তাঁদের রূপায়ণ আমাদের মনোহরণ করেছিল এতদিন, আজ তা এক ঘেয়ে হয়ে গেছে, সেই পুরনো আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তিতে আমাদের মন আজ সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু সেটা হল আঙ্গিকগত ডেকেডেন্স। সমাজকে একমাত্র বাস্তব সত্তা বলে প্রকৃতির লীলাকে কিংবা ব্যক্তিচৈতন্যের সূক্ষ্ম ঘাতপ্রতিঘাতকে সাহিত্য থেকে বিতাড়িত করা প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয়। শিল্পের প্রগতি সৃজনীপ্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীরাই আনবেন, রাষ্ট্রনেতারা তার পথ নির্দেশ করতে গিয়ে শিল্পীর সৃজনীশক্তিকে ব্যাহতই করছেন, উন্মুক্ত নয়।

নিঠুর গরজী
তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে,
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।

সোভিয়েট রাশিয়ার "নামগন্ধ পর্যন্ত" আমার প্রবন্ধে না থাকলেও সোভিয়েট রাশিয়াই আমার "যুক্তিমৃগয়ার আসল শিকার"—অমরেন্দ্রবাবুর এই অনুমানটি বড় অদ্ভুত ঠেকল। আমার বক্তব্যের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিশেষ মতবাদ, সমস্ত প্রবন্ধে কি সে কথা প্রস্ফুট নয়? সেই মতবাদ যদি কোন দেশের প্রায় সমস্ত সাহিত্যামোদীর মনে বলবৎ থাকে তবে সে দেশকে আমি সেই পরিমাণে নিন্দার্হ মনে করব, এটা সত্যি; এবং আমার প্রবন্ধের মধ্যে পরোক্ষে তা ব্যক্ত হয়েছে ভাবা অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় সেই মতবাদ সরাসরি ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে এমন কথা বলবার মত যথেষ্ট তথ্যাদি তো আমার জানা নেই। অমরেন্দ্রবাবু সে রকম নির্ভরযোগ্য সংবাদ

পেয়েছেন কি? তাই কি তিনি আমার "আসল শিকার" সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অব্যর্থ অনুমানটি করে বসলেন। আমার তো যতদূর জানা আছে সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্প্রতিক সাহিত্যে তা নিয়ে বিতর্ক চলছে, সাহিত্যের চরম ও চিরন্তন মূল্যের পক্ষে ওকালতী করেছেন লিয়েফ্ নিট্স, কেমেনেভ প্রভৃতি বিশিষ্ট সমালোচকেরা (*Literature & Marxism* দ্রষ্টব্য)। আমাদের দেশের সাহিত্য-সমালোচনার ধারা কিছুকাল যাবৎ যে খাদে বইছে সেটা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে সাহিত্যকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের উপকরণরূপে গণ্য করবার অভ্যাসটা এখানে মজ্জাগত হয়ে যাবার আশংকা আছে। তাই আমি প্রতিবাদ জানাবার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়ি নি।

অমরেন্দ্রবাবু বলেছেন: "আইয়ুব সাহেব অবশ্য অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন, সোভিয়েট রাশিয়ার কাল্চার ও শিল্প অধঃপাতে গেছে।" এ ধরনের মন্তব্য উক্ত প্রবন্ধে বা অন্য কোথাও আমি কখনো করি নি, এবং অন্তত সজ্ঞান মনে এরূপ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিনি। আমার অজ্ঞাত মনের নিগূঢ় গ্রন্থিগুলির সন্ধান আমাকে না চিনেই অমরেন্দ্রবাবু পেলেন কেমন করে? ফ্রয়েডের শিষ্যেরা সামনাসামনি বসে বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করে মনোবিকলন করেন, অমরেন্দ্রবাবু কি Tele-psychiatrist? আমি যে কথা আদৌ বিশ্বাস করি না আমার কাছে তারই প্রমাণ চেয়ে বড় লজ্জায় ফেলেছেন। উপরন্তু তিনি "অত্যন্ত স্পষ্টভাবে" জবাব দিচ্ছেন যে, যে অভিযোগগুলি আমি কুত্রাপি করি নি আমার "সে অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। সোভিয়েট রাশিয়ার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাই হল কাল্চারের অভাবনীয় অভিব্যক্তি, প্রগতি ও ব্যাপ্তি।" আরেকজন বিশিষ্ট লেখকও (আঁদ্রে জীদ) অনুরূপ ভাবপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে আরো কয়েকটি কথা বলেছেন: We admire in the U. S. S. R. the extraordinary elan towards education and towards culture; but the only objects of this education are those which induce the mind to find satisfaction in its present circumstances and exclaim: Oh! USSR— —Ave. Spes Unica! And culture is entirely directed along a single track. There is nothing disinterested in it; it is merely cumulative and (in spite of Marxism) almost entirely lacks the critical faculty. Of course I know that what is called "self-criticism" is highly thought of. When at a distance, I admired this. I still think it might have produced the most wonderful results if only it had been seriously and sincerely applied. But I was soon obliged to realise that apart from

denunciations and complaints—("The canteen soup is badly cooked" or "the club reading room badly swept")—criticism merely consists in asking one self if this, that or the other is in the "right line". The line itself is never discussed. What is discussed is whether such and such a work, gesture or theory conforms to this sacrosanct line. And woe to him who seeks to cross it ! As much criticism as you like—up to a point. Beyond that point criticism is not allowed. There are examples of this kind of thing in history.

And nothing is a greater danger to culture than such a frame of mind.

অমরেন্দ্রবাবু বলছেন "অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদ জানে এবং জেনে আতংকিত হয় যে সোভিয়েট রাশিয়ার এটম্ বোমার চেয়েও একটি সাংঘাতিক অস্ত্র আছে। সেটা হল সেখানকার মুক্ত স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল, শিক্ষিত, আনন্দময় মানুষ।" রবীন্দ্রনাথও রাশিয়ার চিঠিতে সেই কথা লিখেছেন: "শোনা যায় ইউরোপের কোন কোন তীর্থস্থানে দৈব কৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে—এখানে তাই হ'ল; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে—পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানব সমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।" কিন্তু সেই রাশিয়ার চিঠির উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ যোগ করলেন: "সোভিয়েট রাশিয়ার মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি ...... ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে জন-নায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না, তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন করে হোক মানুষকে টুটি চেপে ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আঁদ্রে জিদ ও অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, তিনজনের কথাই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনি এবং ধৈর্যের সঙ্গে বিচার করতে চেষ্টা করি। কিন্তু কোনোটাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। বরঞ্চ আমার মন অমরেন্দ্রবাবুর দিকেই ঝোঁকে, কারণ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যত লেখা এ পর্যন্ত বেরিয়েছে আমার বিবেচনায় সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েবের Soviet Communism বইখানাই তার মধ্যে সব চেয়ে স্থির বুদ্ধি ও গভীর গবেষণাপূর্ণ। আজকের দুনিয়ায় সে বই না পড়া অপরাধ এবং পড়ে—নিন্দুকের সমস্ত অভিযোগ, সন্দেহ, আশাভঙ্গ ও আশংকা

সত্ত্বেও—সোভিয়েট দেশের নতুন সভ্যতা সম্বন্ধে অনেকখানি আস্থাবান না হওয়া অসম্ভব।

অমরেন্দ্রবাবু লিখছেন ; "চরম মূল্যের অর্থ যদি অনড় অচল শাশ্বত মূল্য হয়, সেরূপ কোন মূল্য নেই বলেই তাকে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।" এর উত্তরে আবার সেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় : আমি কোথায় এবং কবে অনড় অচল চরম মূল্যের কথা বললাম ? অমরেন্দ্রবাবু কেন অনর্থক এক কাল্পনিক শত্রুপক্ষ খাড়া করে তাঁর বহু যত্নে শানানো অস্ত্রগুলির অপচয় ঘটাচ্ছেন ? পূর্বোদ্ধৃত তাঁর qualified অস্বীকৃতি থেকে অনুমান করা যায় বোধ হয় যে পরিবর্তনীয় গতিধর্মী চরম মূল্যের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন। তা না হলে তো সোজাসুজি চরম মূল্য তিনি আদৌ মানেন না বললেই চুকে যেত, বিশেষ করে অনড় এবং অচল চরম মূল্যের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করবার কোন কথাই উঠত না। আমার প্রবন্ধের যা বক্তব্য তার পক্ষে চরম ও উপকরণ মূল্যের পার্থক্য নির্দেশ করাই প্রাসঙ্গিক ছিল, চরম মূল্য অচল কি চলিষ্ণু সে প্রশ্ন তুলবার দরকার বোধ করি নি। নৈলে আমিও তাঁর সঙ্গে একমত, অর্থাৎ চরম মূল্যকে পরিবর্তমান এবং উৎকর্ষনশীল বলেই বিশ্বাস করি। উদাহরণত বলতে পারি যে, মধ্যযুগ পর্যন্ত অধিকাংশ মণীষী একমাত্র ধর্মসাধনার মধ্যেই সমস্ত চরম মূল্যের প্রকাশ দেখতেন। রেনেসাঁস-এর চিত্ত জাগরণের ফলে ধর্মের সংহতি ভেঙে গেল, বিবিধ পথে চরম মূল্যের সন্ধান মিলল—শিল্প বিজ্ঞান ও চারিত্র্য তার মধ্যে প্রধান। এই মূল্যত্রয়ের অস্তিত্ব মধ্যযুগেও প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু উপকরণরূপে, ভগবৎ-সাধনার উপায় হিসাবে। রেনেসাঁসের পর এরা চরম মূল্যের আসনে অধিষ্ঠিত হল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর একদিক থেকে পরিবর্তন দেখা গেল। তখন পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আধিপত্য ছিল অটুট, সমস্ত সমাজের কথা কেউ বড় একটা ভাবত না। কেউ ভাবত না যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর তাকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতেকটি মানুষের কাছে অধিগম্য করে তুলতে হবে, নইলে আমাদের সাধনাই ব্যর্থ। আজ আমরা তাই ভাবছি।

আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি না—অমরেন্দ্রবাবু কোন যুক্তি বলে এই আজব সিদ্ধান্তে পৌছুলেন ? মূল্যবোধ বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণের এলাকার বাইরে পড়ে বলা মানেই কি বিজ্ঞানকে স্বক্ষেত্রেও অস্বীকার করা ?

"মার্কসিস্ট সাহিত্য = ফলিত সাহিত্য = অসত্য অশিব অসুন্দর সাহিত্য, এই equationটা কাগজে কলমে লিখে ফেললেই কি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে ?" হয়ে ওঠে না বলেই তো আমি এমন কোন ইকুয়েশন লিখি নি ; অমরেন্দ্রবাবু কার লেখা থেকে সেটা উদ্ধার করলেন ? আমার প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে কোনো ব্যঙ্গরসিক সেখান থেকে ইকুয়েশনের দ্বিতীয় পর্বটা আহরণ করলেও করতে পারেন, এবং ব্যঙ্গ করে

আত্মপ্রসাদ লাভ করবার অধিকার অমরেন্দ্রবাবুর অবশ্যই আছে। কিন্তু ইকুয়েশনের প্রথম পর্ব (মার্কসিস্ট সাহিত্য = ফলিত সাহিত্য) স্বতঃসিদ্ধ পরতঃসিদ্ধ কিছুই নয়। তবে মার্কসিস্ট সাহিত্যের পটভূমিকায় ফলিত সাহিত্যের আলোচনা করেছিলাম, সুতরাং আমি ওই দুটি বস্তুর সমীকরণ করতে চেয়েছি এমনতর ভুল বোঝার সম্ভাবনা ছিল। তা ছাড়া আমার লেখা সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত যে কয়টি উক্তি অমরেন্দ্রবাবু করেছেন এটা সে রকম সম্পূর্ণ অমূলক ও অসহিষ্ণুতা-প্রসূত নয়। তাই আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমার মতে মার্কসিস্ট সাহিত্যমাত্রই ফলিত সাহিত্য নয়। আগেই বলেছি যে মার্কসপন্থীরা সাহিত্যের দু'রকম সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। সংজ্ঞা দুটি অংশত সমপাতী (overlapping) হলেও এক নয়। যে সাহিত্য কেবলমাত্র সমাজবিপ্লবের ধারালো অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যেই তৈরি তাকেই আমি "ফলিত সাহিত্য" নামে অভিহিত করেছি। (বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন বা পানাসক্তি নিবারণের উদ্দেশ্যে যে সাহিত্য রচিত, তাও ফলিত সাহিত্য, যদিও তা সঙ্গত অর্থে মার্কসিস্ট নয়। পঞ্চাশ বছর আগেকার বাংলাভাষায় এবং এখনও হিন্দিতে এমন গল্প উপন্যাস নাটক বিরল নয়)। সমাজের সজীব সত্তা যে সাহিত্যে সার্থকরূপে রূপায়িত হয়েছে সে সাহিত্য মার্কসিস্ট হলেও বিশুদ্ধ সাহিত্য এবং চরম মূল্যের অধিকারী। তাতে যদি সমাজের কোন আশু প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তবে তাকে একাধারে ফলিত সাহিত্য বলতেও বাধা নেই। এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে সামাজিক সত্তার রূপায়নে রসোত্তীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সাহিত্য-প্রচেষ্টা সাম্যবাদী আন্দোলনের হাতিয়ার হতে পারে। সেই মার্কসিষ্ট সাহিত্যই হবে একান্ত অর্থে (exclusively) "ফলিত সাহিত্য"। যদি মার্কসপন্থীরা বলেন যে তাঁরা এমন সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বা তার পক্ষপাতী নন, তাহলে আমি শুধু গত কয়েক বছরের প্রগতি, পরিচয়, অরণি, স্বাধীনতা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি বামপন্থী ও অর্ধবামপন্থী পত্রিকায় প্রকাশিত বহু গল্প কবিতা ও সাহিত্য সমালোচনার কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

অমরেন্দ্রবাবু আমার বক্তব্যটি এক কথায় নাকচ করে দিতে চেয়েছেন এই বলে যে চরম মূল্য ও উপকরণ মূল্য একই জিনিস। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যার মূল্য চরম তাকে আমরা উপকরণরূপেও ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু যা কেবল উপকরণরূপেই মূল্যবান তাকে আমরা চরম মূল্যের মর্যাদা দিই কেমন করে? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ও দুটির পার্থক্য এতই সুস্পষ্ট যে বুঝিয়ে বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে। বসন্ত রোগের মরসুম এলে টিকে নেওয়ার একটি উপকরণ বা instrumental মূল্য আছে রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য— একথা কি অমরেন্দ্রবাবু স্বীকার করেন না? হাতের চামড়া ফুঁড়ে শরীরের মধ্যে গো-বসন্ত গুটিকার পুঁজ ঢুকিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা সাহিত্য সঙ্গীতের মতন চরম

পুস্তক পরিচয়

GREEN SONG AND OTHER POEMS—Edith Sitwell. Macmillan. 1944.
A SOUL FOR SALE—Patrick Kavanagh. Macmillan. 1947.
THE GARDEN—V. Sackville West. Michael Josseph. 1946.
POEMS 1933-'45—Rayner Heppenstall. Secker and Warburg. 1946.
BEACH RED—Peter Bowman. Michael Josseph. 1946
THE MADNESS OF MERLIN—Lawrence Binyon. Macmillan. 1947.

যুদ্ধকালীন আদর্শবাদ কেটে যাওয়ার পরেই ইংরিজী সাহিত্য একটা ঢিলে, নীচু তারে নেমে এসেছে—এমন বিশ্লেষণ সম্প্রতি ইংরেজ সমালোচকদের মুখে শোনা গেছে প্রায়ই। এই মত অতিরঞ্জনসাপেক্ষ সন্দেহ নেই, তবু একথা মানতেই হবে যুদ্ধোত্তরকালে তেমন আশাপ্রদ কবিতা বেশি রচিত হয়নি যেমন যুদ্ধকালে দেখা গিয়েছিল সিড্‌নি কীস ও অ্যালান লুইসের অবদানে অথবা প্রবীণতর কবিদের যুদ্ধকালীন কবিতায়। "ফোর কোয়ার্টেট্‌স্"-এর পর এলিয়ট-এরও বিশেষ কিছু বেরোয় নি, তাঁর সমসাময়িকদের কণ্ঠও সম্প্রতি প্রায় নীরবই চলা যেতে পারে।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আজকের ইংলণ্ডের জীবনে একটা স্পষ্ট কেন্দ্রস্থিত সত্য এমন কিছু নেই যার দিকে সৃষ্টিশীল মন স্থিরদৃষ্টি হয়ে মনকে সাধনার স্তরে উন্নীত করতে পারে। অপরপক্ষে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ওদেশে একটি নূতন কাব্যপরম্পরার সৃষ্টি হয়েছিল, অডেন-স্পেণ্ডারের গোত্রই হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজী কাব্যচেতনার প্রধান আধার। এলিয়টের সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিরোধ ছিল যথেষ্টই, কিন্তু বর্তমান সভ্যতার প্রতি বিমুখতায় ও নূতন জীবনকেন্দ্র স্থাপনের সাধনায় তাঁদের মূল ভিত্তি ছিল এক। একই অন্তর্নিহিত প্রেরণা তাঁদের কবিতায় বিভিন্ন আকার পরিগ্রহ করেছিল। সমাজচেতনাই ছিল কাব্যের প্রকৃত আধার। মানুষের ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন, স্রোতোমুখীন পথে তার মৃত্যু, এ স্রোতকে ফেরাতেই হবে। বিশ্বাসের অভাব সংকটমুহূর্তে কবিমনকে বিচলিত করে তুলেছিল। স্পেণ্ডারের ভাষায়

For I had expected always
Some brightness to hold in trust,
Some final innocence
To save from dust

কিন্তু এই ক্ষীণতম শিখাটুকুও অন্তর্হিত, তাই প্রয়োজন "to dig some reservoir for my springtime's pain" (সিসিল ডে-লুইস)। কাব্যের আকাশ বিদীর্ণ হয়েছিল আর্তনাদে, তার মধ্যে সাম্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেছিল ক্যাথলিক দৃষ্টি, বিশ্বাসের সঙ্গে সন্দেহ, পলায়নের সঙ্গে আক্রমণ। এলিয়টের সমাধান গতানুগতিক, তবু তাঁর চেতনার পর্দায় সেটা ধরা দিয়েছিল একটা অনন্ত কম্পন হিসাবেই। তাই তাঁর কাব্যে তীব্রতার অভাব কদাচ ঘটে নি, বক্তব্যের জটিল জালকে বিদীর্ণ করে প্রতিভাত হয়েছে বর্তমান জীবনের রিয়্যালিটি; বিমূঢ় সভ্যতার অন্তরের বেদনা বেজেছে তাঁর বিশ্বাসমূলক কাব্যেও। বালজাকের লেখায় যেমন আপন শ্রেণীরই দৈন্য প্রকট হয়েছে ছত্রে ছত্রে, তেমনি এলিয়টের বেদনার্ত বিশ্বাসদানের আড়ালে অনুরণিত হয়েছে অপূর্ণ বিশ্বাসেরই ব্যর্থতা, সংকটেরই অখণ্ড সত্য। Gerontion-এর যে ব্যাঘ্র মানুষকে কবলিত করে, সে ব্লেকের টাইগার নয়। Waste Land-এর আত্মবলির পরেও ধূসরতার পরিসীমা নেই, Ash Wednesdayতে—

> Under a juniper tree the bones sang, scattered and shining
> We are glad to be scattered, we did little good to each other.

এবং এই 'time of tension between dying and birth'-এর পরে Rock-এ দেখি Waste and Void. Waste and Void. And darkness on the face of the deep.' বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে এই ধূসরতার বোধ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে, একসূত্রে গেঁথে তুলেছে চেতনার বিভিন্ন প্রকাশকে। বিশ্বাস-অর্জনের আকাংক্ষার সঙ্গে শূন্যতা-বোধের টানাপোড়েনেই কাব্যের খাপি বুনোট।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ও যুদ্ধকালের গোড়ায় কাব্যের এই যে সমাজচেতন প্রসার, যুদ্ধের শেষার্ধে তার অন্তর্নিহিত প্রবণতা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠল। ফ্যাসীবিরোধী লড়াই-এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব অনেকটা মিটে গেল; আত্মগ্লানির অবসর কিছুদূর পরিমিত হয়ে আর্তনাদের তীব্রতাকে মোড় ঘুরিয়ে দিল শান্ততর মেজাজের দিকে। এলিয়টের বিশ্বাসের প্রবাহ স্থিরতর হল Four Quartets-এ। অ্যালান লুইসের ও সীডনি কীসের মধ্যে পূর্বগামীদের উত্তেজিত দ্বন্দ্বের ভাব কেটে গিয়ে দেখা গেল স্বচ্ছতর বিশ্বাসদৃষ্টি।

যুদ্ধকালীন কাব্যের এই দুই অধ্যায়কে মিলিয়ে যে চেহারা চোখে পড়ে তাতে মনে হয় যে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সংকটবোধ ও আদর্শ-চেতনা উভয়ই তীব্রতর হয়ে ইংরিজী কাব্যে এমন একটি চর সৃষ্টি করেছিল যার ফসলকে একদৃষ্টিতেই চিনে নেওয়া যায়, সমস্ত মিলিয়ে যার মধ্যে একটি সম্পূর্ণতা ছিল, অন্তর্লীন ঐক্যের মূল সুর ছিল।

শ্রীমতী সিটওয়েলের যুদ্ধকালীন গ্রন্থ গ্রীন সঙ-এ সেই মূল সুরের বেশ অনেকটা ধরা পড়ে। ফিনিক্স পাখীর মত মৃত্যুর মধ্য থেকে যুদ্ধকালে যেন নবজন্ম ঘটেছে

সিট্‌ওয়েলের। 'স্ট্রীট সঙ' ও 'গ্রীন সঙ' মিলিয়ে তাঁর নতুন কাব্যের যে গোটা চেহারা ফুটেছে তাতে বিস্ময় না মেনে উপায় নেই। প্রতীক ও প্রতিমার এক সহজ অথচ নূতন পরম্পরাকে গেঁথে তুলে তাতে আশ্চর্য আবেগের সঞ্চার করেছেন সিট্‌ওয়েল। যে তীব্রতা তার মধ্য থেকে স্ফুরিত হয়েছে সে খাঁটি কাব্যেরই অভিজ্ঞানক। এলিয়টের মতো সিট্‌ওয়েলও তাঁর চেতনার ভারবাহী পাটাতন করেছেন ধর্মকে। কিন্তু ধর্মের এই বাহ্য প্রকরণটাই সমালোচকের মনকে বিমুখ করলে চলবে না। আজকের প্রগতিবাদী সমালোচনার পটভূমিতে যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে হচ্ছে বাহ্য মতপ্রকাশের অন্তরালে যে চেতনার অন্তর্লীন গতি প্রচ্ছন্ন থাকে তাকেই সন্ধান করা। এই বিচারে দেখা যাবে বাহ্যত সমাজচেতন কবিতা কী ভাবে মূলে সত্যকার সমাজমুখীন চেতনা প্রসারকে এড়িয়ে কেবল সুপরিচিত বাক্যবিন্যাসের কায়দাকে আশ্রয় করে তার অন্তরালে নিজের ক্লান্তিকে, বিভ্রান্তিকেই প্রচ্ছন্ন করে রাখছে। ফলে তাতে কাব্যের প্রকৃত সুর নিঃসংশয় ভাবে বেজে উঠছে না। সহস্রধারায় উৎক্ষিপ্ত সমাজচেতন কবিতার প্রস্রবণের মধ্যে এই অভাব আজ যে অত্যন্তই দৃষ্টিকটু হয়ে দেখা দিচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। যাঁরা কেবল বাহ্য মতাদর্শের দাপটে কাব্যকে শাসনে রাখতে চান, মূল গতির চেহারা অনুধাবনের চেষ্টা করেন না তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কেবল ডিসিপ্লিন-মাহাত্ম্যে সন্তোষ লাভ প্রগতিশীল সাহিত্যবোধের পক্ষে মারাত্মক একথা বলাই বাহুল্য। এই মারাত্মক দৃষ্টিবিভ্রম থেকে যাঁরা বাঁচতে চান তাদের চোখ চেয়ে দেখতে হবে যে ধর্মপরায়ণ, পলায়নী, বলে যে কাব্য অভিহিত হচ্ছে অনেকক্ষেত্রে প্রাণের সাড়া মিলছে তাতেই, প্রগতির লক্ষণবিচারে যে কাব্যের ফুলমার্ক তাতে নয়। শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের ধর্মাশ্রিত কাব্য এর একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তিনি ধর্মচেতন, তিনি বলছেন :

> O my Calyx of the flower of the world, you the spirit
> Moving upon the waters, the light on the breast of the dove.

(গ্রীন সঙ কবিতার শেষ দুই পংক্তি)

তিনি পলায়নী, আজকে জীবন তাঁর দৃষ্টিতে অনন্ত ধূসরের মধ্যে প্রাণের ক্ষীণ, অথচ পরম প্রিয় শিখাটুকু—

> After the long and portentious eclipse of the patient sun
> The Sudden spring began
> With the bird-sounds of Doom in the egg, and Fate
> in the bud that is flushed with the world's fever—
> But those bird-songs have trivial voices and sound not like
> thunder,

And the sound when the bud bursts is no more
the sound of the worlds that are breaking.
But the youth of the world, the lovers, said, "His spring" !

(গ্রীন সঙ কবিতার প্রথম কয়েক পংক্তি)

কিন্তু এ পলায়নের মূল কোথায়? এ কাব্য প্রাণ ছেড়ে মৃত্যুকে আশ্রয় করছে না। জরগ্রস্ত পৃথিবীতে প্রাণের যে গভীর মূল্য, তাকেই তুলে ধরবার প্রয়াস করেছে। জরগ্রস্ত পৃথিবীতে পূর্ণ স্বাস্থ্য, যৌবন আনার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে যে সৈনিক, তারও ভিত্তি প্রাণের মূল্যের প্রতি এই স্বীকৃতিই। তার ঘৃণারও ভিত্তি তার প্রেম। এবং সেও বর্তমান জীবনকে একটা যুদ্ধসংকুল সংকটময় স্থান রূপেই দেখে, তার আশাও এই সংকটের পটভূমিতেই বিবৃত, পরম নিশ্চিন্ততার প্রকাশ সেটা নয়। অতএব বর্তমান প্রাণসংকটে জীবনের মূল্যের স্বরূপ প্রতিভাত হয় যার দৃষ্টিতে তার রাজনৈতিক চিন্তার প্রসার পরিমিত হতে পারে, কিন্তু তার জীবনবোধ ব্যাধিগ্রস্থ নয়। কাব্যের এই ক্লাসিক শিখরে সে আরোহণ করে নি। যেখানে দূরবিসর্পী দৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বচেতনার ধারা মিলে বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্র রচনা করেছে। কিন্তু তবু তার সেই পরিমিত বোধ রিয়্যালিটির স্পর্শবঞ্চিত নয়, ক্লাসিকের ব্যর্থ অনুসরণের চেয়ে তার আত্মপ্রকাশে জীবনের জোর বেশি। আজকের ইংলণ্ডের জীবনে সেই স্পষ্ট দ্বিধাবিভক্ত পথ আসে নি, যেখানে সাদা কালোর মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম প্রভেদ প্রকরণ অবলুপ্ত হয়ে গিয়ে কবি ব্যহ্য লক্ষণ বিচারেই নিখুঁত প্রগতিবাদী অথবা নিরংকুশ প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে বিজ্ঞাপিত হয়ে যেতে পারেন। সিট্‌ওয়েলের কাব্যের সততাই এর অন্যতম প্রমাণ। সেই স্পষ্ট দ্বিধাবিভক্ততা যখন উপস্থিত হবে তখন এ জাতীয় কাব্যের দেখা মিলবে না, যেমন মেলেনি ফ্যাসিস্ট-জার্মানীতে, ইতালীতে। সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্য থেকে কাব্যের প্রেরণার স্পর্শ কখনো মিলতে পারে না একথা প্রগতিশীল সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য।

তাই ইডিথ্ সিট্‌ওয়েলের কবিতায় 'হিমশীতল' পৃথিবীতে প্রাণের বন্দনার একটা যথার্থতা আছে। এই তাঁর মলস্তব। একে প্রকাশ করার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন নূতন প্রতীকমালা—সূর্য, শোণিত, বসন্ত, শীত, কাল, যৌবন, সিংহ, কঙ্কাল প্রভৃতি। তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থের তিনি নাম দিয়েছেন Song of the Cold. যুবতী মেয়ের প্রতি, বসন্তের দিন, অ্যান্ কোলিন-এর গান, সমস্ত কবিতাতেই এই মৃত্যুর শীতলতার মধ্যে প্রাণের মহিমার প্রকাশ হয়েছে বিভিন্নভাবে। স্পেণ্ডারের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি কবিতায় তিনি খৃষ্টের মধ্যেই নিজের পূর্ণতা দেখতে পেয়েছেন। এতে মনে হতে পারে যে তাঁর কবিমানসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতির নিশ্চিন্ত আশ্রয় আছে। কিন্তু তাঁর সেই আশ্রয় যে নিতান্তই চিন্তাগত বিভ্রান্তিতে

হৃদয়ের আকুলতার প্রকাশ, তা প্রকাশ পেয়েছে 'হৃদয় ও বুদ্ধি' নামধারী কবিতায় :

> Remember only this of our hopeless love
> That never till time is done
> Will the fire of the heart and the fire of
> the mind be one.
> (The Heart and the Mind)

চিন্তা ও হৃদয়ের জোড় এখানে কিছুতেই মিলছে না। তাই এ কাব্যের যে বেদনা সমাহিত সত্তার অভাববোধেই তার মূল। চিন্তা ও হৃদয়ের জোড় মেলানোর আকুলতাই এখানে কাব্যকে সততা দিয়েছে। খৃষ্ট ধর্মকে অবলম্বন করে সে আকুলতা নিবৃত্তি পায় নি। যদি তা পেতো তবে তাঁর খৃষ্টপ্রেম এত বেদনার্ত হত না, লুটিয়ে পড়তো অবিচল বিশ্বাসের নমস্কারে, পূর্ণ স্বীকৃতির মূর্চ্ছনায়। তাই দেখা যায় যেমন এলিয়টে তেমন সিট্‌ওয়েলের ক্ষেত্রেও ধর্মবিশ্বাসের পর্দার অন্তরালেও বিশ্বসংকটের বেদনাই কাব্যকে সার্থকতার ভিত্তি দিয়েছে, সবুজের গানও রয়েছে song of the cold. এখানে song যেমন সত্য, cold তার চেয়ে কম সত্য নয়, তাই তাঁর কাব্যিক তীব্রতার স্তর এত উচ্চ।

যুদ্ধোত্তর যুগে বিভ্রান্তি পৌঁছেছে তার চরম সীমানায়, ইংলণ্ডে শ্রমিক-সরকারের আগমনে প্রগতির বাহ্য লক্ষণে কিছুটা শান্তি মিলেছে, নিশ্চিন্ততার দিকে গোপন প্রবণতার সুযোগ উপস্থিত, অপরপক্ষে ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে জয়-লাভের পর পৃথিবীর এই ভীষণতর চেহারা দেখে যুদ্ধকালীন আদর্শবাদও গেছে ভেঙে, সুতরাং তীব্র সংকটবোধও গত, অথচ বিশ্বাসের ভূমি নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কি গোটা মানসক্ষেত্রেই একটা ক্লান্তির ছাপ লেগে গেছে এমন সন্দেহ হওয়া অসম্ভব নয়। বর্তমান ভীষণতা যে অন্তর্নিহিত সংকটের ক্রমিক প্রকাশের স্তর-ভেদের ফল সে কথা তলিয়ে দেখবার মতো স্পষ্ট দৃষ্টি বিগত। সুতরাং যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধকালে যে সমাজচেতনা ছিল সাহিত্যের ভিত্তি, সেই সমাজচেতনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নতুন রকমের পার্সোনালিজম, সিম্বলিজম ইত্যাদির জোড়াতালি চলছে। তাতে তেমন ভাবে সুরটি লাগছে না, কাব্যের ক্ষেত্রে একটা সবল গতির ভাব ফুটছে না কোথাও। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নৈপুণ্যে এই অভাবকে মেটাতে সক্ষম নয় সেটা ক্রমশই প্রতীয়মান।

সিট্‌ওয়েলের গ্রীনসঙ্‌ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ এই সমালোচনায় বিচার্য সেগুলি সবই যুদ্ধোত্তর কালে প্রকাশিত, (অবশ্য পরোক্ত অনুচ্ছেদের বক্তব্য এগুলির উপরই প্রতিষ্ঠিত নয়)। শ্রীমতী স্যাকৃভিল-ওয়েস্ট বিভিন্ন ঋতুতে বাগানের সৌন্দর্য নিয়ে লিখেছেন, বসন্ত সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এলিয়টকে উপহাস করে নিজের

জীবন-বিশ্বাসকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন উদ্ধত ভঙ্গিমায়। এপ্রিল নিষ্ঠুরতম ঋতু, এলিয়টের এই কথাকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন :

Would that my pen like a blue bayonet
Might skewer all such cat's-meat of defeat
No buttoned foil, but killing blade in hand.
The land and not the waste land celebrate,
The rich and hopeful land, the solvent land,
Not some poor desert strewn with nibbled bones
A land of death, sterility, and stones.

(স্প্রিঙ কবিতার দ্বিতীয় স্তবক)

সিটওয়েলও মহিলা কবি, বিশ্বাস তাঁরও প্রচার্য, কিন্তু এলিয়টের প্রতি তাঁর বক্রোক্তির উপলক্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন :

Heard the priests that howled for rain and the
universal darkness,
Saw the golden princes sacrificed to the Rain-god,
The cloud that came, and was small as the
hand of Man.

(হার্ভেস্ট কবিতার তৃতীয়-পঞ্চম পংক্তি)

তাঁর দৃষ্টি গভীর তাই এলিয়টের ধূসর ভূমির বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য নয়, তাঁর অশ্রদ্ধা সেই ধূসর ভূমি সিঞ্চনের ব্যর্থ আশাকেই। এলিয়টের ব্যর্থতার প্রান্তসীমায় যে ক্ষীণ আশা, তাও তাঁর দৃষ্টিতে অতিপ্রত্যক্ষ ও অবাস্তব বোধ হয়েছে। এই তুলনায় স্যাকভিল ওয়েস্ট-এর দৃষ্টির অগভীরতা অতি সহজেই বোঝা যায়। তাঁর নিরংকুশ আশাবাদ ফলেছে নিতান্ত সাহিত্যিক অভ্যাসেরই জমিতে। গোটা 'গার্ডেন' কবিতাটাই একটা সাহিত্যিক এক্সারসাইজ স্বরূপ। শ্রীমতী ওয়েস্টের কলমের জোর আছে, শব্দবিন্যাসনৈপুণ্য প্রচুর, তবু ঢাকের বাদ্যির ফাঁপা আওয়াজ কানে লাগে প্রতিপদেই। 'Blue bayonet,' 'Skewer', 'Cat's-meat' প্রভৃতি শব্দের কারিকুরি সহজেই অনুধাবনযোগ্য। তৃতীয় লাইনটির সঙ্গে সঙ্গে মিল্টন বা টেনিসনের ব্ল্যাংক্‌ভর্স-এর ঢং মনে আসে। শেষ পংক্তিগুলির সাধারণত্ব প্রকট। বাগান বিষয়ক এমন দীর্ঘ কাব্যে যে বক্তব্যের বা আবেগের তাড়না ব্যতিরেকেও শ্রীমতী ওয়েস্ট এমন নৈপুণ্যের ধারা বজায় রাখতে পেরেছেন তাতে আশ্চর্য বোধ হয়। যেন যন্ত্র প্রস্তুত, অথচ নির্মাণযোগ্য কিছু নেই।

পীটার বোমান-এর 'বীচ হেড' যে গদ্যে লিখিত না হয়ে পদ্যে কেন লিখিত হয়েছে সে কথা ভেবে পাওয়া দুষ্কর। আগাগোড়া কবিতাটি কৌতূহলোদ্দীপক,

প্রকাশের ভাষায় স্পষ্টতা আছে এখানে সেখানে উজ্জ্বল প্রতিমার ঝলকও দেখা দেয়। হয়ত প্রকাশের আকাংক্ষায় লেখকের মন পীড়িত-হয়েছিল, অথচ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গদ্যের দিবালোকে টেনে না এনে কাব্যের নিরালায় ঠেলে দেওয়াতেই মনের আরাম মিলেছে বেশি। রোজনামচার আকারে আত্মপ্রকাশ করলে হয়ত এ বই-এর কিছু সমাদর হত। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে লড়াই করে তাদের চোখে যুদ্ধের যে চেহারা তার সম্পর্কে একটা স্থূল বাস্তবতা এ বইয়ে আছে। কাব্যসৃষ্টির পক্ষে অবশ্যতা অতিমাত্রায় স্থূল। একথা উল্লেখযোগ্য যে বইটিতে কোথাও 'কবিতা' কথাটা উল্লেখ করা হয় নি। তাতে হয়ত লেখকের দ্বিধাটাই বেশি করে ধরা পড়েছে।

অপর তিনটি কবির মধ্যে লরেন্স বিনিয়ন সনাতনী কাব্য লিখে অল্পবিস্তর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থ 'স্যাডনেস্ অফ মার্লিন'-এও সেই গতানুগতিক ধারা অব্যাহত। জেওফ্রে মনমাউথের ভিটা মার্লিনির ভিত্তিতে লেখা এই অর্ধনাটকীয় কবিতার মধ্যে নাকি বর্তমান পৃথিবীর সম্পর্কে বহু অর্থের আমদানী করা হয়েছে, কিন্তু এই ভরসাতেও এত দীর্ঘ কবিতা সম্বন্ধে আগ্রহ মোটেই-জাগ্রত হয় না।

প্যাট্রিক কাভানার আইরিশ কবিতায় এর চেয়ে রসের স্বাদ বেশি। 'গোল ফর সেল' কবিতাটির মধ্যে একটা মাধুর্য আছে। সর্বত্রই একটা পরিমিত বোধের স্বচ্ছ প্রকাশশীলতা বর্তমান, কিন্তু আবেগের তীব্রতার স্পর্শ কোথাও লাগে না।

রেনার হেপেনস্টল অনেকের মতোই ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ, এবং অনেকের মতোই মূলত সনাতনী। এঁরও কাব্যশক্তিতে একটা স্বচ্ছতা আছে, কোথাও কোথাও সেটা বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়ে এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে সিটওয়েলের অন্যান্য কবির চেয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে, তবু পটভূমিহীন এই ধর্মবোধ চলিষ্ণুমনা পাঠকের চোখে নিষ্প্রভ ঠেকবেই।

সিটওয়েলের অন্যান্য কবিদের এই রচনাগুলি যুদ্ধোত্তর কালের হলেও সুখের বিষয় এগুলিই যুদ্ধোত্তরকালীন ইংরিজি কাব্যের প্রতিভূস্বরূপ নয়।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

মানবিক ও পরমাণবিক—বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়। ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড। দু' টাকা আট আনা।

পরমাণু (অ্যাটম) সংক্রান্ত গবেষণাকে আজ আর সমাজ-নিঃসম্পর্ক বলা চলে না। বছর পাচেক আগে 'অ্যাটম' কথাটা এদেশের অধিকাংশের কাছে গ্রীক ভাষার মত দুর্বোধ্য ছিল, মনে কোন ঢেউ তুলতো না। সাধারণ মানুষের

প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় সে ছিল একান্ত অবজ্ঞাত ও অপরিচিত। কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগস্টে হিরোশিমা আর নাগাসাকির বিরাট ধ্বংসলীলার পর পাশার দান উল্টে গেছে। সমস্ত মানবিক অস্তিত্বই যেন নির্ভর করছে অ্যাটম তথা অ্যাটমিক বোমার ওপর। সাধারণ মানুষের মনে তাই আজ প্রশ্ন : কেন এমন হল ? এই সর্বনাশা ধ্বংসের, সংশয়ের ইতিবৃত্তটা কি ? অ্যাটমিক বোমার উদ্ভাবনের ফলে জগত জুড়ে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার সমাধানের পথ কি ? বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য বইটিতে প্রশ্নগুলির উত্তর মিলবে। সেই সঙ্গেই অ্যাটমিক বোমাকে কেন্দ্র করে মুষ্টিমেয় লোভাতুর আর ভুরিভোজীদের যে গভীর ষড়যন্ত্র মানবিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে তার ইতিহাসও তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

আলোচ্য বইটিকে মানবিক ও পরমাণবিক এই দুই অংশে ভাগ করা চলে। অ্যাটমিক বোমা সংক্রান্ত যে কয়েকটি আলোচনা বা বই ইতিপূর্বে নজরে পড়েছে তাতে পরমাণু বিজ্ঞানের মানবিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস এমন সুন্দর ও সমগ্র ভাবে পাই নি। মানবিক অংশের আলোচনাটি তথ্যবহুল এবং পড়ে অ্যাটম-বোমার রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। তাই পড়ে খুবই ভাল লাগল। কয়েক জায়গায় রচনারীতির দুর্বলতা এবং ভাষার জটিলতা থাকা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর গুণে মানবিক অংশটি চিত্তাকর্ষকও হয়েছে। একবার পড়তে সুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। আলোচ্য অংশের বিভিন্ন অধ্যায়ে "পবিত্র আর্য জাতি" তত্ত্বের নূতন সংস্করণ (পৃঃ ৩৪), অ্যাটম বোমার কার্টেল ? (পৃঃ ৪৭), ভেটো বা সর্বসম্মতির নীতি (পৃঃ ৫১), সোভিয়েট প্রস্তাব—গ্রমিকো পরিকল্পনা (পৃঃ ৫৫), অ্যাটম বোমার আসল মালিক (পৃঃ ৭৮) ইত্যাদি পরিচ্ছেদে আলোচিত তথ্য সমাজ-সচেতন বিজ্ঞান-অনুরাগীদের যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলবে। রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে দলনিরপেক্ষভাবে এ কথাটা নিশ্চয়ই বলা যায়। প্রতিক্রিয়ার শিবির অ্যাটমিক বোমার বিভীষিকাকে ফেনিয়ে, ফাঁপিয়ে, তার নির্মাণ-কৌশল একান্ত গোপন রেখে, যুদ্ধের হুমকি দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কেন আতংকের আর হতাশার ধূম্রজাল বিস্তার করছে, শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলির ইউরেনিয়ম থোরিয়ম সম্পদকে নিজের কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করছে তার আসল উদ্দেশ্যটি এই বইয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রগতির লড়াইয়ের কাহিনীও বাদ পড়েনি।

প্রসঙ্গক্রমে অ্যাটমিক বোমা সম্পর্কে আমাদের জাতীয় সরকারের মনোভাব জানতে ইচ্ছা হয়। সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে থোরিয়মকে ২৩৩ পরমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়মে (ইউ ২৩৩) পরিণত করা এবং ইউ-২৩৫-এর মত ইউ-২৩৩কে পরমাণবিক বোমায় ব্যবহার করা যায়। পৃথিবীতে থোরিয়মের চেয়ে ইউরেনিয়ম দুর্লভ এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ ও ব্রেজিলেই সবচেয়ে

বেশি পরিমাণে থোরিয়ম মেলে। কাজেই ভারতের থোরিয়ম সম্পদের সংরক্ষণ, মালিকানা এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে জাতীয় সরকারের ব্যবস্থা জানতে ঔৎসুক্য জাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে বিষ্ণুবাবু এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের অনুসন্ধিৎসা মেটাবেন। পরমাণবিক বোমা তৈরির অন্যতম সরঞ্জাম 'ভারি জলে'র (হেভি-ওয়াটার) কারখানা ধ্বংসের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে দীরেপ দ্বীপে মিত্রপক্ষের হানা দেওয়ার কথাটাও বিষ্ণুবাবুর আলোচনায় থাকবে বলে আশা করেছিলাম।

পরমাণবিক অংশে পরমাণু তত্ত্বের, অ্যাটমিক বোমা উদ্ভাবনের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। মানবিক অংশের তুলনায় পরমাণবিক অংশটি খুবই স্বল্প পরিসর। পড়ে মনে হয় অ্যাটমিক বোমার মানবিক দিকটাই ফুটিয়ে তোলা লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং বিজ্ঞান-কাণ্ডটি তাঁর কাছে গৌণ। জটিল পরমাণু বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের সহজ বোধের উপযোগী করে, তার তথ্য ও সত্য অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবেশন করা সহজ নয়। অধিকাংশের মত বিষ্ণুবাবুর লেখনীও এ ক্ষেত্রে সার্থক হতে পারে নি। তাঁর আলোচনায় তথ্য ও সত্যগত কয়েকটি ভুল সাধারণ পাঠকের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। সংক্ষেপ করতে গিয়ে কয়েক ক্ষেত্রে আলোচনা অস্পষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। উপরন্তু পরিভাষা সংক্রান্ত কিছু গোলমালও আছে।

উদাহরণ হিসাবে ডেভি, ফ্যারাডে, বার্জিলিয়স, বিশেষ করে ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুল্লেখ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। পরমাণুর সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ফ্যারাডের নাম উল্লেখ না করে একেবারে আরহিনিয়াসের (আরেনিয়স ?) গবেষণার অবতারণা করায় পরমাণু বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত অনুসরণে ধারাবাহিকতার অভাব ঘটেছে। ন্যুট্রনের (নিউট্রনের) আবিষ্কর্তা হিসাবে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চ্যাডউইকের নাম বাদ পড়ে যাওয়াটা আর একটি ত্রুটি। ১৯৩২ সালে জার্মান বিজ্ঞানীদ্বয় বোথে ও বেকার আলফা কণার অভিঘাতে বেরিলিয়ম ধাতু যে রশ্মি বিকীরণ করে তাকে গামারশ্মি বলেই স্থির করেন। তারপর জোলিও-কুরী এ সম্পর্কে গবেষণা করে ঠিক ঐ একই ভুল করেন। তাঁদেরও সিদ্ধান্ত হয়, আলফা কণার অভিঘাতে বেরিলিয়ম থেকে বিকীরিত রশ্মি গামা-রশ্মি ছাড়া অন্য কিছু নয়। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হয়ে চ্যাডউইক আলফা-কণা বেরিলিয়ম অভিঘাত সম্পর্কে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত করেন যে বেরিলিয়ম থেকে বিকীরিত রশ্মি গামা রশ্মি নয়—বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ ন্যুট্রন কণা-বর্ষণ। এই ভাবে ন্যুট্রন আবিষ্কৃত হয় এবং বোথে, বেকার, জোলিও এবং কুরীর সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

বিষ্ণুবাবুর একটি উক্তি (পৃ ১২, পাদটীকা) —"পরমাণুর .... .. মর্মকেন্দ্র নিউক্লিয়স গঠিত হয় পজিটিভ বিদ্যুৎশক্তি সম্পন্ন ও বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন দিয়ে"—

ঠিক নয়। প্রোটন কি "পজিটিভ্ বিদ্যুৎশক্তি সম্পন্ন নিউট্রন?" অবশ্য এই এক জায়গায় ছাড়া এই বিষয়েই পরবর্তী আলোচনায় এ রকম ভুল আর কোথাও চোখে পড়ে নি—এর থেকে মনে হয় এটা হয়তো মুদ্রাকর-প্রমাদ। কিন্তু এ রকম ছাপার ভুল বিপজ্জনক।

সংক্রামী-বিক্রিয়ার (চেন রিঅ্যাকশন) বিস্ফোরণ-যোগ্য সংকট-মাত্রা সম্পর্কে বিষ্ণুবাবুর ব্যাখ্যা অস্পষ্ট। চতুর্থ পর্যায়ে 'সংকট মাত্রা' নামক পরিচ্ছেদে (পৃ ১৭) বিষ্ণুবাবু লিখছেন "···আগেকার নানা গবেষণাতেই জানা ছিল যে, ইউ-২৩৫ ও প্লুটোনিয়মের পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে এলে পরই সংক্রমণ ক্রিয়া সুরু হয়ে যায়। অতএব, ঐ সংকট-মাত্রার সম-পরিমাণ ইউরেনিয়ম ভাগে ভাগে রেখে ঈপ্সিত সময়ে অতি দ্রুত তাদের সংযোগ ঘটান চাই······ তাহলেই সংক্রমণ ক্রিয়ার ফলে বিস্ফোরণ ঘটবে।" শ্লথ গতি (স্লো) ন্যুট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়ম দু'শ পঁয়ত্রিশ বা প্লুটোনিয়মে সংক্রামী বিক্রিয়া সুরু হয়—কেবলমাত্র পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় আনলেই নয়। পার্থক্যটা হ'ল যে, সংকট-মাত্রার চেয়ে কম পরিমাণ ইউরেনিয়ম দু'শ পঁয়ত্রিশে (ইউ-২৩৫) বা প্লুটোনিয়মে সংক্রামী বিক্রিয়া বিস্ফোরণ ঘটায় না—নির্মল (pure) ইউ-২৩৫ বা প্লুটোনিয়মের দ্বিভাজন (fission) ধীরে ধীরে ঘটিয়ে তাদের অকেজো করে তোলে। বিস্ফোরণ হতে গেলে সংকট-মাত্রার চেয়ে বেশি পরিমাণ ইউ-২৩৫ বা প্লুটোনিয়মের সঙ্গে শ্লথ-গতি ন্যুট্রনদের অভিঘাত ঘটা চাই। (এ সম্পর্কে রাশিয়ান বিজ্ঞানী George Gamow-র Atomic Energy in Cosmic and Human Life নামক বইটির ১১৭-১১৯ পৃ দ্রষ্টব্য।)

বিষ্ণুবাবুর বইয়ে পরিভাষা সংক্রান্ত জটিলতা মানবিকের চেয়ে পরিমাণবিক অংশে বেশি প্রকট। কোন কোন জায়গায় পীড়াদায়কও বটে। এক জায়গায় (পৃ ৪) বিষ্ণুবাবু লিখছেন "ধনপ্রাণের ওপর অ্যাটম বোমার আক্রমণ নিদারুণ বিধ্বংসী হতে পারে!" আবার অন্যত্র বলছেন, "এই মৌলিক পদার্থগুলি অবিধ্বংসী।" Destructive এর পরিভাষা বিধ্বংসী হলে Indestructible-এর পরিভাষা অবিধ্বংসী হয় কি করে? Release of energy-র বাংলা 'শক্তি উৎসারণ' (পৃ ১১২) না করে শক্তি উৎস্রবণ বা শক্তি উন্মোচন করলে ভাল হয়। 'অপ্রতিষ্ঠ বস্তু' বলতে unstable thing-কেই বোঝায়, unstable element কে নয়। 'নেপচুনিয়ম অপ্রতিষ্ঠ বস্তু' বললে ঠিক বলা হয় না, তথ্যনিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয়, কারণ নেপচুনিয়ম হল অপ্রতিষ্ঠ মৌল। পরিভাষা সংক্রান্ত এ ধরনের বেশ কিছু গোলমাল বিষ্ণুবাবুর লেখায় পাওয়া যাবে। মাত্র আটত্রিশ পৃষ্ঠার মধ্যেই জটিল পরমাণু বিজ্ঞানের আলোচনা সারা হয়েছে। তাই এই ধরনের তথ্য ও সত্যগত ভুল থাকা মোটেই প্রশংসনীয় নয়।

কোনও 'বিব্লিওগ্রাফি' বা 'রিডিং-লিস্ট' না থাকায় বইটি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে নি। কয়েকটি বিদেশী সাময়িক পত্রিকা এবং পুস্তকের ইতস্তত উল্লেখে প্রয়োজন মেটে না। যদি কেউ গ্রমিকো বা বারুচ-পরিকল্পনা সম্বন্ধে অধিকতর ওয়াকিবহাল হতে চান তা হলে বিষ্ণুবাবুর বইয়ে কোন হদিশ পাবেন না। আশা করি Smyth's Report বিষ্ণুবাবু পড়েছেন। পড়ে থাকলে কোথাও তার স্বীকৃতি নেই কেন? পরিশিষ্টে পরমাণুদের ওই তালিকাটির বদলে ছবি, 'ডায়াগ্রাম' এবং গ্রন্থ-পঞ্জি বা পাঠ্য-তালিকা থাকলে বইটি বেশি কার্যকরী হত। বইটির দামও সাধারণ ক্রেতার পক্ষে একটু বেশি বলে মনে হয়।

মোটকথা, অ্যাটম বোমার যে সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক বিবরণটুকু এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে, তা পড়ে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মিটবে না। কিন্তু এই বইটির 'মানবিক' অংশ তথ্যবহুল এবং পরমাণবিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ইঙ্গ মার্কিন পুঁজিপতিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আজকের দিনের নানা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সদুত্তর এতে পাওয়া যাবে—এই দিক থেকে বইখানি উল্লেখযোগ্য।

পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি সংবাদ

প্রত্নবিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়

দিনাজপুর জেলায় বানগড় স্তূপ খননের ফলে প্রাচীন বাংলার যে লুপ্ত ইতিহাস সম্প্রতি উদ্ধৃত হয়েছে, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দিক থেকে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দু'হাজার বছরেরও আগেকার বাঙালী ইতিহাসের অনেক নতুন তথ্য এর ফলে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ইতিহাসের দিক থেকে ছাড়াও এটা আরও উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, এই স্তূপ খননের কাজ আগাগোড়া পরিচালনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নবিদ্যা বিভাগ।

বানগড় স্তূপ খননের ফলে যে সব আবিষ্কার হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ এবং ফটোগ্রাফ ইত্যাদি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। যে সব জিনিস পাওয়া গেছে, সেগুলি বিশেষ একটি প্রদর্শনী মারফৎ সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করাও উচিত। এই জিনিসগুলোর মধ্যে মুদ্রা, মাটির পাত্র, টেরাকোটা বা পোড়া মাটির নানা মূর্তি, কাচের এবং সোনার অলংকার, ব্রাহ্মী লিপি খোদাই-করা শিলমোহর ইত্যাদি পুরাতত্ত্বের দিক থেকে অমূল্য সম্পদ। বানগড় স্তূপ খুঁড়ে পরপর যে পাঁচটি স্তর পাওয়া গেছে তাতে মৌর্য বা শুঙ্গ রাজত্বের প্রথম যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে গুপ্ত যুগ, পাল রাজাদের আমল, সেন রাজত্বের কাল এবং মুসলমান শাসনের সময় পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের পাঁচটি সুস্পষ্ট অনুক্রম চিহ্নিত। বিভিন্ন স্তরে দুর্গের দেয়াল, বাঁধানো রাস্তা, ঘরবাড়ি-মন্দির-বেদীর স্থাপত্য, স্নানাগার, পাকা নর্দমা ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় যে, বানগড়ের মাটির নীচে একটি সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত নাগরিক সভ্যতার ইতিহাস এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন বাংলা বৌদ্ধ-সাহিত্যে কোটিবর্ষ নামে যে জায়গার উল্লেখ আছে সেইটাই নাকি এই বানগড় এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর "রামচরিত" কাব্যে এই বানগড়েরই মন্দিরের খ্যাতির কথা উল্লেখ করে গেছেন।

বানগড়ের এই স্তূপ খনন সবেমাত্র শেষ হয়েছে এবং এই আবিষ্কার সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। এটা হলে প্রাচীন বাঙালী সংস্কৃতির পটভূমিতে যে বহু নতুন তথ্যের আলোকপাত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার প্রসঙ্গে ভারত-সরকারের প্রত্নবিদ্যা বিভাগের এবং সাধারণভাবে ভারতের পুরাবৃত্ত-সংক্রান্ত

গবেষণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। এদেশের পুরাবৃত্ত সম্পর্কিত অনুসন্ধান ও খননের কাজ ইত্যাদি এতদিন পর্যন্ত একমাত্র আর্কেওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক পরিচালিত হয়ে এসেছে। ফলে অন্যান্য সরকারী বিভাগগুলির মতোই এই বিভাগটির কাজও দেশের জনসাধারণের আগ্রহ-ঔৎসুক্যকে বিন্দুমাত্র জাগিয়ে তুলতে পারে নি। এই বিভাগটির কাজ শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ। সুতরাং এঁদের পক্ষে দেশের লোকের সোৎসাহ সহকারিতা অর্জনের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রকে ব্যাপক করে তোলা যেমন দরকার, দেশের সর্বসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরও তেমনি এ-ব্যাপারে এগিয়ে এসে যথাসাধ্য অনুকূলতা করা উচিত। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মতো বেসরকারী পুরাতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান বাংলার বাইরে বোধ হয় আর একটিও নেই। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ যতই উল্লেখযোগ্য হোক না কেন, সংগঠন শক্তি এবং আর্থিক সঙ্গতির অভাবে এঁদের কর্মক্ষেত্র ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে আসতে বাধ্য। সেইজন্যই দেশের বিভিন্ন জায়গায় যত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি আছে, বিশেষভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহযোগিতায় তাঁরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারী প্রত্নবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে একযোগে কাজে নামেন, তাহলে অনেক অসুবিধা দূর হয়। আমেরিকা-ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই সরকারী প্রত্নবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং প্রত্যেকটি এক্সক্যাভেশন্-এর কাজে ছাত্রেরা অগ্রণী। মিশর, মেসোপটেমিয়া, উর, পেরু, ইন্‌কা, মায়া প্রভৃতি সভ্যতার ওপর সম্প্রতি যে নতুন আলোকপাত হয়েছে তার পেছনে লণ্ডন, হার্ভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নবিদ্যার ছাত্রদের দান অসামান্য। আশ্চর্যের বিষয়, এখনো পর্যন্ত ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নবিদ্যা শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নেই। যদি থাকত, তাহলে আর্কেওলজিকাল সার্ভের এ অভিযোগ টিঁকত না যে প্রত্নবিদ্যায় উপযুক্ত রকমের শিক্ষিত লোকের অভাবেই তাঁদের কাজ যথেষ্ট দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে না—এবং এ অভিযোগ যে সত্য তাও অস্বীকার করা যায় না।

আর্থিক অসঙ্গতির জন্য ততটা নয়, যতটা যোগ্য লোকের অভাবে ভারতের বহু অনুসন্ধানযোগ্য ঐতিহাসিক জায়গা আজও অনাবিষ্কৃত পড়ে আছে। প্রাক্-মধ্যযুগীয় ভারতীয় পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও যৎসামান্য। উত্তরাখণ্ডে সিন্ধু-সভ্যতার বিলুপ্তির পর (আনুমানিক খৃস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর) উত্তর-পশ্চিম ভারত পারস্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া পর্যন্ত (খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতক) এই এক হাজার বছরের ইতিহাস এখনও অতি অস্পষ্ট এবং প্রায় অজ্ঞাত। দক্ষিণাপথেও তেমনি সপ্তম শতকে পহ্লব যুগের আগে পর্যন্ত দ্রাবিড় সংস্কৃতির বিভিন্ন অনুক্রম এবং স্তরবিবর্তনের ইতিহাস মোটের ওপর আন্দাজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ-

ভাবে এই দুটি অজ্ঞাত যুগের ওপর ইতিহাসের আলোকপাত করতে হলে প্রত্ন-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং গবেষণার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। এবং এই পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং এক্সক্যাভেশন-এর যে বিরাট সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি আছে তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে হরপ্পার কোনো কোনো জায়গা পুনর্খননের মধ্য দিয়ে। আর্কেওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ষান্মাসিক মুখপত্র *Ancient India*তে (No. 3, January, 1947) হরপ্পার এই নতুন অনুসন্ধানের বিস্তৃত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে এবং সিন্ধু-সভ্যতা-সম্পর্কিত বহু অভিনব তথ্যের সমাবেশে এই বিবরণীটি অত্যন্ত মূল্যবান। হরপ্পার এই নতুন অনুসন্ধানের অনুবৃত্তি হিসাবে চারসাদার বালা-হিসারেও খননের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। এই খননের ফলে মহেঞ্জোদরোর পরবর্তী সিন্ধু-সভ্যতার অভিগমন (migration) সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং উত্তরাখণ্ডে আর্যভাষার প্রতিষ্ঠালাভের আদি যুগ আর প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির ক্ষয়িষ্ণুতার ঐতিহাসিক কাল এবং কারণাবলী আরও অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

*Ancient India*র উক্ত সংখ্যার এই রকম অনুসন্ধানযোগ্য আরও অনেক জায়গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রত্নবিদ্যায় শিক্ষিত উপযুক্ত লোকের অভাবেই যে এই অনুসন্ধান আর তথ্য সংগ্রহের কাজ ঠিকমতো এগুচ্ছে না, সে কথাও বারবার বলা হয়েছে। সেইজন্যই বিশেষ করে এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংঘবদ্ধ হওয়া একান্ত দরকার।

রবীন্দ্র মজুমদার

তাজিক কবি তুর্শুন জাদা

তাজিকিস্থানের কবি তুর্শুন জাদা গত বছর আন্তঃএশিয়া সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে আসেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কবিতা লিখে তিনি সম্প্রতি স্টালিন-পুরস্কার পেয়েছেন।

মির্জো তুর্শুন জাদা তাজিকিস্থানের নবীন যুগের যুবক কবি। সোভিয়েট-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেই তাঁর বিকাশ এবং প্রসিদ্ধি। তুর্শুন জাদার সাহিত্য-শিক্ষা হয় তাজিক গদ্যসাহিত্য-স্রষ্টা সাদ্রিদ্ ও-আইনীর কাছে এবং তাজিক পদ্যসাহিত্য-স্রষ্টা আবুল কাসেম লাধুতির কাছে।

তুর্শুন জাদা বিপ্লবের আগে লেখাপড়া শেখার কোনো সুযোগ পান নি। বিপ্লবের পরে তিনি লেখাপড়া শিখে তাজিক প্রাচীন কবি ফের্দৌসী, সাদী এবং হাফিজের

রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন। রুশভাষায় তিনি অসাধারণ পণ্ডিত হন যার ফলে তিনি রুশ ভাষায় সাদী ও হাফিজের তর্জমা সুরু করেন।

আরও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে তুর্শুন জাদা তাজিক রাজধানী থেকে মস্কো গিয়ে তাজিকিস্থানের বীর জাতীয় নেতা তেমুরমালিকের নামে একটি নাট্য রচনা করেন এবং ইতিহাস পড়ার দিকে বিশেষ করে ঝোঁকেন। মস্কোতে এক তাজিক কলা প্রদর্শনীতে তুর্শুন জাদার লেখা গীতিনাট্য 'বলশয়-থিয়েটারে' অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। তাজিকস্থানের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে গীতিনাট্যটি লেখা।

মহাযুদ্ধ যখন সুরু হল তুর্শুন জাদা তখন তাজিকিস্থান লেখক সংঘের সম্পাদক এবং তাজিক সরকারী কলা-সমিতির নেতা। তাঁর ফ্যাসিবিরোধী কবিতাগুলি দেশপ্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তিনি সম্প্রতি সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোবিয়েতের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

তুর্শুন জাদা ভারতে আসেন ভারতের জনগণের বন্ধু হিসাবে। 'চন্দ্রালোকিত গঙ্গা' নামে তিনি যে কবিতা লিখেছেন, তাতে ভারতের প্রতি নিবিড় বন্ধুত্বের আবেগ সুপরিস্ফুট। তুর্শুন জাদার কবিতায় ভারতবর্ষ অপরিচিত বিদেশী রাষ্ট্র নয়। ভারতের অস্পৃশ্য হরিজনদের উদ্দেশে তিনি যে কবিতা লিখেছেন, তার কয়েকটি পংক্তির মূল বক্তব্যটুকু এখানে দেওয়া গেল :

> অজানা দেশে অচিন আগন্তুক আমি ; দরজায় এসে দাঁড়াল এক অতিথি। আমার ঘরে ঢুকতে তার পা কাঁপে দ্বিধাভরে ; আমার হাতে হাত দিতে সাহস পায় না সে! কেন তার এই ভয় ? তার দেশে আমি তো এসেছি আমার দেশের শুভাকাংক্ষার বাণী নিয়ে। ভীরু হরিণের মত সে শেষে বলে : তোমার ঘরে যাকে তুমি আদর করে ডেকেছ সে অস্পৃশ্য সমাজে তার স্থান পায়ের নীচে। বন্ধু, তোমার এই আগমন আর আবাহন আমাদের কাছে রূপকথা হয়ে বেঁচে থাক। আমি তার স্বজাতির কাছে যেতে চাইলে সে আরো ভয় পেল। তার সেই ভয়চকিত কণ্ঠস্বর জীবনের শেষ দিনটিতেও আমার কানে বাজবে। কোনদিন ভুলবো না তার সেই দৃষ্টি, তার অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি, তার কেঁপে-কেঁপে-ওঠা শীর্ণ রোদে-পোড়া বৃষ্টিতে-ভেজা হাত দুখানি, যে হাত দুখানি সে বাড়িয়ে দিয়েছিল মহান সোবিয়েৎ ভূমির দূতের দিকে ....

মালিক ব্রিটিশ ও গোলাম ভারতের তথাকথিত শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ধোঁয়ার জাল ভেদ করে তুর্শুন জাদা দেখতে পেয়েছিলেন ভারতের পঙ্গু সমাজের ছবি, বৃটিশ-সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার রূপ! এক জায়গায় তিনি লিখছেন, "শান্তিপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট বসতির পটভূমিকায় হঠাৎ দেখি এক বিশাল বিদেশী রণতরীর আবির্ভাব!" আর এক জায়গায় কবি লিখেছেন—"বোম্বাইএর ফুল-বাগানে দেখি মার্কিন ধ্বজা। এর চেয়ে মারাত্মক ঠাট্টা আর কি হতে পারে!"

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তুর্শুন জাদার কবিতা, ছন্দবদ্ধ পত্রাবলী পরাধীন এশিয়ার প্রতি সোবিয়েৎ সমাজতন্ত্রী এশিয়ার মহাবাণীর প্রতীক। পরাধীন এশিয়া আজ জেগে উঠেছে। কবিতাগুলোর মধ্যে ভারত ও সোবিয়েতের মধ্যে আত্মার বন্ধনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বি. ভাদেৎস্কি

পত্রিকাপ্রসঙ্গ

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট : স্বাধীনতা সংখ্যা। শ্রীঅমল হোম সম্পাদিত।

আগস্ট থেকে জুন। যে-জুনের কল্পনায় নেতারা আমাদের আগস্টের পনেরো তারিখ থেকে মাতিয়ে রেখেছেন, তা আসতে আর দেরী নেই। ১৫ই আগস্ট থেকে বহু ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নেহরু সরকার সাধারণ মানুষের মনে 'স্বাধীনতা'র মোহ বিস্তার করতে চেষ্টা করে এসেছেন। তাঁদের এই চেষ্টায় তাঁরা সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থন পেয়েছেন ভারতের 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকাগুলির কাছ থেকে। 'স্টেটসম্যান' থেকে 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার', 'যুগান্তর', 'জনতা', 'শনিবারের চিঠি', 'মডার্ন রিভিয়ু', 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাগজ এই ক'মাসের মধ্যে শতাধিক বিশেষ স্বাধীনতা সংখ্যা প্রকাশ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গ নিয়ে বিলাতের আর আমেরিকার কাগজগুলো দিনের পর দিন প্রচার করেছে—ভারত তার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, ভারতের সেরা বিপ্লবী নেহরুর নেতৃত্বে সেখানকার মানুষ স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদ পেয়েছে! আর স্বদেশী কাগজগুলো প্রচার করেছে—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর যে দুই শতাব্দীর সংগ্রাম, তা আজ শেষ পর্যন্ত সাফল্যে রূপান্তরিত হয়েছে ভারতের নামকরা কংগ্রেসী নেতাদের যোগ্য পৌরোহিত্যে। 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকাগুলোর পাতায় পাতায় সিপাহী বিদ্রোহ, অগ্নিযুগের বিপ্লবী কাহিনী, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সাধনা, অসহযোগ আন্দোলন, আগস্ট বিপ্লব, মেদিনীপুরের বিদ্রোহী ইতিহাস, আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব লেখা হচ্ছে। আর প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে যে দুই শতাব্দীর এই দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে সফল পরিণতি হয়েছে ১৫ই আগস্টের বহু-প্রচারিত স্বাধীনতায়।

আসল কথা, ১৫ই আগস্টের মেকি স্বাধীনতার কলঙ্ক আর বুর্জোয়া নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা ঢাকতে আজ রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম-কানাইলাল-সূর্য সেনের নামে নিত্যনূতন শপথ নেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়া নেতৃত্বের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হিসাবে দৈনিক আর সাময়িক পত্রিকাগুলো প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে এই প্রচারের দ্বারা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে। জুন মাস এসে পড়েছে। অথচ এই ক'মাসের মধ্যেই বুর্জোয়া

নেতৃত্বের আসল চেহারা জনসাধারণের সামনে একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে। নেহরু সরকার আজ পর্যন্ত বৃটিশ ও ভারতীয় কায়েমী স্বার্থের চাপে বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করে নি। শিল্পে জাতীয়করণের নীতি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের খাদ্য-বস্ত্র-চাকরি ও শিক্ষার সমস্যা সাম্রাজ্যবাদের কলুষিত ঐতিহ্যের ডাস্টবিনে ধামাচাপা পড়ে আছে। হাজার হাজার নিরস্ত্র শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বাঁচার সংগ্রামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিতালি আর স্বদেশের গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আঘাত হানার চেষ্টায় নেহরু সরকারের গণতন্ত্র ও নিউট্রালিটির মুখোস খুলে গিয়েছে।

'৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর বার্ষিক সংখ্যা স্বাধীনতা সংখ্যা হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আলোচ্য সংখ্যার মূল প্রবন্ধটির সুর থেকে এই কথাই মনে হয়—লেখক ও সম্পাদক পাকা সাংবাদিকের মতো গুরুগম্ভীর আলোচনার নামে বাস্তব সত্যকে বিকৃত করে পণ্ডিতজীর পক্ষকে সমর্থন করার বেশ কুশলী জাল বুনেছেন প্রবন্ধের ফাঁকে ফাঁকে। কাঁচা সাংবাদিকের মতো নেহরু সরকারের কাঁচা কাজকে তিনি বাহবা দিয়ে নিজেকে হাস্যাস্পদ করেন নি। তিনি প্রয়োজন মতো সিপাহী বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের মহান ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়েছেন। বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের কাছে কংগ্রেসের নেতৃত্বের ঘৃণ্য আত্মসমর্পণকে তিনি রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের সাফল্যময় পরিণতি বলে এক বিভ্রান্তির অবতারণা করেছেন। এই পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী মূল প্রবন্ধটির নাম— 'দি রাইজ অ্যাণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম' (লেখক—সুরেশচন্দ্র দেব ও অমল হোম)। প্রবন্ধে কংগ্রেস আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্য যেমন ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে, তেমনি সংগঠিত গণ-আন্দোলনের বিরাট ইতিহাসকে কয়েকটা নামের উল্লেখ করেই সেরে দেওয়া হয়েছে। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কৃষক সভা প্রভৃতি সংগঠিত গণ-আন্দোলনের যে-ধারা গড়ে তুলেছে তার রক্তাক্ত ইতিহাসকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে ধামা-চাপা দেওয়া হয়েছে। ভারত-লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও 'শক্ত মানুষ' সর্দার প্যাটেল থেকে 'সমাজতন্ত্রী' নেত্রী অরুণা আসফ আলি পর্যন্ত দেশপ্রেমিকদের শতাধিক ফটো এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে, কিন্তু শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের আসল নেতাদের ছবি তো দূরের কথা, পরিচয় পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠা জানিয়ে লেখকরা সাংবাদিক সততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন! আরও লক্ষ্যণীয়, লেখকরা মাঝে মাঝে মার্কসের ভারত-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করে ও দু'এক জায়গায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও ডাঙ্গের কথা তুলে একদিকে প্রগতিশীলতা ও অন্যদিকে পক্ষপাতহীনতার পরিচয় দিতে চেষ্টা

করেছেন। আসলে নেহরু সরকারের স্তাবকদের মুখে 'শ্রেণী-সচেতনতা' ও 'কার্ল মার্ক্স' প্রভৃতি বুলির অবতারণা আজ বুর্জোয়া শিবিরের দেউলিয়াপনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারতীয় মুসলিম রাজনীতির বিচারেও বুর্জোয়া চিন্তাধারার ঐ দেউলিয়াপনাই নতুন করে উদ্ঘাটিত হয়েছে। লেখক ভারত-বিভাগের জন্য কংগ্রেসের নীতির ব্যর্থতার বিচার না করে শুধু মুসলিম রাজনীতিকদের একগুঁয়েমি, ভেদবুদ্ধি ও দেশদ্রোহিতাকেই বার বার চাবুক মেরেছেন গতানুগতিকভাবে। সাম্প্রদায়িকতার বশে ওহাবী আন্দোলনের বৃটিশ-বিরোধী চেহারাকে তিনি দেখতে পান নি, শুধু দেখেছেন তার গোঁড়ামিকে, তার সাম্প্রদায়িকতাকে। আর ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে মুসলিম লীগ রাজনীতির পারম্পর্য আবিষ্কার করে লেখক পাণ্ডিত্যের কসরৎ দেখিয়েছেন। 'ইণ্ডিয়ান রেভলিউশনারিজ অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' নামক প্রবন্ধে (লেখক—রমেশচন্দ্র রায়) লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু নতুন তথ্যের সঙ্গে পাঠক পরিচিত হবেন। সমগ্রভাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন হিসাবে প্রবন্ধটি অপূর্ণাঙ্গ ও অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট। সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে বাংলার বীর নারীদের কোনো সন্ধান মেলে না। তা ছাড়া, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতাদের নাম উল্লেখ সম্বন্ধে লেখকের কার্পণ্য বিস্ময়কর! বারীন ঘোষ, পূর্ণ দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এবং ছবির সঙ্গে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ বা লোকনাথ বলের নাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরবতা অর্থপূর্ণ নয় কি? অপর একটি প্রবন্ধে গান্ধীজির অহিংসা নীতির ব্যাখ্যা করেছেন বাংলার প্রধান মন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। যিনি বাংলার নিরীহ কৃষক ও শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়ে ও ডাণ্ডাবাজি করে এরই মধ্যে বাংলা দেশে বেশ নাম কিনেছেন তাঁর চেয়ে অহিংসা মন্ত্রের যোগ্য ব্যাখ্যাকার কি সম্পাদক মহাশয় খুঁজে পান নি? হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'ক্যালকাটা—দি বার্থপ্লেস্ অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম' নামক প্রবন্ধ গতানুগতিক, তবে তথ্যবহুল।

অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তৃতার বা লেখার অংশবিশেষের সংকলন, বাংলার মনীষীদের ছবি ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনার ফটো প্রভৃতি এই সংখ্যাটিকে একটি স্থায়ী মূল্য দেবে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হাজার মতবিরোধ সত্ত্বেও বিষয় ও চিত্র নির্বাচনে সম্পাদকের পরিচ্ছন্ন রুচির ও সাংবাদিক বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা না করে পারি না।

নরহরি কবিরাজ

আলোচনা

ইন্দোনেশিয়ার কবিতা

দু' হাজার বছরেব পুরানো সভ্যতার বাহক ইন্দোনেশিয়া—সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতেরই এক নাতিদূর সম্পর্কেব জ্ঞাতিভ্রাতা। কাঠ আর ধাতুর বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে 'গামেলান' গান, 'ওয়্যাঙ্গ' ছায়ানাট্য ও 'তড়ি' নৃত্যের চমৎকারিত্ব ইন্দো-নেশীয়রা অর্জন করেছে হিন্দু বহিরাগতের বাণিজ্যতরী সে দেশের মাটিতে ঠেকবার আগেই।

দ্রুত ধীরগতি ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি থেমে গেল এসে ডাচ সাম্রাজ্যবাদীর আমলে। সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে শিল্পের কী মূল্য, কবিতার অর্থ কতটুকু? মৃতপ্রায় পুরানো শিল্পগুলিকে বাঁচাবার চেষ্টা যাও বা কিছুটা হল—নূতন শিল্পসৃষ্টি কাব্য-সৃষ্টির কোন প্রেরণাই শাসক শ্রেণীর তরফ থেকে এল না।

তবু আর এক শিল্পসেবকের ধারা এই ডাচ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার, নির্বাসন, দারিদ্র্য উপেক্ষা করে জনতাকে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে জাগরূক করতে লাগলেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের দৃঢ় বিশ্বাস এই শিল্পসেবকদের শক্তি যুগিয়েছে।

কিন্তু হিন্দু-অদ্বৈতবাদ, পূর্বপুরুষ উপাসনা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মীয় প্রেরণা আর বর্তমান শিল্পসেবকদের শক্তি যোগাতে পারল না। বিশ্বব্যাপী নূতনাভিমুখী গতি ইন্দোনেশিয়াকেও ধাক্কা দিল।

আজ তাই সারা ইন্দোনেশিয়ার মর্মকথা 'নূতন মানুষ' আর নূতন জীবন, যার অর্থ স্বাধীনতা। ওখানকার কবিদের ব্যক্তিগত প্রেমে, ভাস্কর্যে, 'সালো' নদীর সৌন্দর্যের জনপ্রিয় গানে, অঙ্কনে, 'সান্ডিওয়ারা' মঞ্চাভিনয়ে আজ ইন্দো-নেশিয়ার লেখকরা জীবন এবং মুক্তির সেই নূতন মানুষকেই খুঁজছে।

এই নূতন অনুসন্ধান ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্যে-কাব্যেও আলোড়ন তুলেছে। ইন্দোনেশীয় সংবাদ-পত্রিকা "মার্দেকা"র কয়েকটি সংখ্যায় সাম্প্রতিক ইন্দোনেশীয় কবিতার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া গেল, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯২৬ সালে মালয় ভাষাকে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার পর থেকে এই নূতন ধারার আরম্ভ হয়। এই নূতন সাহিত্য আন্দোলন 'পুজ্ঞানগগা বারু' নামে একটি মাসিক পত্রকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে ওঠে।

কি ডাচ আমলে, আর কি জাপানী আমলে রাজনীতি ও সমাজনীতিমূলক যে-কোনো লেখাই দমননীতির হাত হতে অব্যাহতি পেল না—কাজে কাজেই অধ্যাত্মের ছায়ায় কিম্বা রোমান্টিসিজিমের আশ্রয়ে কবি-লেখকেরা আশ্রয় নিলেন।

এ অবস্থা কেটে যায় ডাচ আর জাপানী আধিপত্য দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। জনমনের দিকে শিল্পীরা এগিয়ে আসেন। ইন্দোনেশীয় কবিতা তিনটি বিশেষ স্তবের মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগে এসেছে। ডাচ যুগের রোমান্টিক স্তর, জাপানী অধিকারের জাতীয়তার স্তর এবং জাপমুক্তির পর অভ্যুদয়ের স্তর।

আমীর হামজাহ্ প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। 'পুজানগগা বারু' পত্রে প্রেম, চাঁদ, ফুল প্রভৃতির কবি আমীর হামজাহ্ এ যুগের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। 'প্রতীক্ষা' কবিতায় তিনি বলছেন—

গোধূলির অন্ধকার নেমে এলো পাহাড়ের পরে
ছড়ালো উজ্জ্বল আলো আকাশের পূর্ণতম চাঁদ,
রাত্রির সুগন্ধি আর সুতীব্র খুশিতে যায় ভরে
আমাদের অবসরে বলে ওঠা মৃদুকলনাদ।

প্রকৃতির প্রতি কমনীয়তা তাঁর একটি লক্ষণ :

গাছের পাখির কাছে এ গান আমার
ব্যাধের বাঁশির মতো। স্তব্ধ ছিল বলে
আমার দুখানি ঠোঁট, হৃদয়ের দ্বার
তোমার উদ্দেশে শেষে আজ গেছে খুলে।

এর পরে আমরা পাই একজন গীতিকবি এ. হাস্মিকে—এঁর মধ্যে ধর্মগত প্রেরণা রয়েছে :

স্বচ্ছতম আজকের আকাশ
একটিও মেঘখণ্ড এ আকাশ হয় নাই পার,
নীলচে নরম এক কার্পেটের পরে
সাজানো মুক্তার মতো লক্ষলক্ষ নক্ষত্রের হাসি
আজকে এমন ভালো লাগে।
আমি তো জানি না কোথা ঘোরে ভবঘুরে
হয়তো বা আত্মা তার····হয়তো বা শরীরী সত্তার
ভেসে যায় আকাশের বুকে
ছিঁড়ে যায় তারার স্ফুলিঙ্গ।
আহা সে অনন্ত অভিসারে আমার এ দেহ নয়
আমারই একান্ত আত্মা আজ ছুটে চলে
বিশ্ব-অধিপের দিকে সীমাহীন আলোর উদ্দেশে
তাঁরই চরণতলে রেখে দিতে আমার এ সংকুচিত গান।

এর পরে এল সাড়ে তিন বৎসরের জাপানী আধিপত্য। জাপানী ভাববাদের বীর-পূজা, অতি-জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি 'কেবুদেয়ান তিমুর' (প্রাচ্য-সংস্কৃতি)

নামক জাপ পরিচালিত পত্রিকায় প্রবল হয়ে উঠল। জাপানীদের তৈরি করা P E T A নামে ভলান্টিয়ার দলের উদ্দেশে লেখা এক তরুণ কবি উস্‌মার ইস্‌মাইলের কবিতা 'তোমার গান শুনি' কবিতায় এর প্রমাণ মেলে—

প্রভাতী আলোর গানে তোমারই তো শুনি কণ্ঠস্বর,
বিশ্ব-অধিপের কাছে ভিক্ষা করো করুণা ও সুখ,
বিশ্বাসের বীজ তুমি ছড়িয়েছ অন্তরে আমার,
তুমিই তো অগ্রদূত বয়ে আনো যুগের গৌরব।
তুহিন শীতলে আজ পুনর্বার জেগেছে শোণিত,
জেগেছে শিরায় আজ নবাগত উত্তাল জোয়ার,
বন্যার আবেগে আমি বাসনাকে করি অনুভব,
গর্বভরে তোমাতে নির্ভর করি—বন্ধু আজিকার।

কিন্তু জাপানী অতি-জাতীয় ভাববাদের কবলে বেশি দিন ইন্দোনেশিয়ার কবিরা থাকলেন না। এ কুয়াসা থেকে মুক্ত হয়ে একটা সত্য খাঁটি সুস্থ জাতীয়তার প্রেরণায় কবিরা উদ্বুদ্ধ হলেন। এইটাই হল দ্বিতীয় স্তর। জাপানীদের কঠোর দমন-নীতির ভেতর থেকে এই সমস্ত নবচেতনা-সম্পন্ন মানবতাবাদের কবিতা লোকচক্ষুর সম্মুখে বেশি মুক্তি পায়নি। তবু, ধর্মের ছাপ থাকার জন্য নীচের কবিতাটি ছাড়া পেয়েছিল। কবির নাম এ. কর্তাহদিমাদিয়া

আমি ছিলাম বন্যার কবলে
গর্জমান তরঙ্গের আঘাতে
ছিলাম শক্তিহীন···দোদুল্যমান।
হে রহস্যময় শক্তি
এমন সময় তুমি এলে আমার মধ্যে
নবমানবের আত্মস্থ শক্তির চেতনা
আমাকে দিলে।
সমুদ্রের ফেনিলতা আর টেনে নামাতে পারবে না,
অজেয় পাহাড়ের মতো আমি বাঁচব সৃষ্টির সেবায়।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে কাব্যের আত্মার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্গিকেরও পরিবর্তন হল। ছন্দবদ্ধ কবিতার বদলে ফ্রি ভার্সের প্রবর্তন হল।

কাব্যের তৃতীয় স্তরে ভাবাবেগের তীব্রতা এবং সততা উপভোগ্য। ইন্দোনেশীয় কাব্যে স্থূল ভাষায় আধুনিকতার প্রবেশ এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। একটি একান্ত ব্যক্তিগত ধরনের কবিতার উদ্ধৃতি থেকে এটা বোঝা যাবে। কবিতাটির লেখক চৈরিল আনোয়ার। কবিতার নাম 'অসম' :

আমি জানি ঘটনা এইভাবে বয়ে যাবে :
তোমার বিয়ে হয়ে যাবে···ছেলেমেয়ে হবে, তুমি হবে সুখী।

আর আমি এদিকে ঘুরে বেড়াব যাযাবরের মত
অভিশপ্ত এবং দেবতার কাছে বাক্‌দত্ত।
আমি এই অন্ধ দেয়ালটায় হাতড়িয়ে বেড়াই
এখানে কোনো দরজা খোলা নেই—একটুও না।
তার চেয়ে ভালো এস আমরা নিভিয়ে ফেলি
এই আগুনের শিখা।
কেননা এ তোমাকে একটুও কলঙ্কিত করবে না
আমাকেই শুধু জ্বালাবে
আমার অস্থি পর্যন্ত।

অমল্ হামজাহ্-র লেখা একটি নৈরাশ্যবাদী কবিতার আংশিক উদ্ধৃতি :

হে আমার দেহ
যদি তুমি ধ্বংসই হয়ে যাবে
তবে এক টুকরো পাথরের মতো
ডুবে যাও সমুদ্রের গভীরে,
থাকবে শুধু একটা গোলাকার বৃত্ত
ক্রমশ বাড়তে বাড়তে তা মিলিয়ে যাবে,
বলে যাবে
একদিন কিছুক্ষণের জন্য আমি এই পৃথিবীতে ছিলাম।

রিভাই আপিন—এই তরুণ কবির উদ্ধৃতি দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করছি। তৃতীয় স্তরের এই কবিই সর্বাপেক্ষা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। কবিতাটির নাম 'নেতার প্রতি':

দরজায় ধাক্কা দাও
ওটা তোমার কাছে খুলে যাবে।
কিন্তু তাই বলে
তোমার দেহের ভারে
সমস্ত পথটা তুমি আটকে ফেলো না,
তাহলে আমাদের জন্য আর কোনো জায়গা থাকবে না।
একলাই সরে যাও।
ঢুকতে দাও সূর্যালোককে,
তোমার ছায়া দিয়ে তুমি আমাদের ছায়া ঢেকে ফেলেছ।
কিন্তু আমরা চাই আরো আলোর উত্তাপ।
তুমি যে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ,
একটু পাশে সরে যাও না,
যাতে আমরাও পেতে পারি স্বাধীনতার উত্তাপ।

এই হল ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক কাব্যপরিচিতির অতি-সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র। আজ আমাদের কাছে ইন্দোনেশিয়া সুহৃদের মতো অনেকটা কাছাকাছি রয়েছে। তার সংগ্রাম আমাদের সংগ্রামেরই সমধর্মী। তার কাব্যপরিচয়ের মধ্য দিয়ে যে রূপ সে রূপ আমাদের কাছে তাই অনাত্মীয় নয়। আয়নার সম্মুখে দণ্ডায়মান ইন্দোনেশিয়ার কবি হাউতুরুকের বাণীই আজ ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় বাণী—'আমি আমাকে দেখছি—তার থেকে বেশিও নয় কমও নয়'।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

সপ্তদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৫৫

সাহিত্যবিচারে মার্কসবাদ

মার্কসবাদের প্রথম প্রস্ফুট প্রকাশ কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণাপত্রে। ১৮৪৮ সাল ইওরোপের ইতিহাসে 'বিপ্লবের বৎসর' বলিয়া খ্যাত। ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গণ-অভ্যুত্থানের তরঙ্গ বহিয়া যায়। ঘোষণাপত্রের তরুণ রচয়িতারা বিপ্লবের পরিণামে সমাজবাদের যে প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। প্রত্যেক দেশেই বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। তবুও আজ ঠিক একশত বৎসর পরে পৃথিবীর দেশে দেশে বিপ্লবী জনগণের মধ্যে ঘোষণাপত্রের শতবার্ষিকী প্রতিপালিত হইতেছে। ঘোষণাপত্রের প্রকাশ বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাসে স্মরণীয়তম ঘটনার অন্যতম। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ধনবাদের উচ্ছেদ ঘটাইয়া বিশ্বব্যাপী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত এই ঘোষণাপত্রের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

একটি ক্ষীণকায় বিপ্লবী গোষ্ঠীর অব্যবহিত করণীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ আজ এই বৃহৎ গৌরব অর্জন করিল কেমন করিয়া। কেমন করিয়া সম্ভব হইল, শতবর্ষ পূর্বে ঘোষণাপত্রের অকস্মাৎ আবির্ভাবের কথা স্মরণ করিলে মনে পড়ে কবির উক্তি—পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ? তাহার কারণ, এই উচ্চতায় অধিরোহণ করিতে মার্কস ও এঙ্গেলস্‌কে প্রথমে পৃথকভাবে ও পরে যুক্তভাবে যে অসামান্য প্রস্তুতির ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহা তখন ছিল মেঘাবৃত, লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা। একশত বৎসরের ইতিহাস এই বিরাট যুগ্ম প্রতিভার বহুমুখীন কৃতিত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে, যাহার আয়োজনে ও সার্থকতায় লেনিন্ ও স্টালিনের নাম সর্বাগ্রগণ্য। তত্ত্ব হিসাবে আজ যাহা মার্কসবাদ বলিয়া পরিচিত তাহা প্রধানত এই চারি মহাপুরুষের অভূতপূর্ব প্রতিভার অবদান। এখন ইহা প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত যে মার্কসবাদ মাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মপন্থায় নয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতেও যুগান্তরের প্রবর্তন করিয়াছে, যদিও এই পরিবর্তনের পরিমাণ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অবধি নাই

মার্কসবাদীর মতে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (মার্কসবাদের দার্শনিক অভিধা) একটি পরিপূর্ণ বিশ্ববীক্ষা। ইহাতে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক অভিব্যক্তির স্বতোবিরোধহীন এবং পরীক্ষা-নির্ভর বিবৃতি পাওয়া সম্ভব। ইহা হেগেলের বিশ্ববীক্ষা হইতে উদ্ভূত হইয়াও তাহার ঐকান্তিক নিরাকরণ। হেগেলের উদ্ভাবিত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ইহাতে অঙ্গীকৃত, কিন্তু তাঁহার ভাববাদী সিদ্ধান্তগুলি ইহাতে অস্বীকৃত। বস্তুবাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মার্কসবাদে জড়বাদী বিজ্ঞানকে ও ভাববাদী দর্শনকে সমন্বিত করিয়াছে। মার্কসবাদ, এক কথায়, দার্শনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দর্শন। এঙ্গেলস্, লেনিন, কড্‌ওয়েল ছিলেন বিজ্ঞানে পারদর্শী; আর লাঁজভ্যাঁ, ক্যুরী, হলডেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রয়োগে বিশ্বাসবান।

যে কোন ব্যক্তির পক্ষে মার্কসীয় দর্শন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে যাহা সকল দর্শনের মূলপ্রশ্ন—কে আগে, জড় না চৈতন্য? অর্থাৎ চৈতন্য হইতে জড়ের উদ্ভব, না জড় হইতে চৈতন্যের? বলা বাহুল্য, নিছক তর্কের দ্বারা এ প্রশ্নের সমাধান হয় না। এই ধরনের তর্কযুদ্ধের একটি উপাদেয় বর্ণনা পাওয়া যায় আনাতোল ফ্রাঁস-এর একটি উপন্যাসে :

One camp maintained that before there were apples there was The Apple; that before there were jackanapes there was The Jackanapes; that before there were lewd and greedy monks there were The Monks, Lewd- ness, and Greed; that before there were feet to kick and backsides to be kicked. The Kick in the Arse existed from all eternity in the bosom of God.

The other camp replied that on the contrary apples gave man the idea of The Apple, jackanapes the idea of The Jackanapes, monks the idea of Monk, Greed and Lewdness. and that the kick in the backside existed only after having been duly given and received.

The players grew heated and came to fisticuffs. I was an adherent of the second party which satisfied my reason better.

আনাতোল ফ্রাঁস-এর মতো মার্কসবাদীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যুক্তিপ্রয়োগের পক্ষ সমর্থন করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যান্ত্রিক জড়বাদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যান্ত্রিক জড়বাদ জড় ও চেতনের পরস্পর প্রভাবশীলতা স্বীকার করে না, ও তাহাতে বিবর্তনজনিত অভিব্যক্তির স্বীকৃতি নাই। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে, চৈতন্য জড় হইতে উদ্ভূত হইয়াও জড়ের উপর প্রতিঘাত ও তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে। এই মতানুসারে জড়ের জড় প্রকৃতি সনাতন নয়,

তাহারও বিবর্তন আছে। অ্যাটমেরও আছে ইতিহাস। সে ইতিহাস অলৌকিক নয়। তাহাও বিবর্তনবিধির নিয়মাধীন। জড়েরও অন্তরে আছে দ্বন্দ্ব যাহা তাহাকে নিয়ত ঠেলিতেছে পরিবর্তনের অভিমুখে। এই গতিশীলতা, নিয়মানুগ পরিবর্তনশীলতা, মার্কসবাদীর মতে, ইহাই হইতেছে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের চরম সত্য।

মানবের সামাজিক ইতিহাসও বিবর্তনশীলতার সাক্ষ্য দেয়। মানুষ সামাজিক জীব। তাহাকে সমাজ বাঁধিতে হইয়াছে জীবিকা-নির্বাহের তাড়নায়। জীবিকা-নির্বাহের জন্য যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন। প্রকৃতিদত্ত আহার্য আহরণের পরিবর্তে মানুষ যেদিন যন্ত্র বা হাতিয়ারের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন করিতে শিখিল সেদিন হইলে পশুত্ব হইতে পৃথক মনুষ্যত্বের সূত্রপাত। যন্ত্রের সাহায্যে সে শিখিল প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে। প্রকৃতির সহিত এই সংগ্রামে সে শিখিল তাহার ইচ্ছার বাহিরে আছে প্রকৃতির নিজস্ব সত্তা। প্রকৃতিতে কেমন করিয়া ঘটনাদি ঘটে ও কেমন করিয়া তাহাদিগকে ঘটাইতে পারা যায়—ইহা লক্ষ্য করিতে করিতে সে চিনিতে শিখিল প্রাকৃতিক হেতুবিধির আত্মেতর অবশ্যম্ভাবিতা। ক্রমে সে শক্তি অর্জন করিল প্রাকৃতিক বিধিকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োগ করিবার। প্রকৃতির দাস না থাকিয়া সে প্রকৃতির প্রভু হইয়া দাঁড়াইল।

উৎপাদনের জন্য এই যে পরিশ্রম আদিম যুগে তাহা ছিল সামূহিক, গোষ্ঠীবদ্ধ। অনেক হাতকে এক সঙ্গে খাটিতে হইত, তাহার জন্য প্রয়োজন হইল ইচ্ছা জ্ঞাপনের। পশুর মত চীৎকার তাহাতে যথেষ্ট না হওয়ায় মানুষের কণ্ঠস্বর হইল স্পষ্টতর ইচ্ছা-দ্যোতক। উৎপাদনের এই পদ্ধতি হইতে ভাষার উৎপত্তি। ভাষার শ্রেষ্ঠতম ব্যবহার কবিতার ছন্দ-স্পন্দে। তাহাও উৎসারিত হইয়াছে জীবিকা সংগ্রহের সামূহিক প্রচেষ্টা হইতে, বহু ভাষাবিজ্ঞানী ইহা স্বীকার করেন। মার্কসবাদী ভাষার ও ছন্দ-স্পন্দের অলৌকিক আবির্ভাবে বিশ্বাস করে না।

ভাষা সাহিত্যের বাহন। ভাষা মানুষের ভাবপ্রকাশের ও জ্ঞাপনের মাধ্যম। ভাষার তারতম্যের উপরে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ভর করে। কিন্তু ভাষাবোধ ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সামাজিক ঘটনা। তাই সাহিত্যের বিচারে মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে। তাহার মতে, সাহিত্য সৃষ্টি করিবার সময়, বা কেবলমাত্র সাহিত্যের রস সম্ভোগ করিবার সময়, কেহ সমাজতাত্ত্বিক না হইয়া নিছক সাহিত্যিক থাকিতে পারেন। কিন্তু যখনই উপভোগের সীমা পারাইয়া বিচারের ক্ষেত্রে উপনীত হইতে হয় তখনই প্রয়োজন হয় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর। কোন কিছুকে বিচার করিতে গেলে তাহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সাহিত্য সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার ফল, মুক্তা যেমন শুক্তির। তাই সাহিত্যের বাহিরে দাঁড়ানোর অর্থ, দাঁড়ানো সমাজের ভিতরে। এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই সাহিত্যের বিচার ব্যক্তিগত উপভোগ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

সাহিত্য বিচারে প্রয়োজন হব মূল্যজ্ঞান নিরূপণের। কোন ব্যক্তির পক্ষে সাহিত্যিক মূল্যজ্ঞান তাহার বিশ্ববীক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মূল্যজ্ঞানের পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। তাই মার্কসবাদীর সাহিত্যবিচার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদেরই অঙ্গ—সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের প্রয়োগ।

মানুষের সমাজ স্থিতিশীল নয়, চলিষ্ণু। এই চলার মূলে আছে সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। বর্তমান কাল হইতে অতীতের যতদুব পর্যন্ত লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণীসংগ্রামই মানবসমাজের গতিশীলতার প্রধান উৎপাদক। শ্রেণীসংগ্রাম নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহের উপায়স্বরূপ উৎপাদন যন্ত্রাবলীর বিবর্তনের উপর। এগুলির উপর কাহার কি পরিমাণ কর্তৃত্ব, তাহা দিয়াই শ্রেণী-সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়। আদিম গোষ্ঠী-সমাজ প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে ভাঙিয়া যাইবারপর হইতে দেখা যাইতেছে সমাজের একটি অংশের স্বল্পসংখ্যক লোক জীবিকার্জনের হাতিয়ারগুলির উপর প্রভুত্ব করে ও সমাজের অপর অংশের বহুসংখ্যক লোক তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পরবিরোধী না হইয়া পারে না। ইহাব এক শ্রেণীর স্বার্থ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে অটুট রাখা, অপরেব স্বার্থ ইহাকে বদলাইযা স্ববশে আনা। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রেরণায় মানব-সমাজের ইতিহাসে নানা বিবর্তন ঘটিয়াছে। ক্রীতদাস ও ভূমিদাস-সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে বেতনদাসসমাজ আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। অবশ্য কয়েকটি দেশে সমাজবাদী সমাজেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মার্কসবাদীর মতে, যতদিন বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী সমাজ—সমাজবাদী সমাজ যাহার প্রথম ধাপ—প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিন এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের একান্ত সমাপ্তি হইতে পারে না।

সাহিত্য সমাজ-মানসের ভাষাগত প্রকাশ। সমাজ-মানসের বিকাশও যুগে যুগে বিবর্তিত হইতেছে। তাই সাহিত্যেও নানা যুগধর্ম প্রকট। ট্রাইবাল যুগ, ফিউডাল যুগ, বুর্জোয়া যুগের সাহিত্যের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। যাহা সহজে চোখে পড়ে না তাহা হইতেছে ইহাদের উপর শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাব। ইহার অভাবে সাহিত্যের মূল্যনিরূপণ ব্যক্তিগত রুচির স্তরে থাকিয়া যায়, বৈজ্ঞানিক বিচারের স্তরে উন্নীত হয় না। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে উৎপাদনের শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ জীবনধারণের উপায়গুলিকেও নিয়ন্ত্রিত করা। মানুষ সব সময়েই অর্থনৈতিক কার্যে নিযুক্ত না থাকিলেও তাহার সকল কার্যেরই মূলে আছে অর্থনৈতিক প্রভাব। তাহার সকল কার্যের অর্থনৈতিক ফলাফল আছে বলিয়াই তাহার শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত না হইয়া উপায় নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এই সংগ্রামে যোগ দিতেই হয়। যেখানে সংগ্রাম চলিয়াছে ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, সত্যের সহিত মিথ্যার, অথবা সঠিকতার সহিত ভ্রমের,

কোন্ সহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক তাহাতে যোগ না দিয়া পারেন? না দিলে কর্তব্যে অবহেলা করা হইবে, একথাও বলা যাইতে পারে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে স্থায়, সত্য, সঠিকতা, অন্যায়, মিথ্যা, ভ্রম ইত্যাদি ভাবগুলি শ্রেণীদ্বন্দ্বের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; অর্থ নৈতিক মানদণ্ড বাদ দিয়া ইহাদের বিচার করা চলে না। যে জীবন হইতে তাঁহারা সৃষ্টি বা উদ্ভাবনার উপাদান সংগ্রহ করেন তাহা সর্বদাই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাবে প্রভাবিত।

মানব-সমাজ বিবর্তিত হইতেছে মানিয়া লইলেই প্রশ্ন থাকে, তাহা যে উন্নতির অভিমুখে যাইতেছে তাহার প্রমাণ কি? কোন নীতির মানদণ্ডে বিচার হইবে শ্রেণীহীন সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চেয়ে উন্নততর? উত্তরে বলা যায়, বিবর্তন ধারার সেই স্তরকে তাহার পূর্বগামী স্তর অপেক্ষা উন্নত বলা যায় যাহা পূর্বতন স্তরের গুণকে অধিগত করিয়াও নূতন গুণের বিকাশ ঘটাইতে পারে। জীবিত প্রাণীর জৈবিক প্রক্রিয়া সম্যক বুঝিতে গেলে কেবল অ্যাটম বা ইলেকট্রনের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। অথচ জীবদেহের অস্তিত্বের জন্য ইহাদের পূর্বাস্তিত্ব অপরিহার্য। মানুষের অস্তিত্ব না থাকিলেও অ্যাটম, ইলেকট্রন থাকিতে পারে, কিন্তু অ্যাটম-ইলেকট্রন না থাকিলে মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। জীবদেহ জড় জগৎ হইতে উদ্ভূত হইয়াও তাই জড় জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। ইহা এক নূতন প্রকাশ। এ নূতনের অর্থ নয় পুরাতনের রদবদল, ইহা গুণগত উল্লম্ফন, চৈতন্যের আবির্ভাব। এই চেতন জীব আবার পর্যায়ক্রমে অচেতন জড়বস্তুকে পরিবর্তিত করিতে পারে, ও সেই সঙ্গে আপন প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটায়। এই বিচার অনুযায়ী দেখা যায় মানুষের সমাজও ক্রমিক উন্নতির পথে চলিয়াছে, চলিয়াছে তাহার চরম কাম্যের সার্থকতার পথে। মার্কসবাদীর মতে সামাজিক মানুষের চরম কাম্য এমন একটি সমাজব্যবস্থা যাহাতে ব্যক্তির সহিত গোষ্ঠীর বিরোধ বিলুপ্ত হইয়া সাযুজ্য স্থাপিত হয়, যাহাতে কর্মের প্রেরণা ও কর্তব্যের দাবির মধ্যে সংঘাত না বাধে, যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিমানবের স্বকীয় গুণাবলীর চরম বিকাশ সার্বিক সমাজের অগ্রগতির অনুপন্থী হয়। এই সমাজের প্রধান লক্ষণ তাই অর্থের সমবণ্টন বা উপভোগের সুযোগের সাম্য নয়। তাহা তো হইত কেবল পুরাতনের রদবদল। ইহা সমাজ জীবনে নূতন স্তরের প্রবর্তন, যাহাতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষের প্রকৃতিও বদলাইয়া যাইবে। ইহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ পাইবে তাহার চরম পরিণতি সার্বিক কল্যাণবোধে। এই সমাজের আর্থিক ভিত্তি হইবে শ্রেণীশোষণের অবসানে কল্পনাতীত উৎপাদন প্রাচুর্য, যাহার মূলমন্ত্র—দাও নিজের যতটা শক্তি, নাও নিজের যতটা প্রয়োজন। এই কামনা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অনুস্যূত, অথচ ইহা ব্যর্থ হয় শ্রেণীসংগ্রামের প্রাদুর্ভাবে। যে সমাজব্যবস্থা যে পরিমাণে এই আদর্শের অনুকূল, সেই সমাজব্যবস্থাকে সেই পরিমাণে উন্নতিশীল বলা যায়।

সর্বমানবের স্বোপলব্ধির এই স্বাধীনতার সম্ভাবনা ক্রীতদাস-সমাজ, ভূমিদাস-সমাজ ও বেতনদাস-সমাজের ভিতর দিয়া বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে। এই পথ অতিক্রম না করিয়া সাম্যবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই সাম্যবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার মানদণ্ডে মার্কসবাদী বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার গুণাগুণ বিচার করে, উন্নতি-অবনতির পরিমাপ করে। পরলোকে স্বর্গের কল্পনায়, ইহলোকে ভগবৎ রাজত্বের কল্পনায়, যুগে যুগে ইউটোপিয়ার কল্পনায় এই কামনাই আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বাস্তবতাকে স্বীকার করিয়াও কোন্ পন্থায় সেই লক্ষ্যে পৌছানো যায়, স্বপ্নকে রূপায়িত করা যায় অভিজ্ঞতায়, তাহার রহস্য মার্কসবাদ খুঁজিয়া পাইয়াছে বলিয়াই আজ তাহার প্রভাব দেশে দেশে বিস্তৃত। সাম্যবাদী সমাজ আজ আর চিন্তা-জগতের আকাশকুসুম নয়, কর্মজগতের স্থির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আয়ত্ত-সাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মার্কসবাদী কর্মপ্রবণ। তাই তাহার কর্ম প্রেরণা তথাকথিত চিন্তাহীন ভীতিপ্রদ কর্মবিলাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সামাজিক বিবর্তনের অমোঘ বিধানে যদি আজ সাম্যবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠা অবধারিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে আবার মার্কসবাদী কর্মোন্মাদনার প্রয়োজন কোথায়? যাঁহারা এই প্রশ্ন তোলেন তাঁহারা ইহাতে সমাধানহীন নৈয়ায়িক কূট প্রশ্নের সন্ধান পান। আসলে এই প্রশ্নটির বাস্তব ভিত্তি নাই, নিখাদ কল্পনা-বিলাস। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক। রোগী দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—তোমার আরোগ্য অবধারিত, কিন্তু তোমাকে এই বিধিগুলি পালন করিতে হইবে। রোগী যদি তখন বলে—আমি তো সারিবই, তবে আর নিয়ম পালনের প্রয়োজন কি? তাহা হইলে ডাক্তার বলিবেন—তোমার সারিয়া ওঠা সুনিশ্চিত অন্যান্য কারণের মধ্যে আমার ঔষধ সেবনের ফলে। আমি জানি অসংখ্য লোকে রোগে পড়িয়া ঔষধ খাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। যাহারা বাঁচিতে চায় তাহারা ঔষধ খায়। ঠিক এমনি ভাবে শ্রেণী-দ্বন্দ্বে প্রপীড়িত জনসাধারণকে মার্কসবাদীরা বলে, যদি তোমরা শ্রেণী-শোষণের অবসান ঘটাইয়া শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাও তাহা হইলে তোমাদিগকে আমাদের কর্মপন্থা অনুযায়ী চলিতে হইবে। তাহারা বিশ্বাস করে শোষিত জনসাধারণ তাহাদের কথা শুনিবে ও পরিণামে বিজয়ী হইবে। এ বিশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে যদি কোন বিকৃতমস্তিষ্ক রোগীর মতো জনসাধারণ সামূহিক আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয় তাহা হইলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা--বাচনিক প্রলাপ নয়। শাসক শ্রেণী তাহাদের হস্তগত প্রভূত শোষণশক্তি বিনাসংগ্রামে হস্তান্তর করে না। এই সংগ্রামের জন্য অপরিহার্য সংঘবদ্ধ কৃতসংকল্প কর্মীর দল। কমিউনিস্ট পার্টি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাহারা বিপ্লবী চেতনার অগ্রদূত ও বিপ্লবী সাফল্যের পথকারক। বিপ্লব যখন আসে তখন

আর নিরপেক্ষ বন্ধন-হীনতার অবকাশ থাকে না। শত্রু বা মিত্রপক্ষ বাছিয়া লইতেই হয়। সাহিত্যিক বা শিল্পী বলিয়া রেহাই কোথায়? এ বিপ্লব যে প্রত্যেক সামাজিক ব্যক্তির জীবন-মরণ সমস্যা। তাই বিপ্লবী পর্বে লেনিনের মতো মার্কসবাদী নেতা সাহিত্যিককে ডাকিয়া বলিতে একটুও কুণ্ঠিত নন যে তোমরা যদি জনগণের পক্ষ ও তাহার অগ্রগামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন না করো তাহা হইলে অকাট্যভাবে প্রমাণ হইবে তোমরা শোষক শ্রেণীর স্বার্থবহ। বিপ্লবের গতি অসমান; সকল দেশে একই কালে বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়া ওঠে না। কিন্তু যখনই যে দেশে শ্রেণীবিপ্লব দেখা দিবে, তখনই সে দেশের মার্কসবাদী বিপ্লবী নেতা লেনিনের অনুশাসনকে কর্মপন্থার সঠিক নির্ধারক বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা করিবে না। সাহিত্যিকের প্রতি মার্কসবাদীর এ অনুশাসন উদ্ভট কিছু নয়। সাহিত্য-সৃষ্টির সামাজিক প্রভাব চিরদিনই স্বীকৃত। তাই পরম সাহিত্যরসিক হইয়াও প্লেটো তাঁহার আদর্শ সমাজ হইতে কবিকে সাগ্রহে বিতাড়িত করিয়াছেন। নহিলে যে তাহারা তাঁহার শাশ্বত সমাজে চাঞ্চল্যের কারন হইতে পারে। তাঁহার শিষ্য তীক্ষ্ণতরদৃষ্টি আরিস্টোটল তাই ট্রাজেডিকে ব্যবহার করিতে চাহেন সমাজ-মানসের পবিশোধক রূপে, কবির আত্মতৃপ্তির জন্য নয়। গজদন্তমিনারে বাস করিয়া শ্রেষ্ঠ কবির পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায় না—সাহিত্যের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য। মেঘদূতের কবিও রাজসভার নিত্য-সহচর ছিলেন, আর বিরহী যক্ষের বিরহও স্বেচ্ছাবৃত নিঃসঙ্গতা নহে। আমরা বড় সহজে ভুলিয়া যাই যে তাহার সুদীর্ঘ বিলাপ প্রিয়া-বিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ততটা নয় যতটা স্বাধিকার-প্রমত্ত সামান্য অনবধানের ত্রুটিতে সুখের স্বর্গ অলকা হইতে নির্বাসনের জন্য প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে করুণ অভিযোগ। প্রভুশক্তিকে উচ্ছেদ করার সম্ভাবনা তখন দেখা দেয় নাই, প্রতিবাদ করার সামর্থ্যও তখন জাগে নাই, তাই পরোক্ষ অভিযোগ করিয়াই যক্ষকে ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তবুও যে মেঘদূত আজও আমাদের মনকে নাড়া দেয় তাহার কারণ রামগিরি প্রবাসী যক্ষের মতো আমরাও আমাদের কামনার স্বর্গ হইতে বঞ্চিত, নিজেদের ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতিতে ততটা নয় যতটা বর্তমান নৈর্ব্যক্তিক প্রভুশক্তির প্রবল প্রতাপে। অতীতের ব্যর্থতার সুর বর্তমানের ব্যর্থতার তন্ত্রীতে অনুরণন জাগাইয়া তোলে। রাজ সভার আড়ম্বরের মধ্যে থাকিয়াও জনগণের ব্যর্থতাকে বিস্মৃত হন নাই বলিয়াই কালিদাস মহাকবি।

সাহিত্যিকের নিকট মার্কসবাদীর দাবি তাই কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপন্থার প্রচার নয়, তাঁহার বিশিষ্ট উৎকর্ষ সম্বন্ধে অবহিত থাকা। তাহার মতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টি চিরদিন জনবিপ্লবের সমর্থক। জনগণের জীবনকে, তাহার আশা-আকাংক্ষা, তাহার হর্ষশোক, তাহার সাফল্য-ব্যর্থতা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। লেনিনের মতে, আর্ট হইতেছে আমেতর বাস্তবের

প্রতিফলন। সাহিত্যিকের মানস, মুকুরের মতো, সামাজিক বাস্তবকে প্রতিফলিত করে। নাটকের বৃত্তি সম্বন্ধে হ্যামলেট-এর উক্তির সহিত এ মতের আশ্চর্যরকম মিল আছে। এই প্রতিফলনে, এই অনুচিত্রনে যে সাহিত্যিকের মন যে পরিমাণে প্রকাশধর্মী, তিনি সেই পরিমাণে বড় সাহিত্যিক। কোন শ্রেণীতে তাঁহার জন্ম ইহাই বড় কথা নয়। আসল কথা, সামাজিক বাস্তবকে তিনি কি পরিমাণে যথাযথ রূপ দিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ দিয়া তাহাকে বিকৃত করেন নাই। এই মাপকাঠির ব্যবহারে সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার অনেকখানি আত্ম-নিরপেক্ষ হইয়া পড়ে—আপ্ত রুচিত্বের পরিধি সংকুচিত হইয়া আসে। মনে রাখিতে হইবে, যে প্রতিফলনের কথা এখানে বলা হইতেছে তাহা একান্ত নিষ্ক্রিয় নয়, ফটোগ্রাফির ক্যামেরার মতো। তাহাতে সামাজিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে সামাজিক ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে উপযুক্ত আবেগ থাকা চাই। নহিলে সাহিত্য পাঠককে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না, সামাজিক ফলপ্রসূ হয় না। হ্যামলেটও যে নাটকের পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য ছিল কর্ম-প্রেরণা। এই প্রতিফলনে বিম্বিত হয় সামাজিক সংস্থানের বিচার। ম্যাথু আর্নল্ড-এর সূত্রানুযায়ী ইহাকে বলা চলে জীবনের সমালোচনা, তাঁহার মতে যাহা কবিতার শ্রেষ্ঠ উপাদান। এই প্রতিফলন কথাসাহিত্যে যত স্পষ্ট, কাব্যে অবশ্য ততটা নয়। তাই বলিয়া কাব্য সাহিত্য এই মানদণ্ডের এলাকার বাইরে নয়। কবিতার প্রথমত থাকে প্রকাশ্য আধেয়, তাহার বিজ্ঞাপিত বিষয়বস্তু। কিন্তু বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কবি জীবনের সমালোচনা করেন, ইহাই তাহার নিহিত আধেয়। যে কবিতার বিষয়-বস্তু দেখিতে বিরাট কিন্তু তাহাতে নিহিত আধেয় অতি সাধারণ, তাহা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য হইতে পারে না। অথচ সামান্য বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া ব্যঞ্জনায় গভীর নিহিত আধেয় প্রকাশ করিয়া ছোট একটি গীতি কবিতাও মহৎ সাহিত্যের আসন পাইতে পারে। কবিতাকে, বিশেষ করিয়া গীতি কবিতাকে, এই দিক দিয়া স্বপ্নের সহিত তুলিত করা যায়। স্বপ্নের বাহ্য বিষয়বস্তুর সহিত তাহার নিহিত অর্থের প্রচুর ব্যবধান। তা সত্ত্বেও স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করা সম্ভব, ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির ইহাই বিরাট কৃতিত্ব। আত্মেতর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন—এই সূত্রানুযায়ী মার্কসীয় পদ্ধতিতে বিচার করিলে সাহিত্যের, অর্থাৎ কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির মূল্যবিচার অনেকখানি নির্ভরযোগ্য হইয়া ওঠে। যে কোন ঐতিহাসিক কালে সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ কি, শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভিত্তিতে তাহা নির্ধারণ করা আজ আর অনায়ত্ত ব্যাপার নয়। আর কোন বিশেষ কাব্যে তাহা কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার বিচারও একান্ত আত্মমুখীন হইবার প্রয়োজন নাই। এই

পদ্ধতিতে যে সমস্ত মতভেদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে তাহা দাবি করা হইতেছে না। বলা হইতেছে এই পথে সাহিত্য-আলোচনা সমালোচকের আপ্তবাক্য না হইয়া বিজ্ঞানপন্থী হইয়া উঠিবে। বিজ্ঞানেও মতভেদ হয়। পরবর্তী সিদ্ধান্ত আসিয়া পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে সংশোধন করে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরিবর্তন হয় না। বৈজ্ঞানিক যে আত্মেতর পরিবর্তনশীল সত্যে বিশ্বাস করেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাহার সমস্ত ভ্রম ও সংশোধনের ভিতর দিয়া তাহারই নিকটবর্তী করিয়া তুলিতেছে মানুষের জ্ঞানকে। তাই বিজ্ঞানের নিকট অজ্ঞাত অনেক কিছুই আছে, কিন্তু অজ্ঞেয় কিছুই নাই। আত্মেতর অথচ পরিবর্তনশীল সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাহার ক্রমিক নিকটগম্যতা—ইহাই হইল বিজ্ঞানের বাস্তবতা।

কিন্তু বিজ্ঞান ও কাব্য এক নয়। বিজ্ঞান চায় সত্যের অনুধাবন কিন্তু কাব্যের কাম্য সুন্দরের প্রকাশ। ইহা সত্য কথা। কিন্তু মার্কসবাদ মানে না যে সুন্দর বলিতে বুঝায় কাণ্ট-উদ্ভাবিত একটি আত্মিক প্রত্যয়, আত্মেতর বাস্তবতায় যাহার মূল প্রোথিত নাই। মার্কসবাদ ইহাও মানে না যে সুন্দরের সহিত মননের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা কেবলই বস্তুনিষ্ঠ, মানবের কর্মকুশলতার কোন ঐতিহাসিক প্রভাব যাহার উপর পড়ে নাই, যাহা মানুষের সংবেদনের ও অনুভূতির অতীত। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সুন্দর হইতে পারে, নাও হইতে পারে। মানুষের মনে সৌন্দর্য অনুভূতির বিকাশ হয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাবে, উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছি সেই অনুসারে আমাদের সৌন্দর্যবোধও বিবর্তিত হইয়াছে। পর্বতমালাকে মানুষ যখন অধিকার করিতে পারে নাই তখন পর্বতের দৃশ্য ছিল মানুষের নিকট ভয়ের ও ঘৃণার কারণ। সাহিত্যের ও দৃশ্যচিত্রের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ, ও সেই সঙ্গে সামাজিক জীবনের বিকাশ—ইহারই ফলে মানুষ পৃথক করিতে শিখিল কোন্‌টি সুগঠিত কোন্‌টি কদাকার; তাহা হইতে আসিল সৌন্দর্য, সুষমা ও সমন্বয়ের বোধ। এক্ষেত্রেও মার্কসের প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য যে মানুষ বাহ্য প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিতে গিয়া নিজের প্রকৃতিকেও বদলাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে সুন্দর ও কুৎসিত এই বোধ শুধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখা বা বস্তুজগতের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইতে জন্মায় নাই। তাহার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে যুগযুগান্তের কর্মশীলতা ও শিক্ষাদীক্ষা। এই সৌন্দর্যবোধের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে শিল্পের বিকাশ, ফলিত ও লোকশিল্প হইতে যাহাকে বলা হয় 'বিশুদ্ধ' শিল্প তাহা পর্যন্ত। কারণ সমস্ত শিল্পের মূলে আছে জনসাধারণের উৎপাদনী শ্রমশীলতা।

মার্কসবাদ তাই ফলিত সাহিত্য ও স্থায়ী সাহিত্য, বা 'শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও গণ-

সাহিত্যের আত্যন্তিক বিভেদ স্বীকার করে না। ফলিত সাহিত্য তাহাই যাহা সমাজ-বাস্তবের উপরের স্তরের সত্যকে প্রতিফলিত করে বলিয়া মাত্র সাময়িক আনন্দ দিতে পারে, গভীর ভাবে নাড়া দিতে পারে না। সাহিত্যের প্রধান বৃত্তি—শিক্ষা দেওয়া, আনন্দ দেওয়া ও নাড়া দেওয়া। নাড়া দিতে পারা, বিচলিত করিতে পারা, ইহাই মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ। সমাজ-মানবের অন্তরে আছে যে গভীর দ্বন্দ্ব, যাহা বাস্তবজগতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফল, তাহাকে যিনি রূপায়িত করিতে পারেন তিনিই পারেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, মহৎ সাহিত্য, স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে। সে রূপায়ণ অবশ্য কাব্যরীতিসম্মত হইতে হইবে। আঙ্গিকের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিলে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি সামাজিক জ্ঞাপনশীলতা অর্জন করে, যাহা ছিল একের তাহা হইয়া উঠে সাধারণের, তাহার নির্বাচনে অথবা উদ্ভাবনে কবির ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয়। সাহিত্যের ইতিহাসে যে কোন যুগে শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হয় না। তাঁহারা আসেন সেই সব যুগে যখন সমাজ-বিন্যাসে এক স্তর ভাঙিয়া গিয়া অন্য স্তর উদ্ভবের বাস্তব সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। তখনকার শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে সমাজজীবনের গূঢ় অন্তস্তলে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় শ্রেষ্ঠ কবির অন্তরে সেগুলি মুকুরিত হয় ব্যারোমিটারের মতো। তাহাকে যখন তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে কাব্যে রূপায়িত করেন তখন তাহা সমদরদী পাঠকের নিকট পথপ্রদর্শক হইয়া উঠে সামাজিক সত্যের উপলব্ধির পথে। তাহার প্রভাব যত বাড়িতে থাকে, সমাজ-বিবর্তনে সচেতন কর্মোদ্যম তত দ্রুত হইতে থাকে। শ্রেষ্ঠ কাব্য তাই সমাজবিপ্লবের শক্তিমান সহায়ক, ও শ্রেষ্ঠ কবি বিপ্লবী চেতনার জনক বলিয়া জনসাধারণের পূজার্হ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা এই নয় তাহা মুষ্টিমেয় জনকয়েকের মাত্র বোধগম্য হইবে। বর্তমান সমাজে তাহাই সাধারণত ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্বাভাবিক দুর্বোধ্যতা নয়, জনসাধারণের শিক্ষার অভাব। জনশিক্ষার মান যতই উন্নত হইবে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর ততই বাড়িবে, সে সাহিত্য সমকালের হোক বা অতীত কালেরই হোক। সমাজবাদী রাষ্ট্রে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখানে স্পষ্ট করিয়া জানা দরকার সমাজবাদী সংস্কৃতি বলিতে কি বোঝায়। ইহা শূন্য হইতে উদ্ভূত উদ্ভট কিছু নয, যাঁহারা নিজেকে সমাজবাদী সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলিয়া ভাবেন এই রূপ জনকয়েকের মস্তিষ্কপ্রসূতও নয়। মানবসমাজ ধনবাদী, সামন্তবাদী প্রভৃতি অতীত সমাজের শাসনের ভিতর দিয়াই যে জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়াছে সমাজবাদী সংস্কৃতি তাহারই ঐতিহাসিক পরিণতি। অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত পথ এই লক্ষ্যেই চলিয়াছে ও চলিতেছে এবং চলিতে থাকিবে। অবশ্য তাহাদিগকে যাচাই করিতে হইবে সমাজবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে।

এই যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষিত সমালোচক ও মার্কসবাদীর মধ্যে ঘটিয়

যায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। ধনবাদের গতিবিধির বিশ্লেষণ করিয়া মার্কস দেখাইয়াছিলেন কি ভাবে অতীতের সমাজব্যবস্থা অনিবার্য গতিতে ধনবাদ প্রতিষ্ঠার অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। আর ধনবাদের প্রগতির যুগে বাস করিয়াও তাঁহার জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত হইয়াছিল সেই বিরামহীন বিবর্তন ধারা যাহা ধনবাদেরও অবসান ঘটাইয়া সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করিবে। শুধু শ্রেণীদ্বন্দ্ব মানিলেই মার্কসবাদী হওয়া যায় না, কারণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বীকৃতি মার্কসের পূর্বেই হইয়াছিল। মার্কসবাদের বিশিষ্ট লক্ষণ শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্যের স্বীকৃতি যাহাই কেবল শ্রেণীদ্বন্দ্বের উচ্ছেদ করিয়া সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়াই লেনিন রুশবিপ্লবকে সমাজবাদী সাফল্য দিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বগ্রাসী ফাশিস্টবাদের পরাজয়ের ফলে এই একাধিপত্যের রূপান্তর ঘটিয়াছে। এখনকার একাধিপত্য শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের সম্মিলিত একাধিপত্য; প্রত্যেক ধনবাদী দেশে ইহারাই হইতেছে সবচেয়ে বিপ্লবী, সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী। সকল রকম সামাজিক অসাম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে ইহারাই আজ অগ্রণী। ইহারাই আজ সমাজবিপ্লবের পতাকাবাহক। এই পরিস্থিতি সম্ভব হইয়াছে অতীতের খ্যাত অখ্যাত লক্ষ লক্ষ বিপ্লবীর প্রচেষ্টায় ও আত্মত্যাগে। যে কোন ব্যক্তি যে কোন যুগে সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের সকল রকম প্রকাশকে ঘৃণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি তখন তাঁহার বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় বিপ্লবী শ্রেণীর প্রতিনিধি, শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিচালক। সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া তাই মার্কসবাদী সমালোচক খুঁজিয়া বাহির করেন জনসাধারণের সেই সব প্রবৃত্তিগুলিকে যাহার সাহিত্যিক প্রকাশ হইয়াছে প্রভুশক্তি ও দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে; ধর্মের বন্ধ্যাত্ব, নৃশংস অত্যাচার, অথবা সুমার্জিত অপমানের প্রতিভাষণে। এই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিশ্বসাহিত্যের বিচার করার অর্থ তাহাকে খণ্ডিত করা নয় বরং এই পন্থাতেই আমরা পাইতে পারি আমাদের ঐতিহ্য-লব্ধ বিপুল উত্তরাধিকারের অন্তর্নিহিত মর্ম ও নির্ণয় করিতে পারি কোথায় তাহার মহত্ত্ব। সেই সঙ্গে বর্তমানের স্পষ্টতর শ্রেণীদ্বন্দ্বের আলোকে আমরা দেখিতে পাইব তাহাতে কোথায় আছে বিচ্যুতি, অবসাদ বা অনিশ্চয়তার দোলানি। ইতিহাসের যে কোন যুগের সাহিত্যের বিচারে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাব স্বীকার না করায় মার্কসবাদী সমালোচকের সহিত অন্যান্য শিক্ষিত সমালোচকের মতভেদ অনিবার্য।

এই বিভেদ প্রখরতর হইয়া ওঠে আধুনিক সাহিত্যের পর্যালোচনায়। ক্ষয়িষ্ণু ধনবাদের সহিত আজ চলিয়াছে বর্ধিষ্ণু সমাজবাদের দুনিয়াজোড়া লড়াই। দেশে দেশে আজ এই প্রশ্ন সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূলে, কোন শ্রেণীর হাতে থাকিবে রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহার, চিরশোষিত নির্বিত্তের না চিরাতৃপ্তলোভ মহাবিত্তের। এই

সংগ্রামে কাহার জয় হইবে তাহাতে মার্কসবাদীর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই এবং তাহার বিশ্বাস এ বিজয় সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নহে। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশে দেশে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে একই সংগ্রাম চালাইতেছে। তাহাদের সকল চিন্তা, সকল কর্ম একই লক্ষ্যে কেন্দ্রিত। তাই তাহারা পাইতেছে বিশ্বব্যাপী শোষিত জনসাধারণের উত্তরোত্তর বিবর্ধমান সমর্থন। তাহাদের শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটিতেছে। তাহারাই সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করিতেছে জাতীয় আধারে সমাজবাদী আধেয়ের প্রবর্তনে। যে দেশে এই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা প্রাণবান—যেমন পরাজিত ও পুনর্মুক্ত ফ্রান্সে—সেখানে সংস্কৃতিজীবীর পক্ষে তিনটি মাত্র পথ খোলা থাকে—কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া, তাহার সহিত মৈত্রীভাবে চলা, ও তাহার প্রবল বিরোধিতা করা। বিখ্যাত লেখক ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক্‌-এর কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু হিটলারী শাসনের যুগে তিনিও স্বীকার করিয়াছিলেন—লাঞ্ছিত পদদলিত ফ্রান্সের প্রতি আনুগত্য কেবল তাহার শ্রমিক শ্রেণীই দেখাইতে পারিয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবি পিকাসো-র চেয়ে উচ্চকণ্ঠে আর কেহ করিয়াছেন কি? সেই পিকাসো ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও তাঁহার মতে—চিত্রকলা হইতেছে শত্রুর সহিত আক্রমণ ও আত্মরক্ষণ যুদ্ধের হাতিয়ার। লুই আরাগঁ বিপ্লবের পূর্বযুগে ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক সুর-রিয়ালিস্ট্‌ কবি। পরে তিনি সমাজবাদে আকৃষ্ট হন ও মৈত্রীভাবে চলেন। হিটলারী লাঞ্ছনার ফলে তিনি হন কমিউনিস্ট পার্টির গুপ্তনেতাদের অন্যতম। কবিতার ক্ষেত্রে আজ তিনি ফরাসী দেশে সব চেয়ে আঙ্গিক-কুশলী ও সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি, ইহা আপতিক ব্যাপার নহে। ফরাসী সংস্কৃতির ঐশ্বর্যবান ঐতিহ্যকে আয়ত্ত করিয়া তাহার রূপান্তর সাধনের উজ্জ্বল উদাহরণ লুই আরাগঁ।

ইংলণ্ডে শ্রেণীসংগ্রাম এখনও তেমন প্রবল হয় নাই; তাহার সাহিত্যের স্রোতেও তাই আর তেমন জোয়ার নাই। অথচ এই ইংলণ্ডেই ফিউডাল সমাজ-বিন্যাস ধ্বংস করার প্রথম সফল প্রচেষ্টা রূপায়িত হয় বিশ্বের বিস্ময় এলিজাবেথিয় সাহিত্যে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগের ইংরাজ কবিরা ক্ষীণকণ্ঠ, কায়াহীন, হতাশা ও বিভ্রান্তির মোহগ্রস্ত। যে সামাজিক পরিবেশে তাঁহারা স্থাপিত তাহাকে সানন্দে গ্রহণ করিতে তাঁহাদের ন্যায়বোধ ও সৌন্দর্যবোধ হয় পীড়িত, অথচ যে পথে তাহার প্রতিকার তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। তাই তাঁহাদের কাব্যে না পাওয়া যায় দীপ্ত বুদ্ধির প্রখর প্রকাশ, না পাওয়া যায় দৃপ্ত মনুষ্যত্বের অপরাজেয় বাণী। ইহার ব্যতিক্রম পাওয়া যায় একটি মাত্র কবির কাব্যে—জন কর্নফোর্ড, যে একুশ বছরের তরুণ কমিউনিস্ট প্রাণ দিল স্পেনের গৃহ-যুদ্ধে।

কর্নফোর্ড-এর উল্লেখে স্বভাবতই মনে পড়ে আমাদের দেশের সুকান্ত-র কথা, যে কুড়ি বছরের তরুণ কমিউনিস্ট দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রাণ দিল যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে। যে কবির লাগি বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ কান পাতিয়া ছিলেন, সুকান্তকে বলা যাইতে পারে তাহার প্রতিভূকল্প। অস্ফুট যৌবন হইতে সুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বাংলা দেশের সমাজ-মানসের চেতনা বিবর্তনের ইতিহাস পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, বাণীমূর্তি দিয়াছেন অতুল কাব্যসম্পদে। কিন্তু ১৯২৯-এর পর হইতে যে সমাজবাদী চেতনা বাংলা দেশে বীজরূপে উপ্ত হইয়া ক্রমশ প্রসারলাভ করিল রবীন্দ্রনাথ তাহাকে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বোধ হয় সে বয়সে তাহা কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও একটা মৌলিক পরিবর্তন যে আসিতেছে তাহার অনুভূতি তাঁহার কবিচিত্তকে আলোড়িত করিতে ছাড়িত না। তাই তাঁহার শেষ বয়সের কাব্যে পাওয়া যায় এক নূতন আকুতির সুর যাহা তাঁহার পূর্বজীবনের জীবনদেবতার লীলা সম্বন্ধে আকুতি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। বাংলাদেশের সমাজবিপ্লবীরা বৃদ্ধ কবির এই সংবেদনশীলতাকে শ্রদ্ধা করে, যেমন তাহারা পূজা করে তাঁহার কাব্যসাধনার পূর্বতন অক্ষয় অবদানকে। কিন্তু যে সমাজ-চেতনা বৃদ্ধ কবির পক্ষে ছিল আয়াসলভ্য রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকারী হিসাবে সুকান্ত-র ছিল তাহা জন্মগত প্রাপ্তি। ইহাতে বলা হয় না সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য কবি। বলা হয় রবীন্দ্রযুগের পর বাংলা কাব্য যখন মোড় ঘুরিতেছিল তখন সুকান্ত-র কবিতা তাহার দিক্-নির্ণায়ক। ভবিষ্যতের বাংলা কবিতার ধারা কোন খাতে বহিবে সুকান্তের কবিতা তাহারই পূর্বাভাস, যেমন বলা যাইতে পারে বিহারীলালের কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। হয়ত এ প্রাগোক্তি হঠকাবিতা নয় যে ভবিষ্যতের যুগ-ভাস্কর ইংরাজ কবি কর্নফোর্ডকে ও বাংলা কবি সুকান্তকে, আপন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় সশ্রদ্ধে স্মরণ করিবে কাব্যগগনে পুরশ্চাররূপে। তাহাদের অকাল মৃত্যুতে কাব্যজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত। ইহা শোকের কথা সন্দেহ নাই। তবুও কেমন করিয়া ভুলিতে পারা যায় ইহাই চিরকাল বিপ্লবের মূল্য। যে বিপ্লবের ফলাফলের উপর সারা পৃথিবীর পূর্ণ মুক্তি নির্ভর করিতেছে, তাহার সাফল্যের তুলনায় কি এই মূল্য খুবই বেশি? "এই সংগ্রামের উপর সমগ্র পৃথিবীর মুক্তি নির্ভর করিতেছে। এবং এতটুকু নিরপরাধ রক্তক্ষয় না করিয়া কি এতবড় পুরস্কার লাভ করা যায়?"—ফরাসী বিপ্লবে নিহত নিরপরাধ গুণীজনের সম্বন্ধে মহামতি জেফারসনের এই অভিমত কি বর্তমান বিপ্লবে মার্কসবাদীকে সমর্থন করে না?

২৭.৫.৪৮ নীরেন্দ্রনাথ রায়

বৈশাখী

আকাশ জুড়ে পিঙ্গ ধূসর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
যুধিষ্ঠিরের স্বর্গসাথী কালভৈরব ডাকে
জটপাকানো ছুর্ভাবনায় ইন্দ্রকেও ভাবায়
কাল-কুকুরের বজ্রনখী থাবায়
ঐরাবতের শুঁড় খসে যায় পাগলা শাদা হাতি
তিন ভুবনে চালায় মাতামাতি
মুষলধারে রক্ত ঝরে হাড়ের শিলাবৃষ্টি
কাঁপিয়ে তোলে ঘাম-ঝরানো সৃষ্টি
বান ডেকে যায় ক্ষুব্ধ প্রাণের বিপুল বিরাট গাঙে
লৌহকারার রুদ্ধ তোরণ হুড়মুড়িয়ে ভাঙে
কালভৈরব গর্জায়
হাজার হাজার কালনাগিনী মেঘের ফাঁকে তর্জায়।

পলাশ রাঙা বান ডেকে যায় দুকূল ভাঙা নদে
রুগ্ন খালে বদ্ধ জলায় পাড়-বাঁধানো হ্রদে
উপচে ওঠে আদ্যিকালের শ্যাওলা ঢাকা জল
নতুন কালের ঢেউ লেগে চঞ্চল
ঈশান কোণে ঘনায় কুটিল যুগান্তরের শঙ্কা
দেউটি-নেভা অন্ধকারে স্তব্ধ সোনার লঙ্কা
কেঁদেই আকুল মন্দোদরী বাজছে যমের বাজনা
বিশ হাতেও রাবণ রাজার হয় না উশুল খাজনা
দীর্ণ বুকের ছাতি
রক্ষপুরে রইবে না কেউ বংশে দিতে বাতি।

ঝড়ের রাতে কুকুর ডাকে স্বর্গীয়দের সঙ্গী
সত্য-সাধক অহিংসদের চিত্ত হ'ল জঙ্গী

রামচন্দ্রের মাসতুত ভাই রাবণ রাজার আত্মা
　　স্বর্গ-পথের পায় না খুঁজে পাত্তা
মন্দোদরীর অঙ্গ সেবায় লুব্ধ বিভীষণ
নতুন যুগের প্রভুর পদে ভক্ত অকিঞ্চন ;
রাজার পাপে রাজ্য পোড়ে শকুন ওড়ে শূন্যে
প্রজার ঘরে মড়ক আসে দেশপ্রেমের পুণ্যে ;
　　সওদাগরের ঘোড়া
ঘাড় বেঁকিয়ে কেশর ফোলায় জরির ঝালর মোড়া।
সাঙ্গ হ'ল খড়ম পূজা শুকনো গলায় চৌদুন
ভুঁড়ির সাথে রুগ্ন পেটের গাওনা চলে রামধুন।
জমাট-বাঁধা হাড়ের পাহাড় দগ্ধ সোনার রাজ্যে
অগ্নিগিরির গর্ভে ভয়াল মৃদঙ্গ রোল বাজ্ছে
　　জ্বলছে মেঘের চিতা
রাম রাজ্যের প্রথম বলি অশোক বনের সীতা।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

শহীদ ভরদ্বাজের উদ্দেশে

ভারতবর্ষের ঘোর অন্ধকারে, কালবৈশাখের বৃষ্টিঝড়ে
এ উনিশশো আটচল্লিশ সালের দেয়ালে রক্তে রক্তাক্ত অক্ষরে
আমরা লিখলাম
কমরেড, তোমার নাম।

এ আজব দেশে যারা বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাওয়ারই অপরাধে
ঘুরি গুপ্তচর গুপ্তঘাতক দালাল চোরাকারবারীর ফাঁদে
লাঠি গুলি জেল অনাহার অপমান অপমৃত্যুর নরকে—
হন্যে হ'য়ে পালিয়ে বেড়াই—তারা বন্ধ ঘরে, নির্জন সড়কে
গোপন বৈঠকে কিংবা পাশের বন্ধুকে চুপিচুপি জানালাম :
মৃত্যু দিয়ে তোমাকে মারবে এতো সাধ্য কার ?—

কেবল বললাম
কমরেড, তোমার নাম।

আর বন্ধ ঘরে বন্ধ দরজায় তখন
হানা দিচ্ছে ঝড়-ঝঞ্ঝা অন্ধকার ঈশানের ডানায়, কখন
বনেদী বিশ্বাসে ভিতে ফাটলে ফাটলে পাগলা হাওয়ার শন্‌শন্‌
দুরন্ত পাখ্‌সাটে দরজা ভাঙতে চাইলো, নাড়া দিলো, ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌
পাথরের মতো ভারি অন্ধকার চেপে পড়লো দরজার ওপর :
'দোর খোলো, দোর খোলো' বললো সাতসমুদ্রের হাওয়া রুক্ষ রুদ্ধ স্বর,
'মনের আগল খোলো, খোলো' বললো উত্তরের কনকনে বাতাস,
দক্ষিণসমুদ্র বললো বুকচাপা ঝাপ্‌টায়, 'ছাখো, উদ্‌ভ্রান্ত আকাশ
শকুনের ঝাঁঝালো নিঃশ্বাসে মাতাল টলমল করে, ঝাঁকে ঝাঁকে
বীভৎস চিৎকারে শকুন ভাগাড় থেকে উঠে এলো, এক ফাঁকে
ঘিরলো আকাশ, ঘিরলো শয়তানী চক্রান্তে, নামলো চোরাবাজারের
নখচঞ্চু শান দিয়ে, মুনাফার মৃগয়ালোলুপ নেকড়ের
চকচকে চোখে, নামলো পাণ্ডববর্জিত দেশে শহরে বন্দরে
দূর গ্রামে হাটে মাঠে-মানুষের মিছিলে এ খাল ও খন্দরে
পঙ্গপাল হ'য়ে, নামলো আকাশের পাপচক্রে সংহার-মূর্তিতে
ঘরে ঘরে লোভের হাতছানি হ'য়ে, সম্পটের শিসে, কী স্ফূর্তিতে
মনভাঙা সংসারে নামলো দাঙ্গার দন্তুর হাসি, অসহ্য, তবু সে
কোলের ছেলেকে কেড়ে, মনের তৃষ্ণার জল চেটেপুটে, ফুঁসে
তাড়া করলো—উর্ধ্বশ্বাস ঘরছাড়া মানুষ নামলো মৃত্যুর মিছিলে
শহরে বন্দরে দূর গ্রামে হাটে মাঠে, নামলো পথে খালে বিলে,
নামলো পাণ্ডববর্জিত দেশে, মগের মুল্লুকে—ঠগ, জুয়াচোর
বিশ্বাসঘাতক, ভণ্ড যে দেশের প্রচণ্ড নেতা, অতি ঘোর
পতিতপাবন কর্ণধার—সেই দেশে, সেই চোরাকারবারীর
দরাজ স্বরাজ্যে স্বর্গে মানুষমৃগয়া ছাখো—'

পথে পথে ভিড়
মনের আগল খুলে দেখি : উদ্বাস্তু সংসার, ছত্রভঙ্গ নীড়,
এলোমেলো ভয়ঙ্কর বাঁধভাঙা উদ্দাম জল উদ্ধত অস্থির
মানুষ, মানুষ : সেই ঘরের মানুষ, সেই ঘরকুনো মনের,
মনের কোণের সুখেসুখী দুখেদুঃখী গিরস্তির, জীবনের

ডানাভাঙা পাখি—আজ রুদ্রমেঘে তাড়া-খাওয়া এ সিন্ধুসারস
ঘোরে ঘূর্ণিঝড়ে, ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্-ওড়ে—ভুলে মাচার সরস
লাউলতার ডগা, ভুলে ধানের মঞ্জরী দোলা সারাদিন দোলা
পলকা হাওয়ায়, ভুলে খনির পাতালে কয়লা কাটা আর তোলা
ফিরে ফিরে দেহাতি বৌটার কথা, কুঁদে তোলা ছুটে-ছুটে-আসা
লছ্‌মি মেয়েটার মুখ, শহরতলীর ভিড়ে কেরানির বাসা
ছাঁপোষা সংসার কলকণ্ঠের কাকলী ভুলে গিয়ে—যেন ঝড়
তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো হারানো দিনের খড়কুটো—কই ঘর,
নিকোনো আঙিনা কই ?— ঘুরে ঘুরে ঝড়, উড়িয়ে ছড়িয়ে, যেন
যুগান্তের ভয়ঙ্কর চলে দলে দলে, চলে, কেন চলে ? কেন
উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদ ? কেন ? প্রশ্ন করি, কেন ? কেন ? ছুটে যাই, কেন ?

তোমার কী অপরাধ ?—বুঝি কোনোকালে
মায়া এ-সংসারে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলে ? ভাঙা ঘরে, ফুটো চালে
দুঃখের বর্ষার জল বুকের ছাউনিতে বেঁধে রাত্রের আড়ালে
সুখের ভোরবেলা আলো-আলোয় চোখ মেলে ফুটে উঠতে চেয়েছিলে
জমিদার, মহাজন, চতুর বেনিয়া, বাস্তকেউটের কিল্‌বিলে
দমবন্ধ অন্ধকারে ?

তোমার কী অপরাধ ?—তুমি বারবার
বুক দিয়ে বাড়ন্ত ধানের গোলা আগলেছো ? এ-ক্ষেতখামার
ছারখার শ্মশান, তাই বলেছো খাজনা বন্ধ, তোমার আমার
রক্তচোষা বাকি-বকেয়া বাতিল ? কারখানায় চিম্‌নির হাঁ-মুখে
তোমারই রক্তের ধোঁয়া তবু ভুখা লখ্‌মি মানুষ, রুখে রুখে
উঠেছো হরতালে ? তাই ?

তোমার কী অপরাধ ?—বলেছো, তোমারই
এই গ্রাম, এ শহর, এই স্বর্গ, এ-সবুজ জীবনের পাড়ি ?
তোমার রক্তে ও ঘামে ভেজা মাটি, তোমারই সে ভাটিয়ালি-সারি
গানে কূলহারা নদী, তোমারই ? বলেছো তুমি, তোমারই এ দেশ ?
এ দেশ তোমার সীতা অশোকবনের ? মধ্যে কান্নার অশেষ
সমুদ্রকল্লোল, মধ্যে আত্মোৎসর্গের সেতুবন্ধের প্রাণপণ
রক্তাক্ত তোমার চেষ্টা ?

জিজ্ঞাসা করলাম জনে জনে, কী তোমার অপরাধ ?—আজীবন
শৃঙ্খলে শৃঙ্খলা মানতে রাজি নও ? দেহ-মনে মৃত্যুর সমন
মানবে না ?—জিজ্ঞাসা করলাম, শুধু এই ? শুধু হত্যাকারীর
হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র, এইমাত্র ? বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহীর
হাতে আইন ও শৃঙ্খলা ? শুধু লুব্ধ দুঃশাসন মাতাল বেহেড ?

একে একে
চোখ তুলে তাকালো ওরা।
ওরা কারা ? ওরা
ক্লান্ত, ক্লান্ত, বড়ো ক্লান্ত, ক্লান্ত দেহ, জীর্ণ ক্ষতবিক্ষত ফুসফুস,
ওরা কারা ? ওরা ?
ছত্রভঙ্গ ছিন্নভিন্ন অসংখ্য মানুষ ?
কারা ওরা ? কারা ?
স্তম্ভিত : দেখলাম, ওরা একাকার ভয়ঙ্কর একটিই মানুষ—
চোখে জিজ্ঞাসার শেষ, চাউনি সমুদ্রনিশানী—
সে তুমি, কমরেড !

আর
দূরে ঘুরে ঘুরে ধুলো উড়িয়ে চললো, ঝড় তুললো আবার
মানুষ, মানুষ : সেই মৃত্যুর মিছিল নয়, রক্তাক্ত জন্মের
জয়যাত্রা এযে, এই মৃত্যুতীর্থে জীবনের শোভাযাত্রীদের
শবযাত্রা এযে, এই বজ্রমুষ্টি ওঠে পড়ে, মানুষের মেলা :
যুগান্তসন্ধ্যার ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে রক্তমেঘ বেহুলার ভেলা
এ জনসমুদ্রে দোলে, অন্তহীন খুঁজে ফেরে মৃত্যুহীন প্রাণ।

এ জনসমুদ্রে আজ অবিরাম দোলা ;
আজ আমার এ গান
তোমারও ঘোষণা ;
আজ বিপন্ন বন্ধুর কানে আমার আহ্বান
সে তো তোমারই এ নাম,
নাম-ধ'রে-ডাকা।

কমরেড, তোমার দেহ ঢেকে বিছালাম
লালঝাণ্ডা,
লাল মুক্তিলাঞ্ছিত পতাকা।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মহাভারতী

আশ্বাসের আবরণে ঢাকা আছে কঠিন সময় :
ধর্মপথ কর্মপথ ; রাজতক্তে তাই সমাসীন
দেবদ্বিজে ভক্তিমান সত্যবাদী যুধিষ্ঠির—পৃথিবীতে ঈশ্বরের জয়
অবশ্য পুরুষকার নিত্যসঙ্গী—সুতা কেটে জেল খেটে ফিরেছে সুদিন
নতুবা কপালে ছিল মোসাহেবী কি কেরানীগিরি।
বিনয়ে লোমশ মেষ, উপকারী মুখে রামনাম
দেহে কী জোয়ার এলো ? লঘু পায় পার হয় মোজেইক সিঁড়ি।
ক্ষমার খোদাই মূর্তি, স্বর্গের উজ্জ্বল হাসি ঠোঁটে অবিরাম
পরদুঃখে দুঃখী মন ক্বচিৎ করুণ তবু বেদনায় চোখ ছলছল
হাঁটু ভেঙে কান্না আসে কোথা যাই ভাইরে সুবল!

নিষ্ঠার নায়ক বুঝি রিপুজয়ী শান্তনু-সন্তান
ইচ্ছা-মৃত্যু তাই তার শর-শয্যা। গভীর প্রয়াণ
হেলা ভরে ফেলে গেছে কীর্তি আর সমৃদ্ধির রাজপুরী কৌরবের গৌরব শিবির।

সঙ্গীরা জুটেছে ভাল, ছোট বড় কনিষ্ঠ মাঝারি
বৈষ্ণব নায়েব তথা বৃদ্ধ জ্ঞানদাস—আর ওদিকে পেয়াদা পাই রাজার কাছারি
নিত্য মাতে মতভেদে—শিকারী শকুন—তবু ষোল আনা খাদি,
ভোজ চলে (নিরামিষ ? যে যেমন চায় আহা!) নানা রকমারি
আমার প্রণাম লহ সুচতুর হে দুনিয়াদার।
পৃথিবী অসার—তাই ত্যাগী কর্ণ দানবীর ছেড়েছে পশার
যদিও আকাশ নীল রোদে জ্বলে রূপোর পাহাড়

বুদ্ধিতে বিদ্যুৎ খেলে (লাল জলে রুচি আছে ?) পোশাক সাহেবী
কথায় জাহাজ আর বৃত্তিতে বায়স—মরি মরি দেশসেবী।

তথাপি সংশয়-দোলা দ্বিধা মনে যদি বা কিঞ্চিৎ
জুড়িটির জুড়ি নেই—পদপাতে নড়ে ওঠে সময়ের ভিৎ
বিবর্ণ বিবেক তবু বিচক্ষণ বিশারদ, রণে বিভীষণ
খোলস খুলেছে তাই গায়ে মোড়া কামিনী-কাঞ্চন
এমন মহেন্দ্রযোগ—শনি, রাহু, মঙ্গলের দশা
মঘা আর দিকশূল—এই লগ্নে শ্রীহরি ভরসা
বস্তুঘুঘু যাদু জানে মারপ্যাঁচ কত জারিজুরি
ওদিকে প্রেতের হাত ধার দেয় ছলনার ছুরি
ফুটপাথে ভিড় জমে—ভ্যাবাচেকা মানুষেরা কুকুরের মত
বিশ্বাসে ভুলেছে মন নিয়তির কাছে মাথা-নত।
যারা বলে—কি করছ, পথে পথে কেন মরে লোক
বিদ্যুৎ-বেতারযন্ত্র রাত দশটায় বলে—শত্রুপক্ষ বিশ্বাসঘাতক।

চিত্ত ঘোষ

ভোর রাত্রির স্বপ্ন

জেলের একটা প্রকাণ্ড কামরায় ১৭৫ জনের সঙ্গে বাস করছি, বিচারাধীন বন্দী হিসেবে। আজ সাত মাস হ'ল বিচার হয় নি। সরকার এখনো আসামী ধরেই শেষ করতে পারছে না, আবার বিচার। হাকিম বেরিয়েছে গাঁয়ে, মারাই শেষ হয় নি, তা ধরা। আর ধরা শেষ না হতে আবার বিচার?

মহামহিম সরকারের মহামান্য অতিথি আমরা—ঘড়ি ধরে খাবার আসে, পাছে কষ্ট হয়; ঘড়ি ধরে বিশ্রামকক্ষে ঢুকি, পাছে অতিশ্রমে ভেঙে পড়ি; এক মিনিটও চোখের আড়াল হবার জো নেই। আছে পাহারা, মেট, সিপাই, আছে জমাদার, ডেপুটি জেলার থেকে আরম্ভ করে বড় সাহেব পর্যন্ত। আদর-আপ্যায়নে ভুলেই গেছি যে মাথার ওপরে আকাশ আছে—তাতে সূর্য ওঠে, ওঠে চাঁদ, নক্ষত্র, মেঘ। মনে হচ্ছে কতো দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করে এই পথ্য পেয়েছি।

কী যেন একটা ঘটেছে। দুপুর বেলাটা অন্ধকার হ'ল কেন? একখানা ইংরাজী নভেল পড়ছিলাম, বিরক্ত হয়ে বন্ধ করতে হ'ল এমন একটা পাতায় যেখানে ক্লান্তপ্রেম নায়ক, নায়িকাকে উদ্দেশ করে বলছে 'আচ্ছা আইরিন, যদি বুড়ো হয়ে জন্মে ধীরে ধীরে ছোট ছেলে হতাম, তবে হয়তো এমন ভুল করতাম না। তা যাক্! আমার আশা বিফল হ'ল তোমাতে—তাতে কি! আমরা শীগ্‌গির ভুলে যাব দুজনে দুজনকে। আমাদের প্রত্যেকের মাঝে এমন একটা শিশুসত্ত্বা আছে যে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে বড় হতে—পারে না; এমন একটি ফুল আছে যে কুঁড়িতে শুকোতেই ভালোবাসে।' বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে দিলাম বইটিকে।

অন্ধকার ঘিরে এসেছে; চারিদিকে ভীষণ চাঞ্চল্য। 'বন্ কর' 'বন্ কর' রবে যেন জাপানের 'বানজাই' ধ্বনি পড়ে গেল, পরমুহূর্তেই খটাং, খটাস, দুম-দাম, হুড়-হাড়, শালা শুয়ার ইত্যাদি নানান রকমের মিষ্টি শব্দে চারিদিক গেল ভরে। এতো গোলমালের কারণ যে মেঘমেদুর আকাশ, তার একটুখানি আভাস পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। দুঃসাহসিক আকাশের একটুখানি টুকরো জানালার কাছে এসে ধরা দিল আমার চোখে। কতোদিন যেন দেখিনি এই আজীবন পরিচিত আকাশকে,—এমন ঘাড়ভরা মেঘমেদুরতার সঙ্গে যেন কতোদিন পরিচয় ছিল না। আরো বেশি করে উপভোগ করব বলে একটা 'চটা' ধরালাম। শালপাতায় মোড়া দোক্তা-বিড়ির পরিবর্তে খাই এখন এই—বিড়ির থেকেও সস্তা। ছোট্ট এতোটুকু আকাশ, রং তার লালাভ নীল—ঝড়ের মেঘের রং যেমন হয়। সেখানে যেন তুমুল আলোড়ন চলেছে। বিরাট এক অভিযান, বিপুল এক সংঘাত, সমস্ত পৃথিবীটা কেঁপে কেঁপে উঠছে আশা-আতঙ্কের গোধূলি সংকেতে। একটা প্রচণ্ড আঘাতের জন্ত চোখ বুঁজে প্রতীক্ষা করছে।

ঝড় আমার খুব ভালো লাগে। আমাদের কূর্ম-জীবনের ক্ষুদ্রতাকে প্রকাশ করে দেয় ঝড়, স্থিতির দ্বারা আমরা জীবনকে মাপ করি, সময় হচ্ছে আমাদের জীবনের মাপকাঠি, ঝড় আমাদের এই মাপকাঠিকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। ঝড়ের মধ্যে দেখতে পাই গতি। সে উদ্দাম, সে আসে প্রচণ্ড বেগে, আমাদের ক্ষয়িষ্ণু জীবনের মধ্যে এনে দেয় একটা গতিময় সত্ত্বা। ক্ষণেকের জন্যে আমরা দেখে নিই বিরাট বিশ্বকে, একটা গতিময়, প্রাণবান উপস্থিতিকে। যাকে এতোদিন শূন্য বলে জেনে এসেছি, যাকে জেনে এসেছি এ মৃত, স্থবির, গতিহীন, অকস্মাৎ এক ঘনশ্যাম মধ্যাহ্নে সে ক্ষেপে ওঠে, নাচে শূন্যের দিকে শতবাহু বিস্তৃত করে, ঝড়কে নেয় বরণ করে প্রলয়ের লগ্নে। সামান্য একটু রন্ধ্রপথ আমার মাথার ওপরে, আজকের এই খেয়ালী ঝড়ের মহাপ্রবেশে সে-ও গান গেয়ে উঠছে। আমার সামনের বেলগাছের জীর্ণপাতা উড়ে যাচ্ছে জেলের প্রাচীরের বাইরে, প্রহরীর সতর্ক চক্ষুকে উপেক্ষা করে। আজ এক মহত্তর সম্ভাবনায় সে প্রাণচঞ্চল, জীর্ণ বোঁটার বন্ধন তার কাছে আজ ক্ষীণ; যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু দুর্বল, যতো মলিনতা, যতো আবর্জনা, যতো অস্বাস্থ্যকর ধূলি সব উড়ে চলে যায় এই রুদ্রের কল্যাণবাহী সংঘাতে—এ যেন সমস্ত পরিবেশকে তড়িৎ-পরিবেশক করে তোলে, অতি নগণ্যকেও অভিনবত্বের সৈনিক সজ্জায় দেয় সাজিয়ে। শেলির 'ওড্ টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' কবিতাটি মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলাম। জীর্ণ সমাজের কালিমাকে মুছে দিয়ে নবতর মনুষ্যত্ব গড়ে তোলবার সেই ব্যাকুল আবেদন। আমরা ছাড়া কে বুঝবে তা—আমরা যারা বুঝেছি, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

চটা শেষ হল। আর একটা চটা ধরালাম, একটু বেশি কড়া করে বাঁধা চটা। ঝড় এতক্ষণে খুব জোর করেই সুরু হয়েছে, তার সঙ্গে উৎকট চটার ধোঁয়া। এখানে ওখানে চলেছে খোসমেজাজে গল্প, অবরুদ্ধ বিরহ-বেদনার চটুল বহিঃপ্রকাশ। এই তরল রসিকতা এই পরম মুহূর্তে যেন খাপছাড়া বিরক্তিকর মনে হতে লাগল। আমি মনকে পাঠালুম মিলনের আংটি নিয়ে পনের মিনিটের হারানো ভাবনার সন্ধানে। দ্বিতীয় চটা শেষ হ'ল, তৃতীয় ধরালাম, নাঃ, আমার ঐ বন্ধুরাই সত্য—। এই উচ্ছল জলধারার বর্ষণ, এই মেঘগর্জন, দিশেহারা উদ্দাম বাতাসের আর্তনাদ এদের সঙ্গে মানুষের মনের কি এক গোপন বন্ধন আছে কে জানে। এই প্রশান্ত বারিবর্ষণের মধ্যে, পুঞ্জিত মেঘমালার মধ্যে, বজ্রের গর্জনের মধ্যে মানুষের মন আপনাকে খুঁজে পায়, আপনার একান্ত নিঃসঙ্গতাকে উপলব্ধি করতে পারে।

... 'রাধার কি সজল কাজল আঁখি পড়ল মনে, হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে ?' বিরক্ত হয়ে দেখি একজন জেলের বন্ধু—হাজরা।

'না, অতদূর অগ্রসর হইনি এখনো।' বিরসবদনে বললাম, 'অনেকদিন চিঠিপত্তর পাইনি ভাই, কে জানে কেমন আছে সব। যা ছিল, পুলিশ তো লুটেপুটে নিয়ে গেছে সব, তারপর আরম্ভ হয়েছে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী, বেঁচে আছে কিনা কে জানে।' বলেই মনে পড়ল—হাজরারও ঘরে রয়েছে স্ত্রী-পুত্র কন্যা। অবশ্য সে ঘরই নেই, এখন একটু চালা করে রয়েছে, পুলিশের দাপটে সে চালার কি আছে কে জানে। আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

আমার নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাপ্রবাহে বাধা পড়ায় বিরক্ত হচ্ছিলাম, কি আর করা যায় ?

'যা বলেছেন ডাক্তারদা, আমার ঘরের কাজল আঁখি মেঘ ওঠার আগে থেকেই জলবাহুল্যে শুকোতে না পেরে পচতে বসেছে'—আর এক বন্ধু এসে চটাটায় দুএকটা গাঁজার টান দিয়েই বললেন। কী সর্বনাশ ! এরও কি বিরহবেদনা শুনতে হবে নাকি ! হা, কালিদাস, কি কুক্ষণেই তুমি ঠিক আষাঢ়ের পয়লা তারিখেই চোখের জলে ভাসিয়েছিলে বেচারী যক্ষকে।—'সত্যি, দাদা,' হাজরা আবার সুরু করলেন 'আপনি হয়তো ভাবছেন ঘরবাড়ি ছেড়ে এসে আমাদের মন গেছে খারাপ হয়ে, কিন্তু তা নয়···কিন্তু, দাদা আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, থাক এখন ও সব কথা—'

থাক—মনে মনে বললাম। কিন্তু থাকবে কি করে এক্‌শ পঁচাত্তর জনের খাঁচায় সে অবকাশ যে শেলি, কালিদাস এসে দাঁড়াবেন আমার মনের দোর গোড়ায়। বন্ধুরা তবু এক এক করে চলে গেলেন, আবার নতুন করে হারানো চিন্তার খেইটি সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ আবার শুনলাম 'মেজদা ঘুমুলে নাকি ?' আবার বিরহ বেদনা !

বিরক্তি চেপে বললুম, 'এসো বসো'। ও বিষ্টুপদ ! তা- হলে সেই দু বিঘে জমি। মন্দ লাগে না 'শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই—।' কিন্তু তবু বিষ্ণুপদর মুখে কতবার শুনব ওর সে কথা ! ঠিক জানি, এ তথ্য এতবার শুনতে হলে কবিও ক্ষেপে যেতেন। কিন্তু বিষ্ণুপদ বসেছে।

'কি ভাবছিলে মেজদা ?'

'না এমনিই—।'

'কী সুন্দর জল হচ্ছে মেজদা।'

বিষ্ণুপদের বর্ষা সংগীত সুরু হবে নাকি ? রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়লুম।

'দেখো, মেজদা, আকাশ যেন রান্নাঘরের ঝুল—'

বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস তোমাদের তিরোভাবে তোমরা বেঁচেছ, নচেৎ বর্ষার সজল জলদ-জালের শ্যামরূপ হেরে ভাতের হাঁড়ির কবিতা লিখতে হতো তোমাদের। মন থেকে শেলি বিদায় নিলেন, চণ্ডীদাস গেলেন বৃন্দাবন।

'আচ্ছা মেজদা—'

উঠে বসতেই হল।

'এ জল আমাদের ওখানেও হচ্ছে মেজদা!'

আবহাওয়া-বিজ্ঞানের আলোচনা। বিরহবেদনা বরং সহনীয়, বিজ্ঞান আমার পক্ষে প্রাণঘাতী। আজকের এই বর্ষা-মুখর অপরাহ্ন কাজের জন্যে তৈরি হয়নি। বিদায় হে আমার অভিশপ্ত স্বপ্নলোক, বর্ষাস্নাত কাদম্বীফুলভরা বিরহগীতিমুখর স্বপ্ন-লোক বিদায়।

'আমার মনে হয় মেজদা এ জল ঠিক আমাদের ওখানেও হচ্ছে, আমলাতলা বড় হয়ে উঠেছে, গোটা বিল কানায় কানায় ভরে উঠেছে জলে, আজই সমস্ত তলার জল বেঁধে দিয়ে কাল দেবে চাষ, পরশু রোয়া হবে, কি বলো?'

—কী আর বলবো? চুপ করে থাকি, যদি বিষ্ণুপদ থামে।

'বেশ করে দুতিন চাষ দিয়ে মাটিকে একেবারে পাঁক করে দেবো না তো চাষী কি রকম? চাষের পর মই দিয়েও একবার দেখে নেবো যে ঢিল রয়ে গেল নাকি, ঢিল পায়ে লাগলেই এমনি করে থেঁতলে থেঁতলে ঢিল ভেঙে কাদাকে একবারে দই করে দেব না!'

সভয়ে চেয়ে দেখি বিষ্ণুপদ পা দিয়ে আমার কম্বলটাকেই থেঁৎলাতে সুরু করেছে, সে পদভরে পাথরও পাঁক হয়ে যায়।

'এ-বছর, এবছব এইযে শীগগির বর্ষা লেগেছে, দেখবে একবার ফসলটা! লোকে কথায় বলে আষাঢ়ের চাষ—অবশ্য যদি সার পাঁক সব দিয়ে থাকে ঠিক-মতো, আমরা করি কি জানো, মাটিকে শুঁকে দেখি পচলো কিনা।'

চমকে উঠে দেখি আমার গামছাটা উঠলো বিষ্ণুর নাকে। হে আমার কাব্যলক্ষ্মী বিদায়! যদি তোমাকে কোনদিন খুঁজতে চাই খুঁজবো তোমায় আমার অন্তরলোকে যেখানে চাষ নেই দ্বন্দ্ব নেই গরু তাড়ানোর শব্দ নেই, বর্ষণমুখর বহির্লোকে খোঁজবার বিড়ম্বনা যেন আর না হয়। রেকর্ড বেজেই চললো—

'পাথরচটীর জল এসে পড়েছে কেৎবাইয়ের খালে, সেখান থেকে জল ভাসছে জুলীর মাঠে, দেখতে দেখতে বাড়োইবনার খাল জলে ভরে যেয়ে বাঁকোই মাঠ ধু ধু করছে জলে, নরাপড়শীর মাঠ ভেসে বিষ্ণুচকের মাঠ বেয়ে জল ছুটে আসছে আম'দের মাঠে—ধু ধু করছে চারদিক। জল তো নয় যেন মা ভাগীরথী।'

—উচ্চকিত হয়ে খাড়া হয়ে বসলুম, বাঃ কে বলে চাষের মধ্যে কাব্য নেই? 'বুড়িপুকুরের ধারে ধারে হলদে হলদে কচু ফুল ফুটে উঠেছে, এখানে ওখানে হরগৌরী ফুলের মেলা, চালে ধরেছে রাশি রাশি চিচিঙ্গের ফুল, যেন কেউ আলপনা দিয়ে রেখেছে, শশা গাছ উঠেছে কঞ্চির গা বেয়ে, ঝিঙে গাছ ছুটে চলেছে হলদে ফুলের ভার নিয়ে, চারদিকে শুধু সবুজ শুধু ফুল। ভারি মজার, না মেজদা, কী বলো!'

কি বলব ? তবু ভালো বিষ্ণুপদ এখনো ওর জমির কথাই সুরু করেনি।

'বিষ্ণুচকের জল এসে গেলেই আমার পশ্চিম মাঠের আড়াই বিঘ'র পেট্টা জলে থৈ থৈ করবে। পাঁজাদের বড়ো বাঁধের জল যদি না বাঁধে তো আমার মনসাতলার পেট্টার বান ডেকে যাবে। জানো মেজদা, আমার মনসাতলার পেট্টা আমার ঘরের লক্ষ্মী।' মুখে চুক্ চুক্ শব্দ হোলো—যেন চুমু খাবার। —'আচ্ছা মেজদা, কদম গাছের ফুল, পাতা বোধ হয় খুব ভালো সার না।'

উঠে দাঁড়ালাম, বিষ্ণুপদর অনেক ক্ষ্যাপামিই সই বটে, কিন্তু এতোটা সহ্য করা যায় না। কাব্যসৃষ্টির এতো বড় একটা উপাদানের ওপর এই উৎপীড়ন অসহ্য। কৃষি নিয়ে কাব্যসৃষ্টির চেষ্টা করলে করতেও পারি, কিন্তু কাব্যকে চাষে পরিণত করতে পারব না। বললাম 'দেখ, কদম্বরেণুকে নিয়ে গোপাঙ্গনারা কত মাতামাতি করেছেন অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণপ্রেমে। আর তুমি কি না, তাকে পচিয়ে সার করে নিজের জমিতে দিতে চাও। এটা অন্যায়।'

থতমত খেয়ে গেল বিষ্টু—'হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা অন্যায় হয়ে গেছে, বসো মেজদা।' বসতে হলো, বিষ্টু সুরু করলেন—'কিন্তু তুমি যাই বলো, মেজদা, কদম তলার জমিতে আমায় জন্মে পনেরো মণ ধান হাসতে হাসতে হবে। আর ঠিক এমনি জমি ছিলো মেজদা সেই যে ঘোষপুকুরের ঈশেন কোণে ভুবন মাঝির ঘরের দক্ষিণে সেই দুই বিঘার পেট্টা। কত করে বললাম ঘোষেদের বড কর্তাকে—দেখো আমি কখনো এক ছটাক বাকি রাখিনি আর তুমি কখনো একটি চিরকুটও দাওনি। তবু যদি বলছো বছরের বাকী তাই হোক, আমাকে আট বছরের কিস্তি করে দাও আমি মরে মরেও দিল দেবো। দিলে না, অত কাঁদলাম দিলে না। ঐ জমিটুকু থেকেই আমার উন্নতি হয়েছিল মেজদা। ওটা সেদিন বিনা নালিশে ঘোষ বাবুরা নিয়ে নিলো। জোয়ান ছেলের মত আমার জমি—কেড়ে নিল ওরা। মেজদা, খাঁদার মা আর আমি দুদিন ভাত খেতে পারিনি। জমির আলে বসে বসে কেঁদেছি অনেক মেহনৎ করে এক কোমর মাটি কেটে ওকে বাগিয়েছিলাম। বিষ্ণুপদর কণ্ঠস্বরটা ভারি হয়ে উঠল। উদ্যতপ্রায় একটা কান্নার আবেগ কষ্টে সংবরণ করে বলতে সুরু করলে, 'আর তার ফলটা কি হলো দেখেছ ? যে জমি আমার কাছে পনেরো ষোলো মণ ধান বিয়োচ্ছিল, সেই জমিতে এখন ধান হয় বড়-জোর তিন চার মণ। পারবে না—চাষীর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চাষীর লক্ষ্মীকে ওরা রাখতে পারবে না। লক্ষ্মী থাকবে না। আমার কি মনে হয় জানো, মেজদা, ঐ জমি যেন আমার রতনপুরের ভাইঝি, কেঁদে বলছে, কাকাগো আমাকে এরা খেতে দেয় না। —আমার কান্না আসে মেজদা, জমিটাকে দেখলে, তবু শালারা কি আমাকে দেবে ? নিজেরা চাষ করবে, অত জমিতেও আঁটে না, আরো চাই।'

মন্দ না তো কাব্যটা—বিষ্ণুপদর মেঘদূত। মানুষ আর মাটি, মাটি আর

মানুষ। দুঁহু লাগি দুঁহু কাঁদে !

'কিন্তু তুমি দেখে নিও মেজদা। জমির যারা এমনি করে অনিষ্ট করে জমি তাদের সয় না। জমি তো নয় দাদা, এ যে লক্ষ্মী—স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকরুণ যে মাটি। আমরা চাষী, বুঝলে না দাদা, জানের চেয়ে বড়ো জমি আর ধান, জমির যে শত্রু সে আমাদের সব চাইতে বড় শত্রু, তার সর্বনাশ হবেই।'

কথাটা বিশ্বাস করতে পারি এমন প্রমাণপত্র কম। তবু বিষ্টুপদকে কিছু বলতে পারলাম না। কিছুক্ষণ কেটে গেল, দুজনে চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষ্টু বললে 'দেখো, মেজদা, একটা স্বপ্ন দেখেছি গত রাত্তিরে তার মানেটা কি বলতে পার?'

'স্বপ্ন দেখেছ? কী স্বপ্ন, বলো!' আমি বললুম।

'আমি যেন ঐ ঘোষেদের পেট্টায় চাষ দিচ্ছি, সামনের হালে আমি, মাঝের হালে আমার ভাইপো হরি, শেষের হালে আমার ছেলে খাঁদা, একজন মজুরও নেওয়া হয়েছে। দেখতে দেখতে চাষ দেওয়া হয়ে গেল, ধান রোয়া সুরু করলাম, যত রুয়ে যাচ্ছি, জমি আর ফুরোয় না, আমাদেরও রোখ পড়েছে আজ আর ফেলে রাখবো না একে। সূর্য মাথার ওপর এলো, পশ্চিম দিকে হেলে গেল, খিদেও পেয়েছে খুবই, তবুও রুয়েই যাচ্ছি, মজুরটাকে খেতে যেতে বললাম কিন্তু আমরা তিনজন রুয়েই যাচ্ছি, আর জমি যেন কাদাটে জলের ঢেউ তুলে বলছে এখনো বহু বাকি, জমি আর ফুরুচ্ছে না। খাঁদার মা ভাত এনে দাঁড়িয়ে আছে, বিরক্ত হয়ে ডাকছে—তোমরা এসো বেলা যে গড়িয়ে গেল, তাকে একটা খাঁকার দিয়ে বললাম—মাগী একেবারে ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে এসেছে, এটা না রুয়ে যাবো না যাঃ। খাঁদা কি একটা বলতে যাচ্ছিল তাকে একটা কড়া কথা বলতেই বেচারা চুপ করে রইল। আমরা রুয়েই চল্লাম কিন্তু যখনই পিছনে ফিরে দেখি তখনই দেখি আমার জমির আলের কাছে যেতে এখনো বহু বাকি। ধানের গোছ দেখে মনে হয় যেন তিন বিঘা রুয়েছি, কিন্তু জমি যা বাকি রয়েছে তাও মনে হয় তিন বিঘার মতোই, অথচ জমি তো আমার তিন বিঘা মোটে। বাকি জমিটা যেন অনবরত ঢেউ তুলে বলছে—এইটুকু সেরে ফেল, এইটুকু সেরে ফেল। সন্ধ্যা হল, খাওয়া হল না, জমিও রোয়া শেষ হল না। ফিরবার সময় শুধুই শুনতে পেলুম ঐ ডাক—এইটুকু সেরে ফেলো, থেমোনা, এইটুকু সেরে ফেল, যেয়োনা। ফিরে ফিরে দেখি—কে ডাকে, কে কাঁদে। চেনা-চেনা গলা, চেনা-চেনা পথ, তবুও যেন বুঝি না। খাঁদার মা নাকি? কিন্তু এযে ঘোষপুকুরের সেই বাড়ির পথ। ওই যে বাবুদের সেই দু বিঘার পেট্টা। পড়ে রয়েছে জমি জলে ভেসে—কে দেয় চাষ? এখানে এলামই বা আমি কখন? এলামই বা কেন? বাড়ি ফিরছি জমি থেকে, এখানে এসেছি কেন আর মরতে। খাঁদার মা আসবে

এখানে কেন? কিন্তু সেই চেনা-চেনা গলা বলে—আমায় ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না—মাটিটা কাঁদছে যেন আমার পানে চেয়ে—'

চমকে উঠ্‌ছিলাম। মেঘদূতই তো! মাটি আর মানুষ, মাটি আর মানুষ—দুঁহু লাগি দুঁহু কাঁদে—বর্ষার ধারায় জাগে তাদের বিরহের সুর—দুয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় রাজার দণ্ড, আইনের অভিশাপ, বাধা আর ব্যবধান।

'স্বপ্নটা ভাল না মন্দ মেজদা?' চমকে উঠ্‌লাম আবার বিষ্টুপদের প্রশ্নে।—'স্বপ্নটা ভালো না মন্দ? ভোর রাত্রির স্বপ্ন—'

কি বলব? বললাম, 'ভোর রাত্তিরের স্বপ্ন? তা হলে তো সত্যি।'

বিষ্টুপদ তাকিয়ে রইল।—'সত্যি? মন কেমন কেমন করছে ওদের জন্তে। পাঠান ফৌজ বসেছে ঘোষবাবুদের বাড়ি। স্বরাজের মানুষ আমরা—উজোড় করেছে আমাদের ঘরদোর। টেনে এনেছে জেলে। তাই বলে জমি তো আমাদের ভুলবেন না—তিনি যে লক্ষ্মী। এই তো বর্ষা নামল, পারবে ঘোষ বাবুরা? এবারও পারবে না সে দু' বিঘার পেট্টায় আমার সোনার ফসল ফলাতে। ....দেখছ তো বিষ্টিটা। ... এমন বিষ্টিটা....কেমন চাষ লাগাতুম কষে—'

রবি মিত্র

বিজ্ঞানবাদের উৎস

বুদ্ধি দিয়ে, তর্ক করে, বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করা যায় না; এ-প্রচেষ্টা স্বয়ংবিরুদ্ধ, আত্মঘাতী। কেন না, এই পথে এগুতে গেলে বুদ্ধির দাবিকে, চেতনার দাবিকেই, চরম দাবি বলে মেনে নিতে হয়,—আর সেটুকুই তো বিজ্ঞানবাদের আসল কথা। তাই, দিকপাল দার্শনিকও বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করতে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান-বাদের জালেই জড়িয়ে পড়েছেন – দর্শনের ইতিহাসে এ যেন এক আজব গোলক ধাঁধা। যুগে যুগে বারবার মানুষের চরম বুদ্ধি, চরম মনন-মনীষা, বিজ্ঞানবাদকে অসম্ভব বলে চিনতে চেয়েছে, তবুও মুক্তি পায়নি তার সম্মোহনী দাসত্ব থেকে। যেন মৃত্যুর পরই পৌরাণিক দেবতার পুনরুজ্জীবন, আর দর্শনের মন্দিরে আপাত তেত্রিশ-কোটি দেবদেবীর মধ্যে এই দেবতার উদ্দেশেই প্রায় তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন উপাসনা।

বিজ্ঞানবাদী তো উল্লাস করে বলবেনই: বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের সমস্ত প্রচেষ্টাই বৃথা। এ যেন ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলাবাজি (কেয়ার্ড), কেন না দর্শন আর বিজ্ঞানবাদ নেহাতই তো সহোদর! কিংবা, যা একই কথা, যা কিছু বুদ্ধি-সহ তাকেই যথার্থ বলে মানতে হবে, আবার যা-কিছু যথার্থ তাকেই বুদ্ধি-সহ বলতে হবে (হেগেল)। সত্তা আর চেতনা যেন একই কাচের উত্তল আর অবতল দুটো দিক, যেন একই চুম্বকের দুই মেরুকেন্দ্র। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটির কথা ভাবাই যায় না, যেমন ভাবা যায় না একটা ছড়ির কথা যে-ছড়ির মাত্র একটি প্রান্ত! দর্শন যদি সত্তা-সন্ধানী হয় এবং সত্তার রূপ যদি অনিবার্যভাবেই চেতন-নির্ভর হয় তাহলে বিজ্ঞানবাদ ছাড়া দর্শনের পক্ষে আর কী গতি হতে পারে? বিজ্ঞানবাদ সমস্ত দর্শনেরই যে অনিবার্য পরিণাম শুধু তাই নয়, যেন দার্শনিক প্রচেষ্টারই নামান্তর মাত্র।

হেগেল-কেয়ার্ড-এর এই যে কথা, একদিক থেকে দর্শনের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে এমন নিখুঁত বর্ণনা একান্তই বিরল। আবার, অন্য দিক থেকে, দার্শনিক অসত্যের এমন চূড়ান্ত দৃষ্টান্তও দুর্লভ কম নয়!

দর্শনের অতীত ইতিহাসটুকুর আশ্চর্য নিখুঁত বর্ণনা। কেননা, যাকে আমরা এতোদিন ধরে দর্শন বলে জেনেছি তার চূড়ান্ত দরবার শেষ পর্যন্ত চেতনার কাছেই হয়েছে—তর্কশাস্ত্রের হাজার রকম জটিল অলিগলি ঘুরে বুদ্ধির আর বিচারের আলোতেই দার্শনিক আলোচনার শেষ সিদ্ধান্ত এতদিন পর্যন্ত সন্ধান করা হয়েছে। এক কথায়, চেতনাকেই মেনে নেওয়া হয়েছে দর্শনের চরম কষ্টি-পাথর বলে।

অবশ্য তাই বলে বিপরীত মতবাদ—অচেতনবাদ বা জড়বাদ * মাঝে মাঝে মাথা তোলবার চেষ্টা যে করেনি তা নয়, কিন্তু এতোদিন পর্যন্ত, অর্থাৎ সোভিয়েট দেশে জড়বাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হবার আগে পর্যন্ত, তার পরমায়ু নেহাতই ক্ষীণ, তার পদক্ষেপ দ্বিধাবিড়ম্বিত, আত্ম-নিশ্চয়তার অভাবে সে এগিয়েছে আত্মঘাতের পথে, এমন কি বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় পড়ে সে অনেক সময় যা-হোক করে নিজেকে বাঁচাবার আশায় একটা রফা করে নিতে চেয়েছে চেতন-কারণবাদের সঙ্গেই। এই জড়বাদ সম্বন্ধে সাধারণ দার্শনিক সমাজের ভঙ্গিটাও লক্ষ্য করবার মতো : সাদর সম্ভাষণ তার কপালে কোনোদিনই জোটে নি, বরং জুটেছে শুধু প্রতিবন্ধ আর বিড়ম্বনা ; যখন সে দুঃসাহসীর মতো বড বেশি দুর্বিনীত হৈ চৈ সুরু করেছে তখন তাকে দর্শনের আঙিনার এক কোণায় বড়জোর একটুখানি আসন করে দেওয়া হয়েছে অস্পৃশ্যের মতো, কিন্তু সেই সঙ্গেই চক্রান্ত-পরামর্শ চলেছে কেমন করে তাকে একেবারে একঘরে করে তার ভিটেমাটি পর্যন্ত উচ্ছেদ করা যায়। কখনো বা তাকে খোলা-খুলি গালাগালি করে একেবারে উচ্ছন্নে পাঠাবার ব্যবস্থা, কখনো বা তাকে সংস্কার করে জাতে তুলে নেবার অজুহাতে একেবারে সর্বস্বান্ত করে দেবার মতলব। খোলাখুলি গালাগালি করবার দৃষ্টান্ত সংখ্যায় বহুলতর, এমন কি অনেক সময় 'জড়বাদ' শব্দটি দার্শনিক অপচেষ্টার নামান্তর হিসেবে ব্যবহৃত। কিন্তু এ জাতীয় দৃষ্টান্ত অনেক স্থূল, অনেক ভোঁতা। এর মধ্যে চিত্তাকর্ষণ কম। বরং, সংস্কার করবার নামে সর্বস্বান্ত করবার উদ্যম দৃষ্টান্ত হিসেবে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। এ-উদ্যমের উদাহরণ সর্বদেশে, সর্বযুগে—অতীতের ভারতবর্ষে, প্রাচীন গ্রীসে, আধুনিক ও সাম্প্রতিক য়ুরোপে—প্রায় সর্বত্রই। আমাদের দেশে চার্বাকের দেহাত্ম-বাদ দেবগুরু বৃহস্পতির কূট অভিসন্ধি বলে প্রচারিত ; সাংখ্য-দর্শনের মধ্যে নিরীশ্বর জড়বাদের রেশটুকুকে সংস্কার করতে করতে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানভিক্ষু এর মধ্যে এমন কি ঈশ্বরের জন্যও জায়গা করে ফেললেন ; বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর বৈভাসিক ও সৌত্রান্তিকদের মধ্যে জড়বাদের যতটুকু ভগ্নাংশ পড়েছিল সেটুকুকে উপহাস করে মাধ্যমিক আর যোগাচারেরা প্রচার করলেন—তথাগতের পক্ষে ওটুকু

* বিজ্ঞানবাদের, বা চেতনকারণবাদের বিপরীত মতবাদ হল অচেতনবাদ বা জড়বাদ। লেনিন-এঙ্গেল্‌স্ দ্রষ্টব্য। দার্শনিক সমাজে এ-কথা অবশ্য সাধারণ ভাবে স্বীকৃত নয়। চেতনকারণবাদ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা সর্বত্র জড়বাদের পথ ধরতে পারেনি, তাই বিজ্ঞানবাদের পরিবর্তে যখন কোনো বিপরীত মতবাদ দাঁড় করাবার প্রশ্ন উঠেছে তখন বরং হরেক রকম আজব চিড়িয়ার আমদানি করা হয়েছে (যেমন, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ, অভিজ্ঞতা-বিচারবাদ, ইত্যাদি) কিন্তু জড়বাদকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এ ঘটনাটুকুও ভালো করে নজর করবার মতো—জড়-বাদের বিরুদ্ধে পণ্ডিত সমাজে স্বাভাবিক "প্রতিবন্ধ"র একটি দৃষ্টান্ত। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে।

নেহাতই মন্দবুদ্ধির মানুষকে প্রবোধ দেবার প্রচেষ্টা। বিদেশের দর্শনেও একই কথা। গ্রীক যুগে ডিমক্রিটাস-কে সংস্কার করলেন এ্যানেক্সাগোরাস, আবার এ্যানেক্সা-গোরাস-কে সোফিস্ট আর সক্রেটিস—দুর্জয় জড়বাদ থেকে চেতনকারণবাদে পৌঁছবার যেন সোজা-সড়ক বেরিয়ে গেল। আধুনিক ইংলণ্ডেও এ-উদাহারণের ব্যতিক্রম নেই—বেকন্-হব্স্-এর জড়বাদকে শুধরে নিলেন লক্, আবার লককে শুধরে নিলেন বার্কলি-হিউম; শোধরানোর মানে দাঁড়ালো জড়বাদকে সোজা গোরস্থানে পৌঁছে দিয়ে তার শবদেহের উপর বিজ্ঞানবাদ-প্রেতের আরাধনা করা! আবার এদিকে দেকার্ত, জড়বাদের সঙ্গে তিনি আপোসি করেছেন দ্বিধাভরা বিজ্ঞানবাদের, দেকার্ত-এর পর স্পিনোজা, তিনি তবুও পারমার্থিক বিজ্ঞানবাদের মধ্যে ব্যবহারিক জড়বাদকে ঠাঁই দিয়েছেন ("পিটারের মন পিটারের দেহ"-ইত্যাদি); আর তারপর লাইব্নিৎস্, জড়বাদের ক্ষীণতম স্বাক্ষরটুকুও তিনি লোপ করে দিলেন, জড় হল চিৎপরমাণুর প্রতিভাস-মাত্র।

সোভিয়েট দেশে জড়বাদের পূর্ণ বিজয় ঘোষিত হবার আগে পর্যন্ত সবদেশে সব যুগে এই একই কথা: জড়বাদের কপালে যদিই বা কখনো সাময়িক সাফল্য জুটেছে তবুও সেই সাফল্যের পরই বিদগ্ধ সমাজ হয় একে একেবারে সোজাসুজি উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, আর না হয় তো সংস্কার করে নেবার নামে একেবারে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। যে সব দিকপাল দার্শনিক বিজ্ঞানবাদের অসন্তবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন তাঁরাও কেউ বিপরীত মতবাদ—জড়বাদের—দিকে অগ্রসর হতে পারেন নি, বিজ্ঞানবাদকে ছেড়ে আর এক দার্শনিক আজব চিড়িয়াকে সন্ধান করতে বেরিয়েছেন, আর শেষ পর্যন্ত এই আজব চিড়িয়ার দোহাই দিয়ে প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানবাদের আঙিনাতেই ক্লান্ত দার্শনিক চেতনা এলিয়ে দিয়েছেন। ফলে দর্শনের ইতিহাসে চেতন কারণবাদেরই অবিচ্ছিন্ন প্রতিপত্তি, দর্শন আর বিজ্ঞানবাদ যেন একই কাচের উত্তল আর অবতল দুটো দিক মাত্র!

জড়বাদের ঐতিহাসিক ভাগ্য নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে পরেই সুবিধে হবে। আপাতত প্রশ্ন হল: দর্শনের ইতিহাসের কপালে এমন হল কেন? কেন সে মুক্তি পায়নি বিজ্ঞানবাদের প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে? চেতনকারণ-বাদেই কেন তার একান্ত পরিণতি? তথাকথিত বিশুদ্ধ দর্শনের বিদগ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইলে এ-প্রশ্নের জবাব খোঁজা বিফল হবে। বড় জোর, শুধু এইটুকু বলা চলবে যে এতদিন পর্যন্ত বুদ্ধির দাবিকে বা চেতনার দাবিকে (তথাকথিত বুদ্ধিবিতৃষ্ণ দার্শনিকরাও বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে চেতনারই অপর কোন অঙ্গকে আশ্রয় করতে চেয়েছেন) চরম দার্শনিক পদ্ধতি বলে মেনে নেবার দরুন দর্শনে এমনটা না হয়ে আর উপায় ছিল না! এ-কথা অভ্রান্ত হলেও আলোচ্য সমস্যার সমাধান হিসেবে নেহাতই অসম্পূর্ণ; কিংবা, এ-কথা

আসল সমস্যাকে শুধু ঘুরিয়ে প্রকাশ করা, সমাধান করা নয়। কেননা, পদ্ধতির দিক থেকে চেতনার উপর নির্ভর করা আর পরিণামের দিক থেকে বিজ্ঞানবাদ—এ তো একই কথার ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি মাত্র। কেন এমন হয়েছে? যুগযুগ ধরে দার্শনিকেরা কেন চেতনার দাবিকে চূড়ান্ত দাবি বলে প্রচার করেছেন, কিংবা, যা একই কথা, পরম সত্তাকে চেতন-নির্ভর না বলে কেন শেষ পর্যন্ত শান্তি পান নি?

"বিশুদ্ধ" দর্শন এই 'কেন'-র জবাব যোগাতে পারে না। অথচ মানবসমাজের ক্রমবিকাশের দিক থেকে এর জবাব একান্ত স্পষ্ট: এতদিন ধরে এমনিতর ঘটনা না ঘটে উপায়ই ছিল না! যাকে আমরা "দর্শন" বলে মেনেছি তার জন্ম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ঔরসে, সে লালিত হয়েছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গর্ভে—তার দেহ থেকে শ্রেণীবিভাগের চিহ্ন মোছা যাবে কেমন করে? বিজ্ঞানবাদ, চেতন-কারণবাদ, সেই শ্রেণীবিভাগের চিহ্ন! শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে নিকেশ না করলে বিজ্ঞানবাদের হাত থেকে নিস্তার নেই, তাই সোভিয়েট সমাজে জড়বাদের প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা!

বিদগ্ধ গোষ্ঠী প্রত্যেকটি কথাতেই বিরূপ হবে। না-হলেই বরং অবাক হবার কথা, কেননা এই বিদগ্ধ গোষ্ঠীও শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই উৎপাদন, তাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই মুখপাত্র; দার্শনিক বিচার যদি সমাজ-বিপ্লবের প্রসঙ্গ তোলে তাহলে বিদগ্ধ সমাজের পক্ষে শিউরে ওঠা স্বাভাবিক বই কি! মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আজকের দিনে কেন যে এত রকম অভিনব "প্রতিবন্ধ" (RESISTANCE) তার ব্যাখ্যাও এদিক থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ঔরসে দর্শনের জন্ম, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গর্ভে দর্শন লালিত, তাই দর্শনের দেহে অনিবার্য ভাবেই শ্রেণীবিভাগের চিহ্ন। কিন্তু তার আগে? তার আগে মানবসমাজ শ্রেণীবিভক্ত ছিল না, তার সংস্কৃতি জগতে সত্তান্বেষণ দর্শনে পরিণত হয় নি, আর এই সত্তান্বেষণ বিজ্ঞানবাদের আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হয় নি। আর এর পর? এর পর এক নবীন নিঃশ্রেণীক সমাজ, সে-সমাজে দর্শন-শাস্ত্রের পরমায়ু পরিসমাপ্ত, বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যেই সত্তান্বেষণের চরম পরাকাষ্ঠা; সেই সমাজে বিজ্ঞানবাদের বীজ বিলুপ্ত আর ঐই বীজ থেকে উৎপন্ন বিষবৃক্ষ শুধু জীর্ণ শুষ্ক-কাষ্ঠের মতো সংস্কৃতির যাদুঘরে গবেষকের গৌরব মাত্র। পরমায়ুর দিক থেকেও দর্শন আর বিজ্ঞানবাদ সমব্যাপ্ত—সত্যিই যেন একই কাচের উত্তল আর অবতল দুটো দিক।

আগে ছিল আদিম-সাম্যাবস্থা। মানুষের সংস্কৃতির সবটুকুকে তখন জুড়ে ছিল তার নাচ আর তার ইন্দ্রজাল,—কিংবা নাচে ইন্দ্রজালে মেশা এক প্রাগ্-বিভক্ত সাংস্কৃতিক সত্তা। এই যে প্রাথমিক প্রাগ্‌বিভক্ত সংস্কৃতি, এর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করতে হবে; দেখা যাবে, এর মূল দাবি বিজ্ঞানবাদের বিপরীত দাবি।

আলোচনা করতে হবে কেমন করে আদিম সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুতির পর—মানব-সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার পর—এই প্রাথমিক প্রাগ্-বিভক্ত বিজ্ঞানবাদ-বিরুদ্ধ সংস্কৃতি থেকে বিজ্ঞানবাদী দর্শন (প্রথমে ধর্ম আর তারপর ধর্মেরই পরিচ্ছন্ন সংস্করণ দর্শন বা বিজ্ঞানবাদ) সত্যান্বেষণের সমস্তটুকুকে জুড়ে বসতে লাগল। অবশ্যই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজেরও ইতিহাস আছে, শ্রেণী-বিভাগের কাঠামোর মধ্যেও অনেক রকম পরিবর্তন ঘটেছে ; তাই দর্শনের বা বিজ্ঞানবাদের চেহারাও যুগে যুগে এক নয় ; মোটামুটি একটা অপরিবর্তিত কাঠামোর মধ্যে নানান রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আরো দেখতে হবে, মাঝে মাঝে জড়বাদ কেন মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে, কিসের তাগিদে, কোন সামাজিক পরিবর্তনের চাপে। সোভিয়েট সমাজে—মানব-ইতিহাসে প্রথম পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানবাদকে অগ্রাহ্য করবার—সচেতন আর সমবেতভাবে অগ্রাহ্য করবার উৎসাহের উৎসই বা কোথায় ? এ সব প্রশ্নের জবাব থেকে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের মূল রহস্য আবিষ্কার করবার আশা আছে।

আদিম সাম্যাবস্থার প্রাগ্-বিভক্ত সংস্কৃতি। সে-সংস্কৃতির প্রধান অভিব্যক্তি দু' দিকে—নাচ আর ইন্দ্রজাল। নাচ : কিন্তু আমরা যে অবসর-বিনোদনকে নাচ বলতে অভ্যস্থ তা মোটেই নয়। নাচের মধ্যে অনেকখানিই ইন্দ্রজাল। আর ইন্দ্রজাল : ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে সভ্য মানুষের ভ্রান্তির অন্ত নেই। কেন যে এত ভ্রান্তি তারও সামাজিক কারণ আছে।

নাচ, কিন্তু আজকালকার অবসর বিনোদন নয় ; আদিম মানুষের কাছে বিনোদিত করবার মতো অবসর কোথায় ? চার পা ছেড়ে সবে সে দুপায়ে উঠে দাঁড়াতে শিখেছে আর শিখেছে আগেকার দুটো ফালতু পা-কে দু'হাত হিসেবে ব্যবহার করতে। হাতিয়ার তৈরি করতে শিখলো, তাই হাত। দুনিয়ার আর কোনো জানোয়ার হাতিয়ার বানাতে শেখে নি, "হাত" নেই আর কারুর। হাতের সঙ্গে মগজের যোগাযোগ, তাই হাতিয়ার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিরও ক্রমবিকাশ। কিন্তু আদিম মানুষের প্রথম সেই হাতিয়ার বড় স্থূল, প্রকৃতিকে জয় করবার কাজে প্রায় অকর্মণ্যের চেয়ে মাত্র একটুখানি বেশি। সামনে প্রকৃতি, বিরাট বিপুল প্রকৃতি—স্থূল আর প্রথম হাতিয়ার নিয়ে মানুষ এই প্রকৃতিকে যতটুকু জয় করতে পেরেছে ততটুকুই তার দুঃখ-মুক্তি। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই, হাতে মাত্র সামান্য হাতিয়ার। কতটুকুই বা পেরে ওঠা যায় ? তবু যেটা সবচেয়ে জরুরি কথা, হাতিয়ার হাতে প্রকৃতিকে জয় করতে নেমেছিলো বলেই মানুষ প্রকৃতিকে চিনতে শিখলো, আর চিনতে শিখলো যত ভালো করে ততই ভালো করে পারল জয় করতে। জ্ঞান এসেছে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, আবার জ্ঞান হয়েছে সংগ্রামের অস্ত্র ; তাই সংগ্রামকে বাদ দিয়ে নিছক তত্ত্বজিজ্ঞাসার কথা আদিম মানুষের বেলায় ওঠেই না। কেবল

মনে রাখতে হবে এ সংগ্রাম মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়। কেননা, তখন ছিল আদিম সাম্যাবস্থা, মিলেমিশে এক সঙ্গে থাকবার নিয়ম। সমাজ তখন বিশিষ্ট মানুষের সমষ্টিমাত্র নয়, যেন এক অখণ্ড সমগ্রতা ; একের সঙ্গে দশের সম্পর্ক সংখ্যাগণিতের সম্পর্ক নয়, অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তাই, মানুষের, সংগ্রাম আর জ্ঞান, কিংবা সংগ্রাম-জ্ঞানের সেই প্রাগ্-বিভক্ত সত্তায়, সমগ্রতার চেতনা প্রতিফলিত—ব্যষ্টির চেতনা নয়, শ্রেণীর চেতনা নয়, সমগ্র সমাজের প্রাগ্-বিভক্ত চেতনা। এই চেতনা আদিম মানুষের গোষ্ঠী-নৃত্যে,—গোষ্ঠী-নৃত্য গোষ্ঠী-জীবনের অঙ্গমাত্র। সে-নাচের মধ্যেই আদিম মানুষের সমস্তটুকু সাংস্কৃতিক জীবন, কিন্তু সে-সংস্কৃতিতে অবসর বিনোদনের উৎসাহ নেই, নেই বিশুদ্ধ তত্ত্ব অন্বেষণের তাগিদ। আদিম মানুষের অবিভক্ত সংস্কৃতি তার জীবন-সংগ্রামের অঙ্গ—ব্যষ্টির সংগ্রাম নয়, গোষ্ঠীর সংগ্রাম ; মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম নয়, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম। তাই অন্যে এই নাচের অনেকখানি জুড়ে ছিলো ইন্দ্রজাল—ইন্দ্রজালের মধ্যস্থতাতেই প্রকৃতির রাজ্যে কার্যকারণ নিয়মের অনুবর্তমানতা আবিষ্কার আর সেই অনুবর্তমানতার মূলসূত্র ধরে প্রকৃতিকে জয় করবার প্রচেষ্টা।

শ্রীমতী হ্যারিসন দেখাচ্ছেন :

'অসভ্য মানুষ হল কাজের মানুষ। যে-কাজ করবার ইচ্ছে তার নিজের মনে সে-কাজ করবার জন্যে কোনো দেবতাকে অনুরোধ করবার বদলে সে নিজেই কাজটা সারবার চেষ্টা করে ; প্রার্থনার বদলে সে উচ্চারণ করে মন্ত্র। এক কথায়, সে ইন্দ্রজাল ব্যবহার করে, আর প্রায়ই সে মনে-প্রাণে ঐন্দ্রজালিক নাচে মত্ত। রোদ বা হাওয়া বা বৃষ্টি চাইলে সে গির্জায় গিয়ে কোনো অলীক দেবতার সামনে নুয়ে পড়ে না, নিজের গোষ্ঠীকে আহ্বান জানায়—আর তারপর সকলে মিলে একসঙ্গে রোদের নাচ বা হাওয়ার নাচ বা বৃষ্টির নাচ নাচতে সুরু করে। ভালুক শিকার বা ভালুক ধরবার আগে সে ভালুককে হারাবার মতো শক্তি পাবার আশায় তার দেবতার পায়ে মাথা কোটে না, শিকারের মহড়া দেয় ভালুক-নাচ নেচে।'

আবার 'গ্রীকরা বুঝেছিলো আপনি যদি মন্ত্রাচরণ (rite) করতে চান তাহলে কিছু কাজ করা দরকার ; অর্থাৎ আপনার মধ্যে শুধুই কিছু ভাবাবেগ জাগলে চলবে না, তাকে কাজের রূপে প্রকাশও করতে হবে।' তাছাড়া 'মন্ত্রাচরণের একটি অঙ্গকে আমরা আগেই পরীক্ষা করেছি, সেই অঙ্গ হল মন্ত্রাচরণ সমবেতভাবে করা দরকার, অনেকগুলি মানুষের পক্ষে এক সঙ্গে একই আবেগ অনুভব করা দরকার।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই তো গেল আদিম মানুষের নাচের কথা। ইন্দ্রজাল-এর আসল ব্যাপারটুকু লক্ষ্য করতে হবে। শ্রীযুক্ত ফ্রেজার দেখাচ্ছেন :

৫

Whenever sympathetic magic occurs in its pure unadulterated form, it assumes that in nature one ever follows another necessarily and invariably without the intervention of any spiritual or personal agency. Thus its fundamental conception is identical with that of modern science; underlying the whole system is a faith, implicit but real and firm, in the order and uniformity of nature……… Thus the analogy between the magical and the scientific conception of the world is close. In both of them the succession of events is perfectly regular and certain, being determined by immutable laws, the operation of which can be foreseen and calculated precisely; the elements of caprice, of chance and of accident are banished from the course of nature…………………………………………… Thus in so far as religion assumes the world to be directed by conscious agents who may be turned from their purpose by persuasion, it stands in fundamental antagonism to magic as well as to science, both of which take for granted that the course of nature is determined, not by the passions and caprice of personal beings, but by the operation of immutable laws acting mechanically. In magic, indeed, the assumption is only implicit, but in science it is explicit.

উত্তর উদ্ধৃতিকে দীর্ঘতর করবার প্রলোভন সংবরণ করতে হয়; তবু এটুকু থেকেই আদিম মানুষের নাচে-ইন্দ্রজালে মেশা প্রাগ্-বিভক্ত সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটা মূলসূত্র আবিষ্কার করা যায়।

প্রথমত, এ-সংস্কৃতি একের নয়, দশের; ব্যষ্টির নয়, গোষ্ঠীর। বিদগ্ধ ব্যক্তি বা বিদগ্ধ সমাজ বলে আলাদা কিছু নেই, সংস্কৃতি যতটুকু তাতে সকলেই সমান অংশীদার। দ্বিতীয়ত, এ-সংস্কৃতির প্রধান উদ্দেশ্য প্রয়োগ, প্রকৃতিকে জয় করা; বিশুদ্ধ জ্ঞান বা অবসর বিনোদনের তাগিদ নেই, তাগিদ যেটুকু সেটুকু কাজের তাগিদ। প্রয়োগের খাতিরেই জ্ঞান, আবার জ্ঞানের দরুন প্রয়োগের উন্নতি—জ্ঞান আর কর্ম পৃথক হয়ে পড়ে নি, জ্ঞান আর কর্মের প্রাগ্-বিভক্ত প্রকৃতিগত সমন্বয়। তৃতীয়ত, চেতনকারণবাদের দিকে, ধর্মের দিকে, বিজ্ঞানবাদের দিকে ঝোঁক নেই। ঝোঁকটা বহিঃপ্রকৃতিকে চেনবার দিকে, বহিঃপ্রকৃতির অমোঘ নিয়মকে আবিষ্কার করবার দিকে, এক কথায় জড়বাদেরই দিকে। তাই বলে, সচেতন জড়বাদের উপর ইন্দ্রজালের প্রতিষ্ঠা সত্যিই নয়; তা হবার কথাও নয়। আদিম অসভ্য মানুষ দল বেঁধে প্রকৃতিকে জয় করতে মেতে উঠেছিল, কিন্তু তখন তার সামর্থ্য অতি ক্ষীণ, তার সার্থকতা নেহাতই সংকীর্ণ। বৃষ্টির নাচ নাচলে সত্যিই এমন কিছু বৃষ্টি পড়ার বাস্তব সম্ভাবনা নেই, শিকারের নাচ নাচলেই এমন কিছু মৃগয়া সমাধা হবার কথা নয়। বাস্তব সাফল্যের সংকীর্ণতাকে

কাল্পনিক সাফল্য দিয়ে পূরণ করা। ইন্দ্রজালের তাই অনেকখানিই ইচ্ছাপূরণ। তবুও তখন এই ইচ্ছাপূরণটুকুও জীবন সংগ্রামের অঙ্গ ; এ ইচ্ছাপূরণ বাস্তব সংগ্রামে উদ্দীপনা জুগিয়েছে। (ইন্দ্রজালের মধ্যেকার এই কাল্পনিক দিক এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই দিকটুকুর কী রকম পরিণতি হয়েছে সে-কথা পরে ভালো করে আলোচনা করতে হবে।)

তারপর সেই আদিম সাম্যাবস্থা-বিচ্যুতি। শ্রেণীহীন সমাজ ভেঙে দেখা দিল নতুন সমাজ ; সে-সমাজে শ্রেণীবিভাগ, অতএব শ্রেণীসংগ্রামও। আর দেখা দিল দর্শন আর বিজ্ঞানবাদ। ইন্দ্রজালের বদলে ধর্ম আর ধর্মেরই সংস্কৃত সংস্করণ দর্শন, প্রয়োগের পরিবর্তে নিছক তত্ত্বজিজ্ঞাসার উৎসাহ, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বা জড়বাদের দিকে ঝোঁক ছেড়ে চেতনকারণবাদ বা বিজ্ঞানবাদের দিকে ঝোঁক।

শ্রেণী বিভাগের পাশাপাশি বিজ্ঞানবাদের উদয়। একে নিছক ঐতিহাসিক আপতন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে নিকেশ করার মধ্যেই বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডনের প্রকৃত রহস্য। একে রাজনৈতিক দল-বিশেষের ঢেঁড়রা বলে ব্যঙ্গ করাও অসম্ভব। বিজ্ঞানবাদের মধ্যে, চেতন-কারণবাদের মধ্যে শ্রেণী-সমাজের ছায়া ; শ্রেণী-সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদের কারণ-কার্য সম্পর্ক।

আদিম শ্রেণীহীন সমাজ ভেঙে দেখা দিল নতুন সমাজ—শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। একদিকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, অপর দিকে শূদ্র ; একদিকে ইসাক-ফেরারো-পুরোহিত, অপরদিকে বঞ্চিত লাঞ্ছিত জনগণ ; একদিকে শোষক-শাসকের দল, অপরদিকে শোষিত শ্রমিকের দল।—দল বেঁধে, সবাই মিলে, প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা নয়—প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করবার ভার পড়ল শুধু একদল লোকের উপর ; তারাই গতর খাটাবে, মাটি চষবে, প্রাসাদ গড়বে, মন্দির গড়বে। শ্রমের ভার, কিন্তু শ্রমের ফলভোগে অধিকার নয়। সে-অধিকার অন্য শ্রেণীর, শাসক শ্রেণীর। পরান্নজীবী এই যে নতুন শ্রেণীর মানুষ, এদের পক্ষে গতর খাটাবার তাগিদ নেই একটুও। তাই গতর খাটানোটা নেহাতই ইতরের লক্ষণ—শূকর-যোনি, শ্বা-যোনি বা চণ্ডাল-যোনি, (ছান্দোগ্য উপনিষদ)। গতর খাটাবার তাগিদ এতটুকুও নেই, গতর খাটানো নেহাতই ইতরের লক্ষণ—তাই মাথা খাটাবার দেদার অবসর। চিন্তা বা বুদ্ধি বা জ্ঞান, বা যে কোনো নাম দিয়েই এই মাথা খাটানো ব্যাপারটাকে ব্যক্ত করা যাক না কেন,—চরম উৎকর্ষ বলে ঘোষিত। এই জ্ঞান-এর উপর শাসক শ্রেণীর একেবারে একচেটিয়া অধিকার, কেননা শোষিত জনগণের উপর গতর খাটাবার ভার এবং তখন হাতিয়ারের এমন উন্নতি হয় নি যে শোষিত জনগণ অল্পমাত্র গতর খাটিয়ে মানব সমাজের মোট অভাব দূর করে বাকি সময়টুকু সংস্কৃতি চর্চা করবে। তাই যাদের উপর গতর খাটানোর দায় মাথা

খাটাবার মতো অবসর তাদের কাছে কল্পনার অতীত। প্রাচীন মিশরী প্যাপিরসের ইংরেজী অনুবাদ এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করবার প্রলোভন হয়, গতর খাটাবার দায় যে আজকের শ্রমিকের দায়ের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে—

I have never seen a blacksmith on an embassy, nor a smelter sent on a mission, but what I have seen is the metal worker at his toil, at the mouth of the furnace of his forge, his fingers as rugged as the crocodile, and stinking more than fish-spawn.... The stone cutter who seeks his living by working in all kinds of durable stone; when at last he has earned something, and his two arms are worn out, he stops; but if at sunrise he remains sitting, his legs are tied to his back.........

Shall I tell thee of the mason, how he endures misery? Exposed to all the winds, while he builds without any garment but a belt......His two arms are worn-out with work; his provisions are placed higgledy-piggledy amongst his refuse; he consumes himself, for he has no other bread than his fingers. He is much and dreadfully exhausted, for there is always a block to be dragged in this or that building, a block of ten cubits by six; there is always a block to be dragged in this or that month as far as the scaffolding poles to which is fixed the bunch of lotus flowers on the completed houses. When the work is quite finished, if he has bread he returns home, and his children have been beaten unmercifully during his absence.

The weaver within doors is worse off there than a woman; squatting, his knees against his chest, he dose not breathe. If during the day he slakens weaving he is bound fast on the lotuses of the lake; and it is by giving bread to the door-keeper that the latter permits him to see the light. The dyer, his fingers reeking— and their smell is that of fish-spawn—his two eyes are oppressed with fatigue, his hand does not stop, and, as he spends his time by cutting rags, he has a hatred of garments. The shoemaker is very unfortunate, he moans ceaselessly, his health is the health of the spawning fish, and he gnaws the leather.

(এর পাশাপাশি তুলনা করে দেখুন আমাদের দেশে শ্রেণীসমাজে শূদ্র সম্বন্ধে মনোভাব "মানব" ধর্মে কী ভাবে চরম রূপ নিয়েছে ; তুলনা করলেই বোঝা যাবে বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার খোলসগুলোয যতই তফাত থাক না কেন সে-সব খোলস ছাড়ালে সবগুলিরই চেহারা মোটামুট এক—

"উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ
পুলকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ")

নোংরা ছবি সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো আধুনিক রাজনীতিকের কল্পিত প্রচার-পত্র নয়।

এ-হেন যে জনগণ, এদের পক্ষে মাথা খাটিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চার কথা নিশ্চয়ই ওঠে না। ভগবান কী রকমের সুতো দিয়ে স্বর্গ থেকে পৃথিবীকে ঝুলিয়ে রেখেছেন? তিনি কেন সৃষ্টি করলেন মানুষকে, আর মানুষের মধ্যে সেরা মানুষ ফেরারোকে? পশ্চিমের কোন পাহাড়ের পিছন দিকে মৃত আত্মার জমায়েত? এ সব প্রশ্ন জনগণের মাথায় ওঠে নি। মানুষকে এই জনগণ অমৃতের পুত্র বলে কল্পনা করবে কেমন করে? কখন এরা বসে ভাববে : ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। 'সোহং ব্রহ্ম' বা 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু' কিংবা ওই ধরনের কোনো মহাবাক্যও এদের কারুর ঠোঁটে ফুটে ওঠবার কথা নয়।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। প্রকৃতির সঙ্গে সমবেত সংগ্রাম নয় আর। আসলে সংগ্রাম যেটুকু সেটুকুর দায় লুণ্ঠিত শোষিত জনগণের ওপর; জীবন তাদের কাছে বোঝামাত্র, চিন্তার জাল বোনা দূরে থাকুক, মরবার ফুরসুতটুকুও তাদের যেন নেই। গতর খাটিয়ে শরীর ক্ষয় করার পথই যেন তাদের সামনে একমাত্র পথ। আর অপরদিকে মুষ্টিমেয় শোষকের দল। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করবার হাতিয়ার তখন যতই অনুন্নত আর স্থূল হোক না কেন শোষণের পদ্ধতি এত নির্লজ্জ আর অকুণ্ঠ যে শোষকের ঘরে বিলাসের প্রাচুর্য। তাই তাদের কাছে প্রয়োগের তাগিদ, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের তাগিদ এতোটুকুও নেই; নিছক চিন্তার জাল বোনাই সহজ আদর্শ। যারা লাঙল চষে, কাপড় বোনে, পাথর কাটে, প্রাসাদ গড়ে, তারা নেহাতই ছোটলোকের দল; গতর খাটানোটা ইতরের লক্ষণ, মাথা খাটানোর মধ্যেই মানবাত্মার চরম আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ; এ-কথা অবশ্যই শাসকরাও বুঝেছিলো যে অন্নের উৎপাদন না হলে শেষ পর্যন্ত কিছুই টেঁকে না; কিন্তু তাই বলে অন্নের এই উৎপাদনকেই ধ্রুব আদর্শ বলে মনে করা নেহাতই স্থূল দৃষ্টির পরিচয়! উপনিষদের ভৃগু-বরুণ সংবাদ-এ এই মনোবৃত্তিরই স্বাক্ষর। বরুণের ছেলে ভৃগু-র শখ হল সবচেয়ে চরম সত্যকে জানবার, তাই বাবার কাছে আবদার করে ভৃগু বললেন : ব্রহ্ম কী, সে-বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। বরুণ বললেন : ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা বর্ণনা শুনলেই ব্রহ্মকে তুমি যে জানতে পারবে এমন আশা নেই, তুমি তপস্যা করো, তপস্যা করলেই ব্রহ্ম-কে জানতে পারবে।* তবে এক আধটা মূলসূত্র পেলে তপস্যা করবার সুবিধে হয়, বরুণ তাই মূলসূত্র হিসেবে ছেলেকে বলে দিলেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, ইত্যাদি। অর্থাৎ যার থেকে এই সমস্ত জিনিস জন্মেছে, জন্মাবার পর যার উপর নির্ভর করছে এবং শেষ পর্যন্ত যার মধ্যেই তা

* 'তপস্যা'—দৈনন্দিন প্রয়োগ থেকে অনেক দূরের কথা, বিশুদ্ধ চেতনার আশ্রয় নেবার কথা।

বিলীন হয়ে যাবে, তাই হল ব্রহ্ম। এই মূলসূত্রকে অবলম্বন করে ভৃগু তপস্যায় বসলেন আর খানিক তপস্যা করে এসে বললেন : বাবা বুঝেছি, অন্নই হল ব্রহ্ম। কেননা অন্ন থেকেই এই সমস্ত উৎপন্ন, ইত্যাদি। বরুণ বললেন : হল না। কেননা, এ যে নেহাতই স্থূল দৃষ্টির কথা। ভৃগু আবার তপস্যা করতে গেলেন, আর তারপর ফিরে এসে বললেন : বুঝেছি বাবা, অন্ন নয় প্রাণ। বরুণ বললেন : হল না, আবার তপস্যা করো। তৃতীয়বারের তপস্যায় ভৃগু ভাবলেন : মনই হল ব্রহ্ম। চতুর্থবারের তপস্যায় তাঁর মনে হল : বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। কিন্তু বরুণ বললেন : এখনো হয়নি, আরো ভালো করে ভেবে দেখ। শেষ দফায় চরম তপস্যা করে ভৃগু বুঝতে পারলেন—আসলে অন্ন নয়, প্রাণ নয়, বিজ্ঞান নয়, আনন্দই হল ব্রহ্ম। আনন্দাৎ হি এব ইত্যাদি।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণীর ভঙ্গি এই উপাখ্যানের ব্যঞ্জনা হয়ে রয়েছে। শুরুতে অন্ন, অন্ন না হলে সমাজের ভিতই যে গাঁথা হয় না। কিন্তু তাই বলে অন্নকে চরম সত্য বলে স্বীকার করা নেহাতই ছোটলোকমির পরিচয়! স্থূলদৃষ্টির অল্পবুদ্ধি মানুষ অন্নকে স্বীকার করুক, নুয়ে পড়ুক অন্ন উৎপাদনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। যারা উচ্চ স্তরের মানুষ তারা ওই ছোটলোকদের মতো অন্ন উৎপাদনের দায় নেবে কেন? তারা এগিয়ে চলুক ধাপে ধাপে অধ্যাত্ম সত্য আবিষ্কারের পথে। ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অধ্যাত্ম সত্যের আবিষ্কার। শেষ ধাপে আনন্দ, শুধু বিশুদ্ধ চৈতন্যের আনন্দ, আনন্দই ব্রহ্ম।

সমাজের একপ্রান্তে একদল নির্বোধ মানুষ শুধু অন্নকে সত্য বলে চিনে শুধু অন্নের উৎপাদনে নিজেদের শরীর-মন ক্ষইয়ে ফেলুক; সমাজের আর এক প্রান্তে বিশুদ্ধ নিষ্কলুষ চিন্তায় মগ্ন আর একদল মানুষ, সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কারই তাদের জীবনে পরম পুরুষার্থ হয়ে থাকুক; আধ্যাত্মিক চেতনার চরমে পৌঁছে তারা হৃদয়ঙ্গম করুক আনন্দই ব্রহ্ম। বিশুদ্ধ আনন্দই হল বিশ্বরহস্যের চাবিকাঠি!

তাই মার্কস্‌ বলেছেন—The division of labour does not become an actual division until the division of material and spiritual work appears. From that moment consciousness may actually seem to be something other then the consciousness of the real world and of the activity within that world. As soon as consciousness begins actually to represent something, without that something being a real representation, we find it ready to free itself from all connections and to become a cult of "pure theory", theology, philosophy, morals, etc.

অবশ্যই এ কথা ঠিক যে ইন্দ্রজাল ছেড়ে মানুষের তত্ত্বজিজ্ঞাসা একেবারে এক ধাপে বিশুদ্ধ দার্শনিক বিজ্ঞানবাদে পৌঁছায় নি। ইন্দ্রজালের পর ধর্ম, ধর্মেরই বিদগ্ধতম সংস্করণ দর্শন; যতদিন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ততদিনই দর্শন এবং ঘুরে ফিরে নানান ভাবে নানান পথ দিয়ে যুগ যুগে বিজ্ঞানবাদেই তার পরিসমাপ্তি। তাই,

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উচ্ছেদের মধ্যেই বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের মূলসূত্র। তাই মার্কস্ বলছেন: এতদিন ধরে দার্শনিকেরা নানানভাবে দুনিয়াকে শুধু ব্যাখ্যা করবারই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হল একে বদল করা।

ভবিষ্যতে বিজ্ঞানবাদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবার বাসনা রইলো। শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার পর ইন্দ্রজাল ছেড়ে ধর্মের ধাপ বেয়ে মানুষ কেন আর কেমন ভাবে দর্শনে-এ পৌছোলো, এ-দর্শন কেন বিজ্ঞানবাদ ছাডা আর কিছুই নয়, মাঝেমাঝে যখন জনগণ সমাজবিপ্লবের পুরোভাগে এসে পড়েছে তখন শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ টলে ওঠবার ফলে কেমন ভাবে বিপরীত মতবাদ—জড়বাদ—মাথা তুলতে চেয়েছে এই সব প্রসঙ্গই বিজ্ঞানবাদের ইতিহাস-প্রসঙ্গে আলোচ্য।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জীয়ন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

২

সত্য কথা বলতে কি, ঢাকার অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি পাঁচুর পক্ষে। ঢাকার জন্য তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। সে টের পেয়েছে পাকা অসুস্থ, তার শরীর মন এখনো ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। শুধু তাই নয়। একেবারে সেই চূর্ণবিচূর্ণ অচেতন অবস্থা থেকে সে আটকা পড়েছে ন্যাকামির ফাঁদে, যাতে আহ্লাদী ন্যাকা পুতুল তৈরি হয়। নমুনা দেখে এসেছে পাঁচু। আগেকার পাকাকে যা নাগাল পায়নি, যার ছোঁয়াচ পেলে পাকা হাঁসফাঁস করত, কাবু অবস্থায় পেয়ে পাকাকে তাই আচ্ছন্ন করেছে। এ ব্যাপার পাঁচু জানে, বড়লোকের ঘরে এক-চেটিয়া হলেও গরীবের ঘরে যে একেবারে হয় না তা নয়। যেমন কায়েতপিসীর ছেলে রতন। নিজে প্রাণপাত কষ্ট করে ছেলেটাকে হাবা করেছে। বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা, আজও পিসী তাকে চোখের পলকে হারায়। মায়ের আঁচল ছাড়া রতনেরও চলে না, বোকার মত কি ভোঁতা মিনমিনে তার কথা আর হাসি, আপিমের নেশায় যেন ঝিমিয়ে আছে সর্বক্ষণ!

পাকাকে যদি এরা তাড়াতাড়ি দলে টেনে নিত, ছিনিয়ে আনত ওই নতুন মা নতুন মামীদের কবল থেকে!

শ্যামল হাসে। অত ভাবছ কেন? ডানপিটে ছেলে, দু দিন আদর খেয়ে ও ছেলে কখনো বিগড়ে যায়? গায়ে জোর হলেই ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। দু দিন থাক না ওযুধ।

মাঝখানে একটু ভাল হয়ে শ্যামলের শরীর আবার খারাপ হয়েছে। ভাঁটার অবস্থাই শরীরের, ওর মধ্যে একটু উনিশ-বিশ। মনের জোর? মনের জোর কি শরীরের জোরের ওপর নির্ভর করে? তেজের জন্য পালোয়ান হতে হয় না, পাঁচু তা জানে, সে কথা নয়। এই রোগজর্জর দুর্বল ভাঙা শরীরে জীবন ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে শ্যামলের, তার তবে এত মানসিক শক্তি আসে কোথা থেকে? হয়তো শ্যামলের সঙ্গে পাকার তুলনা হয় না। সারাজীবন একটানা প্রতিরোধের মধ্যে শ্যামলের মনের জোর গড়ে উঠেছে, পাকা এখনো যে সুযোগ পায়নি। একদিকে একভাবে শক্ত কঠিন হয়নি তার মন, এখনো নড়বড়ে হয়ে আছে, কাদায় পোতা খুঁটির মত এদিক ওদিক উল্টেপাল্টে হেলে পড়ে চাপ লাগলে।

তাছাড়া শ্যামলেরও দুর্বলতা আছে। সেটা যে নিছক দৈহিক দুর্বলতার জন্যই, পাঁচু ক্রমে ক্রমে তা টের পাচ্ছিল।

তার নিজের দুর্বলতা ?

এই একটা মজা হয়েছে পাঁচুর বেলা। চাষার ঘরে জন্ম, সেই ঘরেই বসবাস, চাষাদের সঙ্গেই নাড়ীর যোগ, এদিকে জীবনের পরিধি হয়েছে বিস্তৃত, একেবারে দেশের বিপ্লবী জীবনের অগ্রগণ্য চেতনার প্রান্ত ছুঁয়ে! ডোবা হয়ে নালা বেয়ে সাগর ছুঁয়েছে, ওই অসীম অগাধ জীবনের জোয়ার-ভাঁটা তার জীবনেও বয়। শহরে পড়তে গিয়ে অন্য জাতের ক'জন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বলে খুব বেশি তাতে আসে যায় না। চেনাজানা অভ্যস্ত পুরুষানুক্রমিক ছোট হেঁটো ডোবায় ডুবে থাকলে কোন হাঙ্গামা নেই। গাঁয়ের আরও দু'চারটি চাষীর ছেলে খানিক লেখাপড়া শিখেছে, পাঁচু একা নয়। একটু অন্যরকম, একটু খাপছাড়া হলেও তারা মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে, লেখাপড়া ভুলেটুলে গেছে, বেনো জল ঝেড়ে ফেলেছে। পাঁচুর হয়েছে এই মুস্কিল যে চুঁইয়ে গড়িয়ে আসা যেন জল নয়, জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গ এসে হানা দিয়েছে তার ডোবায়, বেচারী ছেলেমানুষ, জমি-চষা চাষীর ছেলে! স্রেফ সে ভুলে গেছে নিজের কথা। নইলে এত বৈচিত্র্য, এত রোমাঞ্চ, এত অর্থকরী সম্ভাবনার ইঙ্গিতগুলির সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারত না। সে সবল কি দুর্বল, বাহাদুর কিংবা সামান্য, বিচার-বিবেচনার অধিকারী অথবা বেয়াদপ, সব ভাববারও তার সময় নেই, দ্বিধা সংশয় প্রতিক্রিয়াও নেই। কদাচিৎ তার যে আত্মবোধ জাগে বিষাদ বেদনা গ্লানির রসে টইটম্বুর হয়ে, পাকার আহ্বানে ঢাকা যাবার সময় স্টিমারে এবং ঘুমন্ত পাকার খাটের মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে নতুন-মাসীর আলুথালু কান্না দেখায় রাত্রে, তাও আসলে পাঁচুর নিজের কথা ভেবে নিজে নিজে বিচলিত হওয়া নয়। তার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নেই, সে কেন ওরকম নিদারুণ মনোকষ্ট পাবে পরের জীবনের বিরোধের জটিলতায়! জীবনে যত নতুনত্ব এসেছে ওটা তার সে সব আয়ত্ব করারই প্রক্রিয়া। কালীনাথ বল, শ্যামল বল, পাকা বল, কানাই বল—আত্মচিন্তা ওদের পাগল করেছে, আমিত্বের পরাধীনতা ওদের বেঁচে থাকাই ব্যর্থ বিশ্রী বেদনাদায়ক করে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য ফাঁসি কাঠে ঝুলে ঝুলে মরাকেও বড় করেছে। ওদের সংস্পর্শে এসে জ্বালার ভাগও পাঁচুকে নিতে হয়—বিরোধী জগৎকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে ফেলার যে আকাশ-ছোঁয়া স্পর্দ্ধা পাকার, সে স্পর্দ্ধার সামান্য অংশটুকু পেতে হলেও জগৎকে বিরোধী করার যে দারুণ মনোকষ্ট তারও একটু ভাগও অবশ্যই নিতে হয়।

গাঁয়ের সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে পাঁচুর ঘনিষ্ঠতার প্রবল জোয়ার ভাঁটা ঘটে থাকে। শহরে থাকার সময় দূরত্ব আসে, লম্বা ছুটিতে গাঁয়ে এলে প্রথম কিছুদিন অসুবিধার পর ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত খানিকটা ব্যবধান থেকেই যায়। একেবারে কেঁচে গণ্ডূষ করার সাধ্য পাঁচুর আর নেই। তাদের সমাজের আরও দু'চারটি ছেলে স্কুলে পড়েছে, দু'বছর আগে রাধানাথ ম্যাট্রিকও পাশ করেছে।

স্কুলের বিস্তার যে মানে নেই, নিছক ফাঁকি, ওরা তার প্রমাণ। গাঁয়ে সমাজে পরিবারে নিজেদের ঠাঁই করে নিতে নিতে সব বিদ্যা স্রেফ ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছে, কোন কাজেই লাগে না। একটা অকাজে লাগে, সেটা অহমিকা,—আমার পেটে বিদ্যা আছে, আমি স্কুলে পড়েছি! চিঠিপত্র লেখার কাজ পর্যন্ত হয় না ওদের দিয়ে, চর্চা নেই, ভয় পায়, ভুল হবে, ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে! রাজেন ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিল, তার বাবা চিঠি লেখাতে আসে পাঁচুকে পয়সা দিয়ে!

পাঁচুও হয়তো ওদের মত হত। কিন্তু তার অন্য জগতের ছোঁয়াচ লেগেছে। শুধুই সে বিদ্যা লাভ করে নি।

এবার পাঁচুর বিদ্যালাভের কাজ থেকে ছুটিটা সুদীর্ঘ, হয় তো বা চিরদিনের জন্যই। নিজের অজান্তে নিজেকে কেন্দ্র করে আটুলিগাঁর চাষা-ভুষো ছেলেদের একটা দল পাঁচু গড়ে তুলছিল। এরকম একটা সংগঠন গড়ার কথা সে ভাবেনি, সংগঠন যে গড়ে উঠছে নিজে সে এটা টেরও পায়নি, মন তার ছিল অন্য দিকে। হাটে ঘাটে মাঠে এই সব ছেলেদের এর ওর তার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা হয়, ইয়ার্কি ফাজলামি চলে, হাসাহাসি ঝগড়াঝাটি রাগারাগি হয়,—দেশের কথা ওঠে। দেশের কথাটা উঠবেই।

যেমন, রাজেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে গোয়ালপাড়ায়। রাজেন এসেছে বাছুর নিতে, তাদের গরুটার বাছুর গেছে মরে, দুধ দুইতে বাছুর লাগে। নিজের বাছুর পরের বাছুর সোনা বোঝে না, যে কোন একটা বাছুর সামনে পেলে তার গা চেটে সে বাঁটের দুধ খুলে দেয়—বাছুর ছাড়া বাঁটে হাত দিতে গেলে শিং নেড়ে পা ছুঁড়ে লাফিয়ে সোনা হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয়। পাঁচু এসেছে ষাঁড় খুঁজতে, দেশী ছোট ষাঁড়। মেজবাবুদের খেয়ালের ষাঁড়ের মিশেল বাছুরটা বিয়োতে আর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে লক্ষ্মীর প্রাণান্ত হয়েছে—তাকে পোষাটাই দাঁড়িয়েছে লোকসানে। গাই-বলদ লোকসানে পুষতে হলেই হয়েছে চাষীর নিজের বাঁচন। লক্ষ্মীর এবার ছোটখাট দেশী বাছুর হোক, আর মিশেলে কাজ নেই!

এই ভাবে দেখা। কি উদ্দেশ্যে দুজনের গোয়ালপাড়ায় আসা সেটা জানাজানি হল। চাষাড়ে টিপ্পনি হল গরু বাছুর মানুষ মিশিয়ে: মেজো বাবুর সেজো বৌ নিজের বাচ্চা হারিয়ে গরীব চাষীর বাচ্চাদের জন্য গাঁয়ে শিশু নিকেতন খুলছে, ছোট একটা আটচালায়। এবং শিকারের ছুতায় যে বিলাতী সায়েবটা ঘন ঘন আসে তার কল্যাণে মেজোবাবুর নিরুদ্দেশ মেজো ছেলের বৌ মিশেল বাচ্চা বিয়োতে গেছে হাসপাতালে। এই সব রসালো আলোচনা।

কলকাতায় কি করে জানিস? পাঁচু রহস্যের সুরে শুধায়।

কি করে?

বাছুর মরে গেলে চামড়াটা খড়ে জড়ায়। তাই চাটিয়ে গরু দোয়।

কলকাতায় সব ফাঁকিবাজি, চোরের আড্ডা। কাকার সেবার গাঁট কাটলে, পুলিশ একটা টাকা নিলে কাকার ঠেঁয়ে। চোর ধরলে খপর দেবে।

—হবে না ? ইংরেজ আছে মোদের গাঁট কাটতে, যেমন কত্তা তেমনি চাকর।

যে কথাতেই সুরু হোক, দুই কিশোরের আলাপে ইংরেজ আসবেই, ইংরেজ এলেই আসবে আনুষঙ্গিক শোষণ পেষণ দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ মহামারীর কথা এবং তারপর সহজে শস্তায় পরাধীনতার অভিশাপ যে ঘুচবে না এই সিদ্ধান্ত।

এই সাতাশ আঠাশ সালের দেশ জোড়া দুর্দিনে এদেশের কোন ছেলেবুড়োর আলাপে এসব কথা না ওঠে, আঁতুড়ের শিশুও টের পায় তার সর্বাঙ্গীন অভিশাপের কারণ কি। কিন্তু পাঁচুর আলাপটা ঠিক তেমন নয়। একুশ সালের উদ্গত আশা স্বপ্ন হয়ে গেছে, বোমারুদের অদ্ভুত দুঃসাহস ছাড়া চারিদিকে নিষ্ক্রিয় ক্ষোভ, কলকারখানায় ধর্মঘটের শ্রীবৃদ্ধিতে স্বাধীনতার ইঙ্গিত সবার চোখে পড়ছে না, বিদেশীর শাসন আর নিজের দেশ নিয়ে সাধারণ মানুষের নিষ্ক্রিয় অবসাদের অফুরন্ত আলোচনা শেষ হচ্ছে হতাশায়। সহজে নয়, শস্তায় নয়! তার মানে মানুষ এই বুঝছে না যে চলো সহজে যখন হবে না তখন কঠোর লড়াই করি, শস্তায় যখন হবে না তখন চরম মূল্য দিই—সবার ভাবখানা এই যে কি আর করা যাবে, আমাদের মন্দ কপাল! কে জানে কবে কি ভাবে দেশের ভাগ্য ফিরবে ? অন্য অঞ্চলের অন্য জেলায় গ্রাম আরও ঝিমিয়ে গেছে। পাঁচুদের এগুলি লড়ায়ে গ্রাম, খাজনা বন্ধের তুমুল সংগ্রাম হয়ে গেছে এদিকে, আজও ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ে। এদিকের হতাশায় রীতিমত বুক পুড়ে যায়, খুচখাচ আন্দোলনের নামে দারুণ অবজ্ঞা জন্মায় —তার চেয়ে কিছু হবে না ধরে নিয়ে গুড়ুক ফোঁকাই ভাল। পাঁচু কিনা সংস্পর্শে এসেছে, একটু ছোঁয়াচ পেয়েছে তাদের, একুশের জোয়ারান্তিক ভাঁটার আদর্শের এই চরম টানের দিনে একমাত্র যারা প্রাণের নাওকে স্রোতের বিপরীতে টেনে নিতে প্রাণপণ করেছে, পাঁচুর আলাপ তাই আশা ভরসা বিশ্বাস উদ্দীপনা জাগায়। গাঁয়ের শিথিল মন্থর নিঃস্ব জীবন চাষী কিশোরের, বাঁশঝাড় শালবন আম কাঁঠালের আদিম রহস্য ঘেরা ডোবাপুকুর গোয়াল কুঁড়ে হপ্তা-হাট, জমিদারের দীঘি দালান, দিনের দেবতা রাতের অপদেবতা নিয়ে দিনরাত্রি। তবু পাঁচুর আলগা ছাড়া ছাড়া আলাপ শুনলে কালীনাথেরও মনে হত পাঁচু বুঝি দলের প্রচার চালাচ্ছে!

চাষী কিশোর গা চুলকে খড়ি তুলে বলে, বাস্‌রে, ওদের সৈন্য কত!

পাঁচু বলে : বাঃ, বেশ বলছিস তুই হাঁদার মত! সৈন্য আছে তো হয়েছে কি ? কামান বন্দুক আছে তো আছে, তাতে কি ? এদেশে লোক যে কোটি কোটি! সেটা মনে আছে ? এদেশে কত গাঁ কত শহর তার হিসাব রাখিস! সবাই ক্ষেপে গেলে সৈন্য দিয়ে কামান বন্দুক দিয়ে করবে কি ? ধর না কেন আমাদের

এই গাঁটা। ধর একশো সৈন্য এল, দু'চারটে কামান আনলো, তিন চারশো বন্দুক আনলো। আমরা বললাম, বটে? আচ্ছা রোসো, মজা দেখাচ্ছি। -কানাই মনাই যত কামার আছে সবাই রাত জেগে দিশি বন্দুক বানালো, আমরা সবাই কোলোরা-পটাস মোমঝাল দিয়ে দিশি বোমা বানালাম, বর্শা শড়কি লাঠি দা কুড়োল সব বানালাম। তিনচার হাজার মেয়েপুরুষ একসাথে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। ওই এক শোটা সৈন্যের দামী দামী বন্দুক কামান কবার গর্জাবে, কতক্ষণ গর্জাবে? মোদের দু'-একশো' মারতে মারতে মোরা ওদের কচুকাটা করে—

হায় রে কিশোরের কল্পনা! গান্ধীর সেই পুরোনো স্বপ্নবৎ জনগণ-আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসীর আন্দোলনকে মিলিয়ে গড়ে তুলেছে প্রাকৃতিক অভ্যুত্থান! ভুলে গেছে যে ইংরেজের পাঁচটা রাইফেল গর্জিয়ে হাজার লোকের অহিংস সভা ছত্রখান করে দিয়েছে। কিন্তু তাতেই বা কি এসে যায়। পাঁচু তো আর ঘোষণা করছে না যে কাল এরকম সর্বভারতীয় বিরাট অখণ্ড অভ্যুত্থান বৃটিশ রাজের সৈন্যসামন্ত কামান বন্দুক উড়িয়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করবে। পিসী কি পাঁচুকে রূপকথা বলত এই জন্যে যে ঘুম ভেঙে উঠেই সে কাল্লু মিয়ার খোঁড়া বুড়ো দেশী ঘোড়াটার চেপে ইংলণ্ডে মেম বিয়ে করতে পাড়ি দেবে! কি ভাবে কোন কথাটা বলা হল সেটা ধরা চাষী ছেলেবুড়ো মেয়ে মরদের স্বভাব নয়, কথার তারা মর্মটা নেয়। সে হিসাবে কি আর এমন খাপছাড়া অদ্ভুত কথাটা পাঁচু তাদের বলেছে? দীনহীন নরম অহিংস গোবেচারী সেজে কিছু হবে না, বাপ-পিতেমোর আমল থেকে বিদেশীর যত লাথি ঝাঁটা জমা হয়েছে সব সুদে আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে, এ ছাড়া কোন উপায় নেই—এতো সহজ সরল বাস্তব কথা।

চাষী ছেলেরা এসব কথা শুনতে চায় পাঁচুর কাছে। তারা পাঁচুকে ঘিরে নিজেদের গঠিত করে। একটা বিশেষ ঘটনায় জন পনেরো ছেলে এক সঙ্গে তার পরামর্শ চাইতে এলে পাঁচু আশ্চর্য হয়ে প্রথম টের পায় যে দলটা গড়ে উঠছে এবং এখন নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে।

ঘটনা সেই চিরকেলে অনাচার।

গরীব চাষীর মেয়ে দেখে বড়লোক জমিদার বা তার ছেলের লোভ। এ ক্ষেত্রে মেয়েটি গণেশ. সাঁতরার, মেজকর্তার ছেলে। কলকাতায় উঁচু পরীক্ষা দিয়ে হেমন্ত দেশে এসেছে। গোবরে যত পদ্মই ফুটুক, দু'কলি তেমন সুন্দরী নয়। তবে লোভ থাকে পুরুষের চোখে এবং মনের মধ্যে মেয়ের জন্য কত চেষ্টা চরিত্র আর হাঙ্গামা ঝঞ্ঝাটের বালাই দরকার হিসাব থাকে তার। সায়া ব্লাউজ ঢাকা যাদের দেখা অভ্যাস হেমন্তের, তারা কেউ এমনি শুধু একফেরতা একটি শাড়ী পরে সামনে এলে দু'কলি কোথায় উড়ে যায়, কিন্তু তাদের রুচি আলাদা। বাপ হলে চর পাঠাত, হেমন্ত একেলে ছেলে, নিজেই গেল সাঁতরাদের বাড়ী। উদার

ভাবে সাঁতরাদের কৃতার্থ করার জন্য গায়ের জোরে ঢোকার বদলে একটা ছুতো করে অন্দরে ঢুকে জাঁকিয়ে বসে বলল, ক'বিঘে জমিতে নতুন ধরনে চাষের পরীক্ষা করব গণেশ, আমার অনেকদিনের শখ। তুমি খেটেখুটে দেবে, দেখাশোনা করবে। তোমার ঘরদোরের অবস্থা তো—

—আজ্ঞে এ বর্ষায় গলে যাবে।

সেদিন হাত ধরা পর্যন্ত। তু'কলি হাঁ না জোর করে বলতে ভরসা পায়নি। বলা কি যায়? মেজকর্তার বড় ছেলে! যার শখ হলে গরীব মানুষের ঘর জ্বলে যায়, মানুষ এ পৃথিবীর বাতাসে শ্বাস টেনে স্বর্গে গিয়ে নিশ্বাস ফেলে। অন্য কোন ফাজিল ছোঁড়া হলে কি করা উচিত তু'কলিকে বলে দিতে হত না, এ বজ্জাতটার কথা ভিন্ন। এর ক্রোধ আর প্রতিহিংসা কে·ঠেকাবে, কিসে ঠেকাবে, ভিটেমাটি ছাড়া করে সপরিবারে তাদের উচ্ছন্নে দেওয়া এর পক্ষে কত সহজ। অন্যদিকে,ভাঙা·ঘর দুয়ার যদি নতুন হয়, বাঁধা জমিটুকু যদি ছাড়ানো যায়, পেট ভরে যদি দুটো খেতে মেলে, গায়ে যদি দুটো শাড়ী গয়না ওঠে—এসব তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়াও তো তাদের পক্ষে সহজ নয়!

গণেশের ভাঙা কুঠির ঘিরে সে রাতটি নামে বিহ্বল ক্লেদাক্ত ভয়ানক। অন্ধকার রাত্রির অতল রহস্যের মতই পুঞ্জীভূত ভয় ও লোভের সঙ্গে অসহায় একটি দীনহীন পরিবারের চরম সংগ্রামের রাত। এ জগতে এমন অদ্ভুত এত অসঙ্গত ঘরোয়া সংগ্রামও চলে অনুভব করতে পারলে অ্যাটম বোমার সংগ্রামী জগতেরও রোমাঞ্চ হত। লাভের হিসাব দূরে থাক, একদিকে প্রায় সর্বনাশের সম্ভাবনা, তবু সেই সর্বনাশের দিকে ঝুঁকে সুনিশ্চিত লাভ ও নিরাপত্তার ভরসার সঙ্গে লড়াই করা! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বরাবর তারা প্রণাম ঠুকেছে,দেবদেবীকে পূজো দিয়েছে,স্বর্গ আর নরক ছাড়া কোন ভবিষ্যৎ তারা জানে না, অথচ সেই বিরাট ঈশ্বরের সেই নিখুঁত বিধি ব্যবস্থা তাদের এতটুকু কাজে আসে না। সর্বশক্তিমান মেজকর্তার ছেলের ভোগে তুকলিকে লাগাবে কি লাগাবে না সে পরামর্শে ঘুণাক্ষরে ভগবানের নাম পর্যন্ত তারা উচ্চারণ করে না। তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে, জমিদারের ছেলে তাদের মেয়েটাকে ভোগ করতে চায় এই সমস্যার বিচারে, পাপ পুণ্যের হিসাব তারা তোলেই না। তারা যেন টের পেয়ে গেছে ও ঈশ্বর বল আর পাপ পুণ্য বল—ওসব তাদের জীবন·মরণের হিসাব নিকাশে আসে না।

শুধু সমাজ আর অভিজ্ঞতার হিসাব দিয়ে তারা আজ রাতের নৈতিক যুদ্ধ মাৎ করতে·চায়। তুকলি প্রায় নির্বাক, মাঝে মাঝে দু'একটি কাটা কাটা কথা শুধু বলে, আলোচনার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তুকলি শুধু তাদের মনে পড়িয়ে দেয় যে সেও আছে, সেও একটা রক্তমাংসের মানুষ। তাতেই কাজ হয়।

গোমড়া মুখে ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত তারা ঠিক করে, না, এ পথ ভাল নয়। এতে শেষ পর্যন্ত মঙ্গল হয় না। গাঁয়ে দৃষ্টান্ত আছে, মেজকর্তার নিজের

নজর পড়েছিল ঘোষেদের বিনির ওপর। কি হল কি এল কি গেল দুদিন ভাল ঠাহর হল না, কোথায় রইল মেজকর্তার শখ, কোথায় রইল বিনি, সমাজ গেল ধর্ম গেল। বিনি আজ ঘুঁটেকুড়েনীর বাড়া।

বড় ক্ষণস্থায়ী বড়র এই চোখের পীরিতি, হয়তো তিনরাত্রি মিলন সইবে না, বিষিয়ে যাবে। হেমন্তের মনে হবে, কেমন যেন পচা পচা গন্ধ দু'কলির গায়ে, খস-খসে চামড়া, ভোঁতা হাবা কথা, টনটনে আদায়ের বুদ্ধি! বাবুদের ছেলেমেয়ের ফাঁকা পীরিত তবু দুটো মাস একটা বছর চলে তবে ফাঁকিতে দাঁড়ায়, চাষীর মেয়ে বাবুর ছেলের দুদিনের বেশি ভর সয় না! মেয়েপুরুষের তফাৎ শুধু নয়,আকাশ পাতাল তফাৎ। খিদের সময় যেমন হাঁসটা মুর্গিটা দেখে প্রাণটা হঠাৎ চনচনিয়ে ওঠে, দু'কলিকে দেখে মেজকর্তার ছেলের হয়েছে তাই, এ ফাঁদে ধরা দেওয়াটা উচিত হবে না।

হেমন্ত এসে শুনল, দু'কলি মামাবাড়ী গেছে।

—কদিন বাদেই এসবে আজ্ঞে। ভয়ে ভয়ে গণেশ জানাল।

কি নির্লজ্জ বীভৎস হিংসা বংশানুক্রমিক জমিদারের! একেবারে তো প্রত্যাখ্যান করে নি, মুখে লাথি মেরে তো জবাব দেয় নি জঘন্য প্রস্তাবের, আচমকা আত্মসমর্পণ করতে ভরসা না পেয়ে ছল করে দুদিন সময় নিয়েছে। শুধু এই জন্য এমন দিশেহারা অত্যাচার! মনগড়া অপরাধের দায়ে গণেশকে বেঁধে এনে বেদম মার, মহাজন ত্রৈলোক্যকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জমি বে-দখলের মামলা রুজুর শাসানি, গভীর রাত্রে লোক পাঠিয়ে হানা দিয়ে ভাঙা ঘর দুয়ার তছনছ করা! এসব কি তবে দু'কলির জন্যে, বালবিধবা কচি চাষাড়ে মেয়েটার জন্যে হেমন্তের উন্মাদ ভালবাসার প্রমাণ? আগের দিন চোখে দেখে পরের দিন হাত ধরে টেনে এতই সে ভালবেসে ফেলেছে মেয়েটাকে যে কলকাতার উচ্চশিক্ষা ভুলে ভালবাসার নিয়মকানুন ভুলে যে ভাবে হোক মেয়েটাকে পাওয়ার জন্যে যাচ্ছেতাই কাণ্ড আরম্ভ করেছে?

পাড়ার নকুল দাস, আগে সে পুলিশের জমাদার ছিল, এখন বুড়ো বয়সে ঘরে বসে খায়, সে যেচে আপোসের দায়িত্ব নেয়। গণেশকে ভৎর্সনা করে বলে, যে ছেলে খুশি হলে মেম বিয়ে করতে পারে, সে ছেলে তোর মেয়ের দিকে কেন তাকিয়েছে বুঝতে পারলি না হারামজাদা—মেয়েকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিলি! বালির বাঁধ দিয়ে তুই সাগর ঠেকাবি? কাল মেয়েকে নিয়ে আয়গে যা। আমি এদিক সামলে নিচ্ছি।

সকালে গিয়ে হেমন্তকে কুঁজো হয়ে প্রণিপাত জানায়, মুচকি হেসে সবিনয় ভৎর্সনার সুরেই বলে, করছেন কি ছোটবাবু, মশা মারতে কামান দাগছেন? হারামজাদা গণেশ আজ মেয়েকে আনতে ভিন গাঁ গেছে, নইলে ওর কান ধরে টেনে এনে নাকে খত দেওয়াতাম।

—মেয়ে আনতে গেছে?

—আজ্ঞে আনতে গিয়ে সেখান থেকে না ভাগে। বড্ড ভয় পেয়ে গেছে। যা দাবড়ানিটা দিলেন!

—কোথা ভাগবে?

—স্বজন আছে, কুটুম আছে, তীর্থ বিদেশ আছে। দেনায় ঘরদোর জমিজমা মাথাটি বিকানো। শালার কি আছে, গাঁয়ে কোন লোভে ফিরবে?

হেমন্তকে চিন্তিত দেখে নকুল মুচকে হাসে, বলে, আপনি ভরসা দিলে ফিরিয়ে আনতে পারি। খরচাপত্র করে গিয়ে পড়ি একবার, কি বলেন? নগদ টাকা কিছু গুঁজে দিই হাতে!

ঢুকলি কোথাও যায় নি, মামাবাড়ি থাকলে তো যাবে। বাড়ীতেই লুকিয়ে ছিল। চেঁচামেচি শুনে এই ছেলেরা হৈ চৈ করে গিয়ে হাজির না হলে মাঝরাত্রে মেয়েটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেত। এরা গণেশকে ভরসা দিয়েছে। মাঝখানে নকুল আপোসে সব মিটিয়ে দেওয়ায় হয়েছে মুস্কিল। গণেশ আর চায় না যে ছেলেরা তাকে রক্ষা করুক। চিরদিনের রক্ষাকর্তা জমিদার, সেই জমিদারের ছেলে ভবিষ্যৎ জমিদার হেমন্ত, তার রক্ষণাবেক্ষণেই গা ঢেলে দিতে গণেশ রাজী হয়ে গেছে।

এখন পাঁচু কি বলে?

—আমি বলি কি, ঢুকলিকে শুধানো যাক।

ষোলোটি ছেলে চমৎকৃত হয়ে যায়, চুপ করে থাকে।

পাঁচু মর্মে মর্মে টের পায় নেতৃত্ব দেওয়া কি কঠিন কাজ। তার কথার মর্মই কেউ ধরতে পারেনি।

পাঁচু এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে থাকে, দু'বার গলা সাফ করে। মুখের ভাব কঠিন করে। ধীরে ধীরে বলে, খানিক সত্যি শুনি, খানিক গুজব শুনি, এলোমেলো আবোলতাবোল কত রকম বত কথা। আসল ব্যাপার জানি কি? তলে তলে কত কিছু ঘটতে পারে, গণেশ সাঁতরা বানিয়ে রটাতে পারে দশ কথা। তবে কিনা, ঢুকলি যদি বলে তার মন নেই, সে বাঁচতে চায়, সে ভিন্ন কথা। তাই ওকে শুধানো।

হারাণের ছেলে দাসু বলে, তা বটে, তুই ঠিক বলেছিস পাঁচু। ও ছুঁড়ি যদি তলে তলে বজ্জাতি করে থাকে, তবে মোরা এর মধ্যে নেই। ওকে শুধোলে হবে কি?

পাঁচু বলে, উঁহু, তা নয়। বজ্জাতি করেছে না করেছে সে মোরা দেখতে যাব না। বড়লোকের ছেলে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে নষ্ট করে থাকে মেয়েটাকে, সে ওরা বুঝবে। জবরদস্তি অত্যাচার মোরা ঘটতে দেব না ব্যাস্। না কি বলিস?

সকলের উৎসাহ অনেক কমে গেছে টের পাওয়া যায়। পাঁচু নিজের ভুল

বুঝতে পেরে বলে, ওটা বললাম কথার কথা, মেয়েটা খারাপ হয়েছে এমন তো নয়! মোর মন বলে, ও খাঁটি আছে। নয় তো ঐ শালার পো হাঙ্গামা করবে কেন? তবু একবার শুধিয়ে রাখা, পরে না বলতে পারে মোদের ব্যাপারে তোমরা এসনি!

এ যুক্তি সকলের মনে লাগে। তাই বটে, গণেশ বা ঢুকলি তো তাদের কাছে ধন্না দিয়ে বলে নি, মোদের বাঁচাও!

পাঁচুই ঢুকলির মনের ভাব বুঝতে যায়। মেয়েদের মন বোঝার বিদ্যাও সে যেন স্কুলে আয়ত্ত করেছে। তবে চাষী মেয়েরা মোটে রহস্যময়ী নয়, ওতে তাদের লাভ নেই, পোষায়ও না। তখন বেলা হয়েছে, মেঘহীন আকাশে ঠাটাপোড়া রোদ। ঢ়ুকলির মা শাক বাছছিল, উনোনের তোলা কাঠ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। রান্নাঘরটা পড়ে গেছে সাঁতরাদের, শোবার ঘরের দাওয়ার এক পাশে বেড়া দিয়ে রান্না হয়। ঢ়ুকলির মা বলে, পোড়াকপালে মেয়েরে বাবা, ঘর না পুড়িয়ে কি ছাড়ে? সোয়ামিকে যে দিন খেলো হারামজাদি, সেদিন জানি ও মেয়ে নিয়ে মোর মরণ হবে।

তেমন ঝাঁজ নেই, জ্বালা নেই তার কথায়। নকুলের সঙ্গে গণেশের কত্তাবাড়ি দরবারে যাওয়ার খবর পাঁচু জানত। আধ অন্ধকার ঘরে গণেশ শুয়েছিল, সেখান থেকে তার গর্জন আসে, মেয়ে তোর করল কি, মেয়ে? বাগানে বেগার খাটা নিয়ে গণ্ডগোল, তাতে তুই মাগী তোর মেয়েকে টানিস কেনরে? ফের রা করবি তো মুখ থেঁৎলে দেব।

ঢ়ুকলির দোষ কি সাঁতরা পিসী? পাঁচু বলে।

—কে জানে বাপ কার দোষ?

পাঁচুকে উদ্দেশ করে গণেশ বলে, হেমন্তবাবুর শখ চেপেছে ফল সবজির বাগান করবে, মোকে বলে বেগার খাটতে। না বলতে খাপ্পা হয়েছিল, আপোসে চুকেবুকে গেছে। বড়লোকের রাগ কতক্ষণ রয়?

তা বটে। বড়লোক রেগেই রয়, আরও বেশি রাগ হলে সেটা বড়লোকেরও বেশিক্ষণ সয় না। ঢ়ুকলির সাথে আর মোকাবিলা না করলেও হয়, ব্যাপার বোঝা গেছে। গণেশ সোজা পথ ধরেছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ঢ়ুকলি তাতে সায় দিয়েছে। মেয়ের জন্ম তাই লাঞ্ছনার ভয় নেই গণেশের, আগামী পরস্কারও মেয়ের-কল্যাণে তার কপালে ঝুলছে। ঢুকলি আড়ালে গেছে—সামাজিক ভাবে।

সেটা অভ্যাস করতেই বোধ হয় ছেলেমানুষ পাঁচুর জন্ম পর্যন্ত ঘরে আধ অন্ধকারে ঢ়ুকলি গা ঢাকা দিয়ে আছে।

সবাই জানবে, ঘোঁট পাকাবে টিটকারী দেবে, কিন্তু তার বেশি যেতে কেউ সাহস পাবে না, না ব্যক্তিগত ভাবে, না সামাজিক ভাবে। কেউ বাড়াবাড়ি করলে হেমন্ত তাকে টিট করে দেবে।

তবে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় মনটা এদের খুশি নয়, নেহাৎ নিরুপায় হয়েই গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তা, মানতে হলে শক্তিমানের দাপটকে এমনি করেই মানুষ মানে। তাতে হেমন্তের জবরদস্তি, কুৎসিত অত্যাচার কাটান যায়নি, নিছক মন্দ মেয়ের কলঙ্ক বা মা-বাপের মেয়ে বেচার কেলেঙ্কারী হতে চলে নি ব্যাপারটা। কিন্তু তবু এ অবস্থায় অন্যায়টা ঠেকাতে এগুনো মুস্কিল। বড়দের বা ছেলেদের সহানুভূতি জাগবে না, যার সর্বনাশ তার যদি প্রতিরোধ না থাকে তো দশজনের কিসের গরজ? গণেশ নিজেই হয়তো গাল দিয়ে বসবে দশজনকে, একেবারে অস্বীকার করবে কারো কোন কুমতলব আছে তার মেয়ের সম্পর্কে!

—কাকা মোকে শুধোতে পাঠাল, পাঁচু বলে, বলল কি, পাঁচু, তোর সাঁতরা পিসেকে শুধিয়ে আয়, ব্যাপার কি। বাবুরা যদি বাড়াবাড়ি করে, গাঁয়ে কি মানুষ নাই? সব বলে কি সব অন্যায় সইবে গাঁয়ের লোক? গাঁয়ের ছেলেবুড়ো পক্ষে দাঁড়ালে গণেশ সাঁতরার ভয়টা কি?

—তোর কাকার বড় দয়া। দয়া করে পাঠিয়ে দেছে, যারে পাঁচু শুধিয়ে আয়, ব্যাপার কি!

এরপর আর কথা চলে না। পাঁচু বিব্রত বোধ করে এক ঘটি জল চেয়ে খায়। জল দেয় দু'কলির মা, দুকলি যে ঘরে আছে তার কিন্তু প্রমাণ মেলে এবারে। চাপা গলায় গণেশের সঙ্গে সে কথা কইছে, দু'একটা ধারালো কথা পাঁচুর কানে আসে। নিমেষে পাঁচু চাঙ্গা বোধ করে। বাঁচবার উপায় থাকলে দু'কলি যদি বাঁচতে চায় তবে আর কিসের পরোয়া করে পাঁচু। হেমন্তের বাবারও সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে।

কিন্তু বৃথাই আশা, অপমান ঠেকাবার পণ নিয়ে দু'কলি রুখে উঠে বিদ্রোহ করে না। ঘরের মধ্যে কলহের গুঞ্জন থেমে যায়, দু'কলি কাঁদছে কিনা বাইরে থেকে ঠিক ধরা যায় না। হাজার কাঁদলেই বা কি আসে যায়। নিজের মান বাঁচাবার যত সাধই তার থাক, মরি বাঁচি গোঁ ধরে তেজের সঙ্গে নিজে যদি সে রুখে না দাঁড়ায়, এমন একটা সুযোগ পেয়েও মরিয়া হযে ঘরের আড়াল ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এসে জোর করে মনের কথা না বলতে পারে, ঘরের কোণেই সে কেঁদে বুক ভাসাবে আর বাপের দুটো যুক্তি আর একটা ধমকে এমনি এলিয়ে যাবে বাঁচার সাধ। দু'কলিই যদি দোমনা হয় কার কি করার আছে? মন খারাপ করে পাঁচু বিদেয় হয়ে আসে।

খান দুই বাড়ী আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে পাঁচু খানিকটা এগিয়েছে, পিছনে দু'কলির ডাক শোনে—অ পাঁচু, পাঁচু! একটু দাঁড়া না।

পাঁচু দাঁড়াতে দাঁড়াতে দু'কলি এসে তার নাগাল ধরে। পায়ে-চলা সরু মেটে পথটা এখানে দুপাশের বাঁশঝাড় হেলে পড়ে ঢেকে রেখেছে। পাঁচুর হাত চেপে ধরে দু'কলি ব্যাকুলভাবে বলে, কি বলছিলি পাঁচু?

ক'দিনের ভয় ভাবনায় ছুকলির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, কালিমাড়া মুখে তার রাজার ছেলের সাথে পিরিতের সুখকল্পনার চিহ্নও নেই। পাঁচু নিজেকে ধিক্কার দেয়। হাঃ, কালীনাথদের দলের সে বিশ্বাস পেয়েছে, পাকা কানাই তার বন্ধু, তাই মগজে তার সব সময় মস্ত মস্ত চিন্তা গিজ গিজ করে, সোজা কথা সহজভাবে আর ঢোকে না মাথায়! এমন একটা ব্যাপারে গাঁয়ের ছেলেরা উৎসাহী হয়ে যেচে এল তার কাছে বিহিতের ব্যবস্থা করতে, সে গা ভাসিয়ে দিল চিরকেলে ঝিমানো ভীরুতায়, সাবধানে চুলচেরা হিসাব কষতে বসল এতে ওই হয়, ওতে ওই হয়। একটা কুৎসিত অন্যায় ঘটতে যাচ্ছে, ছেলেরা কোমর বেঁধেছে সে অন্যায় ঠেকাতে, সে কোথায় উৎসাহের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে কাজে, তার বদলে তার শুধু মাথাব্যথা অন্যায়টা ঠেকানো উচিত কি উচিত নয়! অত্যাচার প্রতিরোধের প্রথম শর্ত যেন কেউ অত্যাচার চায় কি চায় না স্থির করা। ছি, পাঁচু ছি!

—বলছিলাম, বাবুদের ভয়ে পাঁক গিলতে হবে? গাঁয়ে মানুষ থাকে না? তিন গুঁতোতে ভাঙা যায় না হারামজাদার ছিচলেমি? তা তোরাই যদি না চাস তো—

না চাই কি গো! কে বললে চাই না?

তোর বাপ যে গাল দিলে মোকে?

বাপ না বাপ, মাথা ঠিক আছে? ভয়ে হাত পা সেঁধিয়ে গেছে পেটে।

পাঁচু বলে, বটে? তা দাদু বললে, তোর নাকি ফুর্তি খুব, কলকাতা যাবি, মোটর চাপবি।

—দাদুর মুখে নুড়ো জেলে দেব। ছোঁড়া মোর ফুর্তি দেখেছে, না? ওর বোনকে বাঘে ধরুক ঘোগে থাক, ও যাক ফুর্তি দেখতে!

—তা,তোমার মনের খপর কে জানবে বলো? বাঘে ধরলে তো চেঁচায় মানুষ, দশটা আপন জনকে তো ডাকে যে মোকে বাঁচাও গো।

—তোর বৌকে বাঘে ধরলে দেখিস কত চেঁচায়, গলা দিয়ে কত আওয়াজ বেরোয় দেখিস! তোর বৌকে যেন দশটা বাঘে ধরে পাঁচু, তার মধ্যে যেন কটা সাহেব বাঘ থাকে।

পাঁচু তখন খুশি হয়ে তাকে ভরসা দিয়ে বলে, আচ্ছা যা, বাঘে তোকে ধরবে না ছুকলি, ভয় নেই। বাঘ আমরা জব্দ করব।

ছুকলি মিনতি করে বলে, ছায়ায় একটু বসি আয় পাঁচু। আড়ালে বসে কটা কথা কই।

পাশের বাঁশবন প্রায় পথ ছুঁয়েছে, তার মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্তরাল ও ঘন নিবিড় ছায়া। কথা বলার তাগিদ পাঁচুও বোধ করছিল। শক্ত হওয়ার মর্মটা ছুকলিকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। কিসে তার সত্যিকারের ভরসা সে ধারণাও হয় তো তার নেই। পাঁচুকে ছুকলি গভীর গহনে টেনে নিয়ে যায়, আচমকা

শান্তিভঙ্গে মস্ত একটা বিষাক্ত সাপ কয়েক হাত তফাৎ দিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে পালিয়ে যায়, এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ানোর বেশি গ্রাহ্যও করেনি। মানুষের ভয়ে দু'দিন চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে থেকে কি যেন হয়েছে দু'কলির, মানুষের চোখ কানের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েও তার স্বস্তি নেই, আরও সে নিরাপদ আড়াল চায়।

কোথা চলেছ ?

ওই হোথা বসিগে চলো।—দু'কলি জঙ্গলের আরও ভেতরের দিক দেখিয়ে দেয়। বাঁশবনের সেই দুর্গম নির্জন স্থানটিতে পৌছে পাঁচু দেখতে পায় কয়েক হাত জায়গা সাফ করে একটি চাটাই বিছিয়ে রাখা হয়েছে, কাছে একটি সরা চাপা মাটির কলসি।

দু'কলি বলে, চুপি চুপি জায়গাটা খুঁজে রেখেছি, বাড়ীতেও বলি নি। মুখপোড়া এলে টুক করে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রইতাম।

ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলে দু'কলি। পাঁচু অভিভূত হয়ে থাকে। এবার তার দু'কলির কাছে নিজেকে ছোট মনে হয়, একটা মেয়ের কাছে!

এসো মোরা বসি।

চাটাইয়ে বসে হেসে কেঁদে কত কথাই দু'কলি তাকে বলে, রাত্রিবেলা ভয়ে আঁৎকে আঁৎকে ওঠার কথা বলতে বলতে সে গা ঘেঁসে আসে পাঁচুর। জগৎ সংসার যখন তার ঘাড় মটকে দিতে উদ্যত হয়েছে, একজনকে খুঁজে পায়নি ভরসা করে যার মুখের দিকে তাকাতে পারে, তখন একা সে সাপখোপের এই ভয়ানক জঙ্গলে আত্মগোপনের স্থানটি খুঁজে বার করেছিল—আজ এখন সেইখানে সে বন্ধু পেয়েছে একজন, পৃথিবীতে তার একমাত্র আপনজন। কিশোর প্রাণের অতল কৃতজ্ঞতায় কখন সে পাঁচুর গলা জড়িয়ে ধরে।

পাঁচু সাহস দিয়ে বলে, ভয় কি আমি তো আছি!

তাই বটে। পাঁচু থাকতে রাজপুত্রে দু'কলির কিসের ভয় কিসের লোভ ?

আকাশের মাঝামাঝি সেই সূর্য, তেমনি প্রচণ্ড রোদ। আটুলিগাঁর মেটে পথ জুড়ে ঘর বনবাদাড়, কর্তাদের দোতলা দালান, শালবনের সবুজ ঢাল, সব তেমনই আছে বাঁশবনের সোঁদাগন্ধী নিবিড় ছায়ায়। নতুন একটা পৃথিবীর জন্ম হল পাঁচুর জন্য! অথবা তার কিশোর জীবনের সমস্ত শোভা সমস্ত আনন্দ সব তেজ সব উদ্দীপনায় সামঞ্জস্য ঘটেছে। এই চড়া রোদে ঘামতে ঘামতে বাড়ীর পথে হেঁটে চলায় তাই দিগ্বিজয়ী নাচের আমেজ বোধ হয়। প্রথমেই মনে হয়, পাকা কি ভাবরে ? এ কৌতূহল এত প্রচণ্ড, পাকার মনোভাব আন্দাজ করতে এমন আগ্রহ বোধ করে পাঁচু যে, তার ইচ্ছা হয় এখুনি আবার ঢাকা রওনা হয় পাকাকে শুধু এই কথাটা জিজ্ঞাসা করে আসতে। পাকা নিশ্চয় হাসবে, নয় ছি ছি করবে। পাকা ভালবাসার কাব্য জানে। তার কাব্যের জগৎ

স্তম্ভিত হয়ে যাবে। ভালবাসার অনেক প্রস্তুতি, অনেক আয়োজন, অনেক হাঙ্গামা। বলা নেই কওয়া নেই আচমকা বাঁশঝাড়ের পচা হাওয়ায় কি প্রেমের আনন্দ সৃষ্টি হয় ?

পাঁচুর মুখে একটু দুষ্টামিভরা মুচকি হাসি ফুটে থাকে। পাকার সঙ্গে তার তর্ক নেই। তার শুধু জানার ইচ্ছা পাকা কি বলবে!

বেলা থাকতেই গণেশ গিয়ে হেমন্তের দরবারে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। তার মুখের ভাব করুণ, চোখ প্রায় ছলছল করছে।

—বলতে ভরসা পাইনে ছোটকত্তা! কাল বাগানের কাজ সুরু করতে লারব।

—কেন ?

—আজ্ঞে মামাবাড়ী গিয়ে মেয়াটা জ্বরে পড়েছে। দেখতে যাব।

অপমানে ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে যায় হেমন্তের। ঘরের কোণে দোনলা বন্দুকটা ঠেস দিয়ে রাখা ছিল। সেটা হেমন্ত হাতে তুলে আনে। ছাই বর্ণ হয়ে যায় গণেশের মুখ।

—তুই শালা ইয়ার্কি পেয়েছিস আমার সঙ্গে ? পাখী মারতে গিয়ে খানিক আগে দেখে এলাম মেয়ে তোর জল আনছে, মামাবাড়ী গিয়ে জ্বরে পড়েছে ? তোর ক'গণ্ডা মেয়েরে হারামজাদা ?

মাথা হেঁট করে থাকে গণেশ। ভয়ে লজ্জায় তার বুক ফেটে যায়। এমনি বাঁকা বাঁকা ভাষা আড়াআড়ি, কথাবার্তাই হয়েছে তার হেমন্তের সঙ্গে। হেমন্ত কখনো বলে নি তোমার মেয়েকে আমার চাই গণেশ, সেও কখনো বলে নি মেয়ের বদলে আমায় কি দেবে। মেয়েটা তার উহ্য থেকেছে তাদের দরদস্তুরে। খুঁজে পেতে এ মেয়ের সে বিয়ে দিয়েছিল। জামাই তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত, মাথা নত করে তার প্রীতিবাক্য সদুপদেশ শুনত। এ ছোঁড়া তাকে শালা হারামজাদা বলে গাল দিচ্ছে! সে কিনা দরদস্তুর করেছিল, অসামাজিক উপায়ে মেয়ের বয়সকালের সাধ আহ্লাদের রফা সামঞ্জস্য করার সঙ্গে মোটা কিছু পণ বাগাবার চেষ্টা করেছিল, তাই আজ তার এমন লাঞ্ছনা।

জমি নিয়ে খাজনা নিয়ে বেগার খাটা নিয়ে তাকে বেঁধে এনে হেমন্ত মুখে থুতু দিলে বুকে লাথি মারলে তার এতটা লাগত না। সে আলাদা ব্যাপার, সে ব্যাপারের আলাদা রীতি, আলাদা নিয়ম। নির্জন ঘাট থেকে পথ থেকে ছুঁকলিকে হেমন্ত যদি ধরে নিয়ে যেত গায়ের জোরে, সেও হত আলাদা কথা। সামাজিক বিয়ের জন্য হোক বা না হোক, মোটামুটি তার মেয়ের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়তে তার সঙ্গেই বোঝাপড়ায় নেমেছে হেমন্ত, তার বাপের মর্যাদা বরবাদ করে নি। সেই আজ সব আড়াল তুলে দিয়ে শালা হারামজাদা বলে গাল দিচ্ছে মুখোমুখি।

—চালাকি ছাড়, গণেশ। দশখানা কড়কড়ে নোট গুণে নিয়ে এখন বজ্জাতি?

—নোট?

—ওরে শুয়ার। এখন আকাশ থেকে পড়লি? নকুল তোকে টাকা দিয়ে আসে নি?

—বাগানো দুনলা বন্দুকের দিকে চেয়ে গণেশ ধীরে ধীরে বলে, না, কেউ মোকে টাকা দেয়নি! তোমার টাকা আমি চাই না।

শুনে হেমন্ত তৎক্ষণাৎ নরম হয়ে যায়। বন্দুকটা টেবিলে রেখে বলে, নকুলটা তা হলে বজ্জাতি করেছে, টাকা তোমায় দেয় নি? দাঁড়াও, ওকে ডেকে আনাচ্ছি। তোমার সামনে ওর দুটো কান যদি আমি কেটে না নিয়েছি—

সে তুমি কেটো। গণেশ বলে, কান কেন, গলা কেটো। আমি তোমার টাকা চাই নে। একশো কেন, লাখ টাকা চাই নে।

এমন আবেগময় ব্যাপার, অথচ জমিদার-বাচ্চা হেমন্তের কাছে কোন মূল্যই পেল না। তার হল শুধু জ্বালা। সে জ্বালা নিবারণ করতে গভীর রাত্রে জন কতেক লোক নিয়ে সে চড়াও হতে গেল গণেশের ভাঙা কুঁড়েতে। আহা, যেন রূপকথার রাজকুমার চলেছেন দৈত্য-দানবের কবল থেকে রাজকন্যার উদ্ধারে।

চাষী ছেলেদের হাতে নিদারুণ মার খেয়ে তারা ফিরে এল। এমনটা তারা অবশ্য ভাবতেও পারে নি, আগে জানলে প্রস্তুত হয়েই যেত।

হেমন্তকে নাকে খত দেওয়াল ছেলেরা। টিকালো নাক আর চেরা থুতনির খানিকটা চামড়া উঠে গেল। হেমন্ত সত্যই রূপবান, সুন্দর ছাঁচে ঢালা তার মুখখানা, বনেদী জমিদারের ঘরে বংশানুক্রমে রূপসী মেয়ে কেনার ফলে সাধারণত যেমন হয়। লণ্ঠনের আলোয় বীভৎস কুৎসিত দেখাল হেমন্তের মুখ। ভেতরের কি কদর্য রোগ যেন ফুটে বেরিয়েছে।

রাত্রেই চারিদিকে জানাজানি হয়ে যায়। ঘুম স্থগিত রেখে আঁটুলিগাঁ উত্তেজিত জটলা চালায়। রাগে দুঃখে বুক ফেটে যায় মেজকর্তা বসন্তের, হাত পা কামড়ে তার মরতে ইচ্ছা করে। অতরাত্রে হাতের কাছে কেউ নেই, তাই হেমন্তের মা'র উপরেই একচোট ঝাল ঝাড়ে। একটা চাষার মেয়ে বাগাতে কেলেঙ্কারি করে, বংশের নাম ডোবায় এমন হতভাগা অপদার্থ ছেলে সে বিইয়েছে কেন, এই হল হেমন্তের মার অপরাধ! বদ বংশের মেয়ে না হলে তার পেটে এমন ছেলে জন্মায়?

—তোমাদের কাছেই শিখেছে অকাজ কুকাজ। যেমন বাপ ছিল, তেমনি ছেলে হয়েছে।

—শিখেছে? নাকে দড়ি দিয়ে যাদের টেনে আনবে তাদের কাছে কান-মলা খাওয়া শিখেছে?

বহুদিন পরে বসন্ত আজ আবার হেমন্তের মাকে মেরে বসে। তার জমিদারীতে

বাস করে তাকে প্রজারা অবজ্ঞা করছে এই মনঃপীড়া নিয়ে আজকাল তার দিন কাটে, নিজের ছেলের এই আত্মসম্মানবোধের অভাবে যেন তার চরম হল। প্রজার ঘরে এদিক ওদিক দু'টো একটা ফুল ফুটলে, চোখে পড়লে জমিদারের, জমিদারের ছেলের পূজায় তা লাগে। কিন্তু এই কি তার প্রক্রিয়া? হেমন্ত কি গাঁয়ের সাধারণ বখাটে ছোঁড়া যে কাঙালের মত পিরীত করতে চাষার বাড়ী যাবে, চোরের মত মার খেয়ে নাকখত দিয়ে বাড়ী ফিরবে? সামান্য চাষার তুচ্ছ একটা মেয়ে! হুকুম দিয়ে ডেকে পাঠালে যে আসে, না এলে যাকে বাপ-দাদা সমেত পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে আনা যায়। গায়ের জোরে মেয়েটাকে ধরে আনিয়ে হেমন্ত যদি কেলেঙ্কারি করত তাতেও গৌরব ছিল বসন্তের।

এখন শুধু ভরসা, হেমন্ত প্রচণ্ড প্রতিঘাত হানবে। ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে সমস্ত লজ্জা অপমান কলঙ্ক। আতঙ্কে গলা বুঁজে যাবে আঁটুলিগাঁর, বুক ছোট হয়ে যাবে—আজ রাত্রির ঘটনা তুচ্ছ হয়ে তলিয়ে যাবে ভয় ও ভক্তিতে। সকালে তাই শত শতবার বসন্তকে নিজের মৃত্যু কামনা করতে হয়, অসহ্য ক্রোধের জ্বালার মধ্যে আসে অকথ্য যন্ত্রণাবোধ, হতাশা। ভোরে আঁটুলিগাঁর কাক ডাকবার আগে হেমন্ত শহরে পালিয়ে গেছে!

আঁটুলিগাঁর মেজকর্তার ছেলে চাষার হাতে মার খেয়ে রাতারাতি ভেগেছে কলকাতায়!

—আমার ছেলে নয়, মধু। অনেকবার সন্দেহ জেগেছে, আজ প্রত্যয় হল। ছোটলোক চাকর-মুনিষ কেউ ওর জন্ম দিয়েছে। ছাখো, ও যখন ওর মার পেটে এল আমি বেশির ভাগ সময় সদরে নয় কলকাতায় থাকতাম—

হেমন্তের মাকে মাঝে মাঝে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেওয়ার জন্য ছাড়া কোনদিন যে খটকা বসন্ত কারো কাছে প্রকাশ করে নি, মনের মধ্যে পুষে রেখেছে, আজ তা বেরিয়ে আসে। মধু ভটচাজ অবশ্য বহুকালের ইয়ার স্তাবক, এ রকম মানসিক অবস্থায় এসব লোককেই বেশি অন্তরঙ্গ মনে হয়। বাপ ছিল এ অঞ্চলের বিখ্যাত উকিল, মধু কিছুদিন ডাক্তারি পড়েছিল, চিকিৎসা পেশা করে গাঁয়ে আছে। বাপের জমিজমা কিছু অবশিষ্ট আছে, টাকা পয়সা সম্পত্তির বেশির ভাগ উড়ে গেছে বয়স-কালে। লোকটা ঝানু।

মধু বলে, মাথা বিগড়ে গেছে? যা তা বলছ কেন? অন্যের কাছে তোমার চেহারা পেয়েছে না?

—যাই বল মধু, আমার ছেলে হলে ভয়ে পালিয়ে যেত না!

মধু মৃদু হাসে।—ভয়ে? এতবড় জমিদারি চালালে কি হবে, তোমার ভাই এসব বুদ্ধি কম। লজ্জায় পালিয়েছে ছেলেটা, ভয়ে নয়! একালের ছেলে, শহরে পড়েছে, ঘষামাজা পেয়েছে, এই যাকে বলে কিনা মার্জিত রুচি। একটা ছুঁড়ির

সঙ্গে ফচকেমি করতে গিয়েছিল, লোকে কি ভাবছে, কি করে সবাইকে মুখ দেখাবে, এই সব ভেবে লজ্জায় পালিয়েছে। বুঝলে না ?

আবার বলে মধু, ছেলে যাক না শহরে, কি হয়েছে ? এ ব্যাপারটা না ঘাঁটাই তো ভাল ! যতই হোক, মেয়ে নিয়ে ব্যাপার, লোকের মনটায় নানা রকম হয়। শাস্তি দিতে চাইলে কি ছুতোর অভাব ঘটে ? ওই গগনটাকে, ছোঁড়া-গুলোকে, ছুঁড়িটাকে ঠুকে ঠাণ্ডা বানিয়ে দাও। হুকুম দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো।

ছোঁড়াগুলো কে জানো মধু ?

জানি বৈকি। বুড়োগুলোকেও জানি।

বয়স্করা কিন্তু ছেলেদের মতলব জানত না, পিছনে ছিল না। জ্ঞানদাস পর্যন্ত ভাসা ভাসা জেনেছিল। ঘটনার পর শুধু সে আর তারই মত দু'চারজন গোঁয়ার কাজটা পছন্দ না করেও সমর্থন করেছে। সাধারণভাবে বয়স্কদের সমাজ চমকে গেছে ছেলেদের কাণ্ডে, শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এ নিছক গোঁয়ারতুমি ; শোচনীয় অবিবেচনা। এ ছাড়া কি আর উপায় ছিল না হেমন্তকে ঠেকাবার, যাতে চারিদিক বজায় থাকত, কর্তাবাবুরা আহত অপমানিত ও কুপিত হত না। জমিদারের ছেলেকে ঠেঙানো ভাল, কিন্তু ঠেঙিয়েই কি পার পাওয়া যায় ! জমিদারও ঠেঙাবেই, সেটা কি এখন ঠেকাতে পারবে ছেলেরা ? আঘাত যে ব্যাপক ভাবেই আসবে, দোষী নির্দোষী নির্বিশেষে শাস্তি পাবে নাস্তানাবুদ হবে, তাও জানা কথাই।

এখন কোনদিক দিয়ে কি ভাবে অত্যাচার আসে, বড়দের তাই ভাবনা।

বসন্তের ছেলে না হয়ে সাধারণ কেউ হলে এ ব্যাপার নিয়ে সামাজিক মজলিস বসত, ব্যাপারটার সঙ্গতি অসঙ্গতি এবং কি করা না করা নিয়ে আলোচনা হত। রসালো মজাদারও হত মজলিসটা ঠাট্টা তামাসা কথা কটাকাটি রাগারাগি এবং হয় তো বা ছোটখাট দু'একটা হাতাহাতিতে এবং মিটমাট হত জোড়াতালি দেওয়া মীমাংসায়। কিন্তু জমিদারের ছেলে ঘটিত এ ব্যাপারে প্রকাশ্য মজলিস অসম্ভব। কে ঘাঁটতে যাবে বিষয়টা, কে ঘোষণা করবে যে সে জানে কি ঘটেছিল। সঙ্গতি অসঙ্গতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা তো দূরের কথা।

হাটে মাঠে ঘরের দাওয়ায় দু'চারজনের মধ্যে সাবধানে ঘরোয়া আলাপ আলোচনাই চলে। সেই গুঞ্জনেই মুখরিত হয়ে থাকে আটুলিগাঁ।

জ্ঞানদাস আপশোষ করে বলে, আগে একটু পরামর্শ করলি না পাঁচু !

কি পরামর্শ ? ঘরে ডাকাত পড়েছে তার পরামর্শ কি ?

মেয়ে নিয়ে কাণ্ড, এ বড় ঝকমারি কাজ। লোকে এগোয় না মোটে, সায় দেয় না। খাজনা বন্ধের ব্যাপারে স্থাথ, বুক ঠুকে সব ঘাড় তুলে দাঁড়িয়েছিল। এতে মন করবে কি, নোংরা ব্যাপার ওতে গিয়ে মোর কাজ নাই। ঠেঙিয়েছিস, আচ্ছা

করেছিস, ওর বাপ শালাকেও ঠেঙানো দরকার। তা ঠেঙালেই তো হয় না, আঁটঘাঁট বাঁধতে হয় আগে।

কি আঁটঘাঁট বাঁধব?

পাড়ায় গাঁয়ে ঘোঁট পাকাতি আগে যে সবাই ত্থাখো, গরীবের পরে কি অত্যাচার। বাবুদের ছেলে জবরদস্তি মেয়েছেলের ধর্ম নষ্ট করছে। দু'চারজন ভদ্দরলোককে মধ্যস্থ মানতি। তাতেই ভড়কে যেত বজ্জাতটা, মিটে যেত ব্যাপার। তবু যদি আসত জোর খাটাতে, তখন পিটিয়ে দিতি। হত কি যে, আগে থেকে হৈ চৈ করা থাকলে দশজনকে পিছনে পাওয়া যেত। রাগ হত সবার।

খুব সহজ রাজনীতি। পাঁচুও বোঝে। কিন্তু বাঁশবনে দু'কলি তাকে রাজনীতি ভুলিয়ে দিয়েছে। আগে ঘোঁট পাকালে হেমন্ত যদি ভড়কে গিয়ে পিছিয়ে যেত, তাকে আঘাত করার, ঘাড ধরে তাকে উঠানে নাকে খত দেওয়ানোর সুযোগও তাহলে যে ফসকে যেত! আগে পাঁচু জানত না, দু'কলি নিজে জানান্ দিয়েছে সে সত্যই কত ভাল, কত ভীরু, কত অসহায়। টাকার জোরে বা গায়ের জোরে হোক, দু'কলিদের নিয়ে যারা খেলা করে তাদের মত পাষণ্ড জগতে নেই। পাঁচুর আগের হিসাব পাল্টে গেছে। স্বেচ্ছায় খুশি হয়েও যদি কোনো দু'কলি কোনো হেমন্তের সঙ্গে ভাব করে, পাঁচু তাকে এতটুকু দোষ দেবে না, মন্দ ভাববে না। মন্দ শুধু হেমন্তেরা, সব দোষ ওই এক পক্ষের। ওদের ফাঁসি দিতে হয়।

শ্যামল তাকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। বলে, তা বৈকি, যা অন্যায় অত্যাচার সেটা তাই থাকে, হাসি মুখে খুশি হয়ে একজন মেনে নিলেই সেটা শুদ্ধ হয়ে যায় না।

যেহেতু গুরুশিষ্য দুজনেরই মনে উঁকিঝুঁকি মারে তাদের বোধগম্য এই কথাটার পিছনের প্রকাণ্ড সত্যটা যে জগতে যত পাপ যত অনাচার সব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধনবান শক্তিমানদেরই সৃষ্টি, দুজনেই তারা অস্বস্তি বোধ করে। কৃতকার্যের জন্য পাঁচুর মনে কোনো ক্ষোভ কোনো আপশোষ নেই। নলিনী দারোগাকে মারবার সাধটা নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে তার মনে অসহ্য চাপ দিচ্ছিল। দু'কলির মান বাঁচাতে হেমন্তকে শাস্তি দেবার প্রক্রিয়ায় সাময়িক ও আংশিক একটা শান্তি এসেছে। বড় চিন্তা তাই একটু পীড়া দেয়, অস্বস্তি দেয়। একদিকে মনে হয়, কত কথা চিন্তা করার ছিল, কিছুই হল না। অন্যদিকে সেই সঙ্গে মনে হয়, নিজের কাজের যেন অজুহাত খুঁজছে, কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করছে।

বিকেলে আকাশ ছেয়ে ঘনকালো মেঘ ঘনিয়েছে। মেঘ ঘনাবার সমারোহ মাথায় নিয়েই পাঁচু শ্যামলের কাছে এসেছে। জানা কথা যে আজ দারুণ বর্ষা নামবে। এত দেরী করে যখন এসেছে, মাঠের অর্ধেক ফসল জ্বালিয়ে দিয়ে, একেবারে বইয়ে দিয়ে ছাড়বে এবারের বর্ষা। তাই নিয়ম।

—বৃষ্টি নামবে। বাড়ী যাও।

—যাই।

যাই বলেও পাঁচু যায় না। বন্ধুর জন্য তার মন কেমন করছিল। শ্যামলের সঙ্গে অনেকটা রক্ত-সঙ্গ মেলে, যতই সে বুড়ো হোক। আনমনে সে বলে, এমনি মেঘ দেখলে পাকা কি করে জানেন? গুম্ খেয়ে যায়।

গুম্ খেয়ে যায়?

—হাঁ। মেঘ হলে ওর নাকি মিছামিছি মন কেমন করে, গান শুনতে সাধ যায়, ভয়ানক কষ্ট হয়। নিজেকে তাই ধিক্কার দেয়।

লণ্ঠনের আলোয় শ্যামলের মুখচোখের কৌতূহল সবটা ধরা যায় না।—ধিক্কার দেয়, না?

—পাকা বলে, এই তো প্রমাণ ভেতরে ভেতরে আমি ভদ্দরলোক। মেঘ হয়েছে বৃষ্টি হবে, প্রতি বছর মেঘ হয়, প্রতি বছর বৃষ্টি হয়। মেঘ হলে আমার এমন বিশ্রী লাগবে কেন? জানিনা পাঁচু, আমি চং করি তোদের সঙ্গে। ভেতরে ভেতরে আমি ওই খাঁটি ন্যাকা হাঁদা ভদ্দরলোকের বাচ্চা। এমন করে পাকা বলে, যদি শুনতেন।

বাইরে টুপটুপ মোটা মোটা জলের ফোঁটা পড়া সুরু হয়েছে। শ্যামল বলে, পাকার একটা খবর পেয়েছি; তোমায় বলি নি।

পাঁচু সাগ্রহে বলে, পাকার খবর? বলুন।

পাকাকে দলের সভ্য হতে বলা হয়েছে। পাকা রাজী হয় নি।

রাজী হয় নি? পাকা?

কালীনাথ ওকে একদিন বাতিল করেছিল। কালীনাথ নিজে স্বীকার করেছে তার ভুল হয়েছে, সে ঠিক বুঝতে পারে নি। কালীনাথ নিজে ঢাকায় গিয়ে পাকাকে জানিয়েছে তার নাম কাটা ভুল হয়েছিল। সেদিন রাত্রেই কালীমন্দিরে শপথ করিয়ে তাকে একেবারে দলের মেম্বার করা হবে। পাকা নাকি কেঁদে ফেলেছিল, বলেছিল আর তা হয় না কালীদা। অনেক বুঝিয়েও কালী তাকে রাজী করতে পারে নি।

তলিয়ে না জানলেও পাঁচু মোটামুটি পাকার দুঃখ জানত। এই সেদিনও সে শ্যামলের এই বাড়ীতে কালীনাথদের সঙ্গে পাকাকে নিয়ে সে ঝগড়া করেছে; বলেছে পাকাকে তারা কেউ বোঝে না। ঢাকায় পাকার রকমসকম দেখে পাঁচু খুশি হতে পারে নি, কিন্তু বলা মাত্র বাপের রিভলভার ও সৎমার গয়নার বাক্স বিপ্লবের জন্য দান করে পাকা সেটা পুষিয়ে দিয়েছিল। কালীনাথ নিজে গিয়ে বলাতেও পাকা রাজী হল না দলে আসতে?

পাকা কারণ দেখায় নি?

দেখিয়েছে। ওর নাকি ব্রহ্মচর্য নেই। ছেলেটা একটু পাগলাটে।

পাঁচুর মনে পড়ে। ব্যায়ামাগারে পাকার সেদিন নাম কাটা গিয়েছিল। খেদের সঙ্গে পাকা বলেছিল, চরিত্র কাকে বলে জানিস পাঁচু? গা বাঁচিয়ে চলার শুচিবাইকে! চাদ্দিকে গোবর ছড়া দিয়ে মাঝখানে বসে থাকলে চরিত্র ঠিক থাকে, বিধবারা নইলে চরিত্র ঠিক রাখে কি করে বল? গোবরের গণ্ডী পেরোলেই চরিত্র নষ্ট হয়! ব্রহ্মচর্য কাকে বলে শুনবি? যে বাড়িতে মেয়েলোক থাকে সে বাড়ির চৌকাঠ না ডিঙোনোতে! মেয়েলোকের ঘরের চৌকাঠ ডিঙোলেই ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়!

বৃষ্টিতে ভিজে পাঁচু বাড়ি ফেরে। গগনের বাড়ি হয়ে আসে। এগারটি ছেলে আজ রাত্রে গগনের উত্তর ভিটেয় আধভাঙা ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, ইতিমধ্যেই ঘরের অর্ধেকটা জলে ভেসে গেছে। সমস্ত ঘরটা গলে যাওয়া আশ্চর্য নয়। ঘরের মেঝেতে বাঁশ পুঁতে যেদিকে বৃষ্টি পড়ে না সেদিকে মাচা তৈরি করে ছেলেরা জড়াজড়ি করে শুয়েছে। কাঠ বাঁশের অভাব, তাড়াতাড়িতে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি, মাচাটির যায় যায় অবস্থা।

অন্য ঘরটি বর্ষায় বাসের একেবারে অযোগ্য। অত বড় চালায় খড় তুলবার সাধ্য গগনের হয়নি, বুদ্ধিমানের মত দাওয়ার কোণটা ঘিরে নিয়ে সেইটুকু চালা সে মেরামত করেছে। হাত চারেক লম্বা হাত তুই চওড়া ঘর, তবে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে না। গুটিসুটি হয়ে গাদাগাদি করে শুয়ে বসে সুখে রাত কাটাও!

বাড়ীতে সবাই অন্ধকারে জেগেই ছিল, সুভদ্রা লণ্ঠন জ্বালে। বিকালে মেঘ ঘনাবার আগে গোবিন্দ পিয়ন একখানা চিঠি দিয়ে গেছে। আজ তার এ পাড়ায় চিঠি বিলি করবার দিন নয়, কৌতূহলের খাতিরে নিজের গরজেই এসেছিল। পাকার চিঠি, ইতিমধ্যে খাম খুলে পড়া হয়েছে। ধনদাস আর জ্ঞানদাস চেষ্টা করে সাধারণ চিঠির মোটামুটি পাঠোদ্ধার করতে পারে।

ধনদাস বলে, কি চিঠি লেখে তোর বন্ধু, মানে বোঝা দায়। বিষয়টা কি?

আগে পড়ি?

বিষয়টা গুরুতর, কিন্তু লম্বা চিঠিতে এখানে ওখানে শুধু ছুঁয়ে গেছে পাকা, বাকি সব মনের কথা, জল্পনা। তবে সে জল্পনার মানেও পাঁচু আন্দাজ করতে পারে, পাকার বর্তমান মনের ভাবটা ফুটেছে। পাপপুণ্য উচিত অনুচিত তা পাকা বলছে না, কিন্তু সকলের বেলা তো এক নিয়ম খাটে না, মানুষ তো স্বাধীন। যেমন ধর, কারো প্রাণ বাঁচাতে যদি কেউ চুরি করে, সেটা কি পাপ? কারো ক্ষতি যদি সে না করে তবে যা খুশি করার অধিকার পাকার নিশ্চয় আছে। আমি মরি বাঁচি গোল্লায় যাই নরকে ডুবি অন্যের তাতে কি এল গেল, খুশি হলে আমি তো আত্মহত্যাও করতে পারি? আইনে অবশ্য বলে পারি না, কিন্তু আইন যারা করেছে তারা মূর্খ, যে আত্মহত্যা করবে সে নাকি আইনের ধার ধারে। অন্যের অনিষ্ট না করে নিজেকে নিয়ে যা খুশি করার অধিকার নিশ্চয়ই মানুষের আছে,

নইলে স্বাধীনতা কিসের, নইলে তো শুধু অন্যের ইচ্ছায় চলতে হয়। এসব কথা কিসে উঠল কেন উঠল পাকা তা লেখে নি, অনুমান করতে যদিও পাঁচুর কষ্ট হয় না। ঢাকায় কটা দিন সে চোখকান বুঁজে ছিল না। পাকার মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে সুধাকে কাঁদতে দেখার, ওভাবে কাঁদতে দেখার মানে বুঝতে, চাষাভুষো ছেলে সে, তার মাথা ঘামাতে হয় না। সে না হয় হল, জগতে কারো ক্ষতি না করে পাপ করার অধিকার না হয় পাকা দাবী করল, কি করেছে না জানিয়েও পাঁচুর কাছে কৈফিয়ৎ দাখিল করল যা খুশি করার স্বাধীনতার, কিন্তু আত্মহত্যার কথা লেখে কেন পাকা? শুধু কি যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছে না অন্য কিছু আছে পাকার মনে? আরও অনেক কথা পাকা লিখেছে। তার জীবনে সব উল্টো হয় কেন পাকা বুঝতে পারছে না। যেদিকে যাদের সঙ্গে যাবার জন্য সে ব্যাকুল হয়েছিল তারা একদিন বিনা দোষে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজ যখন তাদের সঙ্গে ভিড়বার উপায় নেই, নিজেই সে অধিকার নষ্ট করেছে, তখন আবার তার কাছে ডাক এল। পাঁচু জানে না, এমনিই হয়েছে চিরকাল, যখন যা চেয়েছে পাকা সব গোলমাল হয়ে গেছে। কোনদিকে কাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল পাকা, আজ ডাক এলেও যাদের সঙ্গে ভিড়তে পারছে না, সে সব কিছু লেখে নি। পাঁচুর বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বিষয়টা কি? ধনদাস প্রশ্ন করে।

আবোল তাবোল লিখেছে খেয়ালের কথা।—নিজের মাথায় আঙুলের টোকা দিয়ে পাঁচু বলে, মাথাটা এখনো ঠিক হয় নি।

অ!

ধনদাসকে বুঝিয়ে এড়াবার জন্য শুধু নয়, পাঁচুর সত্যই ধারণা হয়েছে যে পাকার মাথা বিগড়ে গেছে। সে পাকাকে জানে, ভালবাসে, তাই তার এলোমেলো ভাসাভাসা চিঠিখানার মধ্যে বেদনা ও হতাশার গভীরতা সে ধরতে পারে। আত্মহত্যার উল্লেখটা তাকে দারুণ দুর্ভাবনায় ফেলেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে শুয়েও অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই দুশ্চিন্তা নেড়েচেড়ে জেগে থাকে। একবার ভাবে, এ অসম্ভব, সে মিছে ভাবছে, পাকার পক্ষে আত্মহত্যার কথা মনে আনাও সম্ভব নয়। আবার ভাবে, পাকার পক্ষে অসম্ভব কিছু আছে কি?

মাথা ঠিক থাকলে, বিবেচনার শক্তি থাকলে, একটা ব্যাপারকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে এত বড় করে তুলতে পারত পাকা, এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া অস্বাভাবিক ব্যাপার যা নয়? সারা জীবন তছনছ হতেই হবে, উদ্দেশ্য আদর্শ কাজকর্ম সব পণ্ড হয়ে যাবেই যাবে, আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভাবতে হবে! এমন ভয়ঙ্কর যদি এ ফাঁদটা, একবার পা দিলে জীবনে আর সামলে নেবার সাধ্য থাকে না, সংসারে তবে ব্যাটাছেলের তো বাঁচাই কঠিন!

তারা কি কিঁচকে ফাজিল ছোঁড়া, শুধু বজ্জাতি করে বেড়ায়, অসামাজিক ঘটনাচক্র তৈরি করার ফিকির ছাড়া জীবনে আর কিছুই নেই তাদের, যে ওরকম কিছু ঘটলে চিরদিনের জন্য পাপী অভিশপ্ত হয়ে যাবে! পাকা কি তার নতুন-মামীকে তৈরি করেছে, না ঘটাগুলি সৃষ্টি করেছে? তাছাড়া, সে-ই যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে রসাতলে পাঠাল, এতো বাড়াবাড়ি কেন পাকার!

ভালবাসা? এই যদি ভালবাসা হয়, এত কষ্টকর আর এমন সর্বনাশা, ভালবাসা মাথায় থাক পাঁচুর। জগতের কোটি কোটি পুরুষ মেয়ের সাধারণ ভাব সাধারণ পীরিত হলেই তার যথেষ্ট হবে। কোন মেয়েছেলের জন্য কোন ব্যাটা-ছেলে আশা আকাংক্ষা আদর্শ পরিকল্পনা কাজকর্ম সব চুলোয় দিয়ে গুমরে গুমরে আত্মহত্যার-কথা চিন্তা করবে, ভাবতেও পাঁচুর গা ঘিন ঘিন করে।

দুদিন ক্রমাগত বর্ষণের পর সকালের দিকে আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে আসে। বিকালে আর এক দফা সুরু হয়ে রোদ ওঠে পরদিন। গ্রামের চিরকেলে জোড়াতালি দেওয়া শ্রীহীন বঞ্চিত জীবন বর্ষাকালে পাশবিক, কদর্য হয়ে ওঠে। বহুযুগ পিছনের পুরোনো পচা সভ্যতা-ভব্যতার একটু যে আচরণ থাকে অন্য সময়, পশুর জীবন থেকে যা খানিকটা তফাৎ করে রাখে মানুষের জীবনকে, বর্ষায় যেন তাও ধুয়ে মুছে যায়। মনে করাও কঠিন হয়ে পড়ে যে এই মাটির পৃথিবীতে মানুষ স্থানে স্থানে শহর বানিয়েছে, কলকারখানা চালিয়েছে, শক্ত স্থায়ী পথে পথে যানবাহনের চাকা ঘুরিয়েছে, বৃষ্টিতে ইট পাথরের শুকনো আশ্রয় বানিয়েছে, দোকানে খাদ্য বস্ত্র আরাম সাজিয়ে রেখেছে স্তরে স্তরে, মানুষ আর বুনো নেই, সভ্য হয়েছে।

শ্যামল হাসে। ওয়াড়হীন তেলচিটে বালিশে ভর দিয়ে মাটির দেওয়ালে বসানো জানলার কাঠের গরাদের ফাঁকে সে বাইরের থৈ থৈ জল দেখছিল, একটা মরা বাছুর ভেসে এসে জানলার নীচেই বকুল চারার ডালে ঠেকে আছে। গরাদের আলকাতরা উঠে গেছে বহুকাল, পোকায় খেয়ে কাঠ জীর্ণ করে ফেলেছে। এবার শ্যামলের ঘরে জল পড়বে না আশা করা গিয়েছিল। প্রথম দিকে জল পড়ে নি, তারপর টিপ টাপ টুপ টাপ ফোঁটা পড়তে সুরু হয়েছে, চৌকি পাতার জায়গা মেলেনি। হোগলার মেরাপ এনে তার চৌকীর ওপর টাঙিয়ে ঢাকতে হয়েছে। বর্ষা শ্যামলের সয় না, অল্প অল্প জ্বর হয়েছে। নিরুপায় হয়েই সে দু'একমাস শহরে গিয়ে থাকতে রাজী হয়েছে। বর্ষণ স্থগিত হলেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

প্রতিহিংসাও বৃষ্টি থরবার অপেক্ষায় ছিল।

কত ভেবে কি ভাবে ছকে নিয়ে প্রতি-আঘাতের ষড়যন্ত্র ও আয়োজন হয়েছিল, প্রথমে ধরাও গেল না, ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হল। বিপিন ঘোষের বাড়ী ডাকাতি হল, শোনা গেল নগদে গয়নায় বেশ কিছু গেছে। বিপিন অবস্থাপন্ন লোক। কারো বাড়ীতে ডাকাত পড়া আশ্চর্য নয়, গাঁয়ের লোক আশ্চর্য হয়ে গেল এইজন্য যে ডাকাত পড়ার হৈচৈটা তেমন ভাবে তারা টের পেল না। ডাকাতি হলে রাতারাতিই সমস্ত গ্রাম টের পায়, হুলস্থূল হয়, ডাকাতির সময়েই অথবা ডাকাতরা চলে গেলে। গ্রাম দূরে থাক, পাড়ার সব লোকে ভোরের আগে জানতে পারে নি রাত্রে পাড়ায় একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, অনেকে শুধু একটা গণ্ডগোল টের পেয়েছিল। জল্পনা কল্পনা বিস্ময় প্রকাশের সুযোগও ভাল রকম পেল না আঁটুলিগাঁর অধিবাসীরা। এগারটা নাগাদ সদর থেকে পুলিশ এসে গাঁ ছেয়ে ফেলল। তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল চারিদিক।

একটা ডাকাতি নিয়ে সরকারের এত মাথাব্যথা হয়, পুলিশের এমন তৎপরতা দেখা যায়, আঁটুলিগাঁর জানা ছিল না। চিরদিন গাঁয়ের লোকেরাই দল বেঁধে পারলে ডাকাতি ঠেকায়, না পারলে ডাকাতরা লুটেপুটে সরে পড়ে। ধীরে সুস্থে মন্থরগতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকারী তদন্ত ও প্রতিবিধানের মোটামুটি প্রহসন চলে। লোক বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে কিছু ব্যতিক্রম হয়, এইমাত্র। বিপিন এমন কি বিশেষ লোক, স্বদেশী ডাকাতি-টাকাতির মত এমন কি বিশেষ অবস্থা যে সরকারের এত বেশি টনক নড়ল!

আটুলিগাঁর সাধারণ মানুষ বোকা-হাবা নয়, এক দুপুরের ঘটনার গতি আর ঘটনাগুলি ঘটাবার কাজে উৎসাহী মানুষগুলির যোগাযোগ দেখে ব্যাপারটা তারা বিকাল বেলাই মোটামুটি আঁচ করে নেয়। মধু ভট্টচার্য, তারিণী পাঁজা প্রভৃতি অনেকেই নাকি জানে কারা ডাকাতি করেছে। তারা আটুলিগাঁয়েরই একদল কিশোর ও জোয়ান ছেলে এবং দু'চারজন বয়স্ক লোক। এগারটা নাগাদ পুলিশ আসে, বারোটা নাগাদ গগন আর ধনদাসের বাড়ী খানাতল্লাস আরম্ভ হয়, তারপর চাষীপাড়ার আরও অনেক বাড়ী। প্রথমে গ্রেপ্তার হয়েছে গগন আর ধনদাস। জ্ঞানদাস আর পাঁচুকে পাওয়া যায় নি।

গগনের বাড়ীতে সাতজন ডাকাত গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা অবশ্য ছেলেমানুষ। এক দুপুরে একুশটি ঘর লণ্ডভণ্ড করে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষকে লাঠিগোঁতা মেরে ডাকাত খোঁজা হয়েছে। হাতকড়া পড়েছে একুশজনের হাতে। খাজনা বন্ধের বদনামি আটুলিগাঁর চাষীপাড়া! এত বছর পরেও পোড়া ভিটের কলঙ্কচিহ্ন আঁকা আটুলিগাঁ!

নলিনী তদন্তের ভার নিয়ে এসেছে।

পুলিশ এসেছে শুনেই পাঁচুকে একরকম বগলদাবা করে জ্ঞানদাস খিড়কি পথে ডোবার ধারের বাঁশবন দিয়ে সরে পড়েছিল। কর্কশ থাবা, মোটা মোটা আঙুল, তাই দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে পাঁচুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, পাঁচুর কোনো কথা কানে তোলে নি।

শেষে মুক্ত হাতে একটা পলাশ গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে পাঁচু প্রতিরোধ করায় সে থেমেছিল, মুঠি শিথিল করেছিল।

—বুঝিস নে কেন বোকা হাঁদা, হট্টগোলের মধ্যে পেলে তোকে যে মেরেই সাবাড় করবে। তুই-তো আসল আসামী।

—কিসের আসামী?

পাঁচু তখনও ব্যাপার বোঝেনি। একুশ সালের গাঁ-জ্বালানোর অভিজ্ঞতা জ্ঞানদাসের, তারপর থেকে এতগুলি বছর অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা। সে চট্ করে যা আন্দাজ করে ফেলেছে পাঁচুর তা বোঝার ক্ষমতা নেই।

—হেমা বাবুকে মেরেছিলি। এটা তার উসুল সুরু বুঝিস নে তুই? এজন্য বলছিলাম অত বাহাদুরি করিস নে পাঁচু, করিসনে। খুদ্দুর প্রাণী তুই, বল বুঝে না কাজ করলে খতম হয়ে যাবি। সাধ করে খতম হতে তোর ব্যগ্রতা কেন রে হারামজাদা, কিসের শখ অত? অহিংসা মার্কা বাবুদের ছেলে তুই না কি?

তবু পাঁচু মুখ গোমড়া করে থাকে, চারদিকের জঙ্গলের মত।

—উদিকে ঢু'কলিকে বুঝি লোপাট করলে এতক্ষণে।—জ্ঞানদাস ধিক্কার দিয়ে বলেছিল।

তখন গা ঝাড়া দিয়েছিল পাঁচু, জ্ঞানদাসের সঙ্গে প্রায় উড়ে গিয়েছিল গগনের বাড়ীর পিছনের শুকনো মরা পাট ক্ষেতে। গগনের হাতে তখন হাত কড়া পড়েছে, বাড়ীতে প্রলয় চলছে। পাঁচুকে পাটের আড়ালে দাবিয়ে রেখে জ্ঞানদাস একা গিয়েছিল। ঢু'কলির জন্য জ্ঞানদাসকে বাহাদুরি করতে হয় নি। বাড়ীর পিছনে ডাঁটা শাকের ক্ষেতে মাকে নিয়ে ঢু'কলি দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ীর সামনে পুলিশ এলেই গাঁয়ের মেয়েরা খিড়কি দিয়ে পিছিয়ে যায়। যাতে দরকার হলেই পুকুর ডোবায় নেমে জলের নীচে ডুবে আত্মগোপন করা চলে। দেশে যখন বর্গীরা আসত তখন থেকে বাংলা দেশের মেয়েরা এটা অভ্যাস করেছে।

জ্ঞানদাস বলে, ঢু'কলি, মোর সাথে আয়।

ঢু'কলি বলে, মা?

মার ডর নেই, তুই আয়। ক্রমশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

বিয়াল্লিশী বিলাস

অগ্নি—বনফুল। রঞ্জন প্রকাশালয়। দাম দু টাকা।
প্রধূমিত বহ্নি—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়। সমবায়। পাঁচ টাকা।
ভস্মাবশেষ—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়। রঞ্জন প্রকাশালয়। চার টাকা।

১৯৪২-এর 'আগস্ট আন্দোলনের' প্রেক্ষাপটে লিখিত হয়েছে এ উপন্যাস দু'খানি। লিখিত হয়েছে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বযোগের সমকালে ('অগ্নি' সমাপ্ত হয় ফাল্গুন ১৩৫৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩-এ, 'অগ্নিসংস্কার' ১৩৫৩, ৯ই আগস্ট ১৯৪৬-এ) এবং ১৯৪৭-এর 'স্বাধীনতা-লাভের' পর্বে। বিয়াল্লিশ নিয়ে বিলাস তখন আরম্ভ হয়ে গেছে ; অথচ তার বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ নেই। কারণ, যতক্ষণ প্রকাশ্যে ইংরেজ রাজা, —হোক কংগ্রেস তার মন্ত্রী—ততক্ষণ 'বিয়াল্লিশী বিক্ষোভে' কংগ্রেস নেতৃত্ব তার দায়িত্ব ও দায়িত্বহীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে পরোক্ষেও সুবিধা পেতে পারত সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী।

১৩৫৪ এর ফাল্গুনে (মার্চ ১৯৪৮-এ) আজ এ-দ্বিধার কারণ নেই। আজ দেশে স্বাধীনতার জয়-জয়কার—সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতার দানসাগর চালিয়েছে—আমরা স্বাধীন, সিংহল স্বাধীন, বর্মা স্বাধীন, ইরাক স্বাধীন, প্যালেস্টাইন স্বাধীন, মিশর তো বিশ বছর ধরেই স্বাধীন—নিশ্চয়ই স্বাধীন গ্রীস, চীন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়াও। এ-বেলা তাই একটু বিয়াল্লিশের স্বরূপ মনে করে বুঝে দেখার সময় এসেছে : এরূপ উপন্যাসের, গল্পের ও নাটকের লক্ষ্য ও উপলক্ষ কি।

'আগস্ট ১৯৪২' ব্যাপারটা কি? খুব সংক্ষেপে বুঝে নিই। তর্ক হবে, কিন্তু তর্কাতীত সত্য এই যে, নেতাদের মনে হয়েছিল হিটলার-তোজোর দল অজেয়। যাঁরা অস্ত্রশক্তিকেই মনে করেন চরম কথা,—জানেন না যে অন্তত দীর্ঘকালীন যুদ্ধে জনশক্তিই অপরাজেয়, আর জানেন না যে গত মহাযুদ্ধে হিটলার-তোজোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—যেখানে যেমন করে পারে—দুর্নিবার সেই সচেতন জনশক্তি, তাঁরা তখন সহজেই তাই ধরে নিয়েছিলেন এ-যুদ্ধে হিটলার-তোজোর জয় সুনিশ্চিত। অন্তত তাদের এতটা প্রসার অনিবার্য যাতে ভারতবর্ষে আমরা ব্রিটিশের বন্ধন এই ফাঁকে (ফাঁকি দিয়েই) ছেদন করতে পারি। এ-ভুল শুধু যুদ্ধ সম্বন্ধে হিসাবের ভুল নয়, জনশক্তির ওপরেই আস্থাহীনতার ফল অর্থাৎ রাজনীতির মূল নীতিতেই ভুল। নিজের সাহস ও সংকল্পকে নিয়ে তবু এ-ভুলকে আশ্রয় করেন ঐকান্তিকভাবে সুভাষচন্দ্র। আর, নিজেদের সংকোচ ও

চালাকি সম্বল করে এ-ভুল আশ্রয় করেন দেশের অতি চালাক কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁদের আপাতবিরোধী কথার অভাব তখনো তাই ছিল না, পরেও তাই নেই। জেলে গিয়েই তাঁরা অস্বীকার করলেন জনতার বিক্ষোভের দায়িত্ব, বাইরে এসেও (ওয়ার্কিং কমিটির ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরের প্রস্তাব) তাঁরা আবার তা করলেন অস্বীকার। তবু নির্বাচনের ঢেঁড়া পেটাবার সময় থেকে 'শিশুরাষ্ট্রের' নিরাপত্তার নামে তাঁরাই প্রয়োজনমতো এখনো আস্ফালন করেন 'বিয়াল্লিশের' সে ভাঙা তলোয়ার। এ-কথা সত্য তাঁরা সে-আন্দোলনের দায়িত্ব নেন নি— কোন গণবিক্ষোভের দায়িত্ব কংগ্রেস নেতৃত্ব পূর্বাপর গ্রহণ করেছেন এ পর্যন্ত? কিন্তু বিয়াল্লিশে তাঁরা বলে গেলেন—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। বলে গেলেন—'শর্ট এণ্ড সুইফ্‌ট্ স্ট্রাগ্‌ল্'। কংগ্রেসের বৈঠকে বৈঠকে পূর্বেই আলোচনা করলেন ছোট-বড়-মেজো বহু বহু নেতারা রেল-লাইন ওপড়ানো, তার কাটা প্রভৃতি সুবিদিত কৌশলের কথা। 'হরিজনের' পাতা জুড়ে মহাদেব দেশাই রেখে গেলেন যুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয়ের ইঙ্গিত; মুশরাওয়ালা ব্যাখ্যা করলেন 'অহিংসার' নরাতন্ত্র; তাঁদেরই আস্থাভাজন জয়প্রকাশ-লোহিয়ারা দীর্ঘ দিন ধরে কাগজ ছাপিয়ে প্রার্থনা জানালেন জাপানের দুয়ারে ভারত আক্রমণের জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি সহস্র কথা তখনো দেশের লোক বিস্মৃত হয়নি, আজও হয় না। নেতারা যাই বলুন, দেশের মানুষ বোঝে—তাঁরা জাপানের জয়ই চেয়েছেন। উল্টো দিককার প্রমাণও আছে—স্বতঃস্ফূর্ত সে-বিক্ষোভ, এ-কথাও একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, নেতারা দায়িত্ব নেবার জন্য মনে বা কর্মে তৈরী ছিলেন না, কোনো কালেই তাঁরা আসলে গণবিক্ষোভও বেশি চান না—শ্রমিককে, কৃষককে, দরিদ্র জনশক্তিকে তাঁরা দূরেই রাখেন। এক পা বাড়িয়ে দু পা পিছোনোই হল তাঁদের ঐতিহ্য। এ-জন্যই যুদ্ধশেষে যখন তাঁরা দেখলেন হিটলার-তোজো আর নেই, তখন কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করার পথই হল একমাত্র পথ—ভারতীয় মালিকতন্ত্রও যখন বুঝল গণশক্তির প্লাবনের মুখে তাঁদের পুঁজিপাটা সবই যাবে ভেসে তখন এই আপোস-রফার পথই হল কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে রাজপথ।

এ হল বিয়াল্লিশের রাজনীতিক হিসাব। এ নিয়ে তর্ক হতে পারে—হবেই; যতক্ষণ রাজনীতিতে মালিকপক্ষ আছে, আর আছে শোষিত পক্ষ, ততক্ষণ মূলত রাজনীতিতে একমততার স্থান কোথায়? কিন্তু কথা হল—এ বিতর্কমূলক রাজনীতিক হিসাবের এখানে কি প্রয়োজন?—আমরা এখানে পরিচয় গ্রহণ করছি দু'খানি উপন্যাসের; উপন্যাস তো রাজনীতি নয়।

উত্তরটা পরিষ্কার। উপন্যাসও 'রাজনীতি'ই—সূক্ষ্ম বা স্থূল। আর যে-উপন্যাস রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লেখা সে-উপন্যাস নিশ্চয়ই, স্পষ্টভাবেই রাজনীতি; তা ছাড়া এ-উপন্যাস দুখানি অন্তত রাজনীতিকে গোপন করবার জন্যও ব্যস্ত নয়।

আর শেষ কথা- এরূপ লেখার উদ্দেশ্য শুধু বিয়াল্লিশের ব্যাখ্যানেই সমাপ্ত নয়; সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ ও তার পরেকার রাজনীতিকেও চোখের সামনে রেখেই এই বিয়াল্লিশের কাহিনী হয়েছে পরিকল্পিত। কাজেই 'বিয়াল্লিশের' স্বরূপটা বিস্মৃত হলে চলে না। আর কাজেই, বুঝে নিতে হবে এ-গ্রন্থের রাজনীতি কার রাজনীতি—মালিকতন্ত্রের, কংগ্রেস নেতৃত্বের রাজনীতি, না, বঞ্চিত জনতার, বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক-দরিদ্র বুদ্ধিজীবীর রাজনীতি ?

এ-জিজ্ঞাসা নিয়ে গ্রন্থ দুখানি শেষ করবার পরে পাঠকের মনে সংশয়ের কোনো স্থানই থাকবে না—এ রাজনীতি কি। তবু 'পরিচয়'-পাঠককে দু'একটি তথ্য মনে রাখতে হবে—বনফুলের 'অগ্নি' মাত্র ১০০ পৃষ্ঠার আগস্ট কাহিনী হলেও তার অন্যতম প্রধান তত্ত্ব হচ্ছে বিদ্যুৎ-বেতারের ক্রমিক ইতিহাস বর্ণনা—দিবাস্বপ্নের সূত্রে পঠনরত নায়ক অংশুমানের মনে লেখক যোগাচ্ছেন সে-ইতিহাস। সরস, উপভোগ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-কৌশল ও বর্ণনা একঘেয়ে ঠেকে—বনফুলের আশ্চর্য লিপিকুশলতা সত্ত্বেও। বিশেষত, কথা-বস্তুর সঙ্গে এ-দিকটির যোগ মোটেই অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। তাই, মনে হবে, বনফুল একখানা ছাত্রপাঠ্য বেতারের সরস কথাকে মিছিমিছি তাঁর আগস্টের অগ্নিতে আহুতি দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'প্রধূমিত বহ্নি' প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বড় গ্রন্থ হলেও মোটে তাঁর 'অগ্নিসংস্কারের' প্রথম খণ্ড—সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠা পেরিয়ে এ-গ্রন্থে নাগাল পাওয়া যায় মাত্র প্রাক্-আগস্টের (মে-জুনের ?) 'লোকাপসরণ ও শত্রু-বঞ্চনানীতির' পর্ব। শেষ খণ্ড 'ভস্মাবশেষ' না পেতে এ গ্রন্থের পরিচয় আংশিক হবার কথা। অবশ্য সে-অপরাধ পাঠকের নয়, তবু পাঠকও তা স্মরণে রাখবেন।

'অগ্নি'তে কি আছে ? বিবেকানন্দ-সোশ্যালিজম-আধ্যাত্মিকতা (জয়প্রকাশী আভাস ?)-বিজ্ঞান' (?)-এ তালগোল-পাকানো দীপ্তিমান বিদ্রোহী নায়ক আছেন, 'কমরেড-স্বামীর' ভণ্ডামিতে বিক্ষুব্ধা, বিদ্রোহী নায়কের বিদ্রোহ-বিমুগ্ধ বিপ্লবিনী, আই. বি.-বিনাশিনী, দেশপ্রেম-নায়কপ্রেম-পাগলিনী নায়িকা আছেন, লোকের মেতে-ওঠা আছে, জেল আছে, ফাঁসির মঞ্চ আছে, এমন কি ডিটেকটিবী ফোড়নও আছে—আর আছে ভণ্ড, দেশদ্রোহী, কাপুরুষ 'কমরেড-স্বামী' বা কমিউনিস্ট ! এর বেশি এ-গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনো পাঠকের জানার দরকার নেই; লেখকের যে নেই তাও স্পষ্ট। বনফুল তাঁর নায়িকার মুখ দিয়ে সাফাই গাইতে চেয়েছেন "নিঃস্বার্থপর ত্যাগী কমিউনিস্ট যে নেই তা আমি বলছি না····কমিউনিজম জিনিসটা যে খারাপ, তাও আমার বক্তব্য নয়।" কিন্তু 'জঙ্গম' থেকে 'অগ্নি' পর্যন্ত যা সুস্পষ্ট তা এই—বনফুলের অভিজ্ঞতায় তেমন কমিউনিস্ট একটিও মেলেনি; এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর কাহিনীতে ভণ্ড ও দুশ্চরিত্র লোকেরাই প্রায় কমিউনিস্ট ছাড়া অন্য কিছু না—'স্বদেশী' হয় না, 'লেখক' হয় না, 'মন্ত্রী' হয় না, মালিক হয় না,

হয় না 'সোশ্যালিস্ট', হয়-না ভিন্ন মার্গের শ্রমিক কর্মী।

সম্ভবত 'রসোত্তীর্ণতার' কথা বলা হল না। কিন্তু এমন কমিউনিস্ট ব্যাখ্যানেও যদি রস না জমে তাহলে রস জমবে কিসে?

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনারায়ণ রায়ও রসোত্তীর্ণতার এরূপ দাবি করতে পারেন। 'প্রধূমিত বহ্নি' পড়তে গিয়ে ক্লান্তি বেড়ে ওঠে পাতার পর পাতায়, কারণ তিনি 'বনফুলের' মতো লিপিসিদ্ধ নন। কৌতূহল জাগ্রত না হতেই ঝিমিয়ে পড়ে; কারণ তেমন চমক-লাগানো ঘটনার অবতারণা বা সাইকোলজির ডিগবাজি দিয়ে পাঠককে চাগিয়ে তোলার চেষ্টা নেই তাঁর কাহিনীতে। হুগলী অঞ্চলের কারখানা অঞ্চলের 'শনিবারের বাজার' থেকে সে কাহিনী শুরু—কিন্তু 'শনিবারের' নামেও চোখে কোনো রঙ লাগে না। কারখানার আবহাওয়ায় ও সে মজুরবস্তিতে একটা মজুরও নেই যে আসলে মজুর, এমন কি 'মানুষ'—রোগা হোক, বেঁটে হোক, দুর্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হোক, তবু একটা মানুষ, শুধু একটা নাম নয়। আছে তবু মজদুর নামে দু' একটি ছায়া, একটা হাওয়ায়-গড়া মজদুর ইউনিয়ন, তার গান্ধী-জয়প্রকাশ-মার্কা 'নিঃস্বার্থ' সংগঠক (সোশ্যালিস্ট?) এবং আছে তৎ-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকাণ্ড জমিদার-ব্যারিস্টার-ব্যভিচারী-কমিউনিস্ট নেতা অরুণাংশু—যে ইউনিয়নটা ফাঁকি দিয়ে (সোশ্যালিস্টদের হাত থেকে?) কেড়ে নিচ্ছে, যে একদিকে নার্স সুভদ্রার সঙ্গে প্রেমে হচ্ছে তার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা আর দিকে ফ্যাশনেবল ঘরের সুন্দরী মেয়ে অনামিকারও হয়ে উঠছে প্রেমাস্পদ। হয়তো এ-পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট; তবু শেষ দিকে যখন সংকটগ্রস্ত গ্রামের মাঝখানে দেখি সুবোধকে তখন একটু থমকে দাঁড়াই—শেষ খণ্ডে কি পরিণতি হবে কার, কে জানে? আপাতত জানি—সাধারণ পাঠক বা আমাদের চরিত্রবান কর্মীদের চক্ষে এমন 'কমিউনিস্ট = কামনিষ্ঠ' সমীকরণে যথেষ্ট রস জমার কথা। আমার মতো কোনো পাঠক যদি তবু শ্রান্ত হন তাহলে লেখকদের দুর্ভাগ্য—'অরসিকেষু' লেখককে রস নিবেদন করতে হয়েছে।

এ-কথা ভাববার কারণ নেই যে, মালিকতন্ত্রের রাজনীতি নিয়ে 'বিয়াল্লিশী' উপন্যাস চলে না; চলে যে তার চমৎকার প্রমাণ 'জাগরী',—সংযত, সূক্ষ্ম, মালিকী কংগ্রেসী রাজনীতির তা পরিবেশন। এ-কথাও ভাববার কারণ নেই, 'বিয়াল্লিশের' গণ-নীতি নিয়ে উপন্যাস লিখলেই হবে তা সার্থক—এর প্রমাণও আমরা জানি। কিন্তু যা তবু ভোলবার নয় তা হচ্ছে এই—সার্থক ও অসার্থক সমস্ত প্রয়াসের মধ্য দিয়েও রাজনীতি আপনার জাল বুনছে, যেমন তা জাল বুনছে নামের বা পুরাতন-চালের বাদের নামে, ফিলজফির, ইকনমিকসের, আইনের, ইতিহাসের, এমন কি শব্দতত্ত্বের আর শিল্পতত্ত্বের পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে 'অগ্নিসংস্কারের' দ্বিতীয়ার্ধ প্রকাশিত হয়েছে (জুন ১৯৪৮) যখন

বিয়াল্লিশী বীরদের নির্দেশে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে 'পূর্ণ স্বাধীন ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়নের' রাষ্ট্রচূড়ায়, 'গড্ সেভ্ দি কিং' গীত হচ্ছে তার ফৌজী সমারোহে, এবং মাউণ্টব্যাটেন দম্পতির সচিত্র বিদায়-বেদনা মথিত জাতীয়তাবাদী নেতা ও সংবাদপত্রের বক্ষ। গত এক বৎসরের বর্ষফল পরিষ্কার—দেশে আজ 'বন্দুক রাজা, কংগ্রেস মন্ত্রী।' বিয়াল্লিশের ফ্যাশিস্ত দরদের পিছনে যে সামাজিক শক্তি সেদিন ছিল অর্ধ-গোপন আজ তার সাম্রাজ্যবাদের বেনামদারী বৃত্তি ও কলোনিয়াল ফ্যাসিজমরূপ সুস্পষ্ট—বাকি যা আছে তা হচ্ছে পণ্ডিত-প্যাটেল-প্রিন্সদের থেকে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর-নলিনী সরকার-বিধান রায় প্রমুখ চিরসংগ্রামী স্বাধীনতাকামী ও বাজপাই-মেনন-মেটা প্রভৃতি আই-সি-এস আই-পি-এস কংগ্রেসম্যানদের (ও সময় বিশেষে তাঁদের পত্নীদের) বিয়াল্লিশী দোহাই—'ভুলবেন না: কমিউনিস্টরা বিয়াল্লিশে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।' কিন্তু সে সময়ে—অথবা বরাবর—কিংবা এখনো—এঁরা প্রত্যেকে কে কি করেছিলেন তা এই সমালোচনায় আবার না বলতে বসে বিয়াল্লিশের এই 'ভস্মাবশেষ' এ-উপন্যাসের লেখক কিরূপে উপস্থিত করেছেন তা বলা শোভন।

দীর্ঘ সোয়া তিনশ পৃষ্ঠায় আমরা ১৯৪২-এর এপ্রিল (?) থেকে আগস্টে (?) উত্তীর্ণ হই—হয়ত ঘটনা-বিন্যাসে জাগতিক পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয়নি, অথবা ভুল রয়ে গিয়েছে। কিন্তু এহ বাহ্য। নায়ক-নায়িকার মূল কাহিনীই চলছে ও শেষ হচ্ছে একটি মাসে। স্বভাবতই নায়ক-নায়িকার সে-কাহিনী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে এগিয়ে চলেছে—যথাসময়ে শুধু আগস্টী গুলি লাঠি হরতাল নয়, ব্যক্তিরও এ্যাপোপ্লেক্সি, মোটর এ্যাক্সিডেন্ট। অকারণ উপস্থিতি, অনুপস্থিতি প্রভৃতি আকস্মিকতায় 'দৈব ধাক্কাও' এজন্য দরকার হয়েছে; তবু একই ব্যাপারের ভুল বোঝা-বুঝির আবৃত্তি অনুবৃত্তি ক্লান্তিকর। কিন্তু গল্পটা হয়ে দাঁড়াল এই খণ্ডে অননুমোদিত মাতৃত্বের বোঝা নিয়ে নায়িকার (সুভদ্রার) অনূঢ়া মাতারূপে আত্মবিকাশের কথা। কিন্তু সুভদ্রা আনেৎ নয়, আনেতের মতো মাতৃত্ব সুভদ্রার পক্ষে পূর্বাবধি আকাংক্ষিত ছিল না। অথচ সে-মাতৃত্ব সেই অনূঢ়া জননী গ্রহণ করল স্বচ্ছন্দে। নিজের কাছে পরের কাছে কোথাও কোনো বাধাও তাকে বিশেষ সইতে হল না।

এতবড় কঠিন পরীক্ষারও কোনো ছবি বা সংগ্রামের চিহ্নও দেখা গেল না, এজন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য আসলে লেখকের, কারণ শত তেজস্বিনী কোনো অনূঢ়া মাতার পক্ষে ও কৃতিত্ব এদেশে এ-সমাজে এমন স্বাভাবিক নয়, সম্ভবও নয়। ঠিক সেইরূপই লেখকের কৃতিত্বকে সার্থক করবার জন্য অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিতরূপে সুভদ্রা যখন গ্রেফতার হল (বিদ্রোহী শহীদের সঙ্গে এক কাজের সম্বন্ধের জন্য), অমনি সুভদ্রা তার অমন শত সাধনার ধন শিশুসন্তানকে সখীর হাতে তুলে দিয়ে

স্বচ্ছন্দে পুলিশের গাড়ীতে উঠে বসল—ভাবে বা আচরণে কোনো যে ঝড় উঠবে তার মনে এরূপ স্থলে, লেখকের গুণে তারও স্থান নেই। অর্থাৎ এ-জাতীয় নারীর জীবনে যে সংগ্রাম, সংঘর্ষ, সবলতা, দুর্বলতা স্বাভাবিক,—তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই সুভদ্রার মধ্যে।

সে প্রাণময় সত্তা তার নেই, নেই তেমন স্বাধীন সানন্দ ব্যক্তিত্বও। না থাক্। তবু সে গ্রাহ্য; ঝাপসা হলেও আত্মনির্ভরশীল নারী চরিত্রেরই তা ঝাপসা ছবি। এই ঝাপসা ছবির সঙ্গেই তাল-ছন্দ হারা তার কমিউনিস্ট প্রণয়ীর (অরুণাংশুর) রয়েছে ছুনিয়াছাড়া ছবি—এই উপনায়কের প্রতি অবশ্য তার প্রতি "অন্যায় না করারও" চেষ্টা আছে লেখকের। আর সেই সঙ্গে রয়েছে যথারীতি সত্যবাদী দেশভক্ত নায়কের (সুবোধের). গান্ধী-জয়প্রকাশ আগস্ট-সংগ্রামী চিত্র। তাঁর প্রতি ন্যায়-নিষ্ঠুর বিচার করবার সাফাইও লেখকের তেমনি সুস্পষ্ট। কিন্তু এ-কাহিনীর ভস্মাবশেষ কি রইল?—ওই আবছা ছবিগুলি কি? না, তারা মানুষ হিসাবে মনে দাগ কাটে না। রইল তাই এই আবছা ছবির পিছনের সুস্পষ্ট পটটি—উপনায়ক প্রণয়ী কমিউনিস্ট—যার প্রতি লেখক 'অন্যায় করবেন না'—কেমন করে কেড়ে নেয় ইউনিয়ন, কেড়ে নেয়, ফেলে দেয়, আবার কুড়িয়ে নিতেও যায় তার প্রণয়িনীকে, বিয়াল্লিশের দিনে জনযুদ্ধের নামে জাতীয় ফ্রন্টের কাজ গোপনে করে, সাহেব মালিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধর্মঘট ভাঙে, ওয়ার এবং পুলিশে ধরিয়ে দেয় গোপনে আগস্ট-সংগ্রামী বন্ধুকে (লেখক অন্যায় করতে অক্ষম; তাই এই গোয়েন্দাবৃত্তিব ওজর ভালো মানুষের মতোই উপনায়কের মুখে জুগিয়েছেন—নইলে প্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবী লোকটা উত্তেজনার বশে যা তা করে পুলিশের গুলিতেই মরবে!) আর অন্যদিকে এই পটে থাকে নায়ক জয়প্রকাশ-গান্ধী সোশ্যালিস্টের (সুবোধের) আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি। অর্থাৎ ভস্মের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে সেই 'বিয়াল্লিশী বিলাস'—যা আজকার স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের শ্রমিক-কৃষক দমনের এক পচা বেসাতি! 'অগ্নিসংস্কারের' বিষয়ে 'গবেষক-বিদূষক' প্রকাশক বলেছেন:

"জাতির ভুল ক্রটি আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যতের নির্দেশ লেখক দিতে পারিয়াছেন।"

রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এজন্যই এ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশক। নিশ্চয়ই এই 'নির্দেশ'টির জন্যই এই গ্রন্থ 'রসোত্তীর্ণ।'

বাঙালী পাঠক সমাজের সত্যবোধ ও সাহিত্যবোধের উপর এতটুকু আস্থা আছে যে, পশ্চিম বাঙলার ভূতপূর্ব কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার দিনের (১৯৫২) একজন সদস্য হিসাবে আমিও এই 'নির্দেশ'-পরিপুষ্ট সুদীর্ঘ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি এবং পশ্চিম বাংলার ১৯৪৮-এর একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে

আমি বিশ্বাস রাখি—লেখক ও প্রকাশকের উদ্দেশ্য মনে রেখে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের দপ্তর থেকে সশস্ত্র কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই সৎ সাহিত্যের বাধ্যতামূলক প্রচারের জন্য সিপাই-শান্ত্রী ও 'কংগ্রেসভক্ত জনগণের' সোডার বোতল, পিস্তল, বোমা, স্টেনগান দিয়ে যথারীতি ব্যবস্থা হবে। ডলার-রাজের দাক্ষিণ্যও মিলতে পারে, তা না হলে কিসের আমাদের "স্বাধীন রাষ্ট্র" ?

গোপাল হালদার

ভারত-কথা

A SURVEY OF INDIAN HISTORY—By K. M. Panikkar., The National Information & Publications Ltd., Bombay. Rs. 7/8/—

সর্দার কে. এম. পানিক্করের নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত। বিকানীর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক হিসাবেই শুধু তিনি পরিচিত নন। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হ'ল, তিনি ঐতিহাসিক। ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি অনেক গবেষণাপ্রধান তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করেছেন। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে একেবারে বৃটিশ যুগ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া রচনা করা তাঁর পক্ষে সহজেই সম্ভবপর।

আলোচ্য গ্রন্থ ভারতীয় ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত পরিচয়। মাত্র ৩০০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বৃটিশ যুগ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের একটা খসড়া রচনা সহজসাধ্য নয়। ত্রুটিবিচ্যুতি তার মধ্যে থাকতে বাধ্য। সে রকম বিচ্যুতি যে আলোচ্য গ্রন্থে হয়নি তা নয়, যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু লেখকের এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে তা উল্লেখযোগ্য নয়। উদ্দেশ্য তাঁর, খুব বেশি টীকাটিপ্পনিবহুল ও তথ্যাকীর্ণ না ক'রে, প্রাঞ্জল ভাষায় উত্থানপতনমুখর ভারতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকদের শিক্ষা দেওয়া। এই উদ্দেশ্য তাঁর অনেকাংশে সার্থক হয়েছে স্বীকার করতেই হবে। প্রত্যেক যুগের প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির এমন সুসংবদ্ধ গ্রন্থন এবং বিশ্লেষণ, তাঁর মতন ভারতীয় ইতিহাসে গভীর পাণ্ডিত্য না থাকলে কারও পক্ষে চেষ্টা করাও সম্ভব নয়। সর্দার পানিক্কারের এই সংক্ষিপ্ত ভারতীয় ইতিহাসের খসড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—ইতিহাসের প্রত্যেক যুগ ও উপযুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমির মোটামুটি পরিচয়, রাষ্ট্রনৈতিক উত্থানপতন ও ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাদীক্ষা

আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা। এর মধ্যে অবশ্য অর্থনৈতিক সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমির সঙ্গে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশের যোগাযোগ রক্ষার দিকে লেখক নজর দেননি, এবং তার কারণও হ'ল তাঁর সেই "নজরটাই" নেই। সে কথা পরে বলছি। তার আগে সাধারণ যে দু'একটি বিচ্যুতি মারাত্মক বলে মনে হয়েছে তার উল্লেখ করব।

আলোচ্য খসড়া-ইতিহাসের প্রধান ত্রুটি হল, গুরুত্ব অনুসারে ভারতীয় ইতিহাসের যুগবিভাগ এবং তার আলোচনা। সিন্ধুসভ্যতা, অর্থাৎ হড়প্পা ও মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা ও আর্যদের ভারত-অভিযান পর্যন্ত ভারতীয় প্রাগিতিহাসের যুক্তিসঙ্গত আলোচনা এ-গ্রন্থে একেবারে উপেক্ষিত হয়েছে। মাত্র ১১ লাইনের মধ্যে (৪ পৃষ্ঠা) সিন্ধুসভ্যতার পূর্বকালের ইতিহাস সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে গ্রন্থকার বলেছেন: "But prehistory...can provide us with but little on which the story of a people can be based." এখানে "people" বলতে লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন জানি না, তবে যদি ব্যাপক অর্থে "people" 'জাতি' হয়, তাহলে 'জাতি' হিসাবে ঐতিহাসিক যুগে অর্জিত ভারতীয়দের যে বিশিষ্টতা তা যে অনেক সংমিশ্রণ, অনেক বিরোধ-সংঘাত ও যুগান্তকারী সমন্বয়েরই ফল, তা নিশ্চয়ই তিনি স্বীকার করবেন। তাই যদি হয় তাহলে একথাও স্বীকার করা উচিত যে ঐতিহাসিক যুগের এই "জাতি" হঠাৎ ভারতের ভূগর্ভ থেকে উত্থিত হয়নি, তারও ক্রমপরিণতির একটা প্রাগিতিহাস আছে এবং এই প্রাগিতিহাস (Prehistory) ও ইতিহাস (History) স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নয়, একই ইতিহাস, নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। ভারতের ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা ও ঐতিহ্য উপলব্ধি করতে হলে প্রাগিতিহাসের মূল্য তো আছেই, পৃথিবীর মানবজাতির সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার "মানবিক" একত্ব উপলব্ধি করতে হলেও এই প্রাগিতিহাস আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া, "প্রাগিতিহাস" বাদ দিয়ে "ইতিহাস" আলোচনা করা সম্ভব কি ক'রে? প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবাসীর আচারনীতি সংস্কৃতি কি ঐতিহাসিক যুগে আর্যসংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের ফলে "হিন্দুসভ্যতা" ও হিন্দুসংস্কৃতিতে" বিকাশলাভ করেনি? তা যদি করে থাকে তাহ'লে "প্রাগিতিহাস" কি তথাকথিত "ইতিহাসের" সঙ্গে এসে মিলেমিশে যায়নি? তারপর, ইসলামের অভিযানের সময় ভারতবাসী যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল এবং আজকের ভারতীয় মুসলমানদের যারা প্রধান অংশ, তারা কি ঐ প্রাগৈতিকহাসিক ভারতবাসীর বংশধর নয়? তারা কি তাদেরই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করছে না? তার সঙ্গেই তো ইসলামের সংঘাত ও সমন্বয় হয়েছে এবং তার ফলে ভারতীয় ইসলাম-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার সংস্কৃতির অভিনব সংমিশ্রণ হয়েছে। তার জন্যই ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে (দক্ষিণ ভারতে তার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে) বেশ একটা

বড় অংশের লৌকিক আচারব্যবহার ইত্যাদি আজও ঐ আদিম ভারতবাসীর উত্তরাধিকার ব'লে মনে হয়। আধুনিক বৃটিশ যুগেও ভারতীয় আদিবাসীদের সংখ্যা অল্প ছিল না, আজও যথেষ্ট আছে। এছাড়া, আমরা যারা গোঁড়া হিন্দু-সংস্কৃতির বড়াই করি, তাদের মধ্যেও কি প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রকৃতিপূজা, জন্তু ও বৃক্ষপূজা, সংঘউৎসব, নৃত্য, মৃতাচার, বিবাহাচার ইত্যাদির প্রচুর স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায় না? তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, প্রাগিতিহাস বাদ দিয়ে আধুনিক ইতিহাস বোঝাও সম্ভব নয়, হিন্দু যুগ ও মুসলমান যুগের আলোচনা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব তো নয়ই। রাজারাজড়ার কাহিনীর দিক থেকেও যদি বলা যায়, তাহ'লেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের দলপতি কৌমপতি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক যুগের নৃপতি সম্রাট পর্যন্ত ক্রমবিকাশটাও লক্ষ্য করা দরকার। কিন্তু এভাবে এই খণ্ডিত ইতিহাসের ব্যাখ্যা লেখক করেননি। সিন্ধু সভ্যতার আলোচনাও দুইতিন পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে সিন্ধুসভ্যতা যে নিঃসন্দেহে সুমের সভ্যতার সমকালীন তার কোন উল্লেখ করা হয়নি। হড়প্পার সমাজ ব্যবস্থা আর সুমেরের সমাজ ব্যবস্থার সমকালীনত্ব ও সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়ে গেছে আজ। আর্যদের অভিযান, আর্য-প্রাগার্যের সংঘাত ও সমন্বয়ে হিন্দু সভ্যতার বিকাশ, হিন্দুসমাজ সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতির চরম পরিণতি ও পরিপুষ্টির ব্যাখ্যার মধ্যেও এই ত্রুটি রয়ে গেছে। মুসলমান যুগ ও বৃটিশ যুগের ইতিহাস ব্যাখ্যাও এই একই কারণে নির্ভরযোগ্য হয়নি।

অবশ্য সর্দার পানিক্করের এই ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, যদিও এ-ত্রুটি আমাদের কাছে মারাত্মক বলেই মনে হয়। ইতিহাস ব্যাখ্যার জন্য যে "বৈজ্ঞানিক কাচ" থাকার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তা তাঁর নেই। তাই অনেক তথ্য এবং অনেকটা "বস্তুবাদী" হয়েও, তিনি শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের "বৈজ্ঞানিক বাস্তব ব্যাখ্যার" একটা ভূমিকাও তৈরী করতে পারেন নি। এখানেই তাঁর ব্যর্থতা। তিনি উত্থানপতনমুখর ঘটনার একটা কাহিনী রচনা করেছেন, যে-কাহিনী, তাঁর মতে, একটা জাতির ইতিহাস এবং যে-ইতিহাস হল একটা গূঢ় উদ্দেশ্যপ্রধান। তিনি বলেছেন: "With all such ups and downs it is the continuous purpose of a people that makes history" (২৯০ পৃষ্ঠা)। একথা কেউ অস্বীকার করে না, আমরাও না, কিন্তু কি সেই গূঢ় "উদ্দেশ্য", কি তার আসল বাস্তব "স্বরূপ", কি যুক্তিতে সেটা "নিরবচ্ছিন্ন", "people" কিভাবে এই "purpose" সার্থক করে তোলে তার ব্যাখ্যা করলে এ-ইতিহাস জীবন্ত বাস্তব ইতিহাস হয়ে উঠত এবং অনেক বেশি শিক্ষা প্রদও হত।

বিনয় ঘোষ

মহাভারতের সমাজ—শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী। বিশ্বভারতী। দশ টাকা।

কবি রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল মহাভারতের আচার-বিচার, রীতিনীতি কেউ সংকলিত করেন। সেই উদ্দেশ্যেই, বিশ্বভারতীর এই সুপণ্ডিত লেখক এ কার্যে ব্রতী হন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ তাঁর সেই সাধু সংকল্প ও বহু পরিশ্রমের প্রমাণ। তিনখণ্ডে লেখক সমস্ত মহাভারত থেকে সংকলিত করেছেন বিবাহ, গর্ভাধানাদি সংস্কার, নারী, চাতুর্বর্ণ্য, চতুরাশ্রম, শিক্ষা, বৃত্তিব্যবস্থা, কৃষি-পশু-পালন, গো-সেবা, বাণিজ্য, শিল্প, আহার ও আহার্য, পরিচ্ছদ ও প্রসাধন, সদাচার, পারিবারিক ব্যবহার, প্রধান ব্যবহার, অতিথিসেবা, শরণাগত রক্ষণ, ক্ষমা ও শ্রদ্ধা, অহংকার ও কৃতঘ্নতা, দানপ্রকরণ, ধর্ম, সত্য, দেবতা, উপাসনা, আহ্নিক, কৃত্য, শবদাহ, অশৌচ, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, রাজধর্ম, সাধারণ নীতি, যুদ্ধ, দায়বিভাগ, প্রায়শ্চিত্ত, আয়ুর্বেদ, পশু ও বৃক্ষাদির চিকিৎসা, গান্ধর্ব এবং ব্যাকরণ, নিরুক্তাদি বিদ্যা ও সকল দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গ। সাধারণ ভাবেও আমরা জানি—মহাভারত প্রায় প্রাচীন ভারতের সমস্ত বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টি ও কল্পনার আকর। এই আকর থেকে কোন একটি বিষয়ে বিদ্যা বা জ্ঞান আহরণ করতে হলে বিপদে পড়তে হয়, সমগ্র মহাভারতের তেমন সহজলভ্য নির্ঘণ্ট আছে কিনা জানি না। আবার, মহাভারতে প্রাচীনকালের বিবিধ যুগের ও বিবিধ জাতি-উপজাতির এবং তথাকথিত ভারতবর্ষেরও বিবিধ ভূভাগের নানা আচার-বিচার সামাজিক কথা ও স্মৃতি এমন ভাবে মিশে আছে যে 'মহাভারতের সমাজ বলে সমগ্রভারতে প্রচলিত কোন একটি বিশেষ কালের সমাজ কল্পনা করা হয়ত যথার্থ নয়। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যতদিন পর্যন্ত এই বহু যুগ, বহু রাজ্য, বহু জাতি-উপজাতির বিচিত্র বিবরণ স্থির রূপে নির্বাচিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মহাভারতে যে সব সামাজিক রাজনীতি, আচার বিচারের আমরা উল্লেখ পাই তা'ই মোটামুটি 'মহাভারতের সমাজের বস্তু বলে গণ্য করতে পারি। এ সমাজেরও একটি সুসংবদ্ধ বিবরণ না হলে চলে না—কারণ, পাঠক মহাভারতের মহারণ্যের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই সংকলন গ্রন্থ এ দিকে বিশেষ সহায়ক হবে—এক-একটি প্রসঙ্গে তিনি মোটামুটি উল্লিখিত রীতিনীতি একত্র করেছেন, পর্ব ও শ্লোকও উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তার ইতিহাস-সম্মত বিচার নেই। কারণ সে কাজ আরও বহু খণ্ডেও কি শেষ করা সম্ভব হত? কিন্তু তবু এ বিস্তৃত সংকলন গ্রন্থ থেকে বাঙালী পাঠক হিসাবে আমরা প্রাচীন সামাজিক অনেক আচার-বিচার, চিন্তা-ভাবনার একটা ধারণা করতে পারি। আর, এ জন্য আমরা এই পণ্ডিত ও পরিশ্রমী গ্রন্থকর্তার নিকট কৃতজ্ঞ।

গোপাল হালদার

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী : গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী

গিরিজা চক্রবর্তীর মৃত্যু-সংবাদ জনকয়েক বাঙালীর কাছে পৌছেচে, কিন্তু কোনো সম্পাদকীয় মন্তব্য নজরে পড়ল না। তাঁর মৃত্যুতে দেশের, বিশেষত বাংলার, ক্ষতি হল, কারণ তিনি ছিলেন সুগায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, উচ্চ সঙ্গীতের প্রতিভূ, এবং একাধারে ভারতীয় ঐতিহ্যের জীবনশক্তি ও বাংলার পরীক্ষাশীলতার জ্বলন্ত প্রমাণ। নতুন ভারতের কৃষ্টির সৃষ্টিতত্ত্ব ও পতনোন্মুখ বাংলার উত্থানমন্ত্র হিসাবে এই ঘটনাকে না দেখে আমরা কর্তব্যহীনতার পরিচয় দিলাম। কিন্তু দেশ থেকে মূল্যজ্ঞান এখনও লুপ্ত হয় নি ভেবে গিরিজাবাবুর কৃতিত্ব সম্বন্ধে যৎসামান্য লিখছি। তাঁর বিষয়ে বলবার অধিকার আমার অপেক্ষা অন্যের বেশি আছে, যেমন ডাঃ অমিয় সান্যালের, কিন্তু তাঁরা যখন এখনও নীরব তখন আমাকেই এই নিতান্ত অসম্যক প্রবন্ধ লিখতে হল।

গিরিজাবাবু বহরমপুরের বড়ো ঘরের ছেলে। অল্প বয়সে তিনি সঙ্গীতে আকৃষ্ট হন। তখন রাধিকা গোস্বামী আদি-ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর দরবারে থেকে একটি উচ্চ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চালাচ্ছেন। গিরিজাবাবু গোঁসাইজীর শিষ্য হলেন। প্রত্যহ তালিম নিতেন, এবং প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রেওয়াজ করতেন ধ্রুপদ-ধামার। এই শিক্ষার্থী অবস্থায় আমি তাঁর প্রথম গান শুনি। যাঁরা ইদানীংকার গিরিজাবাবুর গায়নের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা হয়ত ভাবতে পারবেন না যে তাঁর কণ্ঠ কি অদ্ভুত শক্তিশালী ছিল। ধ্রুপদ শিক্ষার ফলই তাই। তানপুরার অবলম্বন, ধ্রুপদের অলঙ্কারবিহীন ঋজু ও দৃঢ় স্বরাশ্রয় ও সুরপ্রকরণ, তার শুদ্ধতা ও গাম্ভীর্য কণ্ঠস্বরের স্বরাজ স্থাপন করে। গোঁসাইজীর শান্ত ঘন স্বর আর গিরিজা বাবুর সাবলীল সুগম্ভীর কণ্ঠক্ষেপ মৃদঙ্গের গর্জন ছাপিয়ে উঠেছিল। রাগও ছিল কেদারা। ছয় বৎসর গিরিজাবাবু ধ্রুপদ শিক্ষা করলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদিয়ার কাছে।

তার পর গিরিজাবাবু কলকাতা চলে এলেন। আসাটা হঠাৎ হলেও তার মানসিক ইতিহাস ছিল দীর্ঘ। ধ্রুপদ-ধামারে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন যে ধ্রুপদী সংযম ও সংহতি তাঁর কল্পনার প্রতিকূল। ধ্রুপদের স্মার্ত বিধান তাঁর আধুনিক মনের শ্বাসরোধ করল। তিনি স্থির করলেন যে বাঁধা-ধরা নিয়মের শিকল না ভাঙলে তাঁর প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব। এই রোম্যাণ্টিক, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মনোভাব সেই যুগের একমাত্র বিদ্রোহ-পতাকা ছিল ; অন্য কোনো উপায়ে

মানুষ তখন নিজের নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না। ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, সর্বক্ষেত্রেই দেখি তাই। অতএব তাঁর ধ্রুপদ পরিত্যাগকে ধর্মচ্যুতি বলে কোনো লাভ নেই, যেটা তখন তাঁর সম্বন্ধে বলা হত। কিন্তু তখনও তিনি ঠিক করতে পারেন নি ত্যাগ ও ভাঙনের পর কি গ্রহণ ও সৃষ্টি করবেন। ব্যাপারটি নাটকীয় হয়ে উঠল যেদিন গিরিজাবাবু প্রথম মৈজুদ্দিন খাঁর ঠুংরী শুনলেন। আর তাঁর দ্বিধা রইল না।

সে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরেরও আগের কথা। তখন সামন্ত রাজ্যগুলি নির্জীব হয়েছে; সেখানকার সভাগায়করা শহর মুখে ছুটেছেন; শহরে নতুন ধনী ও চিরস্থায়ী জমিদার তাঁদের পোষণ করছেন, কদর দিচ্ছেন। তখন ধ্রুপদের আসরে দশ-লাখী কলকাতায় হাজার দু' হাজার শ্রোতা জমে, সঙ্গীত-সমাজের সামনে একশো জুড়িগাড়ি রাস্তা জুড়ে থাকে। কিন্তু তখনই সমাজ ও রুচির অন্তরে একটা ফাটল ধরেছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রূপান্তরে, থিয়েটারের ও যাত্রার গায়ন পদ্ধতিতে, এবং গিরিজাবাবুর অনুরাগ পরিবর্তনে। বাঙালীরা তখনও ভালো খেয়াল শোনে নি। আলি বক্স, শ্রীজান ও গহর জান বড় খেয়ালিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু ক'জনই বা তাঁদের গান শুনতে পেতেন। এই সময় গণপৎ রাও গোয়ালিয়র থেকে কলকাতায় এলেন, সঙ্গে আনলেন এক অখ্যাত যুবককে। এই সুদর্শন, অশিক্ষিত প্রতিভার নাম মৈজুদ্দিন খাঁ। এঁদের আসর জমত চুনির্চাদের বাগানে ও হ্যারিসন রোডের ওপর ওভারটুন হলের প্রায় সামনা-সামনি একটা তেতলা বাড়িতে। সেখানে থাকতেন শ্যামলাল ক্ষেত্রী, আর আসতেন বহু মাড়োয়ারী, যেমন রাজাবাবু (বর্মণ), তিনুবাবু, চুনিবাবু, আর বাঙালীদের মধ্যে গিরিজাবাবু, অমিয় সান্যাল প্রভৃতিরা। বহু গণ্যমান্য বাঙালী ঘরওয়ানার সঙ্গে এঁদের বন্ধুত্ব ছিল বটে, কিন্তু তাঁরা পদধূলি দিতেন না। এবং যাঁরা দিতেন তাঁরা সাধারণত হত-চ্ছাড়ার দল, যাদের পেশা ছিল গান শুনে বেড়ানো ও লুকিয়ে লুকিয়ে গান-বাজনা শেখা। এই আড্ডায় গিরিজাবাবুকে আবার দেখলাম। গণপৎ রাও বাজাচ্ছেন হার্মনিয়ম, মৈজুদ্দিন গাইছেন ঠুংরি, আর গিরিজাবাবু তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে সেই অদ্ভুত গান গিলছেন। এই কেন্দ্রটি থেকে আধুনিক লচাও ঠুংরি উৎপন্ন হয়। তার ভাববিকাশ, তার তান-কর্তব, তার মেজাজ লক্ষ্নৌ ও বেনারসের পূরবী ঠুংরি থেকে ভিন্ন। গহর জান, মালকা জান কলকাতায়, এবং লক্ষ্নৌএ চৌধুরাণী ভগ্নীদ্বয় যখন এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেন তখন ভাবের বন্ধন গেল খুলে। গিরিজা-বাবু এই বন্যায় গা ভাসালেন। সত্যই গা ভাসানো, কারণ হঠাৎ একদিন বাড়ির কাউকে না বলে ক'য়ে ছুটতে ছুটতে হাওড়া স্টেশনে এসে তিনি রামপুর-বেরিলির গাড়ি ধরলেন। গণপৎ রাও—তিনি সিন্ধিয়ার ভাই—একটি দল নিয়ে সঙ্গীতের তীর্থযাত্রা করছিলেন, গিরিজবাবু হলেন তাঁদের সঙ্গী।

এবার সুরু হোলো বড়ো গাইয়ের গান শোনা ও বিশেষ করে খেয়াল শিক্ষা তখনও ছম্মন সাহেব, এনায়েৎ খাঁ, মজফ্‌ফর খাঁ জীবিত। গণপৎ রাও-এর খাতিরে তাঁরা সাদরে গিরিজাবাবুকে পাকা গান শেখান। এঁদের খেয়াল ধ্রুপদাঙ্গের, তাতে গিরিজাবাবুর সুবিধাই হল। পূর্ব শিক্ষার কৃপায় তিনি অতি সহজে পাঁচ ছ'শ খেয়াল গান শিখলেন ও স্বরলিপি টুকে নিলেন। বছর দুই তিন পরে যখন গিরিজাবাবু দেশে ফেরেন তখন তিনি উঠতি খেয়ালিয়া। কিন্তু এই ব্যুৎপত্তিও তিনি ত্যাগ করলেন। কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন বাঙালী খেয়াল কেয়ার করে না। আমার মনে হয় তা ছাড়া অন্য কারণ ছিল। মৈজুদ্দিনের প্রভাব তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছিল; কেবল মৈজুদ্দিন নয়, তাঁর শিষ্য মল্‌কা জানেরও। ইতিমধ্যে তিনি বাদল খাঁর কাছে ছোট খেয়ালের তালিম নিতে আরম্ভ করেছেন। এই বৃদ্ধ, ভুতপূর্ব সারেঙ্গী-বাদক বাদল খাঁ-ও গণপৎ রাও ও শ্যামলাল বাবুর আবিষ্কার। তাঁর কাছে বহু অতি-সুমিষ্ট বন্দেশী ছোট খেয়াল গান ছিল। ক্রমে সেগুলিই হল গিরিজাবাবুর প্রধান অবলম্বন। নিতান্ত কম লোকে গিরিজাবাবুর মুখে রামপুরী ধামার ধ্রুপদ কি খেয়াল গান শুনেছেন। তিনি বাদল খাঁনী খেয়ালই গাইতেন লোকে জানে। কিন্তু সেই রাধিকাবাবুর ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গের রামপুরী খেয়ালই ছিল তাঁর ভিত্তি ও ভূমিকা এবং ঠিক এই কারণেই তাঁর ঠুংরী অত রসালো। কেবল ঠুংরী নয়, বাংলা গানও। যিনি তাঁর মুখে 'আর তো যাব না সই যমুনার জলে, ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন-সলিলে' শুনেছেন তিনিই আমার কথায় সায় দেবেন। যেমন ভীমপলশ্রীর অপূর্ব রাগচ্ছটা, তেমনই ঐ রাগের করুণার সঙ্গে ভাষার মিলন! শুনতে শুনতে এক এক সময় মনে হত যেন গিরিজাবাবুর বাঙালীত্ব তাঁর অর্জিত সমস্ত হিন্দুস্থানী গায়ন-পদ্ধতিকে ধুয়ে মুছে দিল। একটু ভাবলেই বুঝতাম ঐ অর্জিত শিক্ষা না থাকলে গানটি যাত্রার 'ভীমপলাশ'ই হত।

তবু সন্দেহ হয় যে গিরিজাবাবুর ধর্ম, অর্থাৎ প্রধান গুণ ছিল মেজাজ, ওস্তাদী রাগবিস্তার নয়। তিনি বিস্তার ভালোই জানতেন, কিন্তু রাগের চেয়ে গানটিকে বেশি শ্রদ্ধা করতেন বলে তিনি গানের রসকেই ফুটিয়ে তুলতেন। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এই বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা একটি যুগের নিদর্শন। ধ্রুপদের দিক থেকে তাঁর পদ্ধতিকে অধোগতি বলা যায় বটে, কিন্তু সঙ্গীতের ইতিহাসে এই গতিটা অবশ্যম্ভাবী, এবং তাই তার একটি বড় রকমের মূল্য আছে। সেই মূল্যের সঙ্গে সাঙ্গীতিক মূল্য চমৎকার জুড়ে যেত বলেই গিরিজাবাবুর গান আমাদের চিত্ত হরণ করতে পেরেছিল।

আজ দেশে তাঁর বিস্তর শিষ্য। তিনি শেষ কয়েক বৎসর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য আসরে গাইতেন না। কয়েক বৎসর আগে একটি বড়ো আসরে আমি তাঁকে ছম্মন সাহেবের ধামার ও খেয়াল গাইতে অনুরোধ করি। অনুরোধ জানাই সকালে,

সন্ধ্যায় আসর বসবে, আর থাকবেন সেখানে বহু গুণী। তিনি পুরোনো খাতা খুলে মালিগৌরা ও পূরবা (পূরবী নয়) তৈরি করেছিলেন সারা দিন ধরে। সন্ধ্যায় গাইবার আগে তাঁর নাক দিয়ে ভীষণ রক্তপাত হতে আরম্ভ হল। আমি হাত জোড় করে বললাম, 'গাইবেন না'। তিনি বিরত হলেন না, বললেন, 'ভাই, তুমি বড়ো ভালো গান শুনতে চেয়েছ। বড়ো বেশি কেউ চায় না, আমাকে গাইতেই হবে, মরি আর বাঁচি।' গাইলেন বটে, কিন্তু মাত্র কাঠামোটি। জমল না। বললাম, চমৎকার হয়েছে। তাঁর উত্তর মনে আছে, 'কিছুই হল না জানি, তবু....।' এই বলে তাঁর বড় বড় চোখ জলে ভরে গেল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ল মনে।

গিরিজাবাবুর যুগ গত। নতুন যুগ তবু কৈ? যতদিন না আসে ততদিন একজন শ্রোতা অন্তত তাঁর 'মেজাজের' স্মৃতি বহন করবে। খানদানী হয়ে খানদান থেকে বেরিয়ে আসা, এবং বেরিয়ে এসে অর্জিত জ্ঞান ও সহজাত কল্পনার জোরে আপন গোষ্ঠী স্থাপনা করার মধ্যে অসাধারণ গুণপনা, সাহস ও আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনের সুচারু কলা-বিকাশ, এ অসাধারণত্বের সুন্দরতম নিদর্শনই হোলো 'মেজাজ,' গিরিজা বাবুর গানের মেজাজ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

'পরিচয়'-এর ভবিষ্যৎ

বিগত ১৩৫৩-এর চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর 'পরিচয়' এই আবার প্রকাশিত হইল—প্রায় সাধারণ একটি সংখ্যায় একযোগে ১৩৫৪-এর 'বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়' এই তিন মাসের সংখ্যা এক সঙ্গে বাহির হইল; এবং বাহির হইল এখন ভাদ্রমাসের মধ্যভাগে। বলা নিষ্প্রয়োজন 'পরিচয়'-এর অনিয়মিত জীবনেও ইহা অভাবনীয় ব্যাপার।

এই ব্যাপারের জন্য 'পরিচয়'-এর কর্তৃপক্ষ এই হিসাবে আমরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি। যত কারণই থাকুক, এক বৎসরের বারো সংখ্যার স্থানে প্রকৃতপক্ষে দশ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া—তাহাও এত বিলম্বে প্রকাশ করিয়া—দায়িত্বজ্ঞানের দাবী করা যায় না। সে দাবীও আমাদের নাই। কিন্তু 'পরিচয়'-এর গ্রাহক, পাঠক এবং অনুগ্রাহকদের মতো, ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল সম্প্রদায় আর দেখা যায় না। তাই, তাঁহাদের নিকট আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—এবং বন্ধু হিসাবে তাঁহাদের কারণগুলিও জানানো কর্তব্য মনে করি।

কোনো পত্রিকা পরিচালনায় সাহিত্যবুদ্ধি বা সংস্কৃতিগত দায়িত্ববোধই যথেষ্ট নয়। বরং প্রধান প্রয়োজন—বিষয়বুদ্ধি, উদ্যোগ-আয়োজন, ও বিজ্ঞাপন-সংগ্রহশক্তি। সাহিত্যিক গুণাগুণে ঘাটতি পড়িলেও সাহিত্য-পত্রের দিন চলে, কিন্তু ঘাটতি বাজেট লইয়া রাজনীতিকদের যাহাই হউক সাহিত্যিকদের দিন অচল হইতে বাধ্য। বিশেষত, গত বৎসরের মুদ্রাস্ফীতি ও দরস্ফীতির বাজারে কাগজ ও মুদ্রণের ব্যয় অকল্পিতরূপে বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে 'পরিচয়'-এর বিজ্ঞাপন-ভাগ্যও মন্দ। তাই প্রত্যেকটি কপি 'পরিচয়'-এর যে দাম 'পরিচয়'-কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত হইতেন, প্রত্যেকটি কপি 'পরিচয়' বাবদ খরচ পড়িত তাহার অপেক্ষা প্রায় ছয় পয়সা বেশি। অথচ ঠিক এই সময়েই 'পরিচয়'-এর গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, অর্থাৎ 'পরিচয়'-এর ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণেও 'পরিচয়' নিশ্চয়ই সংকটের মুখে গিয়া পড়িত, কিন্তু সেই সংকট সন্নিকট হইয়া আসে আকস্মিক রাজনৈতিক উপদ্রবে। পরিচালক-মণ্ডলীর একাধিক

সহযোগীই তাহাতে বন্দী হন ; শুধু তাহা নয়, 'পরিচয়'-এর মুদ্রণালয় 'গণশক্তি প্রেস' হইতে 'পরিচয়' বঞ্চিত হয়, এবং এই সময়ে স্থায়ী মুদ্রণ-ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় 'পরিচয়'-এর নিয়মিত প্রকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এইরূপ অবস্থায় নীরবেই 'পরিচয়' সাধারণের নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিত ;—হয়তো তাহাতে পরিচালক-বর্গও সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। কিন্তু স্বীকার করিতেছি—দুর্বুদ্ধি এখনো আমাদের তিরোহিত হয় নাই। তাই পরিচয়-কর্তৃপক্ষ নূতন করিয়া স্থির করিয়াছেন ঃ

১। **'পরিচয়'-এর বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকমূল্য এখন হইতে যথাক্রমে ন' টাকা ও সাড়ে চার টাকা হইবে।** নগদ দাম সেই অনুপাতে এখনো সাধারণত বারো আনা থাকিবে।

২। নূতন প্রেস ও কার্যারম্ভের জন্য এই অষ্টাদশ বৎসরের পরিচয় শ্রাবণ হইতে না বাহির হইয়া কার্তিক হইতে বাহির হইবে। **আগামী বৎসরের প্রথম সংখ্যা (কার্তিক) শারদীয় সংখ্যারূপে পূজার পূর্ব্বেই আশ্বিনের প্রথম দিকে প্রকাশিত হইবে।**

৩। **গ্রাহকবর্গ উহা ভি, পি, যোগে পাইবেন।** আশা করি, যথানিয়মে গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিবেন।

৪। গত বৎসরের কোন গ্রাহকের বারো সংখ্যার পরিবর্তে কার্যত দশ সংখ্যা প্রাপ্তিতে আপত্তি থাকিলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানাইবেন ; তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানের আমরা চেষ্টা করিব।

'পরিচয়'-এর প্রকাশে উহার কর্তৃপক্ষ যতটা উৎসাহী 'পরিচয়'-এর পাঠক ও গ্রাহকবর্গ তদপেক্ষা কম আগ্রহান্বিত নন,—বিজ্ঞাপনদাতারাও সম্ভবত জানেন তাঁহাদের ক্ষতি হয় না, লাভই হয়।—তাই আবার দুঃসাহসে ভর করিয়া 'পরিচয়' প্রকাশের সংকল্পে আমরা অটুট রহিলাম। ইতি ৩০।৮।৪৮ইং

গোপাল হালদার

সম্পাদক-মণ্ডলী ও 'পরিচয়'-এর কর্তৃপক্ষদের পক্ষে

[দ্রষ্টব্য : 'পরিচয়'-এর নূতন কার্যালয় 'পরিচয়', ১২ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২—এই ঠিকানায়, স্থানান্তরিত হইল। ঐ ঠিকানায় টাকাকড়ি চিঠিপত্র প্রভৃতি প্রেরিতব্য।]